

নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচন

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড প্রথম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। ভব	...	১
২। অন্তর্যামী (কবিতা)	...	৪
৩। নূতনে পুরাতনে	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৫
৪। যুগালের কথা (গল্প)	...	২০
৫। বুদ্ধধর্ম	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫৭
৬। হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব	শ্রীরজেন্দ্রনাথ মীল	৭১
৭। পৌরাণিকী কথা	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫
৮। বৃন্দাবন (ভ্রমণ)	শ্রীকলধর সেন	৯৭
৯। আমার শিল্প	শ্রীমতী সরযুবালা দাসগুপ্তা	১০৯

কার্যালয় :—২০৮১২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সাথী প্রেস

২১১, পটুয়াটোলা লেন, হারিসন রোড, কলিকাতা
শ্রীহেমচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

P29967

নারায়ণ

স্তব

নমস্তে নারায়ণ !

তুমিই জীবের জীবনভূমি । সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন । আমাদের এই হাসি-অশ্রুস্রব জীবন, সুখে-দুঃখে পরিপূর্ণ সংসার,—ইহাকে বাঁচাইয়া, জাগাইয়া রাখ একমাত্র তুমি ।

তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া-পুত্তলিকা । তুমি যখন আপনাকে লুকাইয়া রাখ তখনই সংসার মায়ার খেলা হইয়া উঠে । তুমি সৃষ্টিকে সত্য করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ । সকল সংসার তোমার লীলাভূমি ।

নায়কনায়িকার মাধুর্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখার সখ্য এবং প্রভু ও দাসের একদিকে স্নেহ ও অপরদিকে ভক্তি—এইসব লইয়াই ত সংসার, এইসব লইয়াই ত জীবের জীবন । তুমিই ত এই সকল রসকে সার্থক কর । সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য তুমি ; আর যাহা কিছু সব ত উপলক্ষ্য ।

ওই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন, ঐ বাৎসল্যরস ত তোমারই দিকে

- ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শিশুর মধ্যে যে জননী শিশুরূপী তোমাকে না দেখিতে পান, তাঁহার বাৎসল্যের সার্থকতা কোথায়? তুমি যখনি তাঁহার প্রাণে ওই শিশুরূপে আবির্ভূত হও, তখনি তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম আনন্দ তিনি তখনি উপভোগ করেন। নায়কনায়িকার যে মাধুর্যরস তাহাও তোমারই পানে প্রবাহিত হয়; যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনি তুমি নায়কনায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়। তাহারা হাসি-অশ্রুজলে, চুম্বনে, পরশে, তোমারই মাধুর্যরসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়, সকল দাস্যের তুমি যে প্রভু। যতক্ষণ তুমি সখারূপে প্রভুরূপে, না দেখা দাও, ততক্ষণ তাহারা “কই সখা, কই প্রভু” বলিয়া এই সংসার অরণ্যে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমিই তাহাদের সখ্য ও দাস্যকে সার্থক করিয়া তুল।

সকল জীবের তুমি একমাত্র আশ্রয়, সকল নরের তুমি সমষ্টি, সকল নরসমাজের তুমি ব্যষ্টি, সকল জাতির তুমিই জাতীশ্বর। তুমিই বিশ্বমানব;—অতীত মানব তোমারই বৃকে লুকাইয়া আছে, বর্তমান মানব তোমারই জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনবাণুন করিতেছে; আর মানব যাহা হইবে, তাহার সমুদায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এক অপূর্ব অসংখ্য-দল পদ্যের মত তোমারই বন্ধে ফুটিয়া আছে। তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; অনাদি তুমি, আদি তুমি; অনন্ত তুমি, সান্ত তুমি। তুমিই নরনারায়ণ।

তুমি যেমন জীবের অবলম্বন, জীবও যে তেমনি তোমার অবলম্বন। প্রভো! জীব ছাড়াও তোমার চলে না। লীলা-প্রয়োজনহেতুই তুমি জীবকে তোমার বন্ধ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিলে। সে জীব ছাড়া তোমার লীলা সম্ভব হয় না। তুমি নিত্যই এক, আর নিত্যই দুই হইয়া আপনার মধ্যে লীলা কর। তুমি এক হইয়াও

লীলারসে বিভোর হইয়া অনন্তরূপ ধরিয়া বিশ্বসংসারে বিচরণ কর।
তুমি যখন তোমার বিশ্ববীণায় ঝঙ্কার দেও তখন সকল বিশ্বের কবি
গান গাহিয়া উঠে। কা'র সে সঙ্গীত, প্রভো! তুমি ছাড়া কেই তাহা
সম্ভোগ করে। তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহদান কর,—আবার
তুমিই-সন্তান হইয়া সে স্নেহের দাবী কর। তুমি প্রভু হইয়া
দাসকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুকে প্রাণের
ভক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার
তুমিই সে রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিক্ষারী
হইয়া গ্রহণ কর। তুমিই নায়কনারিকা হইয়া প্রেমলীলার অভিনয়
কর। তুমিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও,
তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে প্রেমচূষন চুরি করিয়া আশ্বাদ কর।

সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আশ্বাদন-
কারী। আমাদের সকল কর্মের তুমি কর্তা, সকল ধর্মের তুমি
ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্ত-
রূপী নারায়ণ! তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা
উন্মোচিত হয়, তখন বুঝিতে পারি ইতিহাস শুধু তোমারই লীলাপরি-
পূর্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর
জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই
বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্বকৃতি। ধন্য
জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা!

নমস্তে নারায়ণ!

অন্তর্যামী

যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই,
মনে রেখো আমি শুধু তোমারেই চাই !
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সে দিন হইতে, বঁধু ! আলোকে আধারে,
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে !
তোমারে পেয়েছি কি গো ? তা'ত মনে নাই, —
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই !
শৈশবে পথের ধারে করিয়াছি হেলা,
সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা ?
সে দিন তোমারে, বঁধু ! পারিনি ধরিতে,
আমার খেলার মাঝে গোরে খেলাইতে !
প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে,
ঘোবনে সকল মনে আপনা বিকাই ;
পুষ্পিত, বঙ্কত সেই, আলোক আগারে,
কেমনে রাখিলে, বঁধু, আপনা লুকাই !
আমার স্মৃতির মাঝে স্মৃতি খুঁজি নাই,
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে, তোমারে শুধু ! পাই বা না পাই ; —
বঁধু হে ! তোমারি লাগি আকুল পরাণ !
বঁধু হে ! বঁধু হে ! আমি তোমারেই চাই,
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই !

নূতনে পুরাতনে

ইংরাজি শিখিয়া, যুরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া, একদিন আমরা নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহার জন্য একটুও দুঃখ করি না। গতানু-
গতিক শ্রদ্ধাটুকু একবার একরূপভাবে ভাঙ্গিয়া না গেলে সভ্যশ্রদ্ধা-
লাভ কখনই সম্ভব হইত না।

তখন আমাদের চক্ষে নিদেশের প্রায় সকলই ভাল লাগিত, আর
স্বদেশের (প্রায় সকলই সম্ভাবিস্থর মন্দ ঠেকিত। সে ভাবটা ক্রমে
কাটিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা
স্বদেশের) যাহা কিছু তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি সেইরূপ
বিচারবিবেচনা-বিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই ভাল
বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। একদিন আমরা বেড়া
ভাঙ্গিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম; আজ সে দিকে বাড়ি খাইয়া,
ফিরিয়া আসিয়া ঐ পুরাতন ঘরকেই অচলায়তন করিয়া তুলিতেছি।
সত্য কথাটা তাহা নয়।

যখন আমরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম, তখন ঐরূপ
বাহিরে যাওয়াই আমাদের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।
যে সকল মমতা কাটাইয়া কোনও দিন ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়
না, সে ঘরের মর্যাদাও কখনও বুঝিতে পারে না। প্রবাসের বেদনা
ও পরদেশীর উপেক্ষা সহিয়াই লোকে আপনার ঘর ও আপনার জন
যে কি বস্তু, ইহা সত্যভাবে বুঝিতে পারে। যে ঘরের কোণে বসিয়া
থাকি, কিংবা হৃদমুদ উঠানে যাইয়া নিরাপদে দাঁড়াইয়া দূরের পথের
আরছায়ার ধ্যান করে, তার পক্ষে এ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না।

ফলতঃ, যে মন বাহিরে ছুটিয়া গিয়াছিল সেই যে ঘরে ফিরিয়া
আসে, তাহাও নহে। সেই মানুষই আসে বটে, কিন্তু সে মন
আসে না। নূতন প্রেম নূতন দৃষ্টি লইয়া সে ঘরে ফিরিয়া আইসে।

আগে যে বস্তুকে যে চক্ষে দেখিত, সেই চক্ষেই যে এখনও দেখে, তাহা নয়। সে চক্ষু থাকিলে, সেই ভাবও থাকিত। সে ভাব থাকিলে, সে পুরাতন অভক্তিও থাকিত। ভাবের পরিবর্তন না হইলে, যেখানে অশ্রদ্ধা ছিল, সেখানে শ্রদ্ধা জাগে না।

“শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সূদৃঢ় নিশ্চয়।” আমাদের স্বদেশের প্রতি এই বিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছে। এই নববিশ্বাসই আমাদের নূতন স্বাদেশিকতার প্রাণ। আর কেবল বর্তমানের সত্যের উপরেই নহে, কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপরেও এই নূতন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কা’র ভিতরে কতটা কি সম্ভাবনা আছে, ইহা দেখিতে হইলে, প্রেমের কাজে চক্ষে মাখিতে হয়। লোকে বলে বটে, প্রেম অন্ধ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেম যতটা দেখে, অপ্রেম বা ঔদাসীণ্য তার শতাংশের একাংশও দেখিতে পার না। অপ্রেম অপূর্ণতাই খুঁজিয়া বেড়ায়, কারণ যাহা দেখিতেছে তাহার মধ্যে সুন্দর ও পরিপূর্ণ কিছুই নাই, এই জ্ঞান বা ধারণাকে আশ্রয় করিয়াই অপ্রেম বাঁচিয়া থাকে। যার জীবনের জন্য যে বস্তুর যেটুকু প্রয়োজন সে তা’ই খুঁজিয়া নেয়। আর অপ্রেম যেমন বস্তুর মন্দটাই দেখে, ঔদাসীণ্য সেইরূপ বস্তুর উপরটা মাত্র দেখে। এক প্রেমই বস্তুর সকলটা দেখে, ছায়ার সঙ্গে তার আতপটুকুও দেখে, মন্দের সঙ্গে তার ভালটুকুও দেখে, বস্তুটা যেমন আছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে ক্রিপে, তাহা কত বড়, কত সুন্দর হইতে পারে, ইহাও প্রত্যক্ষ করে। বস্তুর সমগ্র জ্ঞানের উপরেই প্রেম গড়িয়া উঠে। সুতরাং প্রেম যতটা দেখে, আর কেউ ততটা দেখিতে পারে না।

স্বদেশকে আমরা যখন অশ্রদ্ধা করিতাম, তখন তাহার প্রতি আমাদের এই প্রেম জন্মায় নাই। প্রেমের অভাবে তার বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছিলাম, ভিতরটা দেখিতে পাই নাই, তার এক দেশ মাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সমগ্রকে চাক্ষুষ করিতে পারি নাই। আজ নূতন প্রেমে সেই পূর্ণবস্তুকে দেখিতেছি বলিয়াই, তার

মন্দের সঙ্গেই যে ভালটুকুও জড়াইয়া আছে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর ঐ ভালটুকুর জন্যই জোর করিয়া মন্দটুকুর উপরে আঘাত করিতে ভয় পাই।

ফলতঃ, ভাল মন্দ দুটা এমন একান্ত বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় যে, একটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়। টানাহিঁচড়া করিয়া কোনও জীবন্ত বস্তুর গঠনগত বা প্রকৃতিগত ভাল-মন্দকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করা যায় না। জীবন্ত বস্তুর ভালটাকে বাড়াইয়া দিয়া ও ফুটাইয়া তুলিয়াই ক্রমে ক্রমে তার মন্দটাকে নিরস্ত করিতে হয়। এক্ষেত্রে আর কোনও উপায়ান্তর নাই। জোরজবরির করিলে শেষে জীবের জীবন লইয়াই টান পড়ে।

এই জন্যই জোরজবরদস্তি করিয়া কাহাকেও ভাল করিতে ভয় পাই। নিজের পুত্রকন্যার উপরেও জোর চালাইতে চাহি না, নিজের সমাজের উপরেও নয়। যার প্রকৃতিতে যা নাই, বাহির হইতে বা উপর হইতে তার উপরে তাহা চাপাইতে গেলে তাহাতে কোনও ইফ্ট হয় না, বরং অনিষ্টেরই আশঙ্কা বেশী হইয়া থাকে।

এক দিন এই জ্ঞান জন্মায় নাই। তাই যুরোপের ভালটাকে তখন জোর করিয়া আমাদের নিজেদের সমাজের বাড়ে চাপাইয়া, তাহাকে যুরোপের মতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। যুরোপ যে যুরোপ, আর ভারত যে ভারত, এরা যে দুইটা বিশিষ্ট সমাজ, এবং বিশিষ্ট বলিয়াই যে ইহাদের নিজস্ব একটা অন্তঃপ্রকৃতি, এবং সেই প্রকৃতি অনুযায়ী এক একটা বহির্গঠন আছে; আর সমগ্র, সম্পূর্ণ, মনুষ্যত্বের গোটা বীজটা যে সমভাবে উভয় সমাজের গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে, ঐ বীজকে ফুটাইয়া তুলি যে উভয়েরই সমান লক্ষ্য, উহাতেই যে উভয় সমাজেরই চরম সার্থকতা,—এ সকল কথা তখন বুঝি নাই। বৈষম্যের ভিতর দিয়াই যে সাম্য, বিচিত্রতার মধ্য দিয়াই যে প্রকৃত একত্ব আপনাকে নিয়ত অভিব্যক্ত করিয়া থাকে; বৈষম্য না থাকিলে সাম্য যে অবস্থাতে, আর বিচিত্রতা না থাকিলে একত্ব যে কৃষ্ণ হুঙ্কার

প্রভৃতির ন্যায় কেবল একটা ভাববাচ্যের পদে পরিণত হয়, একথা তখনও জানি নাই। সুতরাং খোদার উপর খোদকারি করিতে যাইয়া দুনিয়াটাকে একাকার করিতে চাহিয়াছিলাম। ঐ মায়া এখন কাটিয়া গিয়াছে। দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টিও হয় নাই। সুতরাং দুনিয়ার ভাল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দুনিয়া-শুদ্ধ লোকে মন্দ বলিতেও আর প্রবৃত্তি হয় না।

এই ভাল-মন্দ জড়াইয়াই দুনিয়ার সত্য ভালটা গড়িয়া উঠে। পচাফাটাকে কোনও দিনই বোধ হয় কেউ ভাল বলে না। অথচ বীজ প্রত্যক্ষতঃ যতক্ষণ না পচিতে আরম্ভ করে, ততক্ষণ তার অকুর-জাত হয় না। অণুকার মন্দ অনেক সময় কল্যাকার ভালই অগ্র-দূত হইয়া আইসে। সকল সাধুরা এই কথা বলিয়াই ত জীবকে সাধুনা দিয়া থাকেন। জ্বাখেরী ভালর উপরে তাঁদের অটল আস্থা আছে; আমাদের নাই বলিয়াই আমরা পদে পদে এত বিচলিত হইয়া পড়ি।

আমাদের নিজেদের প্রকৃতির ভিতরে আমাদের সমাজেরও প্রাণের মূলে, তার পক্ষে যাহা ভাল, আর দুনিয়ার পক্ষে যাহা ভাল, তাহা সকলই বীজাকারে লুক্কাইয়া আছে। এই ভালটাকে সংগ্রহ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বাহিরে যাওয়া নিপ্রয়োজন। একথাটা এক দিন জানি নাই ও বুঝি নাই বলিয়াই স্বদেশের দিকে পিছন ফিরিয়া বিদেশের দিকে ছুটিয়াছিলাম। তবে ছুটিয়াছিলাম ভালই জন্য। ঐ ভ্রান্তিটুকু না হইলে, আজ যে সমস্ত লাভ করিয়াছি, তাহারও পরীক্ষা হইত না। আমাদের ভাল যে আমাদের ভিতরেই আছে, তাহাকে ভিতর হইতেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, বাহির হইতে আগিয়া আনা নিপ্রয়োজন, ইহা বুঝিবার জন্যই বাহিরে গিয়া ভিতরের ভালটাকে একবার খুঁজিতে হয়। ইহা বিধাতারই বিধান। ঐ ভুল করিয়াছিলাম বলিয়াই এই সত্যটাকে আজ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি।

ইংরাজি পড়িয়া যুরোপের সভ্যতার রূপরসে মুগ্ধ হইয়া আমরা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে একটা বিরোধ বাধাইয়া বাহিরে ছুটিয়া গিয়াই এই সত্যটা লাভ করিয়াছি বলিয়া, সেই বিরোধের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করি না। ঐটি না হইলে এইটিও হইত না। আজ আমরা একটা বৃহত্তর, উচ্চতর, গভীরতর সমস্বয়ের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ঐ বিরোধটা বাধাইয়াই এই সমস্বয়ের সন্ধান পাইয়াছি। আজিকার এই সমস্বয়ের পথে দাঁড়াইয়া, পূর্বকার ঐ বিরোধকে জাগাইয়া রাখা বা চাগাইয়া তোলা যেমন অসঙ্গত ও অনিষ্টকর, সেইরূপ ঐ বিরোধ হইতেই যে এই সমস্বয়ের সম্ভাবনা উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথাটা ভুলিয়া যাওয়া বা অস্বীকার করাও অশ্রাব্য। যারা আজিও ঐ পুরাতন বিরোধকেই সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া জাগাইয়া রাখিতে চাহে, তারা যেমন এই সমস্বয়ের বাধা জন্মাইতেছে, অন্য দিকে যারা ঐ বিরোধটার মূল্য অস্বীকার করে, তারাও এই সমস্বয়ের প্রকৃত মর্ম্ম যে কি ইহা জানে না ও বোঝে না। ঐ বিরোধের মূল্য যে বোঝে না, এই সমস্বয়ের মর্যাদাই বা সে জানিবে কিসে ?

সমস্বয় মাত্রেই, যে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই পূর্ণ দাবীদাওয়া কিছু কাটিয়া ছাটিয়া একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার শ্যায় মীমাংসা করিয়া দেয়। সুতরাং এই সমস্বয়মুখে পূর্বের আমরা যে দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলাম, তার কিছু পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। কিন্তু কোনও সমস্বয়ই বিপরীত পথ ধরিয়া চলে না। গতির বেগটা একটু কমাইয়া বা তার মুখটা একটু ঘুরাইয়া দিলেও, প্রকৃত সমস্বয় মাত্রেই বস্তুকে তার মূল গন্তব্যের দিকেই বাড়াইয়া দেয়। সমস্বয় প্রত্যাবর্তন নহে, অগ্রসর ; প্রতিক্রিয়া নহে, বিকাশ। সমস্বয় মাত্রেই পূর্বকার বিরোধের মূল লক্ষ্যকে সাধন করে, তাহাকে একেবারে নিরর্থক করিয়া দেয় না। মানুষের মন ও মানবসমাজ কেমন করিয়া যে বিকাশের পথে চলে, এইটা যারা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন না, তাঁরাই কেবল কার্পণ্যভিভূত হইয়া এই

সমস্বয়-চেষ্টাকে প্রত্যাবর্তন বা প্রতিক্রিয়া বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন।

তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানবসমাজ একটা সরলরেখার দ্বারা উর্দ্ধদিকে উন্নতির পথে চলে না; আর ঘড়ির পেণ্ডুলাম্ বা পরিদোলকের মতনও একবার বামে আরবার দক্ষিণে দোল খায় না। কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ত্রুতী যেমন তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুঁটীর গায়ে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি স্তরেই, উপরে উঠিবার জন্যই, একটু করিয়া নোচেও নাগিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে একরূপ ত্র্যাক-গতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে,—ইহাকে স্পাইর্যাল মোবন spiral motion বলে। সমাজ বিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইর্যাল, একান্ত সরল নহে। এ গতিতে ঠিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, একবার বামে ঘূঁকিয়া, আবার দক্ষিণে ছুটিয়া যাওয়ার মতন কোনও কিছু নাই। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার গতি, কিংবা পরিদোলকের গতির জন্য একটা সমতল ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এইভাবে এক স্তর হইতে অন্যতর ও উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায় না। আপনার গতি-বেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ উর্দ্ধমুখী ত্র্যাকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়। মানুষের মন ও মানুষের সমাজ যে ক্রমাগতই এরূপ এক স্তর ছাড়াইয়া অন্য স্তরে, এক ধাপ অতিক্রম করিয়া অন্যতর ও উচ্চতর ধাপে যাইতেছে, ইহা ত প্রত্যক্ষ কথা। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া শব্দে কোনও মতেই সত্যবস্তুর নির্দেশ করিতে পারে না।

এই জন্যই বলি, বর্তমানে আমরা যে সমস্বয়ের মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছি, তারই জন্ত পূর্বকার বিরোধটা অত্যাৱশ্যক ছিল। এই সময়ের মুখে আমরা ফিরিয়া নহে, অগ্রসর হইয়াই আসিয়াছি। ঐ বিরোধের পূর্বের আমাদের দেশের সভ্যতা ও সাধনা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, আজ তার চাইতে অনেক উচ্চ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার দেশ-ভক্তি বা পূর্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা এই সত্য কথাটা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না।

আজ দেশবাসী যে একটা সতেজ স্বাদেশিক ভাব জাগিয়াছে, ইহাও ত অস্বীকার করা যায় না। এই নূতন স্বাদেশিকতা যে আমাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষদিগের স্বাদেশিকতা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, তাই কি অস্বীকার করিতে পারি? আর এই যুগের প্রথমে আমরা বিদেশীয় ভাবের প্রেরণার স্বদেশের সঙ্গে যে বিরোধটা বাধাইয়াছিলাম, তাহা যদি না বাধিত, তবে এই শ্রেষ্ঠতর স্বাদেশিকতার কোনই সম্ভাবনা যে আমরা পাইতাম না, ইহাও অস্বীকার করা যায় কি?

আজ আমরা আমাদের স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনাকে অল্পে অল্পে প্রত্যক্ষভাবে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের অব্যবহিত-পূর্ব-পুরুষেরা এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলাভ করেন নাই। যাহা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাকেই তাঁরা সত্য ও সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। দেশের রীতিনীতি, আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্ম, এ সকলকে তাঁরা নিষ্ঠাপূর্বক মাথায় করিয়া বহিয়াছেন; কিন্তু কোনও দিন বোধ হয় মাথা হইতে নামাইয়া নিজেদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন নাই। আর যে বস্তুকে কেবলই মাথায় করিয়া রাখা যায়, চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় না, তার যথার্থ জ্ঞানলাভ কদাপি সম্ভবে না।

বস্তুর তত্ত্ব-নিকূপণ ও উপলব্ধির সত্যাসত্য নির্ধারণকেই আমাদের দার্শনিক পরিভাষায় পরীক্ষা কহে। এই পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। আবার সন্দেহ ব্যতীত পরীক্ষার প্রয়োজনও উপস্থিত হয় না। দরজার সামনে অন্ধকারে একটা লম্বা সরু বস্তু পড়িয়া আছে দেখিয়া, ইহা দড়ি না সাপ, এই সন্দেহ উপস্থিত হইলেই আলো আনিয়া

তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি। দড়ি বা সাপ এ দু'এর কোনও একটা ধারণা স্থির থাকিলে এ ব্যর্থশ্রম-স্বীকার কেহ করে না। অতএব পরীক্ষা ব্যতীত যেমন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না, সেইরূপ জিজ্ঞাসা ব্যতীত পরীক্ষারও সূত্রপাত হয় না। আমাদের অব্যবহিত পূর্ব-পুরুষদিগের মনে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনা, আচার ও অনুষ্ঠান, ধর্ম ও কর্মাদির প্রতি একটা কোমল শ্রদ্ধামাত্র ছিল, কোনও কোনও স্থলে একটা গভীর ভক্তি পর্য্যন্তও দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রযুক্তি না জানিয়াও কেবলমাত্র গতানুগতিক রীতিকে আশ্রয় করিয়া যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাকেই কোমল শ্রদ্ধা কহে। আমাদের শাস্ত্রে এই কোমল-শ্রদ্ধাবান লোকদিগকে নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়াছেন। তবে সাধনবলে

“ক্রমে ক্রমে তিঁহ ভক্ত হইবেন উত্তম—”

এই আশ্বাসও দিয়াছেন। আর জিজ্ঞাসাই এই উত্তম অধিকারলাভের পথে প্রথম অবস্থা। কিন্তু আমাদের অব্যবহিত-পূর্বপুরুষদিগের এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। যাহা প্রচলিত তাহাই প্রামাণ্য, যাহা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সনাতন; তাঁরা এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করিতেন। এগুলি যে অসত্য বা সত্যভাস, নিকৃষ্ট ও অধুনা তন হইতেও বা পারে, তখন পর্য্যন্ত কাহারো মনে এই সন্দেহের উদয় হয় নাই। সন্দেহ না জাগিলে জিজ্ঞাসার, জিজ্ঞাসা না জাগিলে পরীক্ষার প্রবৃ্ত্তি হয় না। এই জিজ্ঞাসা ব্যতীত সত্যসন্ধিৎসা, সত্যসন্ধিৎসা ব্যতীত সাধনে একাগ্রতাও জন্মে না। একাগ্রতা না জন্মিলে ত্যাগের শক্তি জাগে না। ত্যাগের শক্তি না জাগিলে সংস্কার-বর্জনের সাহস, আর সংস্কারবর্জন না করিলে সম্যক বিচারের অধিকার, এবং বিচার ব্যতীত কদাপি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ইংরাজি শিখিয়া, যুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ইতিহাসাদির পুঁথি-গত বিদ্যা অর্জন করিয়া, আমাদের নিজেদের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পাদি সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এখানে নিজেদের ঘরে যাহা দেখিতেছিলাম, ওখানে ঐ সকল গ্রন্থে আর সাহেবদের আচার-

আচরণে তার বিপরীত সব দেখিতে লাগিলাম। আমাদের শাস্ত্রের অর্থ তখন কেহ আমাদিগকে কহেন নাই; কহিবার মতন লোক ও দেশে বেশী ছিলেন কি না সন্দেহ। উহাদের শাস্ত্রসাহিত্যের মর্ম্ম আমাদের চক্ষের সম্মুখেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উহাদের ভাব ও আদর্শ যে কি ইহা আমরা স্বল্পবিস্তর বুঝিতে পারিতাম; আমাদের রীতিনীতির মর্ম্ম যে কি, ইহা কিছুই বুঝিতাম না। উহাদের বাহিরের শিক্ষা আমাদের সকল বাঁধন আল্গা করিয়া দিত; আর আমাদের ঘরের শাসন কেবলই চারিদিকে আমাদিগকে কষিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিত। একদিকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, অপরদিকে কঠোর আনুগত্য। একদিকে ভোগ, অপর দিকে ত্যাগ। এক দিকে প্রত্যক্ষ রূপরসাদি, অপর দিকে অপ্রত্যক্ষ স্বর্গমোক্ষ। এক দিকে প্রবৃত্তির মোলায়েম প্ররোচনা, অপর দিকে নিবৃত্তির নিশ্চয় শাসন। এই দুই শক্তির মাঝখানে পড়িয়া আমরা যে যৌবনের সহজটানে আমাদের ঘরের বাঁধন কাটিয়া ঐ বাহিরের মুক্তির সন্ধানে ছুটিলাম, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কারণ, ঐ স্বাধীনতাই যৌবনের স্ব-ধর্ম্ম। বিধির বিধানই মানুষ যৌবনের প্রেরণায় বহির্বিষয়ের রূপরসের মাঝে আপনার ভিতরকার সার্থকতা খুজিয়া থাকে। আমাদের নিজেদের সভ্যতায় ও সমাজে এই সহজ যৌবন-ধর্ম্মের উপযোগী সাধন সে সময়ে একপ্রকার লোপই পাইয়াছিল। যুবা বৃদ্ধ সকলে একই বিধি-নিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আশ্রমবিহীন হইয়া, কেবলমাত্র বর্ণভেদে পরিণত হইয়াছিল। কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্য, যৌবনে গার্হস্থ্য, প্রৌঢ়ে বানপ্রস্থ, বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস—এসকলের কোনও কিছু ছিল না; ছিল কেবল বিধি-নিগড়বদ্ধ গার্হস্থ্য, আর অস্বাভাবিক মর্কট বৈরাগ্য ও উচ্ছৃঙ্খল সহজীয়া সন্ন্যাস। শাস্ত্র ছিল, তার অর্থ কেহ জানিত না; আচার ছিল, তার বিচার কেহ করিত না। ধর্ম্ম ছিল, তার মর্ম্ম কেহ বুঝিত না। সমাজ একদিকে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষণ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত কাম্যকর্ম্মজাল,

পূজা-অর্চনার সংকল্প ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া—“রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি”—বলিয়া সকল সংসার-কামনাকে প্রদীপ্ত করিয়া দিত।

আমরা যে আকস্মিক উদ্ধাপাতের মতন পূর্বাপর সম্পর্কশূন্য হইয়া আকাশ হইতে এদেশের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা নহে। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণের দোষগুণের বোঝা মাথায় লইয়া তাঁহাদের কর্মভারক্ষয় করিবার জন্যই এদেশে আসিয়া জন্মিলাম। ঐ বিধির বাঁধনের ভিতরেই এবং ঐ সমাজশাসন সঙ্কেত, তাঁহাদের মর্মে মর্মে যে সকল কামনা ও বাসনা গুহ্য নিব্বিরগর্ভে গুপ্ত-ফোয়ারার মতন দিবানিশি স্ফুরিত হইত তাহাই আমাদের এই নূতন শিক্ষা ও সাধনার প্রেরণায় বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তাঁরা যাহা চাহিতেন, কিন্তু পাইতেন না; যে বন্ধনের ক্রেশই তাঁরা অনুভব করিতেন, কিন্তু তাহাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া মুক্ত হইবার মতন শক্তি ও সাহস তাঁদের ছিল না; আমরা এই নব-শিক্ষায় নূতন শৌর্য অর্জন করিয়া সেই বস্তুর পশ্চাতে প্রকাশ্যে ছুটিয়া গেলাম এবং অবলীলাক্রমে সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাদের যৌবনকে সার্থক করিতে লাগিলাম। যে শক্তির সাহায্যে আমরা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার বন্ধনকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম, সে শক্তিও মূলে আমাদেরই দেশের, বিদেশের নহে। ইহাকে স্বাধীনতাই বলি, আর স্বৈচ্ছাচারই বলি, যাই বলি না কেন, ইহার উদ্দীপনা মাত্র কেবল বিদেশের শিক্ষা-দীক্ষা হইতে আসিয়াছিল, মূলে শক্তিটা স্বদেশেরই সভ্যতা ও সাধনার। পূর্বপুরুষদিগের যে বাসনা চরিতার্থ হয় নাই, তাহাই এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের জীবনে নিজ নিজ চরিতার্থতা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোনও শিক্ষাদীক্ষাতেই মূল রক্তের বাঁধনটা নষ্ট করিতে পারে না। সুতরাং আমরা এই বিদ্রোহের মুখেও স্বদেশের ভিতরকার প্রাণস্রোত হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারিলাম না। এই যোগটা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলে আজিকার এই সমস্যার সম্ভাবনা

পর্যাপ্ত থাকিও না। সময়ের বিরোধের নিষ্পত্তি করে, সামাজিক-সমস্যা সমাজগতিকে অনিচ্ছিন্ন রাখিয়াই পরিবর্তিত আধার ও অবৈষ্টনের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া দেয়। সময়ের পুরাতনকে পূর্ণ করে, বিনাশ করে না; নূতনকে সার্থক করে, সংহার করে না।

এই সময়ের-পন্থাকে অনুসরণ করিয়াই আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকল মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্মমীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা বা উত্তরমীমাংসা, উভয় দর্শনই এই সময়ের প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন। উভয়েই প্রথমে শাস্ত্র মানিয়া লইয়াছেন, শাস্ত্রের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। সকল বিজ্ঞানই এইরূপে আপনার মূল তত্ত্বগুলিকে মানিয়া লয়। গণিত দেশকালের অস্তিত্ব, আর এই দেশকালের যে একদিকে অন্ত নাই ও অগুণ্ডিকে এরা অনন্ত-ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—এই তত্ত্বগুলি মানিয়া লইয়া তবে আপনার যাবতীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। গণিতের সকল বিচার ও যুক্তি এই কয়টা তত্ত্বকে মানিয়া লইয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছে। জড়বিজ্ঞান সেইরূপ জড়বস্তুর অস্তিত্ব ও তাহাকে আমরা সচরাচর জড়ের গুণ বা ধর্ম বলি, তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াই আপনার সর্বপ্রকারের বিচার-পরীক্ষায়, গণনা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ আমাদের মীমাংসাদর্শনও শাস্ত্র বে স্বতঃপ্রামাণ্য এইটি মানিয়া লইয়াছেন। পূর্বমীমাংসা বেদের কর্ম-কাণ্ডকেই, আর উত্তরমীমাংসা তাহার জ্ঞানকাণ্ডকেই, একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিচারযুক্তি প্রয়োগে নিজ নিজ বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শাস্ত্র উভয়েরই মূল। তাহার পর, এই শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার বা সন্দেহের উৎপত্তি। এই জিজ্ঞাসাই মীমাংসার প্রয়োজন প্রমাণ করে। এইজন্য এই জিজ্ঞাসাই উভয় মীমাংসার প্রথম ও আদি কথা। পূর্বমীমাংসা “অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা,” আর উত্তরমীমাংসা “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”—বলিয়াই আপনাদের দর্শনের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধর্ম কি, আর ধর্ম নয় কি;

ব্রহ্ম কি, আর ব্রহ্ম কি নয় ; এই বিষয়ে সন্দেহই এই জিজ্ঞাসার মর্ম্ম ।
এই সন্দেহ হইতেই বিচার । এই বিচার হইতে সঙ্গতি । আর এই
সঙ্গতির পরে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ।

শাস্ত্র ;
|
সন্দেহ ;
|
বিচার ;
|
সঙ্গতি ;
|
সমন্বয়

—এই পাঁচ পায়ের উপরে আগাদের ধর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তিতেও এই ধারাই
দেখিতে পাওয়া যায় । এখানে শাস্ত্রের পরিবর্তে যদি সমাজের প্রচ-
লিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধানাদিকে বসাইয়া দেই, তাহা হইলে—

যাহা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত,
|
তাহার সত্যতা বা সনাতনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ,
|
সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচার,
|
এই বিচারের ফলে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের
পরম্পরের সঙ্গে সঙ্গতি,
|
আর সর্বশেষে, এ সকল বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের
সঙ্গে সার্বভৌমিক যে বিশ্ব-সমস্তা
তাহার যথাযোগ্য সমন্বয়—

এই পঞ্চ অঙ্কে সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির ক্রমও ঠিক প্রকা-
শিত হইয়া থাকে । ফলতঃ, সমাজ-জীবনের বিকাশের ভিতরেও যে
চৈতন্যের বা জ্ঞানের লীলা রহিয়াছে, ইহা মানিয়া লইলে এই পঞ্চ

পদের অনুক্রমণ করিয়াই যে সমাজের ধারা রক্ষিত ও বিকশিত হয়, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। ফলতঃ ইহাই জ্ঞানের সার্বজনীন ক্রম। জড়বিজ্ঞা, জীববিজ্ঞা, সকলেরই এই একই পন্থা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞানেতেই স্থিতি করিতেছে বলিয়া বিশ্বের গতি এবং অভিব্যক্তি এই জ্ঞানের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই চলে।

যাহা আছে, তাহাতে মানুষের চিরদিন কুলায় না। বাহিরে যাহা ব্যক্ত হয়, ভিতরে তার চাইতে ঢের বেশী অব্যক্ত থাকিয়া যায়। অভিব্যক্তির ধর্ম্মই ইহা। চিত্রকর যখন চিত্র আঁকেন, তখন তাঁর মনে যে রূপটা সর্বাসঙ্গসম্পন্ন হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি চিত্রপটে যতটা ফুটাইয়া তুলেন, তাঁর নিজের চিত্রপটে তার চাইতে অনেক বেশী অপ্রকট থাকিয়া যায়। সমগ্র ছবিটা আঁকা শেষ হইলেও, তাঁর মনটা ফাঁকা হইয়া গিয়াই, যাহা আঁকা হইয়াছে তার চাইতে আরো বড় কি একটা যেন আঁধারে পড়িয়া আছে, এই ভাবে উদাস-পারা হইয়া উঠে। কবি, গায়ক,—সৃষ্টি ঘাঁরাই করেন, তাঁদেরই এই অভিজ্ঞতালাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানের, প্রেমের, কর্ম্মের, সকল অভিজ্ঞতার ভিতরেই এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আর অব্যক্তের সর্ববিধ অভিব্যক্তিই স্বল্পবিস্তর এই ক্রমটার অনুসরণ করিয়া চলে।

স্থিতি
|
বিরোধ
|
সমন্বয়

এই ভাবেই বিশ্বের অভিব্যক্তি হইতেছে। ইংরাজিতে এই ক্রমটাকে—Thesis, Antithesis, Synthesis বলে। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ইহাকে—তামসিক, রাজসিক, সাত্বিক—এই ভাবে কতকটা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। স্থিতির অবস্থাই থিসিসের

(Thesis) অবস্থা। স্থিতিতে গতিবেগ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহা একরূপ অসাড় অবস্থা। অসাড়তা ভ্রমের প্রধান ধর্ম। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার তম প্রলয়ের ধর্ম। নিদ্রা ইহার লক্ষণ। আর প্রলয়-কালে বিধাতা যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া কারণ-জলে শয়ন করিয়া রহেন, পুরাণে এই কাহিনী আছে। সূত্রাং স্থিতি, থিসিস, আর তম, এই তিনই সমধর্ম্যাপন্ন। তার পর বিরোধ বা অ্যান্টিথিসিস্ বা রাজসিক অবস্থা। এই অবস্থাতেই ভেদ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, আত্মপ্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর সমন্বয়ে সিন্থেসিসে, বা সাত্বিক ভাবেতে সকল ভেদবিরোধের মীমাংসা হইয়া, সত্যের আপাত-পূর্ণতম রূপ প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই অবস্থাই আবার ক্রমে স্থিতিতে বা থিসিসে বা ভ্রমেতে যাইয়া দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী যুগের সমন্বয় পরবর্তী যুগের স্থিতি, পূর্ববর্তী যুগের সিন্থেসিস পরবর্তী যুগের থিসিস, পূর্ববর্তী যুগের সহই পরবর্তী যুগে তম হইয়া পড়ে। তখন আবার বিকাশগতিকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বিরোধ, অ্যান্টি-থিসিস্ বা রাজসিকতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিরোধ বিশ্বের প্রকৃতির মূল কথা নহে। বিরোধেতে এ সংসারে কোনও কিছু বেনী-ক্ষণ স্থিতি করিতে পারে না। তাই বিরোধটা পাকিয়া উঠিলেই সমন্বয়ের সূত্রপাত হয় ;—অ্যান্টিথিসিস্ পূরা হইলেই সিন্থেসিস্, আর রাজসিকতা প্রবল হইলেই সত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ এই ক্রম অনুসরণ করিয়া বিশ্ব বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের এই “সনাতন” হিন্দুসমাজের জীবনেও এই সার্বজনীন বিকাশ-ক্রমের ব্যতিক্রম হয় নাই। আমরাও এক দিন বর্নবর ছিলাম। ক্রমে সেই শৈশবের বর্নবরতা হইতেই বর্তমানের সভ্যতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই দীর্ঘপথ হাঁটিতে অনেক যুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে। তম হইতে রজঃ, রজঃ হইতে সহ ; স্থিতি হইতে বিরোধ, বিরোধ হইতে সমন্বয় ; থিসিস হইতে অ্যান্টিথিসিস্, অ্যান্টিথিসিস্ হইতে

সিন্ধেসিস ; — সারংবার এইরূপ করিয়া আমরা ও ফুটিয়া উঠিয়াছি । যুগে যুগে আমরা নূতন জ্ঞান, নূতন শক্তি, নূতন প্রীতি, নূতন কর্মের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছি । হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা বহুকাল পূর্বের যে পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছিল, তাহাই এতাবৎকাল চলিয়া আসিয়াছে, তার অপচয় বা সঞ্চয় তার কিছুই হয় নাই, এ কথা যে বলে, সে হিন্দুর ইতিহাস জানে না, হিন্দুর শাস্ত্র বুঝে না, হিন্দুর দর্শনের কথ'এর জ্ঞান পর্য্যন্ত তার জন্মায় নাই । হিন্দু চিরদিনই মুক্তভাবে চলিতে চাহিয়াছে । এই মুক্তির জন্যই সে নিজেকে কতবার কত বাঁধনে জড়াইয়াছে, আবার এই বন্ধনের দ্বারা এই মুক্তিনাভ হইল না দেখিয়া নির্ম্মম ভাবে সকল বিধিনিষেধকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে । এই কথাটা বুঝিলেই হিন্দু যে কোনও দিন অচলায়তন রচনা করিয়া তার ভিতরে বেশীদিন আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, এটা সুপষ্ট-রূপে বুঝা যায় । যুগে যুগে হিন্দু, যুগপ্রয়োজনকে অঙ্গীকার করিয়া নূতন নূতন ধর্মের, নূতন নূতন কর্মের, নূতন নূতন বিধিনিষেধের, নূতন নূতন শাস্ত্র সংহিতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । যথা পূর্বং তথা-পরং । যুগে যুগে যাহা হইয়া আসিয়াছে, এই যুগেই কি কেবল তার ব্যতিক্রম হইবে ?

ব্যতিক্রম যে হয় নাই, পরমহংস রামকৃষ্ণ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ, ইহঁরাই তার সাক্ষী ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।

মৃণালের কথা

১

ভগিনীর পত্র

মেজ দাদা,

তোমার চিঠি পাইলান। মৃণালের পত্রখানাও পড়িলাম। তুমি ভাবিও না। আমি তারে বেশই চিনি, তোমার চাইতে বোধ হয় বেশীই চিনি। দিন কতক যদি তারে না ঘাঁটাও, সে আপনি ফিরে আসবে।

লেখার ঢংটা দেখেও কি বুঝনি ও চিঠি তার নিজের নয়। তুমি রাগ ক'রো না, তার বিছা কত, আমরা ত জানি। দেখছে না কি, যে সব বইএর কথা গেঁথে গেঁথে মেজ'বউ এই চিঠিটা সাজিয়েছে। আমি ভাবছি সে অমন চিঠিটা তোমায় পাঠালে কেন? তা না করে', কোন ভাল মাসিক কাগজে পাঠিয়ে দিলে তার লেখার তারিফ বেরোত', কালে জানি কি একজন বড় লিখিয়ে বলে লোকে তাকে জানত। আমার দুঃখ হয়, আমরা দুই ভাই-বোন আর উনি ছাড়া অমন একটা বড় লেখা বাংলার সমজদার পাঠকেরা কেউ পড়লে না।

আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিটা সত্যি সত্যি মেজ'বউর লেখা কি না। তার যে ভাইটার কথা লিখেছে, তাকে ত তুমি বেশ জান। শুন্ছি সে নাকি একজন ভারি লিখিয়ে হয়ে উঠছে। শু'ড়-ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে, আর কবিদের মতন বাব্রী চুল রেখেছে। শুনেছি রবিঠাকুরের সঙ্গেও নাকি খুবই জানাশুনা আছে। তাঁর নামসহি ছবি পর্য্যন্ত বাস্তব আছে, বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে বেড়ায়। সে'ই হয়তো এ চিঠিটা লিখে দিয়েছে।

লেখার খুব বাহাদুরি আছে, উনি পড়ে বলেন যে ঠিক যেন রবি ঠাকুরেরই মতন। তুমি জান কি? মেজ' বউই আমায় লিখেছিল যে, “সঙ্গীবনোত্তে” স্নেহলতা ছুঁড়িটার যে চিঠি বেরিয়েছিল, সেটা নাকি এই ছোঁড়াটারই লেখা, স্নেহলতার নাম জাল করে ছাপিয়েছে। আমাদেরো পড়েই তাই মনে হয়েছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে, যতই জ্যাঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখতে পারে না।

দেখ্ছো না মেজ'বউএর চিঠিও ঐ ছাঁচেই ঢালা। আমরাও ত তোমাদের কল্যাণে একটু আধটু বাংলা শিখেছি, কিন্তু অত বড় বড় কথা ত কৈ জুটাতে পারি না। আর অত পৌঁচিয়ে পৌঁচিয়ে লেখা! উনি বলেন আগা গোড়া যেন ইংরেজির তর্জমা। মৃণাল কবিতাই লিখুক আর যাই করুক, ইংরেজিও পড়েনি, বিলেত টিলেতও যায় নি। সে অমন ইংরেজি কাঁকসেব বাংলা লিখতে শিখলে কেমন করে, উনি কিছুতেই ঠাওর করতে পারেন না। আমি মুখখু মানুষ, কি আর বল'ব?

তুমি বল'বে, ইংরেজি হো'ক, বাংলা হো'ক, লেখাটা ত মৃণালের; ভাষাটা যারই হো'ক না কেন, মনের ভাবটা ত তার নিজের। আমি বলি, তাও নয়। ভাষা, ভাব, সব ধার করা, নাটুকে জিনিষ। দেখ্ছ না, ও কোথায়, কোন্ নাটকে, কি কোন গানে, মীরা বাই'এর কথা পড়েছে, আর অমনি ভাবছে যে, সে মীরা বাই হয়েছে। উনি বলেন, ভক্তমালের যখন আবার নতুন সংস্করণ হবে, তখন মেজ'বউএর কোনও কবি-ভক্ত নিশ্চয়ই, মীরা বাইএর কথার পরে, তার কথাটাও বসিয়ে দেবে। এ চিঠিতে তারই আয়োজন হচ্ছে। তামাসা কচ্ছেন না, সত্যি হতে পারে। তবে তুমি মাঝখানে পড়ে বাগড়া দেবে, ওঁর ঐ যা ভয়।

উনি বলেন এ চিঠিটা আর কিছু নয়, কেবল হিষ্টিরিয়া। ওঁদের ডাক্তারী কেতাবে না কি লেখে হিষ্টিরিয়াতে এ সব হয়। এমন কি, অমন যে রক্তমাংসের মানুষের পীঠটা, তাও নাকি একেবারে

~~২৫, ২৫৭~~ P 29967

কাচের হয়ে যায়। উনি বলেছিলেন যে ডাক্তারী বইএতে নাকি এ ধরনের একটা মেয়ের কথা আছে। তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, তার পীঠটা কাচের হয়ে গেছে। তামাসা করে একজন তার পীঠে একটা চাপড় মারাতে, “পীঠ গুঁড়ো হয়ে গেল” বলে চীৎকার করে সে মেয়েটা তখনি মারা যায়। হিষ্টিরিয়াতে এতটা নাকি হয়। মেজ’বউএর এও এক রকমের হিষ্টিরিয়া। তার খেয়াল হয়েছে যে সে কারার বন্দিনী, আমাদের বাড়ীটা একটা জঘন্য জেলখানা, হোমরা সবাই কারারক্ষক। আমাদের বাড়ীর উঠানটা ত নেহাৎ ছোট নয়,—আমার খাশুড়া তোমার বে’র সময় গিয়ে ঐ উঠান দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন,—পাড়ারগায়েও এমন দৌড়দার উঠান কম, কলকাতার ত কথাই নাই। কিন্তু এত বড় উঠানটা মেজ’বউএর চোখে কত ছোট ঠেকেছে! আমাদের ঘরগুলো কেমন বড় বড়, উত্তরদক্ষিণ খোলা, সাহেবদের ঘরের মতন এমন সাজান না হলেও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেজেগুলো আয়নার মতন চক্ চক্ ক’চ্ছে। আর বড় বে’এর যে শুটি বাই, রাতদিনই ত কেবল জল ঢালছেন, আর দুটো বিঁর পেছনে পেছনে ঘুরে ঘষাচ্ছেন ও মাজাচ্ছেন, এমন সাফশুক ঘরদোর সকলের বাড়ীতে দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘরেও মেজ’বউএর মন উঠে না। কিন্তু মেজ’বউএর কোন দোষ নাই। মেজ’বউ ত আর চোখ দিয়ে কোনও জিনিষ দেখে না। তার খেয়ালে যখন যেটা যেমন ঠেকে নেটাকে তেন্নি দেখে। উনি বলেছিলেন যে সব কবি আর ঋষিদেরই নাকি ঐ রকম স্বভাব।

এক দিনের কথা তোমায় বলি ; এ কথাটা নিয়ে আমরা কত দিন হেসে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি। সে বারে আমি পূজার সময় তোমাদের গুণানে ছিলাম। তুমি ছুটিতে কোণায় বেড়াতে গিয়েছিলে। তখন বছর পাঁচ ছয় বোধ হয় মেজ’বউএর বে’ হয়েছে। আমি মেজ’বউএর ঘরেই শুভাম। একদিন, ঘোর অঁধার রাত,

আকাশে ঘন মেঘ, বাহিরে গিয়ে হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। অনেক রাত অবধি আমি বড় বউএর কাছে বসে গল্পগাছা কচ্ছিলাম। শু'তে গিয়ে দেখি, মেজ'বউ জানালার পাশে বসে ঐ অন্ধকার পানে তাকিয়ে আছে। বললাম “রাত অনেক হয়েছে, মেজ'বউ শু'তে এসো।” মেজ'বউ আগায় বলে কি জান?— “ঠাকুর ঝি, দেখ এসে কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। ঐ আমবাগানে যেন রূপো গালিয়ে ঢেলে দিয়েছে, আকাশে বেন রূপালী রং মাখিয়ে তার নীলবরণকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। মরি, মরি, কি সুন্দর!”

আমি চম্কে উঠলাম, বললাম “বলিস্ কি মেজ'বউ? এ যে যোর আঁধার রাত! কাল বাদে পরশু কালীপূজা। চাঁদ পেলি কোথায়? তোর অত রসের ঢেউ আজ উঠলো কিসে?”

মেজ'বউ একেবারে চটে উঠে বলে “ঠাকুর ঝি, “তোমার আঁকল কেমন? অমন ত্রিদিববন্দ্য চন্দ্রমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কচ্ছে? না তোমার চোখের মাথা খেয়েছ?”

আলোটা একটু উকিয়ে দিয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম, মেজ'বউএর চোখের ভাবটা সহজ মানুষের মতন নয়। প্রাণ শুকিয়ে গেল। তবে কি শেষে পাগল হ'লো! হঠাৎ তার বিছানার দিকে চেয়ে দেখি, মেজ'বউ এক নূতন কবিতা লিখেছে—

চাঁদনি রজনী, আও-লো সজনী,

চাহলো নয়ান মেলি।

আত্ম কানন, মর্ম্ম মন্দন

মর্ম্ম পরাণ কেলি।

শুভ্র উজ্জল, অভ্র কাজল

উছল ভুবন ভরি।

মঞ্জীর মুকুরে, শিক্ষিত মুপুরে

রঞ্জল কিবা মরি।

তখন আমার ঐ ডাক্তারী বইএর কথা মনে পড়লো। ভাবলাম এ খেয়ালটা তার যেমন আছে থাক। জোর করে ভাঙতে গেলে হয় ত উল্টা উৎপত্তি হবে। তাই ভেবে বললাম—

“তাই ত মেজ’বউ, আমার কি ভ্রমই হয়েছিল? সত্যিই ত বড় সুন্দর চাঁদনি রাত। তবে জানই ত, উনি কালীপূজার সময় আমায় নিয়ে যেতে আসবেন, তাই ভেবে ভেবে কালই বুঝি অমাবস্তা তাই মনে হচ্ছিল। আমি বিরহে অন্ধ হয়ে গেছিলুম, তাই অমন জোছনা রাতও চোখে আঁধার ঠেকছিল।”

মেজ’বউএর মুখখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। জানালা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে, আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরে বললে,—

“ঠাকুর-ঝি, তুমি তবে প্রেম তা’ কি জান? আমি ভাবতাম তুমি কেবল রান্নাবান্নাই কর, আর স্বামীপুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে এ দাসীত্বই অমন নারীজন্মটা খোয়াচ্ছে। বাঙ্গালীর মেয়ে খাঁচার পাখী, তারা কি বনের পাখীর সুর কখনও ভাঁজতে পারে? কেবল বাঁধা-বুলিই ত কপুচায়, দেখি! বনের গান একেবারে ভুলে গেছে। হায়! বনের পাখী হলাম না কেন?”

আমি কি আর বলব? তামাসা করে বললাম—

“তোরা চকা তো এখন আকাশে উড়ছে; বাসায় ফিরে এলে বলিস্, তোরে উড়িয়ে নিয়ে বনে যাবে।”

এই চিঠি পড়ে আমার সেই কথা মনে পড়লো। এও তার খেয়াল। কবিতাগুলো কি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে, না সত্যিই পুড়িয়ে ফেলেছে? ও জিনিষ পুড়ান যায় না। দেখ দেখি, কোথাও রেখে গেছে কিনা? যদি রেখে গিয়ে থাকে, তবে খুঁজে দেখ, ঐ কৃষ্ণ-পঙ্কের জোছনার বর্ণনার মতন বিন্দির সম্বন্ধেও অবশ্য দু-দশটা কবিতা পাবে।

তুমি ত তাকে জান। পনের বছর তাকে নিয়ে ঘর করছ। সে যে তোমায় ছেড়ে বেশী দিন ঐ নীল-সমুদ্র আর আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ

নিয়ে থাকতে পারবে তা ভেব'না। সত্যি জিনিষে তার মন উঠে না। ছেলেবেলা থেকে সে তাই ছোট যা তাকেই বড়, আর বড় যা তাকেই ছোট করে ভেবেছে। তোমার বাড়ী থেকে তোমার শশুর বাড়ী কত দূর তুমি জান। শ্যামপুকুর আর টালা দু-দশ দিনের পথ নয়। সেকেনক্লাস গাড়ীতে আধ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু বাপের বাড়ী ও শশুর বাড়ী অত কাছাকাছি, এটা ভাবতে মেজ'বউএর ভাল লাগত না। তোমারই মুখে শুনেছি, তাই সে কোনও দিন সোজা-সুজি বাপের বাড়ী যাতায়াত করে নি। শিয়ালদ'এ রেলে চেপে দমদমা গিয়ে নেমেছে, সেখান হ'তে ছ্যাকড়া গাড়ীতে টালায় গিয়েছে। একবার—তোমার মনে আছে কি?—সেবারে বর্ষাকালে আমি তোমাদের দেখতে যাই। মেজ'বউএর ভাইপোর ভাত। কিন্তু সে কিছুতেই গাড়ীতে বাপের বাড়ী যাবে না। শিয়ালদ'এ রেলে চেপেও যাবে না। বল্লে—বর্ষাকালে বধূরা নৌকায় বাপের বাড়ী যায়, সব কেতাবে লেখে। গাড়ীতে বরষার অভিসার কোনও কালে কেউ লেখে নাই। যদি যাই, ত নৌকায় যাব। এক রাত নৌকায় শোব। চড়ায় নৌকা লাগিয়ে ভাত রঁধে খাব। মাঝিগুলো কঁ্যাং কঁ্যাং করে দাঁড় টানবে আর ভাটিয়াল গাইবে। কোট করে বসল। কি কর, তুমিও তা'তেই রাজী হলে। শোভাবাজারে গিয়ে সন্ধ্যা বেলা নৌকায় উঠলে, বাগবাজারে এসে রাত্রে রান্নাবান্না কল্লে, পরের দিন প্রাতে শ্যামবাজারের পোলের কাছে নৌকা লাগিয়ে, পাল্কী করে তাকে নিয়ে শশুর বাড়ী গেলো! এ সকল জেনে শুনেও তুমি অমন অস্থির হয়েছ কেন?

আমাকে পুরী যেতে বল্ছ, আমি এক্ষণি যেতাম। কটক থেকে পুরী তেমন দূরেও নয়; কিন্তু গেলে উন্টো ফল হবে। আমি আমার ঠাকুরপোকে পাঠাচ্ছি সে মেজ'বউকে চোখে চোখে রাখবে, আর প্রতিদিন আমাকে খবর দিবে। উনি তা'কে একটা খাতা করে দিয়েছেন। বল্লে, 'তুই সর্বদা সঙ্গে থাকবি আর

এই খাতায় ডায়রী রাখবি। আর রাত্রে ডায়রীটার নকল পাঠাবি।’

মেজদাদা তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আগরা থাকতে মেজ’বউএর কোনও বিপদ ঘটবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঠাকুর গো’র পত্র

১

বউ দিদি,

এই তিন দিন তোমাকে কোনও খবর দেই নাই ; খবর দিবার কিছু ছিল না। তোমার মেজ’বউ যে বাড়ীতে ছিলেন, আমি এসে দেখ’লাম সেখানে নাই। সে এক পাণ্ডার বাড়ী। কোথায় যে উঠে গেছেন, তাও সে বলতে পারলে না।

তোমার যে খুড়িমার সঙ্গে তোমার মেজ’বউ পুরী এসেছিলেন, এখন তিনি দেশে ফিরে গেছেন। তোমার মেজ’বউকে যাবার জন্য শুনলাম অনেক পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হন নি। ওদিকে তাঁর পোল্টীর বড় অসুখ, খবর পেয়ে বেচারী আর থাকতে পারেন না। তোমার মেজ’বউ তাঁর ভাইকে নিয়ে সেই পাণ্ডার বাড়ীতেই রয়ে গেলেন, বল্লেন, ‘যখন জগন্নাথ এনেছেন, তখন রথযাত্রা না দেখে যাব না।’ তোমার খুড়িমা চলে গেলে, পরের দিনই তোমার মেজ’বউ সে পাণ্ডার বাড়ী থেকে কোথায় উঠে গেছেন, তারা কেউ জানে না। তবে বলে, স্বর্গদ্বারে নাকি একটা বাড়ী ভাড়া করেছেন।

তোমার মেজ'বউকে যদি আমি জান্তাম বা তাঁর ভাইএর নামটাও যদি বলে দিতে, তা হলে স্বর্গদ্বারে গিয়ে খুঁজে বের করা কিছুতেই কঠিন হ'ত না। কিন্তু আমি ত তাঁকেও দেখিনি, তাঁর ভাইএর নামও তুমি বল নাই। তোমার দাদার নাম করে খোঁজ করতে পারতাম। কিন্তু তাতে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি হত, তোমরা আমাকে যে গোয়েন্দাগিরি কন্ডে পাঠিয়েছ তাহা হত না। কাজেই সেটা করি নাই। ঘটনাক্রমে কোনও সন্ধান করতে পারি কি না, তাই দেখে দেখে কেবল স্বর্গদ্বারের পথে ঘাটে এই কটা দিন ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমার আশীর্ব্বাদে সন্ধান পেয়েছি। আমার বাহাদুরী কিছুই নাই। কেবল ঘটনাটুক্রেই এটি ঘটেছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটি পরিচিত ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। কলকাতায় যখন আমি Y. M. C. A. এর বোর্ডিংএ ছিলাম, তখন আমরা দুজনে একই ঘরে থাকতাম। সে আজ তিন চার বছরের কথা। হঠাৎ আজ তাকে এখানে দেখতে পেলাম। বলে সে তার দিদির সঙ্গে স্বর্গদ্বারে আছে। সে আমায় কিছুতেই ছাড়লে না—তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। তার ঘরে ঢুকে দেখি, একটা বিলাতী ট্রঙ্কের উপরে তোমার দাদার নাম লেখা। বুঝলাম বিধি আজ সুপ্রসন্ন হয়েছেন। যা খুঁজ-ছিলাম, তাই আপনি মিলিয়ে দিয়েছেন। সে আমায় কিছুতেই রাত্রে না খাইয়ে ছাড়লে না। তোমার মেজ'বউএর সঙ্গেও দেখা হল, সে'ই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তুমি যে আমার বউদিদি এরা কেউ জানে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে ক্রমে সব খবর পাবে এখন। তবে তোমরা যে প্রতিদিন একটা ডায়রী পাঠাতে বলেছ, তা কি দরকার? যে দিন কিছু বিশেষ বলবার থাকে সে দিনই চিঠি লিখ। আর পুরীতে যারা হাওয়া খেতে আসে, তাদের ডায়রী কিরূপ হবে, তা তুমিই জান। প্রাতে চা'পান। তারপর সমুদ্রের ধারে

ভ্রমণ। তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন। নয়টার সময় মুনিয়ার আগমন। সাড়ে ৯টা হইতে ১১টা সমুদ্রে স্নান ও মুনিয়ার হাত ধরিয়া ঢেউ খাওয়া ও সাঁতার কাটবার ভান করা। ১১।০টায় আহার। ৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রা। ৪টায় চা'পান বা জলখাবার। ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আবার সমুদ্রের ধারে বেড়ান। রাত্রে আহার ও তারপর শয়ন। তোমার মেজ'বউএর ডায়রীও ঠিক এই। এটা আমি তাঁর ভাইএর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই বে'র করে নিয়েছি। স্মৃতরাং প্রতিদিন এইরূপেই কাটছে, জানিয়া রাখিও। প্রতি রাত্রে পুরাতন কথা লিখে বেহুদা কাগজ ও কালি খরচ করার কোনও প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে, লিখিও, ছকুম তামিল করব। এখন ধর্ম্মাবতারকে সেলাম করিয়া এ অধীনের তনে শয্যাশায়ী হইতে আজ্ঞা হয়।

২

বউ দিদি,

আজ একটা নূতন খবর আছে। শুনে তুমি খুসি হবে। তোমাদের খরচ বাঁচল। আমি ভিক্টোরিয়া হোটেল ছেড়ে চলে এসেছি। শরৎ (তোমার মেজ'বউএর ভাইএর নাম শরৎ) ক'দিনই আমাকে তাদের সঙ্গে এসে থাকতে পীড়াপীড়ি করছিল। আমি কিছুতেই রাজি হই নি। ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু নিজেকে অত সস্তা করাটা কিছু নয়, তুমি দাদাকে সর্বদা এই কথা বল। তাই আমিও নিজেকে সস্তা করিতে চাই নি। যা হউক কাল রাত্রে, তোমার মেজ'বউও বড় ধরে বস্লেন। তিনি আমাকে নরেন বলেই ডাকেন, আর আমিও তাঁকে দিদি বলতে আরম্ভ করেছি। তাঁর অনুরোধ আর এড়াতে পারলাম না। তোমাদের কাজের অনুরোধেও এ আতিথ্যগ্রহণ করাই ভাল গনে করলাম। তোমার মেজ'দাদাকে লিখ, আমি তাঁর গিন্নিকে পাহারা দিচ্ছি। গোয়েন্দাগিরিটা জমছে ভাল।

আচ্ছা, বউদি, তোমরা তোমাদের মেজ'বউএর উপরে অমন নারাজ কেন? আমার ত তাঁকে বেশ ভালই লাগে। ভাল'র চাইতেও ভাল লাগে,—সত্যি বড় মিষ্টি লাগে। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। চালচলন অতি শোভন, চোখ দুটো ভাবে ঢল ঢল, নিজেকে সাজানার কোনও চেষ্টা নাই, অথচ সাজা জিনিষটা যেন আপনি ফোর করে এনে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে বসে যায়। কথা অতি মিষ্টি : সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক একবার কেমন উদাস পারা হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন,—দেখে আমার সেই কীৰ্ত্তনের পদ মনে পড়ে—

যোগী যেন সদাই ধোয়ায় !

তোমাদের কত ভাগিা, অমন বউ পেয়েছ। দিন রাত কেবলই লিখছেন আর পড়ছেন। আর তাঁর পড়বার ধরণটা বড় সুন্দর। সর্বদাই পেন্সিল ও খাতা নিয়ে পড়তে বসেন; আর যখন যেখানে মিষ্টি কথা পান, তাই টুকে রাখেন। আমায় বলেছিলেন এতে কবিতা লেখার নাকি খুব সুবিধা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কি করে সুবিধা হয়, দিদি?” বল্লেন, “জান কি, বড় বড় কবিরা যেন এক এক জন তারি রাজমিস্ত্রি। আর এই সে সুন্দর কথাগুলি, এগুলি তাঁদের পশ্চিরকাজের মালমসলা। ঐ মিষ্টি মিষ্টি কথা গুলো চুনে চুনে, “মোর,” “হায়,” “সখি,” “সখা,” “বঁধু” প্রভৃতি মিষ্টি কথার বুকুনী দিয়ে সাজালেই অতি সুন্দর কবিতা হয়।”

আমিও এখন থেকে খাতা হাতে করে সব বই পড়ি। দেখ কি তোমার মেজ'বউয়ের কল্যাণে হয় ত তোমার এই ঠাকুরপোও ক্রমে একটা কবি হয়ে উঠবে। বাঙ্গালা মাসিকে ছাপাবার মতন ভারি ভারি দু-দশটা এরি মধ্যে পকেটে জড় হয়েছে। গোয়েন্দা-গিরি করতে এসে একেবারে একটা ডাকসই কবি হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তবে ভাগিা জিনিষটাই নাকি অন্ধ, তার গমনে নাইক কোন ছন্দ, আমার কপাল নহে নেহাৎ মন্দ; কর কি

এখনও তুমি সন্ধ ; তবু হোমার সঙ্গে আমার বন্দ ; করিলম
এখানেই চিঠি বন্ধ ।

৩

বউ দিদি,

তোমার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম করি । তুমি যদি
মেম সাহেব হ'তে, তা হ'লে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ তোমায় দিতাম ।
তোমার কল্যাণে এই গোয়েন্দাগিরি করতে এসে কি সুখেই দিন
ক্রেটে যাচ্ছে । তোমার করমারেস খাটতে হয় না, ছেলেদের
পড়া বলতে হয় না, আপিসে কলম পিসতে হয় না, ঘরে গিন্নির
মুখ কামটা খেতে হয় না ; দিনে শুতে পাই, বিয়ুতে হয় না ;
রেতে ঘুমুতে পাই, ছেলে বইতে হয় না ; আর দিন রাত কবিতা
শুনতে পাই, ছুনিয়াশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বকাবক্কি করতে হয় না ।
আমার মনে হয়, স্বর্গে যারা যায়, তারা বুঝি এই ভাবেই দিন
কাটায় । বস্তু যত সব ছায়া হয়ে গেছে, ছায়া যত সবই কেবল
কায়া নয়, প্রাণী হয়ে উঠে, চারিদিকে ছুটেছুটি কচ্ছে । নিজ্ঞান
পড়ে যা ভুল বুঝেছিলাম, সব এখন শুধরে যাচ্ছে । চোখ কাণ-
গুলোকে ফাঁকি দিয়ে এখন কেবল মন দিয়ে সব জ্ঞান আহরণ
করতে শিখছি । এ শিক্ষায় তোমার মেজ'বউ আমার গুরু হয়েছেন ।
সত্যি বলছি বউদিদি, মানুষের মনটা যে কত বড় জিনিষ, এতদিন
বুঝি নি । এই মনই ত্রক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়
কর্ত্তা । তোমার মেজ'বউএর মন ঠিক ভাই ।

দে দিন আমরা নরেন্দ্রসরোবরের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম ।
সেখানে একটি অতি সুন্দর মন্দির হয়েছে । তোমরা দেখ নি ।
মন্দিরের বাগানে বিস্তর আমগাছ আছে । একটা আমগাছে এই
অকালেও নতুন লালপাতা গজিয়েছে । তোমার মেজ'বউ আমায়
গাছটা দেখিয়ে বলেন, “দেখেছ নরেন, ঐ গাছগাছে কেমন লাল
লাল পাতা বেরিয়েছে ।”

আমি বললাম—“গাবগাছ কৈ দিদি, ওটা যে আম গাছ !”

দিদি বল্লেন—“আমগাছ, কখনই নয় ; তুমিও এত বড় একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত কচ্ছে ? আমাদের বাড়ীর দেয়ালের আড়ালে এরই মতন একটা গাবগাছ আছে, তার এই যৌবনের সাজ দেখে আমি বসন্তের সংবাদ পেতাম। আর তাকেই কি না তুমি বলতে চাও, আমগাছ ?”

আমি তো একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে বললাম, “একটু কাছে গিয়ে দেখুন, ওটা যে আম গাছ তা বুঝতে পারবেন।”

তোমার মেজ'বউ আরো গরম হয়ে উঠে বল্লেন—“কাছে গেলেই কি সত্য দেখা যায় ? অন্ধেরা তো হাতটাকে গিয়ে হাতড়িয়েছিল, কিন্তু তাকে সত্যিই দেখতে পেয়েছিল কি ? দেখে চোক নয়—মন, আর মনের নিকটে আবার কাছে আর দূরে কি ? তুমি কী দেখে ওটাকে আমগাছ ভাবলে, আমি বুঝতেই পাচ্ছি না। ওটা যদি আমগাছ হবে তবে তার ডালে ডালে কোকিল কৈ ? ডগায় ডগায় ভূঙ্গ কৈ ? আকাশে আকাশে কুহু কুহু কৈ ? ঘরে ঘরে উহু উহু কৈ ? কেবল লাল পাতা দেখে ওটাকে আমগাছ ভাবছ, লালপাতা যে গাবগাছেও হয়।”

বেগতিক দেখে বললাম, “তুমি যখন বলছ, তখন গাবই বা হবে।”

“গাবই বা হবে কেন, গাবই নিশ্চয়। ওটা যদি গাব না হয় তবে কবির দৃষ্টি কি মিথ্যা হবে ?”

আমি বললাম—“কখনই হতে পারে না। বিধাতা যে কবির চোখেই তাঁর জগতকে দেখেন। তিনিও ত কবি।”

এতগুলি ধর্ম্যকথা বলে তবে প্রাণে বাঁচলাম। এবার থেকে তোমার মেজ'বউ যখন যা বলবেন, তাতেই ছাঁ দিয়ে যাব।

বউদিদি,

আমার ছুটি তো ফুরিয়ে আসছে. আর কতদিন তোমার মেজ'-বউকে পাহারা দিতে হবে? তোমার মেজদাদাকেই না হয় পাঠিয়ে দাও. গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। যে কবিতার টেউ উঠছে, তাতে তোমার মেজ'বউকে কোথায় নিয়ে যাবে, বলা যায় না। আর আমাদের পরের স্ত্রীর পাহারা দিতে পাঠিয়ে তোমার ঘরেও যে খুব শান্তি পাচ্ছ, তাও ত সম্ভব নয়। তবে একবার নাকি আমি আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার ফন্দিটা শিখেছিলাম, ঐ যা তোমাদের ভরসা।

সত্যি বলছি আমার ভাবনা হয়েছে। তোমার মেজ'বউকে এই একমাসকাল দিনরাত দেখে দেখে, এতটাই চিনেছি বলে মনে হয় যে, বাহিরে তাঁর যতই কবিতা গজা'ক না কেন, ভিতরটা ঠিক আছে। সে ভাবনা আমার হয় না। তবে জান কি, ভিতর শুদ্ধ থাকলেই যে বাহিরে কালির ছিটা পড়ে না বা পড়তে পারে না, তা নয়। ঐ ভয়টাই আমার বড় বেশী হচ্ছে। অথচ কেমন করে যে বেচারীকে বাঁচাই, ভেবে পাচ্ছি না। তারই জন্য তোমাকে লিখছি। নহিলে তোমাকেও লিখতাম না;—এ সব কথা কাউকেই বলা ভাল নয়। বলাবলিতেই যত গোল বাধে।

আমার আরো বেশী বিপদ হয়েছে এই জন্য যে শরৎ হঠাৎ কল্কাভায় চলে গেছে। বাড়ীতে তোমার মেজ'বউ, একটা বুড়ী চাকরানী আর আমি, আমরা তিন প্রাণী মাত্র আছি। তার জন্যও আমি ভাবতাম না। কিন্তু শরৎটা নাকি নেহাৎ গাধা, যাবার সপ্তাহ খানেক আগে একটা সাহিত্যিক বন্ধুকে এনে জুটিয়ে দিয়ে গেছে। এ ব্যক্তি নিতান্ত ছোকা নয়, বয়স তোমার মেজদাদারই মতন। বলছে ত যে বিলেত টিলেত ঘুরে এসেছে, কিন্তু ইংরেজি

শুনে কথাটা বিশ্বাস করতে মন উঠে না। তবে ইংরেজ কবিদের নাম হামেশাই মুখে লেগে আছে।

ইনি তোমার মেজ'বউকে ব্রাউনীং বলে একজন খুব বড় ইংরেজ কবি আছেন, তাঁর কবিতার তর্জমা করে পড়াচ্ছেন। এখন প্রতি দিন বিকেল বেলা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দুজনে কবিতা পড়েন, আর এ গরিব পাহারাওয়ালা দায়ে পড়ে কাজেই সেখানে গিয়ে বসে বসে ঝিমোয়। আমি মুখখু লোক,—কেরানীগিরি করে খাই, তার উপরে কোনও দিন জাহাজে চড়িনি, কাজেই এই সাহিত্যিকবরের চক্ষে যে অতি নগণ্য হ'ব, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে তোমার মেজ'বউএর একটা বড় বাহাদুরী দেখতে পেলাম। আমি যে তাঁর সোদর ভাই নই, তিনি যুগাক্ষরেও এ কথাটা এ ব্যক্তিকে জানতে বা বুঝতে দেন নি। একদিন ও জিজ্ঞেস করছিল—“শরৎ বাবু, আর নরেন বাবু এঁদের মধ্যে বড় কে?” তোমার মেজ'বউ বলেন—“নরেনই বড় বটে, তবে পিঠোপিঠি বলে শরৎ ছেলেবেলা থেকেই কোনও দিন একে দাদা বলে ডাকে নি।” কথাটা শুনে অবধি তোমার মেজ'বউএর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেছে। যতটা বোকা মনে হচ্ছিল, ততটা বোকা নন। কবিতাই লিখুন আর যাই করুন, ভিতরে ভিতরে বিষয়বুদ্ধিটুকু বেশ আছে।

৫

বউ দিদি,

তুমি ও লোকটার পরিচয় জানতে চেয়েছে। এ সব লোকের পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন। বাংলা সাহিত্যে আজকাল বড় বড় সাহিত্যিক যে কি করে গজিয়ে ওঠে, ভগবানও তার ঠিক করতে পারেন কিনা সন্দেহ। কবিতা যেমন এদের আকাশ থেকে বুর বুর করে পড়ে, এদের জন্মকন্ময়টাও তেমনি দিব্য ব্যাপার বলে মনে হয়। এঁকে আমরা কেবল ‘মিষ্টার মৈত্র’ বলেই জানি।

৫

শরৎকে জিজ্ঞেস করছিলাম এঁর বাড়ী কোথায়, আছে কে, করেন কি, সে ওসব কথার কোনই উত্তর দিতে পারলে না। বল্লে—“ও সব খবর সংসারের লোকেই রাখে। সাহিত্যজগৎ মনোজগৎ, ভাবরাজ্য; এখানে জন্মকর্মের পরিচয় কেউ নেয় না, রসসৃষ্টির শক্তির প্রমাণপরিচয়ই যথেষ্ট। মিষ্টার মৈত্রের লেখাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।” এর উপরে ত আর কোন কথা চলে না। কাজেই ইহঁার কোনও পরিচয় এ পর্যন্ত পাই নাই, পাবার আশাও রাখি না।

তবে নামগোত্রের পরিচয় না পেলেও, কাব্যরসপটুতার পরিচয় প্রতিদিনই পাচ্ছি। সে পরিচয়টা তোমাকে দিতে পারি। কাল বৈকালে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই সমুদ্রের ধারে আমরা বেড়াতে যেতে পারি নি। মিষ্টার মৈত্র এখানে বসেই তোমার মেজ’বউএর সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা করছিলেন। ইনি ব্রাউনীর একটা বাংলা অনুবাদ কচ্ছেন, তোমার মেজ’বউকে তাই পড়িয়ে শুনছিলেন। ভুল ক্রমে এখানেই সে অনুবাদটা ফেলে গেছেন, তার খানিকটা তোমায় পাঠাচ্ছি।

ওগো সুন্দর মোর !

ও বয়ানে তব, এ নয়ান মম

পিয়ে পিয়ে হলো ভোর।

ওগো সুন্দর মোর !

চোরের মতন কতই চাতুরী,

গুপ্ত প্রেমের কিবা এ লহরী,

নাচত আঁখিতে উঠত শিহরী

সুখের নাহিক ওর !

ওগো সুন্দর মোর !

ঘরের ভিতরে বসে যারা ঐ,

ভাবিছে কাতরে গেল ওরা কৈ,

কৌতুকে কপোল করে থৈ থৈ,
বাহিয়া বাহিছে লোর।

ওগো সুন্দর মোর !

আমরা দুজনে, বিজনে বিপিনে,
নীপ মূলে এই, কিবা নিশি দিনে,
বাঁধা আছি, নতু অঁাধোয়া তু বিনে,
কে ভাঙ্গে মোদের জোড় ?

ওগো সুন্দর মোর !

তিলে তিলে গড়ি কতেক ছলনা,
পলে পলে পরি শতেক গহনা,
গাহি মূলতান, পূরবী সাহানা,
কাটিছে রজনী ঘোর,

ওগো সুন্দর মোর !

এ সুখ তেয়াগি, কোন্ সুখ লাগি,
কোন্ মস্ত্র পড়ি, কি সিন্দুর দাগি,
কিইবা সোহাগে, মিলিবে কি ভাগি,
কলা, মোচা, কিবা খোড় !

ওগো সুন্দর মোর !

আষাঢ় মাসের গুপ্ত অভিসার,
ভৈরব ঐ নৃত্য বরিষার,
মর্ষ্য বিদারি এ ঘর্ম্মের ধার,
চর্ম্মে খুরিছে ঝোর !

ওগো সুন্দর মোর !

ছাড়িয়া এ সব বিভব ছন্দে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া ভবের ধন্দে,

কোন রূপে রসে, গরাশে গন্ধে
 আনিবে আনন্দে ভোর ?
 ওগো সুন্দর মোর !

থাক্ তারা নিজ জগৎ লইয়া
 রান্ধিয়া বাড়িয়া, খাইয়া, শুইয়া,
 জীবনে মরিয়া, মরমে মারিয়া
 কেবলি ঘাঁটিয়া হোড় !
 ওগো সুন্দর মোর !

জান নাকি তুমি উহাদের রীতি,
 যশ মান দিয়া করয়ে পিরিতি
 ঝগড়া-ঝাটি হয় নিতি নিতি
 ভান্ধাতে ভাগিনী ভোর
 ওগো সুন্দর মোর !

নাহি সূতা হাতে, হলো কিবা ভায়
 ও রীতি দেখিলে পিরিতি পালায় ?
 দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
 যুক্ত পরাণ-ডোর ।
 ওগো সুন্দর মোর !

দাদাকে বলো, এর গুলটা ব্রাউনীংএর In A Balcony'তে
 কোথাও নাকি আছে। মূলের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক,
 অনুবাদের বাহাদুরী আছে বটে । আর সব চাইতে এর বাহাদুরী
 এই যে, তোমার মেজ'বউকে এ কবিতাটায় একেবারে ফেপিয়ে
 তুলেছে । তিনি বারবার এসে আমায় বলছেন “দেখ নরেন,
 দেখ, দেখ, কি সুন্দর শুনাচ্ছে—

দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
 যুক্ত পরাণ-ডোর —

লেখার কি ভঙ্গী, ভাবের কি গভীরতা ! বাংলায় এক রবি ঠাকুর ছাড়া আর কেউ এমন লিখতে পারে না। তুমি ত ব্রাউনীং পড়েছ, ব্রাউনীং সত্যি কি এত মিষ্টি।” এর উত্তর আমি কি আর দিব। আমার কেবল ইচ্ছা হলো বউদিদি, ঐ মিষ্টার মৈত্র-টাকে আমার এই জিমনাষ্টিকপট্ট মুষ্টিটা যে কত মিষ্টি তাই দেখিয়ে দি। সত্যি বলছি বউদিদি, এ লোকটা যদি শিগ্গির সরে না পড়ে, তবে কোন্ দিন যে আমার সঙ্গে একটা ফৌজদারী বেধে যাবে জানি না।

৬

বউ দিদি।

যা ভয় কচ্ছিলাম, তাই হয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলা জুত্বিয়ে ঐ লোকটার হাড় ভেঙ্গে দিয়েছি। বোধ হয় সে আর এখানে মুখ দেখাতে সাহস পাবে না। আজকের এই জুতোপেটাটা কেউ জানে না, কেবল আমার হাত জানে, আর জুতা জানে, আর ওর পীঠ জানে, আর কেউ জানে না; তোমার মেজ’বউও ভাল করে জানেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি, ফের যদি পুরীর সমুদ্রের ধারে দেখতে পাই, তবে সবার সামনে জুতোপেটা করে ছাড়বো। সে পায়ে ধরে দিব্যি করে গেছে, আজ রাত্রেই পুরী থেকে চলে যাবে। আমার বিশ্বাস তাই করবে।

কেন হলো, কিসে হলো, আমার নিজের মনে মনেও তার আলোচনা করতে ইচ্ছা হয় না; ভয় হয় বুঝিবা এ চিন্তাতেও তোমার মেজবউএর অকৈতব শুদ্ধ চরিত্রের মর্যাদা নষ্ট হয়। কিন্তু তোমাকে না বললে নয়। তোমার মেজ’বউএর প্রাণে যে আঘাত লেগেছে, তার ফল কি যে হবে, ভেবে পাচ্ছি না। এই আঁধার রাতে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ না দিলে বাঁচি। দিনরাত আমায় এখন তাঁকে খাড়া পাহারা দিতে হ’বে দেখছি।

ঘটনাটা তোমায় লিখতেই হচ্ছে, কিন্তু আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে দাদাও এটা জানেন। আমরা পুরুষ মানুষ, স্ত্রী-চরিত্র যে কিছুই বুঝি না, বউদিদি! তাই ভয় হয়, দাদাও তোমার মেজ'বউ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে পারবেন না। যদি পার, তবে তাঁকেও দেখিও না, তোমার মেজদাদার ত কথাই নাই। এই পত্রখানা পড়িয়া পুড়াইয়া ফেলিবে।

ঘটনাটা এই। কাল রাত্রে আমার একটু সামান্য জ্বর হয়েছিল : তাই আজ সন্ধ্যার সময় আর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই নি। মিষ্টির মৈত্র এসে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে তোমার মেজ'বউ তাঁর সঙ্গেই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। আমায় বলে গেলেন যে বেশী দূরে যাবেন না, বাড়ীর সামনেই বেড়াবেন। তখন সবে রোদ পড়েছে। আমি দরজায় বসে দুজনায় বেড়াচ্ছেন দেখতে লাগলাম। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। কাছেই আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তোমার মেজ'বউএর খোঁজে বেরুলাম। সমুদ্র তীরে গিয়া দেখলাম, তিনি সেখানে নাই। তারি মুন্সিলে পড়লাম। কোন্ দিকে গেলেন ঠাণ্ড কর্তে পারলাম না। কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি? এমন সময় একটী পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বল্লেন—“আপনি যে আজ বড় পিছিয়ে পড়েছেন, আপনার ভগিনী চক্রতীর্থের দিকে যাচ্ছেন দেখলাম।” শুনে কি জানি কেন আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। চক্রতীর্থ ত দোরের কাছে নয়। স্বর্গদ্বার থেকে চক্রতীর্থ দেড় ক্রোশের পথ। আর সন্ধ্যাবেলা সে অতি নিরালা স্থান। আমিও ঐ দিকেই বালি ভেঙ্গে ছুটলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। সারকিট হাউস ছাড়িয়ে দেখলাম, আর কোথাও কেউ নাই। হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কাণে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়া দেখলাম, ঐ লোকটা তোমার মেজ'বউকে অপমান করবার চেষ্টা কচ্ছে। আমি এক লাফে

তার উপরে পড়ে তোমার মেজ'বউকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার গলার চাদর কষে ধরে, পায়ের জুতা খুলে, গায়ে যত জোর ছিল তাই দিয়ে বেটাকে পিটুতে আরম্ভ করলাম। বখন ও একেবারে মাটিতে পড়ে গৌগাতে লাগল তখন ছাড়লাম। তোমার মেজ'বউ একেবারে পাথরের মত নিশ্চল, অসাড় হয়ে এই ব্যাপার দেখছিলেন। আমি কাছে যাবামাত্র, মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে কঁাদতে লাগলেন। তোমার মেজ'বউ একটু স্নান হলে, তাঁকে নিয়ে বাড়ী এলাম। ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায়, ভয়ে, অনুতাপে, তাঁর দশা যে কি হয়েছে বলতে পারি না। এই আধ ঘণ্টা কালের মধ্যে তাঁর মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেছে, চোখ বসে গেছে, মনে হয় যেন ছ মাসের রোগী। হঠাৎ মানুষের চেহারার অমন পরিবর্তন হয়, ইহা জন্মে আর কখনও দেখি নাই। বাড়ী আসিয়া তোমার মেজ'বউ ঘরে যাইয়া দোরে খিল দিয়া শুয়ে পড়েছেন। আমি কি করব, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না। যে বিটি আছে, তাকে কোন কথা বলতেও পারি না, নিজের যাইয়াও তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতে পাচ্ছি না। হয়ত এই চিঠি পেতে না পেতেই তুমি এখানে আসবার জন্য আমার টেলিগ্রাম পাবে। কাল প্রাতঃকালের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

৭

বউ দিদি,

ভগবান্ বাঁচালেন। শরৎ আজ প্রাতে ফিরে এসেছে। তা'কে কালকার ব্যাপারের কথা কিছুই বলিনি। বলা যায় কি? সে ভাবছে তার দিদির অসুখ করেছে। অসুখও করেছে সত্যি। খুব জ্বর হয়েছে। মাথায় খুব যাতনা। বিকার না হলে বাঁচি। দেখি ঠাকুর কি করেন। দাদাকে তোমার মেজ'বউএর অসুখের কথাটা বলে রেখো। বাড়াবাড়ি হলে আসতেই হ'বে। তারে খবর দিব।

বউ দিদি,

ঠাকুরের প্রসাদে আজ সাতদিন পরে তোমার মেজ'বউএর জ্বর ছেড়েছে। চেহারাটা একেবারে ভেসে গেছে, সে রং নাই, সে কোনও কিছুই নাই। চোকের ভিতরে কি যেন একটা কাতরতা জেগে উঠেছে। আজ বিকাল বেলা আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—“শরৎ কোথায়?” আমি বললাম—“কিছু আসুর আর ডালিমের জন্ম বাজারে গেছে; আর কলকাতা থেকে কিছু ফল আসবার কথা, তাও এসেছে কিনা দেখতে ষ্টেনে যাবে।” তখন আমাকে কাছে ডেকে, বিছানায় বসিয়ে, আমার হাতখানা ধরে বললেন—“নরেন, তুমি আমার সত্য ভাইএর কাজ করেছ, তুমি না থাকলে সেদিন আমার কি হ'তো জানি না। প্রথম দিন থেকেই আমি যে চোখে শরৎকে দেখতাম, সেই চক্ষে তোমায় দেখেছি। তাই শরৎ যখন কলকাতায় যেতে চাইলে কোনও আপত্তি করি নাই। শরৎ আমার জন্ম যা করতে পারত না, তুমি তাই করেছ, এ ঋণ জন্মে শোধ দিতে পারব না।” বলিতে বলিতে চক্ষু দুটা জলে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন—“শরৎ সব শুনেছে?”

আমি বললাম, “না। কিছুই শুনে নি। ওকি বলবার কথা? শরৎ কেবল জানে যে আপনার অসুখ করেছে।”

“শরৎ তো আমায় ‘আপনি’ বলে না, তুমি বল কেন?”

বউদিদি আমারও চক্ষে জল আসিল। একটু স্নেহের জন্ম ঐ প্রাণটা যে কতই ভূষিত হয়ে আছে, দেখে আমার প্রাণটাও কেমন করে উঠল।

বললাম, “আচ্ছা আমি এখন থেকে ‘তুমি’ই বলব। আর তুমিও শরৎকে যেমন কখন’ তুমি কখন’ তুই বল, আমাকেও তেমনি বলবে?”

“আমার অসুখ বাড়লে তোমরা কি করতে, বল ত।”

“করব আর কি, ভাল ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করা তাম।”

“এখানে কি ভাল ডাক্তার আছে?”

“এখানে নাই, কটকে আছে।”

“সেখান থেকে কি এখানে ডাক্তার আসে?”

“আনালেই আসে।”

“আমার ত তত টাকা নাই।”

“যে ডাক্তার আস্ত সে টাকার জ্ঞান আস্ত না।”

“তবে কিসের জ্ঞান?”

“তুমি আমার দিদি, তারই জ্ঞান আস্ত।”

“সে ডাক্তার তোর কে হয় নরেন?”

“তিনি আমার দাদা, কটকের সিভিল সার্জেন।”

“তোমার দাদা, কটকের সিভিল সার্জেন! তোমার দাদার নাম কি?”

আমি দাদার নাম বললাম। তোমার মেজ'বউ অমনি চমকে উঠে বলেন, “উনি তোর দাদা!” এই বলে চোখ দুটো আবার কঁাদ কঁাদ হয়ে উঠল। এবার আমার পালা; বললাম—“আমার দাদাকে কি তবে তুমি চেন?”—একটু তামাসা করে বললাম—“তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে বুঝি বা কোনও দিন আমার দাদার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছিল।” তোমার মেজ'বউ বড় বিষণ্ণভাবে বলেন;—“উনি আমার নন্দাই ছিলেন।”

“ছিলেন মাকে, দিদি? দাদার ত দুটো বিয়ে হয় নি, আর আমার বউদিদি তো এখনও বেঁচে আছেন।”

“তোর বউদিদিই আমার নন্দ।”

“তবে তুমি আমার দাদার শালাজ, আর এতদিন এই কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলে।”

“তুই যে ওঁর ভাই, আমি জানব কি করে?”

“তা ত বটেই। যা হোক, এখন ত জানা শুনা হলো। আজই

আমি বউদিদিকে আস্তে লিখব। কটক গেকে পুরী ছা'তিন
ঘন্টার পথ বই ত নয়।”

“না না, তাকে লিখিস্ না। সে আসবে না।”

“আসবে না? তাঁর ভা'জ এখানে বেয়ারাম হয়ে পড়ে আছেন,
আর উনি আসবেন না, অসম্ভব কথা। আমার বউদিদি তেমন লোক
নন। আর বউদিদিকে লিখব তাঁর দাদাকেও যেন তারে খবর
দিয়ে আনিয়ে নেন।”

তোমার মেজ'বউ আর ধৈর্য রাখতে পারেন না। একেবারে
আমার দু হাত ধরে বলেন—“না ভাই নরেন, তাঁর পায়ে পড়ি।
অমন ক'র্ষ্য করিস্ না। আমি রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে
এসেছি, তাদের আর এ মুখ দেখাতে পারব না।”

“শরৎ বলেছে তুমি তোমার খুড়িখাত্তরী সঙ্গে জগন্নাথ দেখতে
এসেছিলে, রাগ করে এসেছ কে বলে।”

“কেউ বলেনি, আমি ত জানি।”

“তোমার মনের কথা ত আর কেউ জানে না। লোকে
জানে তুমি জগন্নাথ দেখতে এসেছিলে, এখন বাড়ী ফিরে যাবে।
তাতে হলো কি?”

“উনি জানেন।”

“তা হলে এত দিন যে উনি তোমায় নিতে আসেন নি, তার
ক'ণ্ড মিস্টার মৈত্রেয় যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরও সেই ব্যবস্থাই
ক'র্ব।”

“নরেন তুই আমায় ভালবাসিস্ বলে ওসব বল্ছিস্। তুই
জানিস্ না, আমি কি করেছি। আমি তাঁকে ত্যাগ করেছি।”

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। “ত্যাগ করেছ কি
করে? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স নাই তা কি জান না?”

“ডাইভোর্স কিরে?”

“মুসলমানেরা যাকে তালাক বলে, ইংরেজেরা তাকেই

ডাইভোর্স বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।”

“কিন্তু আমি ত করেছি তাই।”

“করেছ কি, খুলেই বলনা, দেখি।”

“ওঁকে লিখেছি, আমি আর ওঁর স্ত্রী নই।”

“ঐ কথা! সব স্ত্রীই ত রাগ করে ও কথা বলে।”

“ঝগড়ার মুখে ও কথা বলিনি, কোনও দিন ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় নি। তাই বুঝি ছিল ভাল।”

“তবে কি করেছ?”

“আমি তাঁকে শাস্ত্যভাবে, ঠাণ্ডা হয়ে, চিঠি লিখেছি যে আমি তাঁর স্ত্রী নই।”

“আবার একটা বে করতে বলনি ত?”

“তা বলতে যাব কেন? তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি করবেন। সে দায় আমার নয়।”

“ঐ দেখ, তুমি তাঁকে ছাড়নি; ছাড়লে তাঁর বিয়ের কথায় অমন হয়ে ওঠ কেন?”

“না নরেন, সত্যি আমি তাঁকে ছেড়েছি।”

“তিনিও কি তোমায় ছেড়েছেন?”

“তাঁর ছাড়ার অপেক্ষা ত আমি রাখি নি?”

“তবে তিনি যদি না ছাড়েন?”

“তাও কি হয়, আমি যে তাঁকে ছেড়েছি।”

“স্বামী স্ত্রীতে অত সহজে ছাড়াছাড়ি হয় না, দিদি। যে দেশে মাজিস্ট্রেটের কাছে রেজিস্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার মাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে রেজিস্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ করতেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। জান না দিদি, সাত পাক ঘুরে যে বে হয়, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না?”

“আমি যে তাঁকে ছাড়লাম বলে লিখেছি।”

“লিখেছ তাতে হলো কি ? ছেলেটা বেশী বিরক্ত করলে, মা যে কতবার বলে মর, মর ; তাতে কি আবার সেই ছেলেকে বুকে টেনে রাখে না ? আমাদের শাস্ত্রে বলে, রাগের মাথায় মানুষ যা বলে তাতে মিথ্যা বলার পাপ হয় না।”

“আমি যে কি করেছি তুমি জানিস্নে নরেন, নইলে অমন কথা ভাবতে পার্তিস্ন না।”

“কি করেছ ? ঝগড়াঝাটি করনি ; গারধর করনি ; একখানা চিঠি লিখেছ বই ত নয় ?”

“সে চিঠি দেখলে ও কথা কইতিস্ন না। চিঠিখানা দেখবি ? ঐ বাস্তবের ভিতরে তার নকল রেখেছি। বের করে নে।”

চিঠিখানা পড়ে বল্লাম,—“এই ত, অমন চিঠি আমরাও কত পাই। তাতে হয়েছে কি ?”

এমন সময় শরৎ এসে হাজির হলো।

বিকাল বেলা তোমার মেজ'বউএর আর জ্বর আসে নি। এখন-কার ডাক্তার বলেন, আর জ্বর হবে না। এখন ওঁকে বাড়ী পাঠবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯

বউদিদি,

আজ একটা খুব নতুন খবর আছে। বিন্দু বলে যে মেয়েটা আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে শুনে তোমার মেজ'বউএর এই বিরাগ হয়েছিল, সে মরেনি। শরৎ কলকাতা থেকে সে খবর নিয়ে এসেছে। বিন্দু নিজেও তোমার মেজ'বউকে চিঠি দিয়েছে। কি সামান্য ভুল ভ্রান্তি ধরে কত বড় ট্রাজেডির (মাপ কর বউদিদি, ট্রাজেডির বাঙ্গলা আমি জানি না) সৃষ্টি হতে পারে, এই ঘটনায় তাই বুঝলাম। বিন্দু মরে নি। শরৎ বিন্দুর শশুর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গিয়েছিল। তাই সেই গলিতেই আর একটা বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়ে জানে, সে বাড়ীর নতুন

বউ কাপড়ে আগুণ লাগিয়ে স্নেহলতার মতন আত্মহত্যা করেছে।
 ঐ খবর নিয়ে এসেই ত যত গোল বাধিয়েছে। বিন্দু কেবল
 মরেনি তা' নয়, এখন অতি সুখে আছে। তোমার মেজ'বউকে
 সে যে চিঠি লিখেছে, সেখানা নকল করে দিলাম, পড়ে দেখ।
 রাগ করো না, বউদিদি, বিন্দু যে প্রথমে অতটা গোল বাধিয়ে
 তুলেছিল, তা তোমার মেজ'বউ এর শিক্ষারই গুণে, তার নিজের স্বভাব-
 দোষে নয়। তোমার মেজ'বউ নিজেকে এখন এটা বুঝেছেন, নইলে
 আমি ও কথা কইতাম না। বিন্দু সর্বদাই নিজেকে বড় নিস্পীড়িত
 মনে করত। তোমার মেজ'বউই এ ভাবটা তার প্রাণে বেনী করে
 জাগিয়ে দেন। আর যে আপনাকে সর্বদাই নির্ব্যাভীত ও নিস্পীড়িত
 ভাবে, তার জ্যোতিষ অবশ্যস্তাবী। সব বিজ্ঞোহীর ভিতরকার কথাই
 এই। বিন্দুর কথাও তাই। তোমার মেজ'বউ এর কথাও তাই।
 বিন্দু এখন এ রোগমুক্ত হয়েছে; তোমার মেজ'বউ ও ঠাকুরের কৃপায়
 আরোগ্যের পথে দাঁড়িয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিন্দুর পত্র

শ্রীশ্রীচরণেষু,

দিদি আমি মরি নাই। তোমরা যে খবর পেয়েছিলে সেটা
 মিছে কথা। আমি যে দিন আবার আমার শ্বশুড়বাড়ী ফিরে আসি,
 তার দুদিন পরে, আমাদের পাশের বাড়ীতে একটা বউ কাপড়ে
 কেরোসিন দিয়ে আগুণ ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। তারও নাম বিন্দু
 ছিল। ওরা আমাদেরই জাতি। তারও এই দু'তিন মাস আগে
 বে হয়। এরই জন্য আমিই মরেছি বলে কথাটা রটে যায়। দিদি,

আমি মরি নি। আর এমন সুখে আছি যে, মরবার কোন সাধ আমার আর নাই।

ঐ মেয়েটা যখন পুড়ে মরে, আমি দেখেছিলাম। আমার শোবার ঘরের পাশেই ছাদ, আর তার পরেই ওদের ছাদ। তখন রাত দুপোর হবে। আমরা তার চীৎকারে জেগে উঠে, দৌড়ে বাহিরে গিয়ে দেখি, মেয়েটার চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে, আর সে “বাবা গো, আমি মরবো না, আমি মোরবো না”—বলে বিকট চীৎকার কচ্ছে। তার মুখের সে ছবি আমার প্রাণের ভিতরে কে যেন ঐ আগুন দিয়ে দেগে দিয়েছে। যখনই মনে হয়, সর্দাঙ্গে ঘাম ছুটে, এত ভয় হয়। আমি ঐ দেখে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। উনি আমাকে কোলে করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, সারা রাত বাতাস করে, কত রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ঐ ভয়টা ভাড়াতে চেম্টা করেন। আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম; আর উনি, ছেলে ভয় পেলে মা যেমন তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ঘুমাতে দেয়, তেমনি করে সারারাত জেগে আমার গায়ে হাত রেখে, আমার মাথায় বাতাস করে পাহারা দেন। ভোর বেলা চোখ মেনে, দেখি, এইভাবে বসে আছেন। দিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি বড় সুখে আছি।

তুমি আমার দুঃখ অনেক দেখেছ, আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কেঁদেছ, আমাকে মার পেটের বোনের মতন ভাল বেসেছে। ক্ষম্মে আমি তার আগে অমন আদর ও ভালবাসা পাই নাই। আর তুমি অমন করে ভালবাস্তে বলেই আমার বিয়ে করতে এত অনিচ্ছা ছিল। তোমার ঐ আদর ছেড়ে পরের বাড়ী যেতে একেবারেই মন চাইল না। তাই তোমার পায়ে ধরে অত কেঁদে-ছিলাম, বলেছিলাম, “আমায় বিয়ে দিও না, দাসী করে নিজের কাছে রাখ।” আমার রূপ নাই জান্তাম। সনাই বলত অমন

কাল মেয়ের কি আমার ভাল বে হয় ? আমার বাপ মা নাই, টাকা কড়ি নাই। শূন্য একরাশ টাকা নইলে কোনও মেয়ের বে হয় না। তাই আমার যখন বিয়ের সম্বন্ধ এল, তখন ভাবলাম, যে এর ভিতরে অবশ্য একটা কিছু ভারি গলদ আছে ; নইলে অমন কাল মেয়েকে, অমন মা নাপথোগো গরিব মেয়েকে বিয়ে করতে চায় কে ? তাই ভয় হচ্ছিল, কোথায় বাচ্ছি। মনে মনে ভাবলাম, অমন কাল মেয়েকে যে বিয়ে করতে রাজি হয়, না জানি সে কত কুৎসিত। আমার মনের কথা কেউ জানে না দিদি, কেবল এই আজ তোমায় বলছি। তোমায়ও এ সব কথা কোনও দিন কইতাম না, যদি ঠাকুর আমার ভাগ্যে এত সুখ না লিপ্ত করেন। সুখ পেয়েছি বলেই আজ দুঃখের কথা কইতেও আমার সুখ হয়। কি বলছিলুম ? হাঁ, ঐ আমার বের রাতের কথা। মনে মনে আমার স্বামী অতিশয় কুৎসিত হবে ভেবে রেখেছিলুম বলে, শুভদৃষ্টির সময় আমি জোর করে চোখ দুটোকে চেপে রেখেছিলুম। ছেলেবেলা অঁধার রাতে ঘরের বাহিরে গেলে ভূতের ভয়ে যেমন চোখ বুজে থাকতাম, তেমনি করে চোখ বুজে রইলাম। তার পর বাসর ঘরে গিয়ে আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। গল্প শুনতাম, বাসর ঘরে কত লোক থাকে, কত রং তামাসা হয়, আমার বাসরে সে রকম কিছুই হলো না। একজন বুড়ী আমার হাত ধরে নিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পরে উনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি ভয়ে আড়ম্বল হয়ে গেলাম। মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বিছানার এক পাশে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। একবার তিনি আমার হাত খান্না এসে ধরলেন, তার পরেই ছুড়ে ফেলে গর্গর্ করতে করতে উঠে গেলেন, আর সারা রাত ঐরূপ গর্গর্ করে পাইচারি করে কাটালেন। মাঝে একবার মনে হল যেন, অনেকগুলি কাচের বাসন ছাতে ছুড়ে ফেলে চুরমার করে ফেলেন। আমি বুঝলাম, এ ব্যক্তি পাগল। তার পর দিন যখন খেতে বসেছি, অমনি তেড়ে

একেবারে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ; আর ভাতের খালা ছুড়ে ফেলে, উশুনে জল ঢেলে, হেঁসেলের ভাতবেগুন সব জুতা শুদ্ধ পায় লাগি মেরে চারিদিকে ছড়িয়ে চলে গেলেন । আমি দেখে শুনে ভয়ে ভয়ে প্রাণের দায়ে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম । তার পর কি হলো, তুমি জান । তুমি আমায় রাখতে চেয়েছিলে । কিন্তু আমার ভাণ্ডর যখন নিতে এলেন, তখন দেখলাম তোমাদের বিপদ হ'তে পারে, তাই তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলাম । এবারে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি । আমি চলে এসেছি শুনে উনিও বাড়ী ছেড়ে চলে যান । তার পর যখন শুন্লাম, আবার ফিরে এসেছেন, তখন আবার আমার পিস্তি শুকিয়ে গেল । তাই আবার পালিয়ে আমার খুল্লতাত ভাইদের ওখানে যাই, ওরা যখন কিছুতেই স্থান দিলে না, তখন কাজেই আবার ফিরে আসতে হলো । আমার গাড়ী যখন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখলাম একটা নতুন লোক আমাকে গাড়ীর দরজা খুলে তুলে নিলেন । আমি ভাবছিলাম আমার শ্বাশুড়ী বা বাড়ীর কি চাকরাণী বুঝি কেউ এসে দরজা খুল্ল ; তাই নিঃশঙ্কোচে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম । দিদি, দেখলাম একজন অতি সুন্দর পুরুষ । যেমন মুখ, তেমনি রং, যেমন কোঁকড়া কাল চুল, তেমনি বড় বড় টানা চোখ, যেমন নাক তেমনি সব । পুরুষের অমন রূপ জন্মে দেখিনি । মিশ্রা বল্বে না, দিদি, দেখেই মনে হলো, হা বে কপাল ! অমন স্বামী যদি আমার হ'ত ! আমি তাঁর পিছু পিছু অন্দর মহলে ঢুকলাম । তখন ইনি ডেকে বলেন—“মা, তোমার বউ এসেছে, আমার ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি ।” গলার স্বরে আমার সর্বস্ব কেমন করে উঠল । পা যেন আর চলে না । শরীরটা যেন হঠাৎ ভারি হয়ে পড়ল । মনে হলো যেন আমি ভেঙে পড়ছি । তখন তিনি আমার হাত ধরে একেবারে ছুতালায় শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন । বহু করে বিছানায় বসালেন । পাখা

নিয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগলেন। তার পর বল্লেন—অমন মিষ্টিভাবে জন্মে আমার সঙ্গে আর কেউ কথা কয়নি, দিদি, অভিমান করো না, তুমিও কইতে পার নি—“একবার এদিকে এস।” আমি যেন পুতুলবাজির পুতুল সেজেছি। অমনি ধীরে ধীরে উঠে তাঁর সঙ্গে গেলাম। বারান্দায় একখানা কাঠের চৌকি ছিল, আমায় সেখানে বসালেন। তার পর নিজে এক ঘড়া জল এনে আমায় পা ধুতে দিলেন। আমি লজ্জায় মরে যেতে লাগলাম, কিন্তু বাধা দিবার শক্তি ছিল না। আমাকে হাতে মুখে জল দিতে বল্লেন, নিজে দাঁড়িয়ে সে জল ঢেলে দিলেন। তার পরে আবার ঘরে এসে, নতুন বাণারসী শাড়ী বের করে বল্লেন,—“কাপড় ছাড়, তোমার ফুলশয্যার জন্য এখানি এনেছিলাম, আজই তোমার ফুলশয্যা।” এই বলে বারান্দায় গেলেন। আমি সেই শাড়ীখানি কোনও মতে পরলাম। হাত পা কিছুই যেন আর আমার নিজের বশে নাই। আমার কাপড় ছাড়া হলে, এক বাস্তব গহনা বের করে, —তোমার দেওয়া গহনাগুলি একে একে খুলে ফেলে, নিজের হাতে বালা, বাজু, অনন্ত, চিক, ইয়ারিং পর্যন্ত পরিয়ে দিলেন। কতক্ষণ যে এই গহনা পরতে লাগল, বলতে পারি না। এক এক খানি গহনা পরাচ্ছেন্, আর অনিমেষে খানিকক্ষণ সে অঙ্গটাকে দেখছেন। এক এক বার মনে হতে লাগল, বুঝি এ ব্যক্তি সত্যি সত্যি পাগল। আবার মনে হতে লাগল, দুনিয়ার সব ভাল লোকের চাইতে আমার এ পাগলই ভাল, এ পাগলকে গলায় বেঁধেই আমি মরব। সব গহনা পরান শেষ হলে আমার মুখখানি তুলে ধল্লেন,—আমার তখন চোখ বুজে থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দিদি, পোড়া চোখ তা কলে না, চাঁর চক্ষে মিলন হলো! এই আমাদের ‘শুভদৃষ্টি’। দিদি, আমার চোখ জলে ভরে আসছে, আমি যে কাল’, আমি নাকি কুৎসিত, তবু ওঁর চক্ষে বুঝি বা আমিও বড় সুন্দর! নইলে ও চৌখ আমায় দেখে অমন হয় কেন?

দিদি, ইনি পাগল নন। ছেলে বয়সে একবার বড় মদ গাঁজা খেতে আরম্ভ করেন, তারই জন্ম মাঝে ক'দিন একটু ক্ষেপে উঠেছিলেন সত্য। কিন্তু সে প্রায় দশ বার বছরের কথা। এখন তুমাক পর্যন্ত ছোঁই না। তবে বড় বদরাগী লোক। রাগলে জ্ঞান থাকে না। আর, দিদি, যে রাগতে জানে না, সে ত পাথর, সে কি ভালবাসতেই জানে? জান কি, আমায় বে কল্লেন কেন? স্নেহলতা মেয়েটা যখন আত্মহত্যা করে, ঐ কথা শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যার কোনও রকমে বরপণ দিবার সম্ভল নাই, তেমন বাপের মেয়ে না পেলে বে করবেন না। তাই খুঁজে খুঁজে ঘটকী আমায় বের করে। এ বিয়েতে তাঁর বাপমায়ের বড় আপত্তি ছিল। তাঁরা প্রথমে টাকা খুঁজছিলেন। যখন ছেলে পণ নিয়ে বে করবেই না কোট করে বসুলো, তখন আর কিছু না হউক, যার দুপয়সা আছে, বারমাসে তের পার্বণে তত্ত্ব পাঠাতে পারবে, এমন ঘরের মেয়ে বে করুন, তাঁরা তাই চাচ্ছিলেন। কিন্তু উনি এতেও নারাজ হলেন। তাতেই বাপনেটাতে ঝগড়া হয় ও বাপ ছেলের বিয়েতে থাকবেন না বলে কানী চলে যান। আমার শাশুড়ী বাড়ী ছেড়ে গেলেন না বটে, কিন্তু আমি যে কুলীনের মেয়ে এ অপরাধটা ভুলতে পারেন না। তারই জন্ম আমাকে হাড়ীবাগদীর মেয়ের মতন পিতলের খালাতে ভাত দিয়েছিলেন। হয় ত ভেবেছিলেন, অতি গরীবের ঘরের মেয়ে, তাতে আবার বাপ মা নাই, একপেই বুঝি আমি লালিত পালিত হয়েছি; তারই জন্ম উনি অমন রেগে উঠেছিলেন। মাঝে আর কিছু মুখে বলতে পারেন না, তাই কতকটা আমার উপর দিয়ে, আর কতকটা খালাবাসন ও হাড়িকুড়ির উপর দিয়ে সে রাগটা চালিয়ে দিলেন। আর উনি যে সব গহনা দিয়েছিলেন, ওঁর মা আমায় সেগুলি পরিয়ে দেন নি বলে বিয়ের রাতে অমন করে রেগে গিয়েছিলেন।

দিদি, আমি ভাবি, তোমরা যদি আমায় সত্যি সত্যি রাখতে, আমার খুড়তুত ভাইয়েরা যদি আমায় স্থান দিত, আর একমুঠা

ভাত যেখানেই হউক আমার মিলুই,—তাতে আমার কি সর্বনাশই হতো। অমন দেবতার মতন স্বামীকে পেতাম না! আর স্বামীকে পেয়েছি বলে, শশুর, শাশুড়ী সবাইকে পেয়েছি। ভাশুর, যা, ভাশুর-পো, ভাশুর-বী, সকলে আমার কতই আপনার হয়ে গেছে। দিদি, আমি নিজে কে ওঁদের সেবায় নিযুক্ত করে, ওঁদের মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। এখন আর আমার নিজের কোনও দুঃখ নাই। সুখ আমার উপছে পড়ছে। দিদি, অনেক দিন তোমার বুকে মাথা রেখে আমি আমার ছোট দুঃখের কান্না কেঁদেছি, আজ বড় সাধ যায়, ঐ বুকে ছুটে গিয়ে এইবার আমার সুখের কান্না কাঁদি। আমার দুঃখে চিরদিন দুঃখ পেয়েছ, এবার আমার সুখ দেখে সুখী হও।

শুনলাম আমি মরেছি শুনে তুমি বিবাগী হয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছ। আমি যখন সত্যি সত্যি বেঁচে আছি, তখন তুমি আর ঘর বাড়ী ছেড়ে থাকবে কেন? আর মরেই কি কখনও তোমার দুঃখে আমার সুখ হতো? স্বামীর কোলে মাথা রাখাতে যে কি সুখ, তা ত তুমি জান। তুমি আমার জন্য এই স্বর্গসুখও ছেড়েছ, শুনে অবধি আমার নিজের সুখ যেন আধখানা হয়ে গেছে। তুমি শিগুগির ফিরে এস। তোমায় বড় দেখতে ইচ্ছা করে। লক্ষ্মী দিদি আমার, শিগুগির ফিরে এস। আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিবে।

তোমারই সেবিকা

বিন্দু

চতুর্থ অধ্যায়

মেজ'বউএর পত্র

ঠাকুর-ঝি,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ঠাকুর-পোর কথা কি আর লিখব, আমার জন্য সে যা করেছে, শরৎ তা করতে পারত না। ভগবান্ তাকে এনে জুটিয়েছিলেন বলেই তোমার মেজ'বউ এখনও বেঁচে আছে।

আমাকে তোমার ওখানে যেতে বলছ। আমি কি করেছি তা জানলে এ পোড়ারমুখীর মুখ আর দেখতে চাইতে না! অমন দেবতার মত স্বামী, তাঁকে কতই না অনাদর, কতই না অপমান করেছি। শাস্ত্র মতে আমি পরিত্যক্তা। কারণ অপ্রিয়ভাষিনী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে, শাস্ত্রে এই কথাই বলে।

আমি তোমার দাদাকে পরিত্যাগ করেছি। তিনি আমায় ছাড়েন নি, আমি ছেড়ে এসেছি। আমি তীর্থ করতে আসিনি, ওটা একটা ছুতা মাত্র। আমি আর তোমাদের সম্পর্ক রাখবো না বলে এসেছি। স্ত্রীলোকের মনের যে অবস্থা হলে আজ কাল তারা নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরে, আমি সেই মন নিয়ে বাড়ী ছেড়ে আসি। মরতে সাহস হয় নি বলে মরি নি। সতী স্ত্রী আপনি মরে, আমি তা করি নি, স্বামীর ভালবাসাটাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছি।

ঠাকুর-ঝি, তোমরা সতী সাধ্বী, আমি যে তোমাদের অম্পৃশ্যা! আমায় মাপ কর। আমি তোমাদের কাছে এ মুখ দেখাতে পারব না।

স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক, এই প্রার্থনা করি।

পঞ্চম অধ্যায়

ঠাকুর-পোর পত্র

বউদিদি,

আমি ত কিছুতেই তোমার মেজ'বউকে বাড়ী ফিরে যেতে রাজি করাতে পারলাম না। তোমাকেই আসতে হবে। তোমার দাদা যদি আসেন, আরও ভাল হয়। তোমাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঠাকুর-কীর পত্র

মেজ'বউ,

তুমি যখন এলে না, আমরাই তখন যাচ্ছি। মেজদাদাকেও লিখেছি, তিনি রবিবারে এখানে আসবেন। উনিও শানাজকে দেখতে যাবেন। তিন দিনের ছুটি নিয়েছেন। আমরা তিন জনে সোমবার প্রাতে তোমার দোরে গিয়ে অতিথি হবো। জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিতি।

সপ্তম অধ্যায়

আবার কীর পত্র

শ্রীশ্রীচরণকমলেশু,

ঠাকুর-কীর পত্রে জান্লাম, এই সোমবারে তুমি এখানে আসবে। তোমার পায়ে পড়ি, এস না—আমিই যাচ্ছি। আমার জন্য এই কষ্ট স্বীকার করে, এ হতভাগিনীকে আর নতুন করে অপরাধিনী করে না।

তুমি এস না বলছি ; কিন্তু তোমার কাছে কোনও কথা গোপন করব না। তুমি আসবে শুনে আমার প্রাণটা যে কি করে উঠল, তোমায় বুঝাতে পারব না। তুমি আসবে বলেই আমি ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছি। নইলে বাকী জীবন হয় ত এমনি করে এই দুঃখের আগুনে পুড়ে মরতে হতো। তুমি আসছ শুনে বুঝলাম, তুমি তোমার এ কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর নি। আজ ঈশ্বরের দয়াতে আমার সত্য বিশ্বাস জন্মাল। লোকে যতই পাপ করুক না কেন, তিনি যে কাউকে ছাড়েন না, তোমার এ ক্ষমা দেখে তাই বুঝলাম।

আর, সত্যি বলছি, ঈশ্বর কে, তা ত আমি জানি না। একজন মনগড়া ঠাকুরের পায়ে এতকাল জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলেছি, কিন্তু এতদিন পরে আমার সত্য ঠাকুরকে আমি পেলাম।

তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারি মতন একজন মানুষ বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে পাই নাই। আর মানুষ ভেবেই ত তোমায় এত অযত্ন, এত দুচ্ছতাচ্ছল্য করেছি। পনের বছর কাল তোমার ঘর কল্লাম, কিন্তু একদিনও তোমার পানে তাকাই নাই, কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অহঙ্কারই করেছি, তোমার ঐ বিশাল জ্ঞানের দিকে তাকাই নাই ; আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি, তোমার ত্যাগকে লক্ষ্য করি নাই ; কেবল পাবার জন্যই ছটফট করেছি, কোনও দিন তোমায় সত্যভাবে কিছু দিই নাই। এবার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝলাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে নয় ; ত্যাগেই শান্তি, ভোগে নয়। যে আপনাকে বড় করে, সেই ছোট হয়ে যায়, যে নিজেকে ছোট করে, সেই বড় হয়ে ওঠে। আমি তোমার সঙ্গে টকর দিয়ে তোমার সমান হতে গিয়ে, তোমাকেও ধরতে পারলাম না, নিজেকেও রাখতে পারলাম না। আজ এই কলঙ্কের কালি মেখে, তোমার চরণের ধূলি হয়ে, তোমাকেও ধরেছি, নিজেকেও পেয়েছি।

আমি বার বছরের ছোট্ট বালিকা তোমাদের এত বড় পরিবারের মধ্যে এসে পড়লাম। কিন্তু তোমাদের বিশালহের ভিতরে আপনার ক্ষুদ্রকে হারাতে পারলাম না। লোকে বলত আমার রূপের কথা, অমন রূপ বাঙ্গালীর ঘরে হয় না—আমি তারই গর্বে ফেঁপে উঠলাম। মা বাবা বলতেন আমার বুদ্ধির কথা, আমি সেই অহঙ্কারেই ঘট হ'য়ে বসলাম। তুমি শিখালে আমায় লেখাপড়া, আমি তাই নিজেকে বিদ্বান্ ভেবে একেবারে টগে চড়িলাম। অন্য লোক হ'লে কত ঝগড়াঝাটি হতো। কিন্তু তুমি একদিন একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত বল নি। যখন বড় অন্ডায় করেছি, মুখখানা কেবল একটু ভারি হতো। এত করে তোমায় কষ্ট দিয়েও আমি যখন যা চেয়েছি, তুমি তাই দিয়েছ। কোনও দিন কিছুতে 'না' কর নি। 'না' কথাটা বিধাতা তোমায় শিখান নি। বাড়ীর যে যা ইচ্ছা তাই করে, তুমি কোনও দিন কারও ইচ্ছার প্রতিরোধ কর নি। আমি ভাবতাম তোমার পুরুষত্ব নাই। ভেবে দেখি নি যে, এই দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিও ত অমনি ভাবে চুপ করে বসে আছেন। তুমি ভাইদের মধ্যে সকলের চাইতে বেশী রোজগার কর ; তুমি যদি কোনও বিষয়ে কথা কও, পরিবারে শান্তি থাকবে না। যার যত শক্তি বেশী, যে যত কন্ঠী বড়, সে তত চুপ করে থাকে। এই মোটা কথাটা আমি তখন বুঝি নি। আমি নিজেকে তোমা থেকে কেবলই আলাহিদা করে দেখতাম বলে, তোমার গহবর যে কত ও কোথায় তা বুঝতে পারি নি। তাই আমার এ দুর্গতি। আমি সব ছোট জিনিসকে বড় করে তুলতাম, তাই তুমি যে অত বড় তা বুঝি নি, তোমাকেও ছোট বলে ভেবেছি। এই করে জীবনের এই পনর বছর খুইয়েছি। সব জীবনটাই খোয়াতে বসেছিলাম।

আমার সকল অপরাধের কথা ত শুন নি। তোমাকে ছেড়ে এসে আমায় কি অপমান সহিতে হয়েছে, তুমি জান না। সে দিন যদি তোমার বোনের দেবর নরেন আমার খোঁজে এসে ঐ অপমান

থেকে আমায় না বাঁচাত, তা' হলে এই সমুদ্রেই চিরদিনের মতন তোমার মৃণাল ডুবে মরিত। অরক্ষিতা স্ত্রীর অঙ্গ পরপুরুষে স্পর্শ করলে অনেক স্বামী শুনেছি তাকে আর গ্রহণ করে না। অপরের কথা কি, স্বয়ং রামচন্দ্র পর্য্যন্ত করতে চান নি। আমায় কি তুমি গ্রহণ করবে? এই কথাটা তোমায় না বলে আমি তোমার কাছে যেতে পারি না।

বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবার চরণাশ্রয় দাও, তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী-জন্মটা সার্থক করি। বিন্দি আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া সত্যকে পেয়েছে। আর আমি নিজেকে নষ্ট করতে বসে সত্যকে দেখেছি। তুমি আমায় রাখ বা ছাড়, যাই কর না কেন, আমি তোমারই চিরদিনের চরণাশ্রিত।

মৃণাল।

বৌদ্ধ ধর্ম

১। বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে ?

বৌদ্ধধর্ম যত লোকে মানে, এত লোকে আর কোন ধর্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মালুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবিরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভূটান, সিকিম, রামপুরবুনায়েরের সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্ধেকেরও বেশী বৌদ্ধ। বর্মা, মায়াম ও আনাম অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ। সিংহলদ্বীপে অধিকাংশ বৌদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও অনেক জায়গায় বৌদ্ধ মত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে। চাটগাঁ, রাজামাটির ত কথাই নাই। উহার বর্মা আরাকানের শিষ্য। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্য এখনও বৌদ্ধ মত চলে। তাহার মধ্যে বোধ নামক রাজ্য যে বৌদ্ধমতাবলম্বী তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই সকল মহলে অনেক দিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা মহিমপন্থ নামে এক নূতন বৌদ্ধ মত চালাইয়াছেন। বাঙ্গালায় যাহারা ধর্ম-ঠাকুরের পূজা করে তাহারা যে বৌদ্ধ একথা এখন কেহ অস্বীকার করেন না। -বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রতিমূর্তি বলিয়া পূজা হয়, কিন্তু এই দুই দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্মের গন্ধ ভরভর করে। যাহারা বলেন ৫ম মহাশূন্যে তারা! ও ৬ষ্ঠ মহাশূন্যে কালিকা, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহেন, কারণ কোন হিন্দু কখনও শূন্যবাদী হন নাই, হইবেন না ও ছিলেন না।

এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরও বিস্তার হইয়াছিল। তুর্কী-স্তান এককালে বৌদ্ধধর্মের আকর ছিল। সেগান হইতে সাময়েদরা এবং তুর্কীস্তানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছিল। পারস্য এককালে বৌদ্ধধর্ম প্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পুরাই বৌদ্ধ ছিল। পারস্যের পশ্চিমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কারণ রোমান কাথলিকদিগের অনেক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতি, বৌদ্ধদেরই মত। রোমান কাথলিকদের মধ্যে দুই জন ‘সেন্ট’ বা মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম ‘বারলাম’ ও ‘জোসেফট’। অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে এই দুইটি শব্দ বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দের রূপান্তরমাত্র।

অনেকে এই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে সক্ষম হন নাই। কারণ বৌদ্ধেরা বড় আপনাদের ইতিহাস লিখেন নাই। মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বৌদ্ধধর্মের নামও শুনে নাই। তবকতিনাশিরী ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস হইবার ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, মহাম্মদি বক্ত্রিয়ার ঐ বিহারটাকে কেহ্না বক্ত্রিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যখন উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত “দুর্গরক্ষী সৈন্য” বধ করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন, সৈন্যদিগের চেহারা আর এক রকম; তাহাদের সব মাথা মুড়ান ও পরনে গেরুয়া কাপড়। তখন তিনি মনে করিলেন, ইহার “সব মাথা মুড়ান ব্রাহ্মণ”। আবুল ফাজল এত বড় “আইনি আকবরী” লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বৌদ্ধধর্মের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড় করে নাই; করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা কিরূপ হইতেছে? শুনা যায় এককালে কোন অন্ধনিবাসের লোকে হাতী দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।

সকলেই অন্ধ, স্তূতরাং তাহাদের জীবন্ত হাতী দেখান কঠিন। সেইজন্য অধ্যক্ষ অন্ধগুলিকে একটি মরা হাতীর কাছে লইয়া গেলেন। কানারা হাত বুলাইয়া হাতী দেখিতে লাগিল। কেহ শুঁড়ে হাত বুলাইল, কেহ কাণে হাত বুলাইল, কেহ দাঁতে হাত বুলাইল, কেহ মাথায় হাত বুলাইল, কেহ পিঠে হাত বুলাইল, কেহ পায়ে হাত বুলাইল, কেহ লেজে হাত বুলাইল, সকলেরই হাতী দেখা শেষ হইল। শেষে সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেখানে সকলে ঝগড়া করিতে লাগিল। কেহ বলিল হাতী কুলার মত, কেহ বলিল হাতী নলের মত, কেহ বলিল হাতী উন্টা ধামী, কেহ বলিল হাতী বড় উঁচু, কেহ বলিল হাতী থামের মত, কেহ বলিল হাতী চামরের মত। সকলেই বলিতে লাগিল ‘আমার মতই ঠিক’। স্তূতরাং ঝগড়া চলিতেই লাগিল, কোনরূপ মীমাংসা হইল না। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপই ঘটিয়াছে। ইউরোপীয়েরা সিংহলদ্বীপেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেখেন ও সেইখানেই পালো শিখিয়া বৌদ্ধদের বই পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলেন বৌদ্ধধর্ম কেবল ধর্মনীতির সমষ্টিমাত্র, উহাতে কেবল বলে ‘হিংসা করিও না,’ ‘মিথ্যা কথা কহিও না,’ ‘চুরি করিও না,’ ‘পরস্ট্রীগমন করিও না,’ ‘মদ খাইও না’। হজ্জসন্ সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্ম পাইলেন। তিনি দেখিলেন, বৌদ্ধদের অনেক দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর। কেহ বা শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদীমাত্র, কেহ বা তাহাও বলেন না। যে সকল দর্শনের মত আঠার ও উনিশ শতে ইউরোপে প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তিনি সেই সকল মত নেপালের পুঁথির মধ্যে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, এ সকল মত বৌদ্ধদের মধ্যে দুই তিন শতে চলিতেছিল। বিশপ বিগাণ্ডেট ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম দেখিতে পান। তিনি দেখেন, উহার আকার অনুরূপ। উহাতে পূজাপাঠ ইত্যাদির বেশ ব্যবস্থা আছে। তিনি দেখেন, বৌদ্ধমঠমাত্রই এক একটি পাঠশালা।

ছোট ছোট ছেলেরা পড়ে। যিনি তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্ম দেখিলেন, তিনি দেখিলেন, সেখানে কালীপূজা হয়, সেখানে মল্লতন্ত্র আছে, হোমজপ হয়, মানুষপূজা হয়। চীনদেশের বৌদ্ধধর্ম আবার আর এক রূপ। তাহারা সব মাংস খায়, সব জন্তু মারে; অথচ বৌদ্ধ। জাপানীরা বলে ‘আমরা মহাযান অপেক্ষাও দার্শনিকমতে উপরে উঠিয়াছি’। অথচ আবার তাহাদের মধ্যে এক দল বৌদ্ধ আছে, তাহারা নানারূপ দেবদেবীর উপাসনা করে।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম নানাদেশে নানামূর্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে; কোথাও বা উহা পূর্বপুরুষের উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভূত প্রেত-উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দেহতত্ত্ব-উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও আবার থাটি বুদ্ধের মত চলিতেছে, কোথাও খাটি নাগার্জুনের মত চলিতেছে। সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধধর্মের একখানি পূরা ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার ভাষার গোল। বুদ্ধের বচনগুলি তিনি কি ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাহার বাড়ী ছিল কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশের লোক বুঝিতে পারে এমন কোন ভাষাতে তিনি ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে সকল অতিপ্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না সংস্কৃত, না মাগধী, না কোশলী; এক রূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন ‘মিশ্র ভাষা’। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন ‘Mixed Sanskrit’। ‘বিমলপ্রভা’ নামে নয় শতের এক পুঁথিতে আমরা দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিল; মগধদেশে মগধভাষায়, সিন্ধুদেশে সিন্ধু ভাষায়, বোটদেশে বোটভাষায়, চীনদেশে চীনভাষায়, মহাচীনে মহাচীনভাষায়, পারস্যদেশে

পারস্ত্যভাষায়, রুক্ষদেশে রুক্ষভাষায়। আমরা জানি পারস্তদেশে মগের ধর্ম চলিত ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও ‘জরথুশা’র শিষ্য ছিল। সে দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ছিল, এ কথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই নূতন। রুক্ষদেশ কাহাকে বলে, জানি না, রোম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, বিমলপ্রভায় বলে, উহা নীলানদীর উত্তর। বিমলপ্রভায় আরও একটি নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপ্রভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধদিগের অনেক সঙ্গীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ পর্য্যন্ত অতি অল্পলোকেই জানেন।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নানামুনির নানামত আছে। যাঁহার সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া এবং পালি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করেন, তাঁহারাই মথার্থ বৌদ্ধ। গৃহস্থবৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে

বৌদ্ধ কাহাকে
বলে ?

রাজী নহেন। তাঁহারা বলেন, ত্রিপিটকে যাহা কিছু ব্যবস্থা আছে, সবই বিহারবানী ভিক্ষুদের জন্য। বিনয়পিটকে যত বিধিব্যবস্থা আছে, সবই ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের তাহাতে স্থান নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহারা “পঞ্চশীল” গ্রহণ করে অর্থাৎ “প্রাণাতিপাত করিব না”, “মিথ্যাকথা কহিব না”, “চুরি করিব না”, “মদ খাইব না”, “ব্যাভিচার করিব না”—এই পাঁচটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাহারাও বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলে এক জায়গায় ঠেকিয়া যায়। যে সকল জাতি দিনরাত প্রাণিহিংসা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যথা জেলে, মালা, কৈবর্ত, শিকারী, ব্যাধ, খেট, খটিক্ প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের অধিকার একেবারেই থাকে না।

এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবীশুদ্ধই বৌদ্ধ; কারণ, যিনি

বোধিসত্ত্ব হইবেন, তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। লঙ্কাবাসীর মত আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এই ক্ষণে নেপাল ও তিব্বতবাসীরা লঙ্কাবাসীদিগকে হীনযান বৌদ্ধ বলেন এবং আপনাদিগকে মহাযান বৌদ্ধ বলেন। এখানে ‘যান’ শব্দের অর্থ লইয়া অনেক বিবাদবিসম্বাদ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ উহার ইংরাজী করেন Vehicle অর্থাৎ গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে ‘যান’ শব্দের অর্থ পশু বা মত। আমরা যেমন এখন বলি ন’নকপশ্চী দাছুপশ্চী কবীরপশ্চী, সেকালে বৌদ্ধেরা সেইরূপ বলিত শ্রাবকযান, প্রত্যেক যান, বোধিসত্ত্বযান, মল্লযান ইত্যাদি। Vehicleএর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মহাযান বৌদ্ধেরা আপনাদের বড় দেখাইবার ক্ষণে আগেকার বৌদ্ধদিগকে হীনযানী বলিত, আর আপনাদিগকে বোধিসত্ত্বযান বলিত।

মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগৎই উদ্ধার করিতে বসিলেন, তবে জগৎশুদ্ধই ত বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন ‘আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত, পৌত্তলিক, রাজপূজক, ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করিব’। কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কি, সে কথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না; এইমাত্র বলেন ‘যাহার যাহাতে ভক্তি, আমরা সেইরূপ ধারণা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব’। এ বিষয়ে কার্ণশূব্র্যহে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“তুমি কি করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে? জগতে ত নানামুনির নানামত, লোকে তোমার কথা শুনিবে কেন?” তখন করুণামূর্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন,—“আমি বিষ্ণুবিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিববিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনায়কবিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব, রাজভটবিনেয়দিগকে রাজভটরূপে উদ্ধার করিব”। এরূপে তিনি যে কত

দেবতার বিনেয়দিগকে কতরূপে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সেইজন্য উপরে তাহার কয়েকটি-মাত্র দেওয়া হইল। এ মতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ। এখন যেমন থিওজফিট মহাশয়েরা বলেন “তোমরা যে ধর্ম্মই থাক, যে দেবতার উপাসনাই কর, ধর্ম্ম এবং চরিত্রে বড় হইবার চেষ্টা করিলেই, তোমরা থিওজফিট এবং যে কেহ থিওজফিট হইতে পারে”। এও কতকটা সেইরূপ, তবে ইহাদের অপেক্ষা মহাযানী বৌদ্ধদের জগতের প্রতি করুণা কিছু বেশী ছিল। তাঁহারা নিজেই চেষ্টা করিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে যাইতেন। তোমার চেষ্টা থাকুক, আর নাই থাকুক, তাঁহারা বলিতেন “আমরা নিজগুণে তোমায় উদ্ধার করিব”। সেইজন্য মহাযান ধর্ম্মের সারের সার কথা “করুণ”। উহাদের প্রধান গ্রন্থের নাম “প্রজ্ঞাপারমিতা”। উহার নানারূপ সংস্করণ আছে ; এক সংস্করণ শত সহস্র শ্লোকে, এক সংস্করণ পঁচিশ হাজার শ্লোকে, আর এক সংস্করণ দশহাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ আটহাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ সাতশত শ্লোকে, আর এক সংস্করণ, সকলের চেয়ে ছোট, স্বল্পাক্ষর—“স্বল্পাক্ষর প্রজ্ঞাপারমিতা”,—উহার তিনটি পাতা মাত্র। প্রজ্ঞাপারমিতা আরম্ভ করিতে হইলে কতকটা গৌরচন্দ্রিকা চাই—শেষ করিতে গেলেও কতকটা আড়ম্বর চাই। এই সব বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িয়া দিলে উহাতে একটিমাত্র কথা সার—“সকল জীবের করুণা কর”।

মহাযানের মর্ম্ম গীতায় একটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি অনেকেরই অভ্যাস আছে।

যো যো যাং যাং তমুং ভক্তঃ শ্রদ্ধার্থিতুমিচ্ছতি ।

তস্য তাস্মাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥

গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাযানে এই ভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্বানের অভিলাষী, তাঁহারা মানুষ। ভগবানের মুখে যে কথা শোভা পায়,

মানুষের মুখে সে কথা আরও অধিক শোভা পায়। ইহাতে বুঝা যায় তাঁহাদের করুণা কত গভীর।

মহাযান মতে তাহা হইলে জীবমাত্রই বৌদ্ধ, কিন্তু এ কথায় ত কাজ চলে না। ভারতবর্ষে তখন নানাক্রপ ধর্ম ছিল, মত ছিল, দর্শন ছিল, পন্থ ছিল, যান ছিল। মহাযান যেন বলিলেন, সকলেই বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা সে কথা মানিবে কেন? সুতরাং বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এ নিচাঁরের প্রয়োজন চিরদিন ছিল, এখনও আছে। ইহার মীমাংসা কি? বৌদ্ধেরা জাতি মানে না যে, ব্রাহ্মণাদির মত জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ হইবে বা ক্ষত্রিয় হইবে বা শূদ্র হইবে, বৈশ্য হইবে বা শৈব হইবে। একে ত বৌদ্ধগৃহস্থেরা বৌদ্ধ কিনা তাহাতেই সন্দেহ, তার পর তাহাদের ছেলে হইলে, সে ছেলে বৌদ্ধ হইবে কিনা তাহাতে আরও সন্দেহ। এখনও এ বিষয়ে কোন ইউরোপীয় বা এদেশীয় পণ্ডিতেরা কোন মীমাংসা করেন নাই, কিন্তু শুভাকর গুপ্তের আদিকর্ম রচনা নামক বৌদ্ধদের স্মৃতিতে ইহার এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেওয়া আছে। তিনি বলেন, যে কেহ ত্রিশরণ গমন করিয়াছে সেই বৌদ্ধ।

ত্রিশরণ শব্দের অর্থ—

“বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি”

“ধর্ম্যং শরণং গচ্ছামি”

“সজ্জং শরণং গচ্ছামি”

“দ্বিতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি”

“দ্বিতীয়মপি ধর্ম্যং শরণং গচ্ছামি”

“দ্বিতীয়মপি সজ্জং শরণং গচ্ছামি”

“তৃতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি”

“তৃতীয়মপি ধর্ম্যং শরণং গচ্ছামি”

“তৃতীয়মপি সজ্জং শরণং গচ্ছামি”

বোধ হয় অতি প্রাচীন কালে ত্রিশরণ গমনের জন্য কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত।

কিন্তু পরে পুরোহিতের নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা হয়। হস্তসার , গ্রন্থে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা আছে। যেমন শ্রীমন্দের পুত্র হইলেই সে শ্রীমন্দের হয় না, তাহাকে বাপটাইজ করিলে তবে সে শ্রীমন্দের হয়, সেইরূপ বৌদ্ধ পিতামাতার পুত্র হইলেও, যতক্ষণ সে ত্রিশরণ গমন না করে, ততক্ষণ তাহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। বৌদ্ধ-দের যতগুলি ধর্মকর্ম আছে, তাহার মধ্যে যে গুলিকে তাহারা অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে করিত এবং সকলের আগে সম্পন্ন করিত, সেই গুলিকে আদিকর্ম বলিত। সেই সকল আদিকর্মের মধ্যেও আবার ত্রিশরণ গমন সকলের আদি। বিমলপ্রভায়ও লেখা আছে, আগে ত্রিশরণ গমন, পরে এই জন্মেই বুদ্ধ হইবার জন্য কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রত্ন-ত্রয়ের শরণ লইলেই যদি বৌদ্ধ হয় এবং সেরূপ শরণ লইবার জন্য যদি পুরোহিতের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে জেলে, মালা, কৈবর্তদের বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের আর বাধা রহিল না। বিনয়পিটকে লেখা আছে যে, যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তাহাকে ভিক্ষু করিতে পারিবে না ও তাহাকে সঙ্ঘে লইতে পারিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে বেচারী বৌদ্ধ হইতে পারিবে না? শুভাকর গুপ্তের ব্যবস্থায় সে অনায়াসে বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল। যে সন্ন্যাস লইবে তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুবিব করিয়া সন্ন্যাসীর আখড়ায় বাইতে হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাম ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর বৌদ্ধধর্মের গুরু দলের নাম সঙ্ঘ। যেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিত কে? তাহার নাম সঙ্ঘারাম। সঙ্ঘারামের মধ্যে প্রায়ই একটি মন্দির থাকিত, তাহার নাম বিহার। সেই মন্দিরের নাম হইতেই বৌদ্ধভিক্ষুদের আখড়াগুলিকে বিহারই বলিয়া থাকে।

শিক্ষানবীস একজন ভিক্ষুকে মুরুবিব করিয়া সঙ্ঘে উপস্থিত হন। সেখানে গেলে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধা ভিক্ষু, যাহাকে শ্রবির বা থেরা বলে,

তিনি নবীসকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার সময়

শ্রাবকবানের
গুরু

সঙ্গে আর পাঁচ জন ভিক্ষুও থাকা চাই। স্ববির

নবীসের নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তাহার

কোন উৎকট রোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন,

সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজার কোন

চাকরী করে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি আরও জিজ্ঞাসা

করিতেন, তাহার ভিক্ষাপাত্র আছে কিনা, তাহার চাঁবর আছে কিনা,

অর্থাৎ, ভিক্ষু হইতে গেলে যে সকল জিনিস দরকার, তাহা তাহার

আছে কিনা। সে এ সব জিনিস আছে বলিলে, তিনি সজ্জকে

জিজ্ঞাসা করিতেন, ‘আপনারা বলুন, এই লোককে সজ্জ লওয়া যাইতে

পারে কিনা। যদি আপনাদের ইহাতে কোন আপত্তি থাকে, স্পষ্ট

করিয়া বলুন, যদি না থাকে তবে চুপ করিয়া থাকুন।’ তিনি এইরূপ

তিনবার বলিলে, যদি কোন আপত্তি না উঠিত, তবে তিনি নবীসকে

জিজ্ঞাসা করিতেন, “তোমার উপাধ্যায় কে?” সে উপাধ্যায়ের নাম

বলিলে, তাঁহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইত। সে

উপাধ্যায়ের নিকট সন্ন্যাসীর কি কি কাজ, সব শিখিত। এখনকার

ছেলেরা যেমন মাফটার মহাশয়দের মান্য করিয়া চলে, শিক্ষানবীস,

শ্রমণেরা, সেইরূপে আপনার উপাধ্যায়কে মান্য করিয়া চলিত। ক্রমে

সে সব শিখিয়া লইলে, তাহাতে ও উপাধ্যায়ে কোন প্রভেদ থাকিত

না। সজ্জ বসিলে, দুজনের সমান ভোট হইত।

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে “প্রব্রজ্যা” দিয়াছিলেন, তখন তিনি উহাকে

বৈদেহ যুনির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদেহ যুনি নন্দকে আপ-

উদাহরণ

নার বন্ধুর মত দেখিতেন, বন্ধুর মত তাহাকে পরামর্শ

দিতেন ও শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধদেব মধ্য মধ্য বৈদেহ

যুনিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “কেমন, নন্দ বেশ শিখিতেছে ত?”

বৈদেহযুনি যেমন জানিতেন, সমস্ত খুলিয়া বলিতেন। যেখানে বৈদেহ-

যুনি নন্দকে কোন বিষয় বুঝাইতে অক্ষম হইতেন, বুদ্ধদেব নিজে গিয়া

তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতেন। মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দর্যনন্দ কাব্যে বৈদেহমুনি ও নন্দের অনেক কথা লেখা আছে। তাহাতে বেশ দেখা যায়, বৈদেহমুনি নন্দের উপাধ্যায় হইলেও দুজনে পরস্পর বন্ধুভাবেই বাস করিতেন, তাহারা পরস্পর আপনাদিগকে সমান বলিয়া মনে করিতেন।

মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে “কল্যাণমিত্র” বলিত। কল্যাণমিত্র শব্দ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল,

মহাযানের
গুরু

সে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণ-কামনায় গুরু শিষ্যের মিত্র মাত্র। মহাযান-মতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চর্চা করিতেন। এখানে

গুরুশিষ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইত না। সঙ্গে অধিকার দুজনেরই সমান থাকিত এবং উভয়ে পরস্পরের মিত্র হইতেন।

ক্রমে যখন এত দর্শনশাস্ত্র পড়া, এত যোগ ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যখন ভিক্ষুরা বিবাহ

মহাযানের
গুরু

করিতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল, তখন মহাযানের উৎপত্তি হইল। তাহারা বলিতে লাগিলেন “মন্ত্র জপ করিলেই, পাঠ, স্বাধ্যায়,

তপ প্রভৃতি সকল ধর্মকর্মেরই ফল পাওয়া যাইবে। প্রজ্ঞাপারমিতা পড়িতে অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরও বেশী দিন লাগে এবং প্রজ্ঞাপারমিতার ক্রিয়াকর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরও বেশী দিন লাগে। এত ত তুমি পারিবে না বাপু, তুমি এই মন্ত্রটি জপ কর, তাহা হইলে সব ফল পাইবে।” যখন বৌদ্ধধর্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব অঁটাঅঁটি হইয়া গেল। তখন তিনটি কথা উঠিল—‘গুরুপ্রসাদ,’ ‘শিষ্যপ্রসাদ,’ ‘মন্ত্রপ্রসাদ,’ অর্থাৎ গুরুকে ভক্তি করিতে হইবে, শিষ্যকে স্নেহ করিতে হইবে, এবং মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিবে। যে সময় বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মহাযান প্রবেশ করে, সে সময়

ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গুরুশিষ্যের বিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানা যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য্য ও শিষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত। বাস্তবিকও যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতার কার্যই করিবেন। সন্তানের শিক্ষার ভার ত পিতারই, তবে তিনি যদি না পারেন, তবে একজন প্রতিনিধির হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া দিবেন। শিক্ষক বা আচার্য্য পিতার প্রতিনিধিমাত্র। আচার্য্যের মৃত্যুতে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত। এখনও যিনি গায়ত্রী উপদেশ দেন, সেই আচার্য্য-গুরু মরিলে, ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসর্বস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূলই মন্ত্রযান। মন্ত্রযানের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড় ও একজন ছোট হইয়া গেল।

বজ্রযানে গুরু আরও বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব-
 বজ্রযানের গুরু
 দিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন।
 পঞ্চাধ্যানিবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর একজন
 বুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে উহার বুদ্ধগণের পুরোহিত
 বলিয়া মানিয়া থাকে। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান
 অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য্য বলিত।
 বজ্রাচার্য্যের পাঁচটি অভিষেক হইত, মুকুটাবিষেক, ঘণ্টাবিষেক,
 মস্ত্যাবিষেক, সুর্য্যাবিষেক ও পট্টাবিষেক। তাঁহার দেশীয় নাম গুভাজু,
 অর্থাৎ, তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং
 শিষ্য হইতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রযানে গুরুকে
 শিষ্যের “প্রসাদ” খুঁজিতে হইত, বজ্রযানে তাহার কোনই দরকার
 নাই।

সহজযানের গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহা-
পাপ কার্য করিলেও তাহাতে মহাপুণ্য হইবে।

সহজযানের
গুরু

সহজযানের একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যে
পঞ্চকাম উপভোগের দ্বারা মূর্থলোক বন্ধ হয়, গুরুর
উপদেশ লইয়া সেই পঞ্চকাম উপভোগ করিয়াই সে মুক্ত হইয়া যায়।

গুরু উবএসেঁ অমিঅরসু হবহিঁ ৭ পীগই ঘেহিঁ ।

বহুসন্তুখ মরুখলিহিঁ তিসিএ মরিখই তেহিঁ ॥

“গুরুর উপদেশই অমৃতরস। যে সকল হাবারা উহা পান না
করে তাহারা বহু শাস্তার্থরূপ মরুস্থলীতে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়।” গুরুর
উপদেশ ভিন্ন সহজপন্থীদের কোন জ্ঞানই হয় না ; আগম, বেদ, পুরাণ,
তপ, জপ সমস্তই বৃথা ; গুরুর উপদেশমাত্রই সত্য।

আগম বেদ পুরাণে পংডিতমাণ বহন্তি ।

পকসিলিফলঅ তলি বা জিম বহেরিত্ত ভমঅন্তি ॥

“যাহারা আগম, বেদ ও পুরাণ পড়িয়া আপনাদের পণ্ডিত মনে
করিয়া গর্বি করে তাহারা পক শ্রীফলে অলির ন্যায় বাহিরে বাহিরেই
ঘুরিয়া বেড়ায়” ।

এইরূপে যতই বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন হইতে লাগিল, গুরুর সম্মান ও
বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

কালচক্রযানে যে গুরুর মাণ্ড কত অধিক তাহা একটি কথাতেই
প্রমাণ হইয়া যাইবে। লঘুকালচক্রতন্ত্রের টীকা বিমলপ্রভা যিনি

লিখিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীক, আপনাকে অবলোকিতে-
শ্বরের নির্মাণকায় বা অবতার বলিয়া মনে করিতেন।

সুতরাং তিনি স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর কেহ নহেন। কালচক্র-
যানের পর লামাযানের উৎপত্তি। সকল লামাই কোন না কোন বড়
বোধিসত্ত্বের অবতার। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্বজ্ঞ ও
সর্বদর্শী। লামাযান ক্রমে উঠিয়া দলাইলামাযানে পরিণত হইয়াছে।
দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তিনি মরেন না, তাঁহার

কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নিৰ্ম্মাণ হয় । তিনি এক কায় ত্যাগ করিয়া কায়ান্তর ধারণ করেন ।

বৌদ্ধধৰ্ম্মে প্রথমে যে উপাধ্যায় মিত্রমাত্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বশক্তিমান, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার ।

বৌদ্ধধৰ্ম্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে । তন্ত্র-মতে গুরুই পরমেশ্বর, গুরুর পাদপূজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়, ; গুরু শিষ্যের সৰ্ব্বস্বের অধিকারী, যে শিষ্য ধনজন, আপন স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্য্যন্ত গুরুসেবায় নিয়োগ করিতে পারে সেই পরম ভক্ত । বৈষ্ণবের মতেও তাই । তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে এখন কৰ্ত্তাভজা হইতেছেন । তাঁহারা বলেন “গুরু সত্য, জগন্মিত্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও তাই খাই, যা বলাও তাই বলি ।”

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।

হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব

(শ্রীব্রহ্মেন্দ্রনাথ শীল কথিত)

যুরোপীয় এবং ভারতীয় সাধনা

যুরোপ যত বড় হউক না কেন, তার বাহিরেও যে একটা আরও বড় জগত আছে, যুরোপের সভ্যতা ও সাধনাই যে জগতের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনা নয়, অথবা চীনের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা যে বিশ্ব-মানবের শৈশব-লীলা মাত্র ছিল, তার পরিপূর্ণ যৌবন-লীলা প্রথম যুরোপেই হইতেছে, এ সকল কথার ভ্রান্তি ক্রমে ধরা পড়িয়াছে। বিগত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর যুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, সমষ্টিগত মানব সমাজের সভ্যতা ও সাধনা একটা সরল রেখার ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জীব-জগতের ক্রমবিকাশের বা ইভোলিউশনের ধারাকে ফরাসী পণ্ডিত লা মার্ক এই ভাবেই কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সে ভুল খণ্ডন করিলেও, আজিকালিকার সমাজ-বিজ্ঞান মানব সমাজের ক্রমবিকাশে সেই লা মার্ক-কল্পিত ক্রমই দেখিতেছে। চীন একদিন কতকটা পরিমাণে একটা বিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতা ও সাধনা গড়িয়া তুলিয়াছিল; তার পর চীনের বিকাশক্রম চিরদিনের মতন থাগিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালে একটা অত্যন্ত সভ্যতার ও সাধনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; কিন্তু সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে; তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই। মানব-প্রকৃতির ও মানবের সভ্যতার এবং সাধনার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ দেখিতে হইলে, এখন যুরোপের গ্রীক-রোমক-গথিক-হিব্রু-খৃষ্টীয় সভ্যতা ও সাধনারই আলোচনা করিতে হইবে। যুরোপের

জনসাধারণের ত কথাই নাই, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যেও চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এই ধারণা প্রবল প্রচলিত আছে। এই ভ্রান্তিটা দূর করিবার জন্য ভারতের সভ্যতা ও সাধনা বিশ্ব-মানবের উন্নতিকল্পে কতটা কি করিয়াছে বা না করিয়াছে, তার আলোচনা ও প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশীয়েরাই যে কেবল এ সকল তত্ত্বের সন্ধান রাখেন না, তাহা নহে। আমরাও ভাগ করিয়া এ সকল কথা জানি না। আমাদের স্বদেশাভিমান, এবং এই স্বদেশাভিমান হইতে যে স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব সর্বত্রই জাগিয়া উঠে, সেই পক্ষপাতিত্বের বা পেট্রিয়টিক বায়সের (patriotic bias'এর) প্রভাবে আমরা আমাদের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনাকে জগতের অপর সকল সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে। যুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া, যুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎপরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এ বিষয়ে যুরোপের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয়েই স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব দোষে দুর্দুষ্ট। উভয়ের বিচারই সেই জন্য সত্য-ভ্রষ্ট। উভয়েই সত্যভাস মাত্রকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সত্যকে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন।

বিশ্বমানব

সত্য কথা কিন্তু এই যে, বিশ্বমানব বিশ্বব্যাপী। ছোট বড়, পুরাতন ও অধুনাতন, যুরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও মার্কিন, সকল

জ্ঞাত মহাদেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বিশ্ব-মানবের অথবা নর-নারায়ণের লীলা-ভূমি হইয়া আছে। সে লীলা বিশ্বব্যাপী লীলা। এই লীলাময় বিশ্ব-মানব এক অখণ্ড বস্তু বা তত্ত্ব। সকল মানবে ও সকল মানব সমাজেই ইনি একই সঙ্গে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অব্যক্তরূপে তিনি কোথাও পরিপূর্ণ নহেন। কোনও সমাজ, কোনও সভ্যতা, কোনও সাধনা, এই বিশ্ব-মানবের বা Universal Humanity'র আত্ম-বিকাশ-ধারার একটি বা দুইটি বা তিনটি তরঙ্গ-ভঙ্গ (moments) প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। আর অপর কোনও সমাজ, সাধনা ও সভ্যতা বা তার আর দুই তিনটি তরঙ্গ-ভঙ্গ বক্ষে ফুটাইয়া অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। ভারত-বর্ষও বিশ্ব-মানবের অঙ্গ, বিশ্ব-মানবের লীলা-ক্ষেত্র, বিশ্ব-মানবের লীলার সহায় ও সহচর। যুরোপও তাহাই। যুরোপ তাঁর এই বিশ্ব-ব্যাপী লীলা-নাট্যের দু'একটি অঙ্কের অভিনয় করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতবর্ষ অপর দু'একটি অঙ্কে আপনার ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রকট করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতের ও যুরোপের সত্যের এবং সাধনার আলোচনা করিবার সময় সর্বদা এই কথাটা মনে করিয়া রাখা প্রয়োজন।

সামান্য-মনুষ্যধর্ম

মানুষ মাত্রেরই কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে। এই গুণ-সামান্যই মনুষ্যত্বের সার্বজনীন নিদর্শন। সকল মানুষেরই চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় আছে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রারূপে সকলেরই কতকগুলি সাধারণ মনোবৃত্তি আছে। আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় একটা রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শময় বহির্জগৎও সকলের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। চিরদিনই মানুষ এই সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বহির্জগতে বিচরণ করিয়া আপনার জীবনের অশেষবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। এই সকল অভিজ্ঞতার প্রকৃত ও নিগূঢ় মর্ম উদ্ঘাটন করিতে যাইয়াই মানুষ

সর্বত্র আপনার দর্শন ও বিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয় সকল মোটের উপরে এক এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই রূপরসাদিপূর্ণ বহির্জগত ও স্বল্প-বিস্তর সমান-ধর্ম-সম্পন্ন হইলেও এই সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা এবং সাধনা বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছে। একই সময়ের ও একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকেও একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মর্ম বাহির করিয়া লয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন সাধনাও সেইরূপ মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিচার ও আলোচনা করিয়া, জীব ও জগত, জীব ও জগতের পরস্পরের সম্বন্ধ, জীবের জন্ম ও মৃত্যু, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি, এ সকল সম্বন্ধে কতকগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল সিদ্ধান্তকেই দর্শন কহে। এই সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষ আপনার জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি ও জ্ঞান-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এক দিকে যেমন মানুষের একটা অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা আছে, অণ্ড দিকে সেইরূপ তার অনন্ত রস-পিপাসা এবং কর্ম-লিপ্সাও রহিয়াছে। কেবল জ্ঞানেতেই মানুষের তৃপ্তি হয় না। যাহাকে সে জ্ঞানেতে লাভ করিল, তাহাকে সে ভোগ করিতে চাহে; তার মধ্যে সে আনন্দ অন্বেষণ করে; তার সঙ্গে সে রসের সম্বন্ধ পাতাইতে যায়, তাহার দ্বারা তার ভাবেরও তৃপ্তি করিবার জন্য সে লালায়িত হয়। ফলতঃ জ্ঞান ও ভাব দুইটা বস্তু নহে; একই অভিজ্ঞতার দুই দিক মাত্র। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই রস বা ভাব জাগে। ভাব জাগিলেই তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও সম্যক্ সার্থকতার জন্য সেই জ্ঞান ও ভাব উভয়ে মিলিয়া কর্মের প্রেরণাকে জাগাইয়া দেয়। জ্ঞান, ভাব, কর্ম—Reason, Emotions, Will—এই তিন পাদে মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই পূর্ণ হয়।

জ্ঞানের পূর্ণতা অপূর্ণতা, ভাবের পরিপক্বতা বা অপরিপক্বতা, কর্মের পটুতা বা অপটুতা,—এ সকল বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ থাকে বটে। কিন্তু যেখানে জ্ঞান সেখানেই ভাব, যেইখানেই ভাব সেইখানেই কর্ম চেষ্টা,—অনায়ত্বে আরম্ভ, যাহা লোভনীয় অথচ আপাততঃ অনক, তাহাকে লাভ করিবার জন্য বহুবিধ উপায়-উদ্দেশ্যের সংযো-
যোজন,—এসকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্মই সাধন। যে পরম তত্ত্ব ঐ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও ভবের আশ্রয় তাহাই এই সাধনের নিত্য সাধ্য বস্তু।

মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষের প্রভাব

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সভ্যতা ও সাধনা মানবীয় অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ মর্মোদঘাটন করিয়াছে, মানব জীবনের কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, মানবসমাজের গঠন ও বিকাশের কতক-
গুলি বিশেষ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে এবং মানব জীবনের সার্থ-
কতা লাভের জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট সাধন অবলম্বন করিয়াছে। এইগুলি ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার বিশিষ্ট ও নিজস্ব বস্তু। এইগুলিই বিশ্বমানবের বিকাশে ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট কর্ম।
প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত, মধ্য-
আশিয়ার বিস্তৃত উপত্যকাভূমি হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণপ্রান্ত
পর্যন্ত প্রায় সমগ্র প্রাচ্য ও মধ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতের এই সাধনা
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসরকাল এই বিশাল মানব
সমাজ যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন, যে সমাজ-নীতির অনুসরণ, জীবনে
যে আদর্শের সাধন করিয়াছে, তার গভীরতম মর্ম এবং মূল সূত্রগুলি
ভারতের তত্ত্ববিদ্যার, ভারতের সমাজনীতির এবং ভারতের ধর্মনীতির
ও ধর্ম-সাধনের মধ্যেই কেবল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রোমের
বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী রোমক-শাসন-যন্ত্র, রোমক-রাষ্ট্র-তন্ত্র,
এবং রোমক-ব্যবহার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইয়া পৃথিবীতে একটা

নূতন একতার ও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কোনও দিন আশিয়াখণ্ডে এরূপ কোন পার্থিব সাম্রাজ্যের বা শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা করে নাই, বা করিতে চাহে নাই। কিন্তু রোম যেমন যুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার রাষ্ট্র-তন্ত্র, ব্যবহার-বিধি, এবং শাসন-যন্ত্রের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইরূপে ভারতবর্ষও সমগ্র মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির এবং পারমার্থিক সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছে। পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তি বা পার্থিব সম্পদ ও সাধনার প্রভাব অপেক্ষা যে পরিমাণে গভীরতর হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে যুরোপের সভ্যতা ও সাধনার উপরে রোমের প্রভাব অপেক্ষা প্রাচ্য আশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার উপরে ভারতবর্ষের প্রভাবও সমধিক গভীর ও স্থায়ী হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে আশিয়ার এই বহুবিস্তৃত ভূভাগে, এই অগণ্য কোটি লোকপুঞ্জের মধ্যে, জাতি-বর্ণ-গত, আচার-অনুষ্ঠান-গত, ধর্ম-কর্ম-গত, অশেষ প্রকারের বৈষম্য ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া বটে। কিন্তু এসকল ভেদবিরোধের মধ্য দিয়াই আমরা একটা নিশ্চিত আকারের সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি আদর্শ এবং সাধন-পন্থাও দেখিতে পাই। আর ভারতের তত্ত্ব-জ্ঞানই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সমাজ-তন্ত্র, জীবনাদর্শ, ও ধর্ম-কর্মকে আত্ম-জ্ঞানের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া তার প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সভ্যতা ও সাধনাকে আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের যন্ত্র ও সাধনরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষ যে কেবল প্রাচ্য আশিয়ার সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও অধ্যাত্মজীবনকেই আপনার তত্ত্বজ্ঞান ও সাধন-পন্থার দ্বারা পরিষ্কৃত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহা নহে। যে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে আশিয়া সত্যের সন্ধান গিয়াছে, তার মূল উপাদান ও প্রণালী, তার বৈজ্ঞানিক অনুভূতি বা scientific concepts,

যে ভাবে আশিয়া এই প্রত্যক্ষ জগৎকে জানিতে ও ধরিতে গিয়াছে তার শ্রেণীবিভাগ, আর মানুষের সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের যে সকল সূত্র সন্ধান ধরিয়া আশিয়া সত্যের বা সত্যংএর এবং চৈতন্যের বা জ্ঞানংএর মূল প্রকৃতির অনুসন্ধানে যাইয়া আপনার বিবিধ তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তৎসমুদায়ই ভারতের নিকট হইতে পাইয়াছে। জাপানের ও চীনের তর্কশাস্ত্র ভারতের ন্যায়ের মূল সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যুরোপের ন্যায়দর্শন গ্রীশীয় ন্যায়ের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রীশীয়দিগের প্রমাণপ্রতিষ্ঠার প্রণালী ভারতের প্রমাণবিজ্ঞানের প্রণালী হইতে ভিন্ন। জাপানের ও চীনের প্রমাণ-বিজ্ঞানে ভারতীয় ন্যায়েরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীশীয় ন্যায়ের নহে। ভারতবর্ষের প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা philosophy of nature জড় ও গতির, কারণ ও কার্যের, দেশ ও কালের যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, চীনের মধ্যযুগের বিজ্ঞান তাহারই উপরে গড়িয়া উঠে। হিন্দুর রসায়নজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই চীনে কোনও কোনও পণ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। চীন নানা প্রকারের রত্নের আবিষ্কার করিয়াছে, আর তার কতকগুলি হিন্দুর রসায়নবিদ্যার আশ্রয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এমন কি বিশেষজ্ঞেরা মধ্যযুগের চীনের এবং জাপানের ললিতকলাতেও ভারতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

দর্শনের উপাদান

ইহজীবনে আপনার শরীর মনের আশ্রয়ে মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার নিগূঢ় মর্ম্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিতে যাইয়াই দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। অভিজ্ঞতা বলিতে একজন জ্ঞাতা, এই জ্ঞাতার কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় এবং এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কতকগুলি শারীরিক বল ও মানসিক বৃত্তির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষই

জ্ঞাতা এবং প্রত্যেকেরই জ্ঞানলাভের জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও কতকগুলি মনোবৃত্তি আছে। এই জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয় মোটের উপরে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম, সে তার নিজকে জানে, আপনাকে জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্তা রূপে জানে, অতএব সে নিজে তার নিজের জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়। ২য়, সে এই বিশাল বিষয়-রাজ্যকে জানে, এই বহির্জগতের রূপরসাদি তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া তার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ৩য়, সে অপর মানুষকে এবং এই মানুষ যে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে তাহাকেও জানে। ঐ বহির্জগত বা বিষয় রাজ্য (আর এখানে আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং মনোবৃত্তি সকল পর্য্যন্ত বিষয়পদবাচ্য হয়) এবং অপর মানুষ ও মনুষ্য-সমাজ—এই উভয়ই আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষায় ইদং পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই ইদংকে যে জানে, যে ইদংএর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়া, যাহাকে এই ইদংএর সম্পর্কে কর্তাও বলা যায়—সেই মানুষ অহং পদবাচ্য হয়। এই অহং ও এই ইদংকে লইয়া মানুষের যা কিছু লীলাখেলা। এই দুই তত্ত্বের আশ্রয়েই মানুষ তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতার উৎপত্তি কোথায়, স্থিতি কিসে, গতি কোন্ দিকে, নিয়তি কি, ইহার প্রকৃতি ও প্রণালী, মূল্য ও মর্ম্ম কি, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়াই যাবতীয় দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতের সাধনা এই মানবীয় অভিজ্ঞতার কি বিশেষ তত্ত্ব ও মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে? আমাদের দেশে এই বিশ্ব সমস্যার কিরূপ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে,—সকলের আগে আমি এই প্রশ্নেরই আলোচনা করিব। তারপরে হিন্দু এই বিশাল বিষয় রাজ্যকে কোন্ চক্ষে দেখিয়াছে, মানুষ এবং মানবসমাজ সম্বন্ধেই বা হিন্দু কোন্ বিশেষ সিদ্ধান্তের, তত্ত্বের ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছে, ক্রমে এ সকল বিষয়েরও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমে এই শান্তিবাচন আছে,—

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতে ॥

পূর্ণত পূর্ণানাম পূর্ণমেবাবশিষ্টতে ॥

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

“ও তাহা (অর্থাৎ বিঘের অব্যাক্ত বীজ) পূর্ণবস্ত্র । ইহা (অর্থাৎ ঐ বীজের ব্যাক্ত আকার) পূর্ণ ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয় । এই পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয় তখন পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে ।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।”

হিন্দুরা কি ভাবে আপনার যাবতীয় অভিজ্ঞতার মর্ম উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এই শান্তিবাচনে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।

এই উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে এই হেঁয়ালির ব্যাখ্যা দেখিতে পাই ।

“তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাক্তত্বাসীত্ত্বানরূপাত্যানেনব ব্যাক্রিয়তেহসৌনানামহমিদং রূপ ইতি তদিদমপ্যেতহি নামরূপাত্যানেনব ব্যাক্রিয়তেহসৌনানামহমিদং রূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ । আন্থাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুঃ ক্ষুরধানেহবহিতঃ স্যাৎস্বিত্তরো বা বিশ্বস্তরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি । অকুংসোহি স প্রাণেনেব প্রাণোনাম ভবতি । বদন্ বাক্ পশুংচক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্থা-নোমনস্তাত্তসৈত্যানি কশ্মনামাক্তেব । সযোহত এতৈককমুপান্তে ন স বেদ অকুংসোহেবোহত এতৈককেন ভবতি আয়েতোবোপাসীতাএহেতে সর্ক একং ভবাণ্ড তদেতং পদনীরমস্য সর্কস্য যদম্মন্যাহনেন হেতং স স্তং বেদ । যথাহৈবপদেনাম্মুবিন্দেদেবং কীর্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবংবেদ ।”

“তখন সেই অব্যাক্ত বা অব্যাক্ত ব্রহ্মই কেবল ছিলেন । সেই অব্যাক্ত ব্রহ্মবস্ত্রই নামরূপের দ্বারা ব্যাক্ত হইলেন । এই জন্ত এখনও লোকে নাম ও রূপের দ্বারাই সমুদায় পদার্থকে বিশিষ্ট করিয়া থাকে—বলে “ইহার এই নাম,” “উহার এই আকার”।

“সেই ব্রহ্ম এই ব্যাক্ত ও নামরূপের দ্বারা বিশিষ্টকৃত বিধে অনুপ্রবিষ্ট

হইলেন। নখাগ্রভাগ পর্যন্ত সকলের মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষুর যেমন আপনার আধানে নিঃশেষে অমুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ হইলেন। অথবা সকল বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে যে বায়ুমণ্ডল, তাহা যেমন আপনার মণ্ডলস্থিত সকল জীবের অন্তর্দাহে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেই ব্রহ্ম সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে অমুপ্রবিষ্ট হইলেন।

“কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সকলের অন্তরতর ও অন্তরতম বস্তু, তথাপি অদ্ব্যবুদ্ধি লোকে তাঁহাকে দেখে না। তাহাদের নিকট তিনি অকৃত্রিমবৎ প্রতীয়মান হইলেন। তাঁর অমুপ্রাণনেই জীবের প্রাণন ক্রিয়া সম্ভব হয়। এই ক্ষুদ্র ইহারা তাঁহাকে প্রাণ নামে অভিহিত করে। তাঁহারই প্রেরণায় জীবের বাণী উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা তাঁহাকে বাক্ বলে। সেইরূপ শ্রবণ ক্ষুদ্র তাঁহাকে শ্রোত্র, দর্শন ক্ষুদ্র তাঁহাকে চক্ষু, মনন ক্ষুদ্র তাঁহাকে মন বলে। কিন্তু এ সকল তাঁর কর্মেরই নাম মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্রাদির নাম ও কর্মের মধ্যে তিনি অখণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব যাহারা তাঁহাকে প্রাণাদিরূপে ভজনা করে, তাহারা সমগ্র তত্ত্বের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের এই অপূর্ণজ্ঞাননিবন্ধন তারা সচ্চিদানন্দ পুরুষের সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ অজ্ঞ থাকিয়া যায়।

“এই আত্মাতেই তাঁর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য ও মহিমা বিরাজিত; জ্ঞান, আনন্দ, প্রাণ, সকলই এই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাতেই এ সকল বহুবিধ নামরূপ এক হইয়া আছে। “ঐ” আর “এই” সকলই আত্মা। “তাহা” ও “ইহা” সকলই আত্মা। যাহাকে আত্মা কহে, এ সকল তাঁহারই বিবিধ জ্ঞান-বল-ক্রিয়া। আত্মাই এ সকলের বীজ ও আশ্রয়। এই আত্মার উপাসনার দ্বারাই সকল জ্ঞান লাভ হয়। যৈথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ যেমন অবশ্যস্তাবীরূপে আপনার ঐশ্বর্য লাভ করে, সেইরূপ এই আত্মাকে যে জ্ঞাত হয়, সে কীর্তি এবং পরমানন্দ ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

“এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রথম মন্ত্রে “আটৈঋ-বেদমগ্র আসীৎ”—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল আত্মা মাত্র ছিলেন, তিনি চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন আর কেহ ও কিছু নাই, তখন তিনি “অহং” এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন—

এই সকল বলিয়া এবং এই পরমাত্মাই একমাত্র উপাত্ত, অপর দেবতা উপাত্ত নহেন, এই উপদেশ করিয়া, শ্রুতি এখন, এই পঞ্চম ভাঙ্গনে, এই আত্মা হইতে কিরূপে এই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

ঈশ্বরের ঈশ্বর্য অনন্ত এবং তিনি নিতাই পরিপূর্ণ। এই অনন্ত ঈশ্বর্যশালী পরিপূর্ণ ঈশ্বর আংশিক বা অপূর্ণ ভাবে কোনও বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন না। এইরূপ করনা তাঁর ঈশ্বরত্বেরই বিরোধী। তিনি যেখানেই থাকেন, পরিপূর্ণ রূপেই থাকেন। অতএব অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাতে তিনি পরিপূর্ণ রূপেই বিরাজ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে ঈশ্বররূপে ভজনা করা সম্ভব নহে। এই ক্ষণেই শ্রুতি কহিয়াছেন, “যে ব্যক্তি পরম পুরুষকে অগ্নি কিংবা বায়ুরূপে ভজনা করে, তার উপাসনা অপূর্ণ হয়; কারণ এ সকল তাঁর ক্রিয়াবিশেষের বা গুণবিশেষের প্রকাশ মাত্র, তাঁর সর্বগুণ প্রকাশ করে না।

পরমপুরুষ পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে উপাসিত হন, তখনই কেবল তাঁর পূর্ণ উপাসনা হয়। এই আত্মা বা “অহং”ই জ্ঞানের ও চৈতন্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এইক্ষণেই পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে বা “অহং”রূপে উপাসিত হন, তখনই তাঁর সত্য উপাসনা হইয়া থাকে। অপিচ, এই আত্মা বা অহং শব্দ পূর্ণতাজ্ঞাপক। জীব-শরীরের আর কোনও চেষ্টা এই অহং প্রত্যয়ের পূর্ণতার সম্বন্ধ হইতে পারে না। প্রাণন, শ্রবণ, দর্শনাদি মাতৃষের ক্রিয়া-বিশেষের বিভিন্ন অংশ মাত্র প্রকাশ করে। কিন্তু যখন সে অহং বলে, তখন তার মধ্যে এই সমুদয়ের প্রাণনাদি ক্রিয়া এবং তার অতিরিক্ত আরও অনেক তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকে। অতএব পরমপুরুষের মধ্যে আমরা যে সকল গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ও পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করি, এই অহং নামে বা শব্দে সর্বাপেক্ষা তাহাকে অধিক ব্যক্ত করিয়া থাকে।”

উপরে মূল শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার মাধবভাষ্যের মর্ম্ম বাঙ্গলা করিয়া দিলাম। আমার বর্তমান প্রয়োজনের জন্য ইহাই যথেষ্ট। এই প্রাচীন ঋষিবাক্যে আমরা তিনটি বিশেষ তথ্য প্রাপ্ত হই;—

১ম,—একটা পূর্ণতত্ত্বের অনুভূতি, আর আত্মাই এই পূর্ণতত্ত্ব।
২য়,—আমরা যাহাকে “আমি” “আমি” বলি, সেই অস্মদ প্রত্যয়ের
বস্তুই আত্মবস্তু, আর এই আত্মবস্তুই বিশ্বের পরমতত্ত্ব ও পূর্ণ-
তত্ত্ব। ৩য়,—এই আত্মার অন্বেষণ ও আত্মাকে জ্ঞানেতে প্রাপ্ত
হওয়াই পরমানন্দ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণতত্ত্ব

যাহাতে এই বিশ্ব-সমস্তার নির্বিবোধ মীমাংসা হয়, তাহাকেই
আমাদের দর্শনের পরিভাষায় তত্ত্ব কহে। এই ঋষি বাক্যেতে
আমরা এই পূর্ণতত্ত্বের বা পরমতত্ত্বের একটা গভীর অনুভূতির
প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এই বিশ্বের বস্তু বা বিষয় অশেষ; চক্ষু, কণ,
নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও এক নহে। ইহারা প্রত্যেকেই জাগতিক
বস্তু সকলের এক একটি গুণ বা ধর্মকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়
করিয়া থাকে। চক্ষু বস্তুর রূপ, কণ শব্দ, নাসিকা গন্ধ, এইরূপে
প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়
আমাদের নিকটে উপস্থিত করে। এখানে একত্বানুভূতির সম্ভাবনা
কোথায়? বৃহদারণ্যক শ্রুতি কহিতেছেন, আপাততঃ যাহা বহুরূপে
প্রতীত হইতেছে, মূলে তাহা বহু নহে। যাহা খণ্ড খণ্ড বলিয়া দেখা
যাইতেছে, মূলে তাহা অখণ্ড। যাহা অপূর্ণ বোধ হইতেছে, তাহা
পূর্ণ। ব্রহ্মই সেই এক, সেই অখণ্ড, সেই পূর্ণ বস্তু বা পূর্ণতত্ত্ব। চক্ষু-
কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সেই পূর্ণ বস্তুরই বিবিধ ও বহুমুখী প্রকাশ
মাত্র। এই জন্য ইহারা ব্রহ্মেরই নিদর্শন। সেই ব্রহ্মকে, সেই পূর্ণ-
তত্ত্বকেই ইহারা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করে, কেবল মাত্র আংশিক বা
খণ্ড বস্তুকে প্রকাশ করে না।

আত্মাই পূর্ণতত্ত্ব

বাহিরের বিবিধ বিষয় ও জীবের এই সকল ইন্দ্রিয় যে ব্রহ্মের
আংশিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি মাত্র প্রকাশ করে, আত্মাই সেই ব্রহ্মের

অখণ্ড পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই আত্মার দ্বারাই “সূত্রে মণিগণা ইব”—
হারের মণি সকল যেমন তার সূত্রেতে গাঁথা থাকে, সেইরূপ আমাদের
দর্শন-শ্রবণাদি নানাবিধ খণ্ড-জ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া
জ্ঞানের বা অনুভূতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা চক্ষুর
দ্বারা রূপ দেখি, নাসিকার দ্বারা গন্ধ শুঁকি, হকের দ্বারা স্পর্শলাভ
করি; এ সকলই খণ্ড-জ্ঞান। রূপ ও শব্দ, শব্দ ও স্পর্শ, স্পর্শ ও
গন্ধ, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিভিন্ন অনুভূতির বিষয়; আর এই
সকল বিভিন্ন অনুভূতি কখনও একই কালেও জন্মিতে পারে না।
প্রবল স্রোতবাহী জল-প্রবাহের, কিংবা প্রবল বাত্যা মুখে বায়ু-প্রবাহের
ন্যায় এ সকল অনুভূতি বিদ্যুৎবেগে ইন্দ্রিয়ের ও মনের উপর
দিয়া বহিয়া যাইতেছে। চক্ষু রূপই দেখে, কিন্তু এই রূপও অখণ্ড
বস্তু নহে। রামের রূপ প্রথমে তার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাহারে
গঠিত; তার এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে যে বর্ণের আভা
ফুটিয়াছে, তাহা বিন্দু বিন্দু বর্ণের সম্মিলনে রচিত। রূপ বস্তুও
অখণ্ড নহে। চক্ষু কোন রূপই একেবারে ও একই সঙ্গে সমগ্র-
ভাবে দেখিতে পায় না। টুকরা টুকরা করিয়া চক্ষু দেখে, কিন্তু
এই খণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া আত্মা বস্তুর রূপের জ্ঞান ফুটাইয়া
তুলে। শব্দজ্ঞানও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সংযোগে ও সমাহারে
উৎপন্ন হয়। আর আত্মাই এই বিভিন্ন ধ্বনির সংযোক্তা। এই
আত্মাই আমাদের বাবতীয় অভিজ্ঞতার একত্বের ভূমি ও একীকরণের
মূল সূত্র। এই আত্মাই আমাদের সকল অভিজ্ঞতার নিত্য সাক্ষী
হইয়া এ সকলকে সম্ভব ও সার্থক করিতেছেন।

এই আত্মার অন্বেষণ, এই আত্ম-জিজ্ঞাসা ও যে আত্ম-জ্ঞানেতে
এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞানই একমাত্র
পরিপূর্ণ আনন্দ বস্তু। ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মাকে
জানিলে আর অপর কোনও কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না।
হিন্দুর দর্শন চিরদিনই এই একত্বের অন্বেষণ করিয়াছে। এই

একহানুভূতিই হিন্দুর অন্তঃপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম। এই সহজ বুদ্ধি প্রভাবে হিন্দু সর্বদা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বিরোধের মধ্যে মিলন ও সন্ধি, বহুর মধ্যে এক, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। এই জন্যই বিশাল বিশ্ব-সংস্কার সম্মুখীন হইয়া হিন্দুর তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্ব-পিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর অনুরাগের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। এই প্রেরণাতেই হিন্দু বলিয়াছে—“যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাগ্নে সুখমস্তি” অর্থাৎ যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অগ্নিতে সুখ নাই। আর এই ভূমাকে হিন্দু কেবল জ্ঞানের অজ্ঞেয় ভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। এই ভূমাই সমুদায় জ্ঞানের ও সমুদায় সত্ত্বার আধার ও সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছেন। ইনি কেবল আছেন, এই সাধারণ অস্তিত্ব মাত্র অনুভব করিয়াই হিন্দু ক্ষান্ত হয় নাই। সকল দেশের সকল তত্ত্ববিদ্যা এবং তত্ত্ব-মীমাংসাই কোন না কোনও আকারে এই অনন্তকে বা ভূমাকে মানিয়া লইয়াছে। হিন্দু কেবল অনন্তকে এই ভাবে মানিয়া লইয়া স্থির থাকিতে পারে নাই, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বহুবিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছে, এবং অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই ভূমাকে ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং’ রূপে আপনার আত্মার মধ্যে এই আত্মার নিত্য সিদ্ধ একত্বের মূলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই নিগূঢ় একহানুভূতিই হিন্দুর নিকটে সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, বাস্তবের মধ্যে অব্যক্তকে, বাস্তবের মধ্যে আদর্শকে, বুদ্ধির মধ্যেই যাহা বোদ্ধব্য, জ্ঞানের মধ্যেই যাহা নিত্য জ্ঞাতব্য, তাহাকে সর্বদা প্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুর অস্থি-মজ্জা-গত এই সহজ প্রকৃতিসিদ্ধ একহানুভূতিই তাহার সমুদায় জ্ঞানান্বেষণ ও কর্মক্ষেত্রের প্রেরয়িতা হইয়া হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজীতে এক কথায় হিন্দুর বিশেষত্বের বা হিন্দুত্বের মূল সূত্রটি ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে,—

“The Hindu not only starts from Experience as a

homogenous whole, but always in investigating the manifold in the real world, returns to the actual synthetic unity in the *Atma*,"

বারান্তরে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পৌরাণিকী কথা

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততোজ্জয়দৌরয়েৎ ॥

হিন্দুর গৃহে পুরাণাদি পাঠ করিবার পূর্বে এই শ্লোকটি পাঠ করিতে হয়। নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তবে জয়োচ্চারণ করিবে; ইহাই হইল এই শ্লোকটির সহজ অর্থ। এই অর্থ বোধগম্য করিতে হইলে নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং সরস্বতী, এই কয়টি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে; পরে, পুরাণ পাঠের সময়ে জয়োচ্চারণই বা কেন করিতে হয়, তাহাও বুঝিতে হইবে; অনুষ্ঠাপছন্দের শ্লোকটি দেখিতে ও শুনিতে আমাদের যত সরল বোধ হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তত সরল নহে; উহার মধ্যে অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি সিদ্ধান্ত লুকান আছে। দেখা যাউক, কয়টা গুপ্ত কথা বা কয়টা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।

প্রথমে দেখা যাউক, নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? নব্বাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণের বচন ধরিয়া নারায়ণ শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

“আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর শ্রবঃ।

অঘনং তস্ত তাঃ পূর্ণং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥”

“নারাজাতানি তস্মানি নারানীতি বিহবুধাঃ ।
 তান্বেব চায়নং তস্ম তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥”
 “যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসকলং দৃশ্যতে শ্রয়তেহপিবা ।
 অদৃক্হিষ্ট তৎসৰ্ব্বং বাপ্য নারায়ণঃ হিতঃ ॥”
 “একতেঃ পর এবাত্তঃ স নরঃ পঞ্চবিংশকঃ ।
 তস্মৈমানি চ ভূতানি নারানীতি প্রচক্ষতে ।
 তেষামপায়নং বস্মান্তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

ইহাই হইল নারায়ণ শব্দের পৌরাণিকী ব্যাখ্যা । ইহা ছাড়া
 ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে নারায়ণ শব্দের অন্য অর্থ
 আছে । অপ্ শব্দের অর্থ জল ; সমষ্টিসীকৃত শক্তির যে সম্মুত-
 ব্যাপ্তি তাহাকেও আপঃ বা নারা বলে, তাহাই যাহার অনয় বা স্থিতির
 স্থান তিনিই নারায়ণ । প্রলয়কালে যখন সকল বিকশিত শক্তি সংহত
 হইয়া সামঞ্জস্যের ব্যাপ্তিতে বিস্তৃত থাকে, তখন সেই ব্যাপ্তি বা
 সাগরবক্ষে যিনি ভাসমান থাকেন তিনিই নারায়ণ । জগতে যাহা
 কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাহিরে,
 স্থূলে ও সূক্ষ্মে যাহা কিছু আছে—থাকে—বা থাকিতে পারে, সে
 সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তিনিই নারায়ণ । অথবা
 নরত্বের অয়ন যিনি তিনিই নারায়ণ । যাঁহা হইতে নরজাতির উদ্ভব
 হয়, যাঁহার কৃপায় সেই নর নরোত্তম আখ্যা লাভ করে, তিনিই
 নারায়ণ । তন্ত্র বলিতেছেন যে, যত জীব, তত শিব ; প্রত্যেক জীবেরই
 ভগবানের অংশ নিত্য বিদ্যমান । ভগবান অনন্ত শক্তির অনন্ত-
 গুণের আধার ; তাঁহার অংশও অনন্ত শক্তির ও গুণের আধার ;
 কেন না অনন্তের অংশ কখনই সান্ত হয় না, অনন্তের অংশও
 অনন্ত । তাই জীবও শিব এক ও অদ্বয় । যখন জীব বুদ্ধিতে পারে
 যে আমি শিব, তখনই সে শিবই লাভ করে । অনন্ত শিবশক্তির
 অসীম সাগরের এক একটি বুদ্ধ এক একটি সৃষ্টি, যেন এক
 একটি ব্রহ্মাণ্ড ; সেই অনন্তকোটি বুদ্ধ খচিত শক্তিসাগরে যিনি

লীন তিনিই নারায়ণ। সূতরাং প্রতি জীবেরই নারায়ণের অংশ নিত্য বিদ্যমান ; লোকসমাহার জনসঙ্ঘ নারায়ণের একটি রূপ—একটা প্রকট নৃতি।

নর শব্দের অর্থে বিষ্ণু বুঝায় ; স্বয়ং জনার্দীনকে নর শব্দে আখ্যাত করা হইয়াছে। সূতরাং তিনিই নরোত্তম যিনি পুরুষোত্তম। নর, নরোত্তম ও নারায়ণ এই তিনই এক, একই তিন। প্রথমে বৈষ্ণবীশক্তিসম্পন্ন সজীব পুরুষ বা নর বা মানুষ ; তাহার পর ধরার ভার হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি নরোত্তম বা পুরুষোত্তম ; তিনিই আদর্শ পুরুষ, আদর্শ নর। এই নর এবং নরোত্তমের আধারভূত যিনি তিনিই নারায়ণ। এই তিনই যে এক, এবং এক হইতেই তিন, তাহা বলিল কে ?—বুঝাইল কে ? উত্তরে বলিব,—বাক্, বাণী, সরস্বতী। তিনি কি বলিয়াছেন ? একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি আর কি বলিয়াছেন ? তত্ত্বমসি। তিনি আরও কি বলিয়াছেন ? একোহং বহুশ্চামঃ। শেষে তিনি দেবীসূক্তে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন,—

“ওঁ অহং রুদ্রেতির্ষস্তুভিষ্চরাম্যহমাদিতৈতাকৃত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং মিত্রাবরণোভা বিভর্ষ্যামিস্রায়ী অহমশ্বিনোভা ॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ “যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যাভিহীয়তে”—যে দেবী সর্ব ভূতে চেতনারূপিণী, যিনি রুদ্র, যিনি ইন্দ্র, যিনি মিত্র, যিনি বরুণ, যিনি সর্বভূতে, সর্বজীবে, সর্বত্রে, সর্বব্যাপারে পরিব্যাপ্তা, তিনিই বুঝাইয়া দেন নর, নরোত্তম ও নারায়ণ একই, তিন ভিন্ন নহে। তিনিই বুঝাইয়া দেন যে, নর ইচ্ছা করিলে নরোত্তম হইতে পারে, শেষে নারায়ণে আত্মসংবরণ করিতে পারে ; অনন্ত শক্তিসম্পন্ন জীবের উন্নতির অবধি নাই। এই বোধটুকু লাভ হইলে পর নর, নরোত্তম, নারায়ণ এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে। কেন জয়োচ্চারণ করিবে ? যেহেতু এই বোধ হইলে জীবের তখন

আর কোন ভয় থাকিবে না,—শোকের ভয়, মোহের ভয়, পতনের ভয়, চিরনৈরাশ্যের ভয়—কোন ভয়ই থাকে না। যাহার দ্বারা ভয় দূর হয়, যিনি অভয় দান করেন, তাঁহাকে দেখিতে বা চিনিতে পারিলে তাঁহারই জয়োচ্চারণ করিতে হয়। পুরাণে তাঁহারই লীলা ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। তাঁহাকে চিনিবার ও বুঝিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই পুরাণ পাঠের পূর্বে ও শেষে এই ভাবে নর, নরোত্তম নারায়ণ, এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া সানন্দে নারায়ণের জয়োচ্চারণ করিতে হয়।

ইহা হইল পৌরাণিকী ব্যাখ্যা। এইবার মুমুকু ও ভক্তের দিক দিয়া কথাটা বুঝিতে হইবে। নারায়ণ অব্যক্ত পুরুষ, বেদান্ত মতে “শুদ্ধান্তর্যামিসূত্রবিরাদাখ্যাঃ”—তিনি শুদ্ধ ও অন্তর্যামি পুরুষ।

“সাক্ষ্যমুক্তি বচনো নারেতি চ বিদ্বর্ধাঃ।

যো দেবোহপ্যন্নং তন্ত স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥”

“নারাশক্ত পাপাশ্চাপ্যন্নং গমনং স্মৃতং।

যতো হি গমনং তেষাং সোহন্নং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥”

নারক মোক্ষণং পুণ্যমন্নং জ্ঞানমীপ্সিতং।

ভয়োজ্ঞানং ভবেদ্বশ্মাং সোহন্নং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

পাপের মুক্তি, নরকের হীনতা হইতে মুক্তি যাহা হইতে হয় তিনিই নারায়ণ। অথবা যাহা হইতে মোক্ষের জ্ঞান হয়, বন্ধন ভয় দূর হয়, তিনিই নারায়ণ। যাহা ভয় তাহাই পাপ, যাহা অভয় তাহাই পুণ্য। বাধাই ভয়, বাধাই দুঃখ ; যাহার বাধা নাই, তাহার দুঃখ নাই ; স্মৃতরাং সেই নির্ভয় পুণ্যবান। যিনি বাধা হইতে, দুঃখ হইতে, ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনিই নারায়ণ। ভয় দূর হয় কেমন করিয়া ? যিনি ভয়হারী তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে, তিনি যে সর্বদা আমার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা সদাই অনুভব করিতে পারিলে, তাঁহার রাজ্যে,—খাস্তালুকে বাস করিতে পারিলে,

তঁাহার সেবক সহচর হইয়া থাকিতে পারিলে, অথবা তঁাহাতে স্নেহ
স্বা ভুলাইতে পারিলে, আর কোন ভয় থাকে না। সাযুজ্য, সাগীপ্য,
সাক্ষ্য ও সালোক্য—এই চারি প্রকারের মুক্তির কোন একটি
মোক্ষপদ লাভ করিতে পারিলেই নির্ভয় হওয়া যায়। ভক্ত বলেন,
আমি তঁাহাতে মিশিতে চাহি না, তঁাহার আকারে আকারিত হইতে
চাহি না,—আমি চাহি তঁাহার সেবা করিতে, তঁাহার লীলা-নাট্য
দর্শন করিতে, তঁাহার আশ্রয়ে থাকিতে। পুরাণে তঁাহার লীলা-
ব্যাখ্যা আছে, কেমন করিয়া তঁাহার সেবা করিতে হয় তাহার পদ্ধতি
ও ক্রম পুরাণে লিখিত আছে, জীবন কি ভাবে পরিচালিত হইলে,
কোন পথে যাইলে, কতকটা নির্ভয় হওয়া যায়, তাহাও পুরাণে বিশদ
ভাবে, অর্থবাদের আবরণে, লিখিত আছে, অতএব পুরাণ পাঠের
পূর্বে সেই ভয়হারী নারায়ণের নমস্কার করিতে হয়। নর কেমন
করিয়া নরোত্তম হয়, সেই নরোত্তম কেমন করিয়া নারায়ণের দেহ
হইতে সঞ্জাত, তাহা পুরাণের বাণীই প্রকট করিয়াছেন। যে নর
নরোত্তম হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে, যে নরোত্তম নারায়ণের অংশ-
স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছেন, ইহাদের দুইজনকে আমি প্রণাম করি।
আর যে পুরাণের বাণী আমাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছে, তাহাকেও
প্রণাম করি। কেবল প্রণামই নহে, সঙ্গে সঙ্গে জয়োচ্চারণ করিব;
কারণ, আর ত ভয় নাই, গুরুপুরাণ আমাকে সেবার পথ, কৈঙ্কর্যের
পথ দেখাইয়া দিতেছেন। সর্বভয়-হর, সর্বতাপ-হর, সর্বপাপ-হর
শ্রীভগবানের আমি কিস্করতা লাভের উপায় পাইতেছি, অতএব—
জয়-জয়-জয়!

পুরাণ সকল লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যেই লিখিত। সে লোক-
শিক্ষাটা কেমন? সংহতিঃ কার্য সাধিকা—মনুষ্য সকলের একী-
করণেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমে যাহাদের লইয়া
সংহতি তাহাদের প্রত্যেককে খাঁটি করিয়া গড়িতে হইবে। ধর্ম
শিক্ষা না পাইলে মানুষ মানুষ হয় না, নরাকারে পশুবৎই থাকিয়া

যায়। যাহা নরকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই নরের ধর্ম। জীবন হেতু নরে এবং পশুতে অনেক গুণ-সামান্য আছে। যে সকল গুণের জন্য নরের বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়, নর নরোত্তম হইতে পারে, তাহাই নরের বিশেষ গুণ। আহাৰ, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি দেহীর যে সামান্য গুণ আছে তাহা নরেরও যেমন আছে, পশুতেও তেমনি আছে। পরন্তু শম দমাদি গুণসকল নরের পক্ষে বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ গুণ সকল বা মানব ধর্মের সম্যক উন্মেষ মনুষ্যসমাজে ঘটিলে, তেমন মনুষ্য সংহতিই কার্য-সাধিকা হয়। তাই পুরাণ আর কাহাকেও নমস্কার করেন না, কেবল 'জগদ্ধিতায় গোবিন্দায় নমোনমঃ' বলিয়া থাকেন। জগতের হিতের জন্য, সমাজের মঙ্গলকামী হইয়া পুরাণ লিখিত এবং পঠিত হয়। নর নরোত্তম হইতে শিখিলে, নরোত্তম নারায়ণের অংশ-স্বরূপ বলিয়া জানিলে, জগতের হিত নিশ্চয়ই হয়। যে বাণী এই হিতসম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন, তিনিই নর ও নরোত্তমের মধ্যগতা হইয়া, উভয়ের পরিচয় সাধন করিয়া থাকেন। সে পরিচয়ের কথা পুরাণেই পাওয়া যায়। নরকে নরোত্তম হইতে হইলে কত অসংখ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, কতবার পড়িতে হয়, আবার উঠিতে হয়, তাহারও বিবরণ পুরাণেই পাওয়া যায়। পুরাণ কেবল ইতিহাস বা 'হিস্টরি' নহে, উহা মানবতার উত্থান-পতনের আখ্যায়িকা মাত্র—মানবতার বিশ্লেষণ ও পরিপোষণের উপাখ্যান মাত্র। শাস্ত্রের হিসাবে কেমন করিয়া মানুষ মানুষ হইতে পারে, তাহারই ইতিহাস পুরাণে পাওয়া যায়। তাই সে ইতিহাস পাঠের পূর্বে নরনারায়ণকে প্রণাম করিতে হয়—দেবী সরস্বতীর অর্চনা করিতে হয়।

আমার পুরাণ কোন দেশের? “গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি,—নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেশ্বিন্ সন্নিধিং কুরু” বলিয়া যে দেশে পিতৃপিতৃ অর্পণ করিতে হয়, সেই সপ্তসন্নিধি বন্ধুরাই

আমার পুরাণের দেশ—জন্মভূমি। যে জাতি বা জাতি সকল
ঋষি মুনিগণের বংশধর বা বংশরক্ষক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া
থাকে, তাহাদেরই পিতৃপরিচয়, পূর্বগামিগণের কীর্তিপরিচয়, নরক
উন্মেষের শ্লাঘার পরিচয়, আত্মদানের গৌরব পরিচয়, এই পুরাণ
সকলের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লিখিত আছে। পুরাণ নিদ্রিতকে
জাগ্রত করে, মুককে সজ্ঞান করে, বিহ্বলকে শান্ত করে, মরণভয়-
ভীতকে অমর করিয়া তুলে। পুরাণ দুর্বলদৃষ্টি নরের ঈক্ষণ-যন্ত্র,
পুরাণ অন্ধের যষ্টি, বিষণ্ণের তুষ্টি, প্রমত্তের তৃপ্তি ও শান্তি।
কেননা, পুরাণ আমাদের দেশের, আমাদের জাতির এবং নরনারায়ণের
গাথায় পরিপূর্ণ। তাই আমার বাণী, আমার মেধা, আমার স্মৃতি,
আমার চিত্ত, আমার বুদ্ধি—আমার স্বরস্বতী—আমার অনুকূল না
হইলে আমার পুরাণ আমি বুঝিতে পারি না। আমার পুরাণ আমি
বুঝিতে না পারিলে আমি তীর্থচ্ছিন্ন নৌকার ন্যায় অনন্তকাল
সমুদ্রে মৎস্যযন্ত্রহীন হইয়া, বিক্ষিপ্তের ন্যায়, কেবল ইতস্ততঃ ভাসিয়া
বেড়াই, আমার জাতিগত, ধর্মগত, বংশগত কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয়
আমাতে থাকে না। পুরাণ বিশ্বমানবতা বা নারায়ণের ভূমা ভাব
সংসারী জীবকে বুঝাইয়া দেন না; কারণ পুরাণ বলেন যে, বংশের
ধারার প্রভাব এবং দেশবিশেষের জলবায়ুর এবং সেই দেশের
বিশ্বাস প্রভাব মানুষ এড়াইতে পারে না। যতদিন মানুষের দেহাত্ম-
বুদ্ধি প্রবল থাকে, ততদিন মানুষ জন্মের ও জন্মভূমির ভাব এড়াইয়া
স্বতন্ত্র ও অভিনব জীবে পরিণত হইতে পারে না। তাই এই
দুই সংস্কারের গণ্ডীর ভিতরে রাখিয়া নরকে নরোত্তম করিবার পথ
পুরাণ দেখাইয়া দিতেছেন। আমার জন্মভূমি কেবল সপ্তসরিদ্বরাই
নহেন; যিনি আমার জননী, আমার জাতির জননী, আমার বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডারী, তাহারই সতীদেহের একান্ত খণ্ডের দ্বারা আমার
জন্মভূমি খচিত—পবিত্রীকৃত। তাই বিশ্বজননী, আমার জননী এবং
আমার জন্মভূমি,—এই তিনই এক, একই তিনে পরিব্যাপ্ত।

পঞ্চান্তরে আমি নর, আমার নরোত্তম এবং আমার নারায়ণ এই তিনই এক, একেই তিন পরিব্রাজ্য। এই ত্রয়ীর বিশ্লেষণ ও সমীকরণ যাহাতে আছে তাহাই পুরাণ। সেই পুরাণ জগদ্ধিতায়—গোবিন্দায় নিনিযুক্ত।

এইবার পুরাণ শব্দের পারিভাষিক অর্থের আলোচনা করিব। পুরাণ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, উহার অর্থ “ব্যাসাদি-মুনি-প্রণীত-বেদার্থবর্ণিত-পঞ্চলক্ষণায়িত শাস্ত্রম্”। অর্থাৎ পঞ্চলক্ষণযুক্ত বেদার্থ প্রকাশক এবং ব্যাসাদি মুনি প্রণীত যে শাস্ত্র, তাহাই পুরাণ। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ এই,—

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমবন্তরানি চ।

বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥”

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মবন্তর, বংশানুচরিত—ইহাই পুরাণের পঞ্চলক্ষণ। ব্যাসাদি-মুনি-প্রণীত যখন বলা হইল, তখন একা ব্যাসই অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ “ব্যাস” শব্দটা উপাধিবাচক; যাহারা শাস্ত্রব্যাত্যাতা কথক, এখনও রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে তাঁহাদিগকেই “ব্যাস” বলা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ পুরাণ ভাল করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, “ব্যাস” একজন ছিলেন না। অনেকগুলি ব্যাসের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। আবার ইহার মধ্যে আরও একটু মজার কথা আছে। “ইতিহাসো ভারতঞ্চ বাণ্মীকং কাব্যমেব চ”—অর্থাৎ মহাভারত গ্রন্থকে ইতিহাস বলা হয়; বাণ্মীকী-রামায়ণ পুরাণও নহে, ইতিহাসও নহে, উহা কাব্য মাত্র। প্রত্যেক পুরাণে যেটুকু বংশানুচরিত আছে সেইটুকুই ইতিহাস, বাকী সব গল্প-গাছা, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, অর্থবাদ, রোচক মাত্র। কিসের অর্থবাদ?

“ধর্ম্মাধর্ম্ম-পরিজ্ঞানং সদাচার প্রবর্তনং।

গতিশ্চ পরমা তদুক্তির্ভগবতি প্রভৌ।

তানি তে কথয়িষ্যামি ন পন্থানানি ভুতলে ॥”

অর্থাৎ ধর্ম্যধর্মের পরিজ্ঞান, সদাচারের প্রবর্তন এবং ভগবানে পরমা ভক্তি যাহার দ্বারা ভূতলে প্রমাণসহ প্রচারিত হয়, তাহাই পুরাণ। শাস্ত্র তিন রকমে সাধকগণের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। প্রথম—রাজবাণী ; যথা বেদ ও গৃহ-সূত্র। এখানে কেবল লুকুম, কেবল আদেশ ; সে লুকুম অনুসারে কাজ করিতেই হইবে, না করিলে পাপভাগী হইতেই হইবে। দ্বিতীয়—মিত্রবাণী ; যথা দর্শন শাস্ত্র। মিত্রের সহিত কথা কহিতে হইলে যেমন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া কথা কহিতে হয় ; তাহাকে তর্ক হারাইয়া স্মীয় মতানুকূল করিতে হয়, তেমনি দর্শন শাস্ত্রে কেবল বিচার, কেবল তর্ক আছে। রাজাদেশের ন্যায় কোন আদেশ দর্শন শাস্ত্র করেন না,—‘আমি বলিতেছি’ বলিয়া কোন কথা মাণ্ড ও গ্রাহ্য করিতে কাহাকেও বলেন না। ইহাই মিত্রবাণী। তৃতীয়—কান্তাবাণী ; যথা পুরাণেতিহাস, স্ত্রীকে কোন কথা বুঝাইতে হইলে যেমন গল্পগাছা করিয়া বুঝাইতে হয়, যেমন কাহারও তুলনা দিয়া বলিতে ও বুঝাইতে হয় ; পুরাণ শাস্ত্রও তেমনি বেদ এবং তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল আখ্যায়িকা ও উপাখ্যানের সাহায্যে জনসাধারণকে বুঝাইয়া থাকেন। তাই পুরাণের কথাকে কান্তাবাণী বলে। পুরাণ ব্যাখ্যান শাস্ত্র, সিদ্ধান্তের শাস্ত্র নহে ; বেদ, উপনিষদ, তর্কশাস্ত্র যে সকল সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন, গল্পের ছলে পুরাণ তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পুরাণের আবার তিন শ্রেণী আছে ; সাহিত্যিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন ভাগে অষ্টাদশ মহাপুরাণ বিভক্ত। সাহিত্যিক পুরাণে মোক্ষের ও ভগবন্তক্তির কথাই প্রশস্ত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের লীলা নাট্যেরই বর্ণনা হইয়াছে। বিষ্ণু, নারদ, শ্রীমদ্ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ছয়টিই সাহিত্যিক পুরাণ। রাজসিক পুরাণে সমাজ-রক্ষা, সমাজ-বিস্তার, রাজধর্ম, প্রজাপালন, জাতিরক্ষা প্রভৃতি সমাজ-তত্ত্বের কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আছে। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত,

মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ সকলকে রাজসিক পুরাণ বলে। যাহাতে ব্যক্তিগত ঋদ্ধি সিদ্ধির কথা আছে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রবলভাবে ফুটান হইয়াছে, তাহাই তামস পুরাণ। মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, অগ্নি ও স্কন্দ, এই কয়টিকে তামস পুরাণ বলে। সাম্প্রদায়িকতার হিসাবেও পুরাণ সকলকে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বৈষ্ণব, বিষ্ণু নারদাদি পুরাণ সকলকে শ্রেষ্ঠ বলেন; শাক্ত ও শৈব, মার্কণ্ডেয়, শিব, স্কন্দাদি পুরাণ সকলকে শ্রেষ্ঠ পদ দিয়া থাকেন। তবে বাঙ্গালার শাক্ত এক মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ছাড়া পুরাণের আর কোন অংশ লইয়া তেমন ব্যস্ত নহেন। পুরাণের হিসাবে বল, আর ইতিহাসের হিসাবেই বল, বাঙ্গালার শাক্ত কেবল মহাভারত পাঠই শুনিতেন, আর নিত্য চণ্ডী পাঠ করিতেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কেবল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই পাঠ করিতেন। ইংরেজের আমলের পর, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে পর বাঙ্গালায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতার আদর বাড়িয়াছে। পূর্বে উহা পশ্চিমের দশনামী দণ্ডী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল; গৃহস্থ-গৃহে কদাচিৎ উহা পঠিত হইত। আচার্য্য রামানুজ, গীতাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত-বাদ প্রচারক গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, বাণ্মীকির রামায়ণ পুরাণও নহে, ইতিহাসও নহে; উহা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান কাব্য-গ্রন্থ। বাণ্মীকি কবিগুরু, একজন মুনি মাত্র, ঋষিও নহেন। তবে রামানুজাচার্য্যের সময় হইতে শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার মান্য করিয়া তাঁহার পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। রামানন্দ এবং পরে তুলসীদাস রাম-পূজার পথ উত্তর ভারতে সর্বজনমান্য করিয়া যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময়ে বাঙ্গালায় বিভূজ-মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের পূজার প্রবর্তনা করেন, সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে অযোধ্যায় এবং চিত্রকূট প্রদেশে সাধারণ ভাবে রাম-পূজা

পদ্ধতি প্রচলিত হয়। রাম ইষ্টদেবতা নির্দিষ্ট হইবার পর তবে রামায়ণ ধর্মগ্রন্থ রূপে গ্রাহ্য হইয়াছে। পশ্চিমের রামসেবকদিগের ব্যবহার দেখিলে বলিতে হয় যে, উহারা তুলসীকৃত রামায়ণকেই ধর্মগ্রন্থ রূপে গ্রাহ্য করে, বাগ্মিকী-রামায়ণকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া তেমন মান্য করে না। বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ আসিয়া বাস করিলে এবং গুরুর আসন প্রাপ্ত হইলে পর, রামপূজা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ভট্টপল্লির বৈদিকগণ সবাই রামাত বৈষ্ণব ; তবে তাঁহারা বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বাধ্য হইয়া তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাদের চেষ্টাতেই বাঙ্গালায় এক কালে রাম-কথার প্রচার হইয়াছিল। এই ত গেল পুরাণের কথা। ইহা ছাড়া উপপুরাণ আছে ; তাহাদেরও সংখ্যা অষ্টাদশ। শাস্ত্র কোনখানে পুরাণকে গল্প-গাছার গ্রন্থ ছাড়া অন্য কিছু বলেন নাই।

পুরাণাখ্যানকং বিপ্র নানাকল্প সমুদ্ভবম্।

নানা কথা সমাধুক্তমদ্ভুতং বহুবিস্তরম্ ॥”

কিন্তু পুরাণের স্তুতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে,—

“চতুর্লগ্নশ্চ বীজঞ্চ শতকোটি প্রবিস্তরম্।

প্রবৃতিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণাদভবন্ততঃ ॥”

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ভুজের বীজ পুরাণে সমাহিত, পুরাণ পাঠ করিলে সর্বশাস্ত্রে প্রবৃতি জন্মে। সূতরাং পুরাণ রোচক শাস্ত্র ; উহার সাহায্যে নরনারী সাধনশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরাণ সমাজের ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণপ্রদ ; ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে সাধন পথ দেখাইয়া দেয়, তাই উহা কল্যাণপ্রদ ; সমষ্টিকে মধুরভাবে বিভোর করিয়া রাখে, তাই উহা সমষ্টির মঙ্গল-সূচক। পুরাণ একলা শুনিতে নাই ; আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, প্রতিবেশী, পল্লিবাসী সকলকে সঙ্গে করিয়া, একস্থানে সমবেত হইয়া পুরাণ-পাঠ শুনিতে হয়। প্রত্যেক পুরাণেরই দুই দিক্ দিয়া অর্থ করা

যায় ; এক সমাজত্বের দিক্ দিয়া, অপর দেহত্বের দিক্ দিয়া। দেহত্বের একটা সিদ্ধান্ত ধরিয়া বহু পুরাণে এমন এক একটা আঘাটে গল্পের সৃষ্টি করিয়া ইঙ্গিতে গুপ্তকথা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তাহা একটু তলাইয়া বুঝিতে গেলেই বিষয়ে অভিভূত হইতে হয়। ইংরেজি বুদ্ধির মাপ কাটি লইয়া পুরাণ বুঝিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আবার বলি, পুরাণ হিন্দী নহে, তোয়ারীখ নহে—গাথা, কথা, উপাখ্যান, আখ্যায়িকার সমাহার মাত্র। পুরাণ সমাজ-শিক্ষার যন্ত্র, সাধকের ইঙ্গিতের গ্রন্থ, সাধনার রোচক মাত্র। তাই পুরাণকে নারায়ণী শাস্ত্রও বলা হইয়া থাকে, —নরসমাজ রক্ষার—নরত্ব রক্ষার শাস্ত্র যাহা, তাহাই নারায়ণী শাস্ত্র। গরুড় পুরাণ পাঠ করিলে মনে হয়, নর-সমাহারকে—নরত্বকে নারায়ণ বলা হইয়াছে। ইংরেজিতে নারায়ণকে Super-man এবং Humanity দুই বলা যায়। সেই নর-নরোত্তম-নারায়ণকে বার বার প্রণাম করিয়া, নারায়ণ পরায়ণ হইয়া আজ “নারায়ণের” সেবাত্রেতে দীক্ষিত হইলাম। যুগে যুগে তুমি কত রূপ ধারণ করিয়াছ, কত ভাবের প্রচার করিয়াছ ; আজ নারায়ণের অঙ্গীভূত হইয়া বাঙ্গালার, তথা ভারত ভূমির নর-নারায়ণের পুষ্টিকল্পে অবতীর্ণ হও,—আমাদের নরদেহ ধারণ সার্থক হউক।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃন্দাবন

‘নারায়ণ’ পত্রের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর এক অতি কঠিন কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনি যদি আমাকে তাঁহার পত্রে ‘যা-হয় একটা কিছু’ লিখিবার জন্য ফরমাইস করিতেন, তাহা হইলে আমি নিঃসঙ্কোচে লেখনী ধারণ করিতে পারিতাম। অনেক বাজে জিনিস বাঙ্গালা মাসিক পত্রগুলির মারফত সাহিত্যের হাটে হাজির করিয়াছি,—আর একটা না হয় বাড়িবে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় প্রচলিত সম্পাদকীয় মামুলী ‘যা-হয় একটা কিছু’ চান না,—তিনি চান ভ্রমণ-বৃত্তান্ত! আমি সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম, “ভ্রমণ ত করি না, বৃত্তান্ত আসিবে কোথা হইতে?” আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সম্পাদক মহাশয় সুধু কবি ও সাহিত্যিক নহেন, তিনি ব্যবহারাজীবী—বড় বারিস্টার—জেরায় পঞ্চ-মুখ। তিনি একেবারে তিন চারিটি প্রশ্ন ডিম্বাইয়া বলিলেন “আপনি কি কখন বৃন্দাবনে যান নাই”? অস্বীকার করিতে পারিলাম না, বলিলাম, “অনেকবার গিয়াছি”। তিনি অমনি বলিয়া বসিলেন, “তাঁহারই একবারের কথা লিখিয়া দিতে হইবে”। আমি মৌন রহিলাম, তিনি বুঝিলেন উহা সম্মতির লক্ষণ। কিন্তু আমি যে কি জন্য মৌনভাবে অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা ত তিনি বুঝিতে পারিলেন না, আমিও তখন বলিতে পারিলাম না;—যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, তাঁহাদের কাছে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারি না, কথা যেন কেমন বাধিয়া যায়,—আমি ঐ প্রকার অবস্থায় পড়িলে প্রায়ই চুপ করিয়া থাকি।

তখন আমার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তখন বলিতে পারি নাই, এখন একেলা বসিয়া লিখিতে পারি। আমার মনে হইয়াছিল, আমার বয়স যে দুই যুগের উপর বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা কি ইহঁরা ভুলিয়া গেলেন? যখন ‘হিমালয়,’ ‘প্রবাসচিত্র,’ ‘পশ্চিক’

লিখিয়াছিলাম, তখন আমি যে পৃথিবীতে বাস করিলাম, যে ভাবের ঘোরে অভিভূত ছিলাম, সে পৃথিবীর উপর দিয়া মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে, সে ভাবের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, সে বীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সে মুকুটপক্ষ নিমানবিহারী বিহঙ্গ এখন লৌহপিঞ্জরে বসিয়া প্রতিপালকের শিখান 'রাধাকৃষ্ণ' বলে,—মনের আবেগে কথা বলিবার শক্তি সামর্থ্য তাহার নাই ! সে দিন নাই, বন্ধু, সে দিন নাই !

কথাগুলি সে সময় বলিতে পারিলে হয় ত আমি এ দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতাম ; কিন্তু কাজের সময় ঠিক ঠিক মত কথা বলিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয় জানিয়াও কথা বলিতে পারিলাম না । অতএব আমাকে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেই হইবে ; পারি আর নাই পারি, অনুরোধ প্রতিপালন করিতেই হইবে ।

তাহার পর আর একটা কথা সকলে ভাবিয়া দেখিবেন । দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভাল হউক আর মন্দ হউক লেখা সহজ । অনেকে শুনিয়াছি স্থান না দেখিয়াও লিখিয়া দিতে পারেন । আমি সে বিদ্যা শিক্ষা করি নাই । যাহা দেখিয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারি না, কত ক্রটি থাকিয়া যায়,—না দেখিয়া লেখা ত বহু দূরের কথা । তবুও না হয় দিল্লী লাহোর এক রকম করিয়া বলিয়া দিতাম ; কিন্তু এ ত দিল্লী লাহোর নহে—এ বৃন্দাবন—এ ব্রজভূমি—এ কিশোর কিশোরীর লীলা নিকেতন—এ গোপগোপীর আনন্দ ভবন—এ প্রেমের নন্দন-কানন—এ বৃন্দাবন ! কত কত প্রেমিক ভক্ত যে স্থানের নাম স্মরণ করিয়াই প্রেমপুলকে অধীর হইয়া পড়েন, কঠোর শুকহৃদয় ভজন-পূজন বিহীন আমি সেই বৃন্দাবনের কথা কেমন করিয়া বলিব ? যে বৃন্দাবনের ক্রোড়বাহিনী যমুনার কথা মনে হইলেই উচ্চসরে বলিতে ইচ্ছা করে—

“যমুনে, এই কি গো সেই যমুনে প্রবাহিনী ।

ও যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকাস্তমনি ।”

—সে যমুনার কথা আমি কেনন করিয়া বলিব ? বৈষ্ণব কনি-
গণ যে বুন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া লেখনী ত্যাগ
করিয়াছিলেন, সে বুন্দাবনের কথা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব
—সম্পূর্ণ অসম্ভব ।

তবুও বুন্দাবনের কথা বলিতে হইতেছে । আমি তিন চারি
বার বুন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম । প্রথমবার যখন যাই
তখনকার কথাই আজ বলিব, কারণ সে-ই আমার প্রথম শ্রীধাম
দর্শন । আমি তখন পশ্চিম দেশে থাকিতাম, কাজ কর্মের মধ্যে
ভ্রমণ । এই ভ্রমণ উপলক্ষে একবার আগ্রার তাজমহল দেখিতে
গিয়াছিলাম । আগ্রার কথা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়,
সুতরাং তাহা আর বলিয়া কাজ নাই ।

আমি যখন তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে সেখা-
নেই একটি ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত আমার আলাপ হয় । যুবকটি
আগ্রা কলেজের বি.-এ, শ্রেণীর ছাত্র । তাঁহার বাড়ী মথুরায় ।
তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতে আমি মথুরা বুন্দাবনের কথা
জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি যখন শুনিলেন যে, আমি মথুরা
বা বুন্দাবন দর্শন করি নাই, তখন তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে
বলিলেন যে, তিনি সেই রাত্রির গাড়ীতেই বাড়ী যাইতেছেন ;
আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে মথুরা বুন্দাবনে যাইতে
পারি । তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে গেলে আমার
থাকিবার, খাইবার ও দেখাশুনার কোন অসুবিধাই হইবে না ।
এ সকল অসুবিধার কথা আমার কোন দিনই মনে হয় নাই ;
কি খাইব, কোথায় থাকিব, কি হইবে, এ সকল ভাবনা আমার
মনে স্থান পাইলে আমি এ পথে পদার্পণ করিতাম না । কষ্ট,
অসুবিধা, অনাহার, এ সকল কোন দিনই আমি গ্রাহ্য করি নাই,
আমি সকলই সহ্য করিতে শিখিয়াছিলাম । তাই হিমালয়ের মধ্যে
আমি মারা যাই নাই, তাই তখন আমার ভোগের শেষ হয় নাই ।

মথুরা বৃন্দাবন, আগ্রা অতি নিকট, আর আগারও অন্য কোথাও কাজ বহিয়া যাইতেছে না। সে সময় আমার যে প্রকার মনের অবস্থা ছিল, তাহাতে কোন রকমে দিনের পর দিন কাটিয়া গেলেই আমি বাঁচিতাম—একেবারে সকল দিনগুলি যদি একদিনে আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহাতেও আমার আপত্তির কোন কারণ ছিল না—তাহার জন্য আমি তখন প্রস্তুতই ছিলাম। সময়ের যে কোন মূল্য আছে, জীবনের যে কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমি তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আর এখন—এখন সেই পরিপূর্ণ অপব্যয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য দিবানিশি খাটিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাক্—নিজের দুঃখের কথাই পাঁচ কাহন করিয়া আর কাজ নাই।

আমি যুবকের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলাম। তখন দুইজনে তাজমহল হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে সহরের দিকে আসিতে লাগিলাম। আমি আগ্রা কেল্লার নিকট রেল ষ্টেশনের অদূরবর্তী একটা ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার সঙ্গে যে জিনিসপত্র ছিল, তাহা সেখানেই রাখিয়া আহাৰান্তে তাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। জিনিসপত্রের কথা শুনিয়া পাঠকপাঠিকাগণ যদি ট্রক, বাস, বিছানা প্রভৃতি বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার কথা আমি কিরাইয়া লইতেছি। পথে চলিতে গেলে যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই জিনিসপত্র। আমার তখন প্রয়োজন হইত দিনের মধ্যে একবার স্নান করা, আর এক বেলা হউক বা দুই বেলা হউক, দুইটা আহাৰ করা। ইহা ব্যতীত আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। আহাৰটা কখনও বা হোটেলে হইত, কখনও বা কাহারও বাড়ীতে ‘নমো নারায়ণ’ বলিয়া উঠিয়াই হইত; সূতরাং খালা, গ্লাস, ঘটি, বাটি প্রভৃতির প্রয়োজন কোন দিনই হয় না,—লোকালয়েও না, হিমালয়েও না। এক স্নানের প্রয়োজন; তাহার জন্য একখানি কাপড় ও একখানি গামোছা সঙ্গে থাকিলেই

হইত। তাহারা দুইজনে স্নানের ব্যবস্থা করিত এবং শয়নের সময় তাহাদের মধ্যে কাপড়খানি তোষক এবং গামোছাখানি বিছানার চাদরের কাজ করিত—আমি রাজা মহারাজার মত ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতাম। এখন বুঝিলেন আমার জিনিসপত্র কি?—একখানি কাপড় আর একখানি গামোছা। লোকালয়ে ইহাই আমার জিনিসপত্র ছিল, হিমালয়ে উহাও থাকিত না। সে কথা এখন থাকুক।

যুবকটির সহিত আসিবার সময় তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহার পিতামাতা বর্তমান আছেন; পিতা মথুরার জজ আদালতের উকিল, বেশ পরসাকড়ি পান। তাঁহার আর ভাই নাই; দুইটি ভগিনী আছেন। একটি বিধবা, তাঁহাদের বাড়ীতেই থাকেন, আর একটি সখবা, তিনি শ্বশুর-গৃহেই থাকেন। যুবকের বিবাহ হয় নাই; লেখাপড়া যাহা হয় এক রকম শেষ না হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিবাহিত করিবেন না। তিনি আমার পরিচয়ও গ্রহণ করিলেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে আমরা ধর্মশালায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে তাঁহাদের ছাত্রাবাসে লইয়া যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। তখন ঠিক হইল যে, আমি রাত্রিতে ষ্টেশনে যাইব এবং সেখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। রাত্রি তিনটার পর একখানি গাড়ী আগ্রা হইতে মথুরার দিকে যায়, সেই গাড়ীতে যাওয়াই স্থির হইল। যুবক আমাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর জলযোগ শেষ করিয়া আমার ‘জিনিসপত্র’ লইয়া ষ্টেশনে গেলাম। ধর্মশালায় থাকিলে অত রাত্রিতে কে আমাকে জাগাইয়া দিবে? তাই ষ্টেশনে যাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মুসাফিরখানার বিস্তৃত কক্ষে কাপড়খানির অর্দ্ধাংশ বিছাইয়া এবং অপরাধ জড়াইয়া তাহার উপর গামোছাখানি দিয়া একটি পরম সুন্দর উপাধান প্রস্তুত পূর্বক সুখ-শয্যায় শয়ন করিলাম। দেখিতে দেখিতেই নিদ্রাদেবী

আমাকে তাঁহার শাস্ত-ক্রোড়ে স্থান দান করিলেন। কি শাস্তিতে ও নিরুপদ্রবে তখন দিন কাটিত !

শেষ রাত্রিতে যুবকের ডাকাডাকিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি উঠিয়া বসিতেই যুবক বলিলেন, “গাড়ী প্লাটফরমে আসিয়াছে, ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, চলুন”। আমি বলিলাম, “আমাকে একটু পূর্বের ডাকেন নাই কেন” ? তিনি বলিলেন, “আপনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া এতক্ষণ ডাকি নাই ; এখন চলুন”। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার ‘জিনিসপত্র’ গুছাইয়া বলিলাম, “আপনি একটু দাঁড়ান, আমি একখানি টিকিট কিনিয়া আনি। আপনি টিকিট কিনিয়াছেন কি ? কোন্ ক্লাশের টিকিট কিনিব” ? তিনি হাসিয়া বলিলেন, আপনাকে সে সব কিছু করিতে হইবে না। আমি আপনার টিকিটও কিনিয়াছি। এখন গাড়ীতে চলুন”। আমি বলিলাম, “বহুৎ খুব চলুন”।

তিনি আগে আগে চলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি কয়েকখানি গাড়ী অতিক্রম করিয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তখন বলিয়া উঠিলাম, “মাই ফ্রেণ্ড, ইয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী !” তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, “ইয়েস্ সার্, ম্যায় জাস্তা হুঁ, আপ্ উঠিযে”। আমি বলিলাম, “এ যে একেবারে ডবল প্রোমোশন্”। তিনি তখন বলিলেন, “আপনাকে যদি সন্ধ্যার সময় বলিয়া দিতাম যে, আপনি সেকেণ্ড ক্লাশের ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করিবেন, তাহা হইলে থার্ড ক্লাশের মুসাফিরখানায় আর আপনাকে কষ্ট পাইতে হইত না। কৈ আপনার চিজবাস্ কাঁহা” ? আমি আমার জিনিসপত্র—খুতি ও গামোছা—দেখাইয়া বলিলাম, “ইহাই আমার চিজবাস্”। যুবক বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন ; বোধ হয় তাঁহার এই বাইশ বৎসর বয়সের অভিজ্ঞতায় এমন লগেজ্‌হীন ভদ্রলোক ভ্রমণকারী দেখেন নাই।

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে তিনি বলিলেন, “আপনি কোন কিছু সঙ্গে না লইয়া কেমন করিয়া বেড়ান, আপনার অসুবিধা হয় না” ? আমি বলিলাম, “কিছু না। অভাব বাড়াইলেই বাড়ে, কমাইলেই কমে”। যুবক আর উত্তর করিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এইবার মথুরা বৃন্দাবনে চলিয়াছি। যুবক বিছানা ঝাড়িয়া আমাকে শয়নের জন্য অনুরোধ করিলেন ; আমি বলিলাম, “আর ঘুমাইব না ; আমি বসিয়াই থাকিব”। যুবকও শয়ন করিল না, বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এতকাল পরে এখনও মনে আছে, সে রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। পশ্চিমাকাশ হইতে তখন চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণ-ধারা ধরণীর উপর নিঃশেষে ঢালিয়া দিতেছিলেন ; সেই কিরণে স্নাত হইয়া অদূরবর্তী গ্রামগুলির বৃক্ষ সকল হাসিতেছিল, প্রশস্ত মাঠের উপর সোনার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। আর কি হইতেছিল, তাহা এতকাল পরে অকবি আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব ! সে যে অনেক দিনের কথা—সে যে আর একটি মানুষের স্মৃতি ! সেই মানুষের স্মৃতিটুকুই আমার সম্বল আছে বলিয়া এখনও দুই এক কথা বলিতে পারিতেছি—বর্ণনা করিবার শক্তি নাই।

একটা কথা কিন্তু আমার বেশ মনে আছে—সে একটা গান। সে গানটী আমি ভুলি নাই। এখনও যখনই সেই গানটী আমার মনে পড়ে, তখনই আমার সেই প্রথম বৃন্দাবন যাত্রার কথা, সেই চন্দ্রমাশালিনী যামিনীর কথা মনে হয়। আমি সেই নিশাবসান কালে গাড়ীতে বসিয়া দাশরথি রায়ের গানটী গুণ গুণ করিয়া গাহিয়াছিলাম—

“হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।

ওগো ভক্ত-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।

মুক্তি কামনা আমারি,

হবে বৃন্দে গোপ-নারী,

দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥

ধর ধর জনার্দন, (আমার) পাপভার-গোবর্দ্ধন,

কামাদি ছয় কংশ-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ;

যদি বল রাখাল প্রেমে,

বন্ধু আছ ব্রজধামে,

দীন হীন রাখাল তোমার, দান হবে হে দাশরথি ॥”

এত গান থাকিতে এই গানটা তখন কেন মনে হইয়াছিল, তাহা
এতকাল পরে কেমন করিয়া বলিব ? তখন ত ডাইরী লিখিতাম না।
তখন কি আর জানিতাম যে, লেখকের মুখোশ পরিয়া, সাহিত্যিকের
ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাকে এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে হইবে ?
তবে, আমার মনে হয়, বৃন্দাবনে যাইতেছি, যদি কমলাপতির বসিবার
জন্ত হৃদয়টাকে বৃন্দাবন করিতে পারি, তাহারই জন্ত গানটা
গাহিয়াছিলাম। কিন্তু তখন যে হৃদয় একটা প্রকাণ্ড মরুভূমিতে
পরিণত হইয়াছিল, তখন যে সেই মরুভূমির মধ্যে শুধু চিতার
আগুন জ্বলিতেছিল ! চুপ্—ও কথার আর কাজ নাই—বৃন্দাবনের
কথা বলিতে হইবে।

অতি প্রত্যাষে আমাদের গাড়ী মথুরায় পৌঁছিল, আমরা গাড়ী
হইতে নামিলাম। গাড়ীর মধ্যে বসিয়াই স্থির করিয়াছিলাম,
মথুরায় আজ আর অপেক্ষা করিব না, বরাবর বৃন্দাবনে চলিয়া
যাইব। সেখান হইতে ফিরিবার সময় মথুরায় যুবকের গৃহে আতিথ্য
গ্রহণ করিব। গাড়ীর মধ্যে যুবককে আর সে কথা বলি নাই।
স্টেশানে নামিয়া আমি যুবকের নিকট আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন
করিলাম। যুবক কিছুতেই ছাড়িবেন না, অন্ততঃ এক বেলার জন্তও
তাঁহার গৃহে আমাকে লইয়া যাইবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ
করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, “আজ আমি বৃন্দাবনে যাই,
আগামী কল্য এখানে ফিরিয়া আসিব এবং যে কয়দিন আপনি
বলিবেন, সেই কয়দিনই আপনাদের বাড়ীতে থাকিব”। আমার
বিশেষ ঔৎসুক্য দেখিয়া যুবক অগত্যা তখনকার জন্ত আমাকে ছাড়িয়া
দিতে স্বীকার করিলেন।

যে রেলগাড়ী বৃন্দাবন যায় তাহা ছাড়িতে দেড় ঘণ্টা বিলম্ব। এত বিলম্ব আমার সহিল না। যুবককে বলায় তিনি আমার জন্য একখানি ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। গাড়োয়ান তাঁহার পরিচিত। যুবক তাহাকে বলিলেন, আমাকে যেন তাঁহাদের পাণ্ডা ব্রজবাসীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়। আমি ব্রজবাসী কাহারও গৃহে যাইতে অস্বীকার করায় তিনি বলিলেন যে, বৃন্দাবনে তাঁহার পরিচিত একজন বাঙ্গালী বাবাজী আছেন, তিনি অতি সাধু ব্যক্তি। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত; তাঁহার আশ্রমে গেলে আমার কোনই অসুবিধা হইবে না, তিনি আমাকে পরম যত্নে রাখিবেন। তিনি গাড়োয়ানকে সেই বাঙ্গালী বাবাজীর বাড়ীতে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, তিনি তখনই আমার সঙ্গে যাইতে পারিতেন, কিন্তু বাড়ীতে তাঁহার মায়ের অসুখ; তাঁহাকে না দেখিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। তিনি বলিলেন, তিনি অপরাহ্নকালে বৃন্দাবনে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি তখন আমার 'জিনিস পত্র' লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। যুবক আমাকে অভিবাদন করিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই আমি বৃন্দাবনে চলিয়াছি? আমার ত তাহা বিখ্যাস হয় না। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাদিতে যে বৃন্দাবনের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, যে বৃন্দাবন দর্শনের জন্য কত সাধু মহাত্মা পাণ্ডিবে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে পাগলের মত বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছিলেন, জ্ঞানশূন্য হইয়া পথ অতিবাহন করিয়াছিলেন, আমিও কি সেই বৃন্দাবনে যাইতেছি? কিন্তু সে আগ্রহ কই? হৃদয়ের মধ্যে সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা কই? কিছুই নাই, কিছুই নাই। আমার মত মানুষের পক্ষে তীর্থ ভ্রমণ বিড়ম্বনা। আমার পক্ষে বৃন্দাবন দর্শন অসম্ভব।

প্রাতঃকালে একাকী গাড়ীতে বসিয়া এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। এই ত বৃন্দাবনের পঞ্চকোশীর মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছি, ঐ ত সম্মুখে বৃন্দাবন ! কিন্তু সে ধবলী শ্যামলী কৈ ?
সে গোপনারীবৃন্দ কৈ ? সে শ্যামের মধুর মুরলী-ধ্বনি কৈ ?
যে বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিত, সে বাঁশীর স্বর কৈ ? যে
বাঁশীর স্বর শুনিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—

“ঐ শুন বাঁশী বাজে

বন মাঝে কি মন মাঝে ।”

বাঁশী কোথায় বাজে ?—বন মাঝে কি মন মাঝে ? যে শুনিতে
পায়, যাহার কর্ণ শুনিবার উপযুক্ত হইয়াছে, যে সাধনবলে দিব্য
কর্ণ লাভ করিয়াছে, তাহার মন মাঝেই বাঁশী বাজে ; তাহার ভিতরের
শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবিশ্রান্ত বাঁশী বাজে ; বাঁশী ‘রাধা রাধা’ বলে, বাঁশী
‘আয় আয়’ বলে । তাই শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—

“ওরে বাঁশী, বাজ ধীরে ধীরে,

এত কেন গভীর গরজ তোমার ;

বাঁশী রবে গৃহে জাগে

কাল নন্দী আমার ।”

বাঁশী, তুমি একটু ধীরে বাজ । বাঁশী এখনও তেমনই করিয়া
বাজে, এখনও যমুনা পুলিনে বংশীধারীর বাঁশী বাজিয়া থাকে ;
এখনও রাধা নামে সাধা বাঁশী তেমনই ‘আয় আয়’ বলিয়া ডাকে ।
কিন্তু শুনিবার মানুষ কৈ ? তেমন সাধনা কার ? তেমন হৃদয়
ভরা প্রেম লইয়া কে বৃন্দাবনে যায় ? কামুর বেনু শুনিবার জন্য
কে উৎকর্ষ হয় ? যে সে ভাবে যায়, তাহার বৃন্দাবন দর্শন সার্থক
হয় । তাহার জীবন ধন্য হয়, সে বাঁশীর স্বর শুনিতে পায় ।
বলিও না এ সকল ঝুটবাত্—বলিও না এ সকল বাজে sentiment,
—বলিও না এ সকল প্রলাপ ! বৈষ্ণব সাধকগণ এ কথার সাক্ষ্য
প্রদান করিবেন ; আর তাঁহাদের অপেক্ষাও যদি বড় সাক্ষী চাও,
তবে, নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষান কর, কাতরভাবে প্রার্থনা

কর, এক মনে তাঁহাকে ডাক,—তার পর—তার পর একদিন নিশ্চয়ই সেই বাঁশীর স্বর শুনিতে পাইবেই—পাইবে—পাইবে ।

না—আমি এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না—এ সকল কথা লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । আমি গোছাইয়া কথা বলিতে পারি না, সব গোলমাল হইয়া যায় ; কিসের মধ্যে কি বলিয়া বসি । তবুও আর একবার চেষ্টা করিব—আর একবার দেখিব ।

গাড়ী ধীরে ধীরে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল । চারিদিকে কত কি দেখিলাম ! কি দেখিলাম জিজ্ঞাসা করিতেছ ? যাহা দেখিলাম, তাহা পূর্বের কখনও দেখি নাই, তাহা অনির্বচনীয় ; তাহা শুধু অনুভব করিতে হয়, তাহার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে হয় । সে কথা পারি ত পরে বলিব । তখন আমার গাড়ী কত মন্দির, কত আখড়া পার হইয়া একটা বাড়ীর সম্মুখে লাগিল । গাড়োয়ান নামিয়া আমাকে বলিল যে, এই সেই বাঙ্গালী বাবাজীর আশ্রম । আমি হঠাৎ আশ্রম বা কুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া গাড়োয়ানকে পাঠাইয়া দিলাম । একটু পরেই গাড়োয়ান ফিরিয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গে আসিলেন—কে ? আমি অবাক হইয়া গেলাম, আমি প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলাম, আমি সম্ভাষণ করিতে ভুলিয়া গেলাম । বাবাজীও অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বালকের ন্যায় দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন । আমার তখন হুঁস হইল, আমি অতি ধীরে বলিলাম, “আমি ত আপনার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম । সেই একদিন হিমালয়ের মধ্যে দুই তিন ঘণ্টার জন্য দেখা হইয়াছিল” । তিনি বলিলেন, “তাতে কি হয়, ঘণ্টা মিনিটে কি সময়ের পরিমাণ হয় ; এক মিনিটের পরিচয় যে আজীবন স্থায়ী হয় । তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভুলি নাই” । যাহারা

আমার 'হিমালয়' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, হিমালয়ের মধ্যে এক বাঙ্গালী সাধুর সহিত একদিন একটা চটীতে আমাদের দেখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুপুত্রের অনুসন্ধানে বদরিকাশ্রমে যাইতেছিলেন। ইনি সেই বাঙ্গালী বাবাজী। বৃন্দাবনে হাজার হাজার আশ্রম কুঞ্জ আছে; হাজার হাজার বাঙ্গালী এখানে বাস করিয়া থাকেন। আমার যুবক বন্ধু তাঁহাদের মধ্যে আর কাহারও কুঞ্জে আমাকে পাঠাইলেন না, পাঠাইলেন আমারই পরিচিত এই সাধুর আশ্রমে! আমার যে তখন কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব।

গাড়োয়ান ভাড়া না লইয়া চলিয়। যাইতেছে দেখিয়া আমি তাহাকে ভাড়ার টাকা দিবার জন্য ডাকিলাম। সে বলিল, সে ভাড়ার টাকা মথুরায় পাইবে, চৌবে বাবুজী তাহাকে ভাড়ার টাকা লইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি ত অবাক! চারিদিক হইতে আমার মত পাপীর উপর এ ভাবে অযাচিত কৃপা বর্ষিত হয় কেন? কি জানি কেন?

এবার এই স্থানেই আমাকে চুপ করিতে হইতেছে। বাজে বকুনিতেই স্থান জুড়িয়া যায়। কি করিব বলুন। যদি বলিবার মত করিয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে পরে একবার চেষ্টা করিব, নতুবা এই স্থানেই বিদায়।

শ্রীজলধর সেন।

আমার শিল্প

শীত কাটিয়া গেল, বসন্ত আসিল। বসন্ত বাতাসে আবার সেই তিরোহিত পরিমল। ধরণীর সঙ্গে আবার সেই পরিত্যক্ত আভরণ। কুসুম কলিকাতে আবার সেই উপভুক্ত শোভা। শিশুর বদনে আবার শৈশবের প্রথম হাসি, যাহা মিলাইয়া গিয়াছে। যুবকের প্রাণে আবার প্রথম যৌবনের অরুণ আশা, যাহাকে বিসর্জন দিয়াছে। শীতের অবসানে প্রকৃতি বেশ পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু এ পরা পোষাকে আমাকে আর মুগ্ধ করিতে পারিলেন না। বসন্ত সমীরণ একদিন এ জীবনে বহিয়াছিল, সে বাতাসে কত সোনার স্বপন ভাসিয়া আসিল, স্বপ্নঘোর-চক্ষের ধরিত্রী সুন্দর দেখাইয়াছিল, কিন্তু আজ এই বহা বাতাসে আমার মোহ আসে না। বিশ্বছবি তেমন সুন্দর হইয়া আমার নয়নে ভাসে না।

কিন্তু সে রঙ্গীন আভা না আসিলেও এ বাতাসে এক সম্ভাবনী শক্তি আছে। এ বাতাস সুখে হোক, দুঃখে হোক, চেতন অচেতন সকল পদার্থকে জাগাইয়া তুলিতে জানে। সকলকে ক্লীবতা পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আমিও আজ উত্তিত হইয়াছি।

আমি মরি নাই। আমি যেন গতবর্ষের একটি শুষ্ক পত্রের ন্যায় সরোবরপ্রান্তে পড়িয়া ছিলাম। যেন আমার প্রাণ অঙ্গারস্থিত প্রচ্ছন্ন অগ্নিকণার ন্যায় আমার মধ্যে মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। বসন্ত ঋতুর আবাহনে সবাই জাগিয়াছে, তাই আমিও জাগিয়াছি। তাহার। বসন্ত উৎসবে মাতিতে উঠিয়াছে, আমি দুঃখ লইয়া বেদনাতে জাগিয়াছি।

আজ যেন কোন মহাপুরুষের বোধনের নিমিত্ত কোন মহাসভায় বহুবিধ রাগিনীর আলাপ সূচনা হইতেছে। আমি যেন বীণার ছিন্ন-তন্ত্রী ন্যায় সুরভ্রষ্ট হইয়া একপার্শ্বে পড়িয়া আছি। উৎসব বাজের নহবদে আমার তান মিলাইতে পারিলাম না।

তাই আজ একপ্রান্তে এই শিলাতলে উপবেশন করিয়া জীবনের পূর্বকাহিনী অনুরাগভরে কল্পনা করিতে করিতে প্রাণ করুণরসে সিক্ত হইয়া আসিল। একটি পূর্বশ্রুত সুর কাণে বাজিতেছিল—

কিসের কুহকে মন
মরণের বিমোহন
ছায়া করে আলিঙ্গন

আবেগ ভরে।

সাধ কি হবে পূর্ণ,
পরাণ যে শক্তিশূন্য,
আশারে করেছি চূর্ণ

নিরাশার ভারে!

এমন সময়ে অভ্যন্তর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—কেন কঁাদ ? যাহা কালসাগরে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ছায়াময়ী কল্পনার দ্বারা কি জীবনসমস্তার ভঞ্জন হইবে ?

আমি কেন কঁাদি ! শুনিবে কেন কঁাদি ? আমার প্রাণের রূপ দেখিতে পুনরায় সাধ হইয়াছে। কুসুমে কমনীয়তা আছে, কোকিলে কুহস্বর আছে, সলিলে স্বচ্ছতা আছে, সমুদ্রগর্ভে মুক্তা আছে, আকাশে নক্ষত্র আছে, বসুন্ধরায় সম্পদের অভাব নাই ; এত থাকিতেও এ প্রাণের দর্পণ মিলিল না, তাই এ ক্রন্দন। প্রাণের স্বরূপ মিলিল না যদি, তবে কেন বিশ্ব অসুন্দর হইল না। কেন বা চির শ্রান্তিবোধ আসিল না, বিরাগ জন্মাইল না ! কই, তাহা ত হইল না !

আজও কেন তনু মম ঘোবনেতে ভরা,
শ্যামল-পল্লব-লতা-প্রস্ফুটিত ধরা !
পূর্ণিমা রজনী কেন, আকাশে টাঁদিনী,
কুলুস্বরে কেন বহে অদূরে তটিনী !

তারা দেখিয়া দেখিয়া নয়ন আজও দৃষ্টিরহিত হয় নাই, কুসুমের কমনীয় পরশে অঙ্গ অবসন্ন হয় নাই, নারসিসাসের (Narcissus) মতন স্বচ্ছ স্বভাবদর্পণে আপন প্রতিবিশ্ব দেখিতে দেখিতে আপনাকে ক্ষয় করিতে পারি নাই। হতাশনে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বানলে আপনাকে দগ্ধসাৎ করিতে পারিলাম কই? অবিনাশী অমর আমি। অনন্ত জীবন সম্মুখে। অনন্ত পিপাসা প্রাণে। আমার অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডার কোথায়? অনন্ত দ্রষ্টা আমি, আজীবন দেখিব কাহাকে? অনন্ত জ্ঞাতা আমি, আমার অনন্ত জ্ঞেয় কই?

যद्यপি বিনষ্ট হইলাম না, তবে প্রাণের স্বরূপকে স্থায়ী করিতে পারিলাম না কেন? নতুনা প্রাণের রূপ দেখিব কেমনে? প্রাণের প্রতিকরূপকে নির্বাতনিকম্প দীপশিখার ন্যায় ধরিয়া রাখিব কি প্রকারে? প্রাণময়ের স্থিতিস্থাপকতা ঘুচিবে কিসে? প্রাণ থাকিতে ধৃতি কোথায়?

কৈলাসে মহাদেবও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, রূপবাসনা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু মহাপুরুষ মূর্ত্ত বাসনার প্রতিকরূপ মনসিজকে চিরতরে ভস্মীভূত ও আত্মরতিকে অনাথা করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। মধ্যযুগের দান্তকবি (Dante) দান্তেরও প্রাণকে জানিবার সাধ হইয়াছিল। তিনি স্বর্গের (Beatrice) বিয়াট্রিস কল্পনা করিয়া অপার্থিবে পার্থিব তৃষ্ণা মিটাইলেন। কিন্তু কৈলাসের সে যোগবল, মধ্যযুগের সে কৌশল, আজ কোথায়? ধ্যানে বা অপার্থিব কল্পনায় প্রাণের রূপ দর্শন করিয়া থাকিতে পারি কৈ? আজ এ যুগের যাত্রীদের সে প্রাচীন মার্গ রুদ্ধ হইয়াছে। এখন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ ঘটিলে আমরা শান্তিভঙ্গ করি, প্রত্যক্ষ ও কল্পনায় সংগ্রাম বাধিলেই বিগ্রহের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলি। আর আমরা অসত্যের সহিত রক্ষা করিতে রাজী নই। সর্বসত্যকে, সর্বদেবতাকে, আমরা ইচ্ছাময় রূপে জানিয়াছি। আজ আমিই বিশ্বের কেন্দ্র। বিশ্বে লীন হইতে পারি না। আকাশের চাঁদ যেমন

কিরণধারা বিস্তারে শূন্যের সকল দিক, সকল প্রান্ত, ছাইয়া ফেলিলেও শূন্যে বিলীন হইতে অসমর্থ।

এই বিশ্বরূপ ও আত্মচৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ অনির্বচনীয়। কৃষ্ণপক্ষে অঁধার রাতে খছোতপুষ্পের সন্তরণ দেখিয়াছ কি ? মনে কর সেই ঘোরতমসচ্ছন্ন খছোতসকুল শূন্যসাগরই বিশ্বরূপ, ও অগণন খছোতের প্রত্যেকটিই যেন সেই অঁধার সাগরে সন্তরণকারী জীব। খছোতের দেহনিঃসৃত তেজঃপদার্থ যেন জীবের চৈতন্য। মাঝে মাঝে খছোত জ্বলিয়া উঠে ও আপনার প্রদীপ্ত প্রাণের আগুনে স্বসত্তা ও স্বাধারকে একাকার করিয়া দেয়। আবার অগ্নি নির্বাপিত হইলে, ক্ষুণ্ণ হইতে পুনরায় খছোতে পরিবর্তিত হয়। অথবা বাষ্পীয় পোতের চক্র যেমন মগ্নোপ্ত হইতে হইতে সমুদ্রের ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া চলিয়া যায়, বিশ্বরূপ ও জীবচৈতন্যের সম্বন্ধও সেইরূপ।

হে আমার বিশ্ব, একদিন জ্বলিয়া উঠিয়া তোমার সহিত একাকার হইয়াছিলাম। সেদিন যেন আকস্মিক উল্কাপাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অলোকময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কই, সর্বদা ত জ্বলিতে পারি না। প্রাণের আগুন যে ক্ষণে ক্ষণে নিবিয়া যায়। না জ্বলিলে তোমার সহিত মেশা যায় না। আজ প্রাণের আগুন নিবিয়া গেছে। তাই অঁধারে ফিরিয়া আসিয়াছি। তাই তুমি ও আমি উভয়েই অঁধারে। সেই ভাল। অঁধারে থাকিয়া আলোকের মহিমা বোঝাই ত ভাল। সব যদি অলোকময় হয়, অঁধার থাকিবে কোথায় ? অঁধার না থাকিলে জ্বলিবে কে ? চক্ষু ফুটিবে কার ? হে বিশ্ব, তোমার অঁধার রাতে খছোত যদি বারে বারে জ্বলিয়া না উঠিত, তবে অমাবস্তার নিশাকে আলোক প্রদান করিত কে ? শুধু আগুনে চলে না, ইন্ধনও চাই। শুদ্ধ প্রেম উদ্দীপক অভাবে অনাথ হইয়া কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায় ? প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়-সংঘর্ষণে, মান অভিমানের অভাবে প্রেম কোথায় অবস্থান করে ? সূর্য্যের কিরণ

যদি তুমি-মণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরকে চুম্বন না করিও, তবে বর্ণ-ভঙ্গিমা কোথায় ফুটিয়া উঠিত ?

এই বর্ণ-ভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। এই যে ভগবান্ অক্ষয় সংসার পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই যে ভবের হাট বসিয়া গিয়াছে, এই যে বিচিত্র রঙ্গ বেরঙ্গ মেলা, ইহা কবে, কোথা হইতে আসিল ? কেমনে এক অনির্বচনীয়, অবর্ণ, অরূপী, লোহিত-শুভ্র-কৃষ্ণরূপে প্রতিভাসিত হইল ? যেমন সমাস্তুরাল সমান আয়তনের দুইখানি দর্পণের মধ্যে কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলে, সেই ব্যক্তির আকৃতি একখানি দর্পণে প্রতিবিস্তৃত হয়, পরে দর্পণগত বিশ্ব অপর দর্পণে প্রতিফলিত হয়, এবং এই বিশ্ব-প্রতিবিশ্বের প্রতিভাস-ক্রিয়া অনন্ত ধারায় অনন্তকাল চলিতে থাকে, ভগবান্ ও জীবের ভবলীলাও কি সেইরূপ ?

আজ আমি এই দর্পণে নিজের প্রাণের প্রতিক্রম দেখিতে চাই। আমার প্রাণের রূপ মিলিল না বলিয়া আমি কঁাদি।

আমার প্রাণের রূপ দেখিতে আমার সাধ হইয়াছে। কেন, সে রূপ কি আমার মুখচ্ছায়ায়, অঙ্গকাস্তিতে প্রকাশিত নয় ? আমার আকৃতিতে, অঙ্গসৌষ্ঠবে অঙ্কিত নহে ? তাই যদি হয়, তবে একখানা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই ত সব গোল চুকিয়া যায় !

কিন্তু কই, তাহা ত হয় না, নয়ন নিজের রূপ দেখিয়া তৃপ্তি পায় না। নয়ন কখনও পশ্চাদ্দর্শী নয়, আনতপল্লবও নয়, সদাই সম্মুখদর্শী। বর্তমানের বেষ্ঠনী ? এ জীবনে যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, সমাজের যে রীতি-নীতি, সংস্কার প্রণালীতে বদ্ধিত হইয়াছি, আমার সমসাময়িক ভাবশ্রোত যাহা রক্ত-প্রবাহের ন্যায় অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছে, সে সকলই ত আমার অন্তর্গত ? অতীতের ইতিহাস ? আমিই ত অতীতের প্রতিনিধি, সেই অতীতের আশ্রয় ত আমারই কল্পনা, আমারই স্মৃতি ? তবে তাহাতে আর জ্ঞানিবার আছে কি ? দেখিবার আছে কি ? যাহা দেখিয়াছি, তাহা

আর দেখিব না; যাহা শুনিয়াছি, তাহা আর শুনিব না। সে যে নিজেরই উপাসনা, নিজেরই ভজনা। নয়ন অপরের নয়নে, অন্তর অপরের অন্তরে, আপনাকে প্রতিবিস্তিত দেখিতে চাহে। কেবল প্রকৃতিদর্পণ, কেবল অতীতের স্ফটিক গোলক লইয়া চলে না। প্রত্যেকেই তাহার স্বজাতির রূপে আপন স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। তাই স্বজাতির সহিত না মিলিলে প্রাণের রূপ দেখিব কেমন করিয়া ?

বসন্তের ফুল ফোটে ও বরিয়া পড়ে, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য মাসের পর মাস, বরষের পর বরষ, আসে যায়, সৌরজগতের পর সৌরজগত জলবুদ্বদের ম্যায় উঠে, ভাসে ও মিলায়। কিন্তু এ আবর্তও এক চিরন্তন ধারার অন্তর্ভূত। অনাদি অনন্ত কালপরম্পরায় যে ধারা আছে, মাস, ঋতু, বর্ষ তাহারই অঙ্গ। বসন্তের ফুল তাহারই অলঙ্কার। আমি কোন্ ধারা হইতে অংশে অংশে নিত্য নূতন বেশে গমনাগমন করিতেছি ? আমার ধারা কোথায় !

প্রাণই প্রাণের স্বজাতি। তবে প্রাণবিশিষ্টের সমষ্টিই কি আমার ধারা ? কে সে বিশ্বপ্রাণ ? কোথায় সে প্রাণময় ?

সাংখ্য দর্শনে বলে যে, একই শক্তি বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া, পরে সেই বুদ্ধি-প্রতিবিস্তিত চেতনের প্রেরণায় সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ করে ও ক্রম-নিয়মানুসারে অণু-পরমাণু, তৃণলতা, কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী প্রভৃতির ভিতর দিয়া সর্বশেষে মানব দেহে প্রাণের প্রাণরূপে অবস্থান করে। এবং পুনরায় স্বভাবের নিয়মে বিপরীত ধারায় জড়ে পরিণত হয়। মানব সেই মহাশক্তির আবর্তনে আদি ও অন্তের সংশ্লেষস্থল। জানি না কোন্ শ্রোতে কোন্ পথে ভাসিয়া আসিয়াছি, তবে একদিন আমার জাগ্রত চৈতন্য বিপরীত গতিতে, সেই প্রাণময়ের সন্দর্শনে মম্বমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল। সাংখ্য যোগে যাহাকে “প্রকৃতিভয়” বলে, আমার কি সেই যোগাবস্থা ঘটিয়াছিল ? না—সেদিন প্রকৃতি আমায় গ্রাস করে

নাই। প্রাণময়েই প্রাণ লয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে নয়। আমারও তাহাই ঘটিয়াছিল।

আজ সেই অভলম্পর্শ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছি। আজ বন্যাস্রোতে ভাসমান হইয়া কিনারায় ঠেকিয়াছি, এই মাত্র পারে উঠিয়াছি।

সম্মুখে দেখি নূতন জগত, যেন এক বিরাট হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে। এই বিরাট প্রাণিসমষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া এ কোন্ মহাপ্রাণী কালপথে মহাযাত্রা করিয়াছে? এই মানব ইতিহাসের ধারা, কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় চলিতেছে? বোমমার্গে ঐ তারকামণ্ডলের ধারা, আর মর্ত্তে এই সমাজ-জীবনের ঐতিহাসিক ধারা। ইহাই মহাপ্রাণের প্রশস্ত পথ! আমি এই মহাযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই দিশাহারা, বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম।

আজ বুঝিতেছি, এই বিচিত্র বিশ্ব-ধারার সহিত অন্তরের আদর্শের সামঞ্জস্যে দর্পণদ্বয়গত প্রতিনিম্বপরম্পরার ন্যায় একটি জীবন-ধারা সৃজন করিতে হইবে। এমনি করিয়াই বিশ্ব-দর্পণে প্রাণের রূপ প্রতিফলিত হয়, ও এক অখণ্ড অনন্ত ধারা সৃজন করে। ইহাই প্রাণের শিল্প-কৌশল। এতদিন বসিয়া বসিয়া স্বভাব-লীলা দেখিলাম, আজ আর রঙ্গাভিনয়ে দর্শক নহি। আজ আমি অভিনয়ে সূত্রধার। অথবা আজ আমি শিল্পী। ভাসিতে আসিয়াছি। ভাসিয়া গড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আজ এই ভগবদন্তু বিশ্বস্তূপের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি, ইহা দ্বারা কোন্ অপূর্ব বস্তু রচনা করি। চিত্রকর পটে রং ফলাইবার জন্ত তুলি ধারণ করেন। ভাস্কর খনিজ পদার্থ দিয়া মূর্ত্তি গঠন করেন। আমার এই অভিনব শিল্পে অচেতন পদার্থ উপকরণ নয়। বিশ্বপ্রাণই আমার উপাদান। আমি এই চেতন পদার্থ দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিতেছি, তাহা কেহ দেখিবে না, কেহ বুঝিবে না, তাহার রস কেহ উপভোগ করিবে না। আমি সাকার পদার্থ দিয়া নিরাকার গড়িয়া তুলিতেছি। তাহা বিশ্ব-মানবের জন্ত

নহে। তাহা বিশ্বপতির স্থপত্যাগারে এক কোণে স্থান পাইলেই আমার শিল্পচেষ্টা সার্থক হইবে।

রসই শিল্পীর প্রাণ। কিন্তু এই রস, এই প্রাণ, যে নিরাকার। শিল্পী যখন তাহার শিল্পবস্তুটিকে গড়িতে থাকে, তখন সে ত রসের কথা, প্রাণের স্বরূপ, একেবারেই ভাবে না, ধ্যান চক্ষেও দেখে না। সে যে জ্ঞানাক্র। চিত্রকর ও রং যে আলাহিদা, চিত্রকরের সে জ্ঞানও থাকে না। সে শুধু ঐ রংএর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং নানা রং লইয়া মিলাইতে থাকে; কখনও সাদা, কাল, লাল, কখন নীল, সবুজ, হলুদে, কখন মেটে, কমলা, গোলাপী, আর এই মিলাইতে মিলাইতে, পটের উপর তুলি দিয়া অঁচড় কাটিতে থাকে, অঁচড়ের পর অঁচড়, টিপের পর টিপ, ও এইরূপে আগে দেহের কাঠাম তারপর মুখ ও পরে হাত পা যোগ করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে চোখ নাক ফুটাইয়া তুলে, ও অবশেষে কেমন ক'রে কোথা হ'তে এক ছন্দোবদ্ধ পূর্ণাবয়ব মূর্তি ওই পটের উপর প্রাণময় হইয়া জাগিয়া উঠে। আমিও আজ নানা রং মিলাইয়া এক নূতন রং সৃষ্টি করিতেছি। তাই আমাকে রংএর সহিত রং সাজিতে হইবে। রঙ্গীন্ না হ'লে রং-রাণী হইব কেমনে? এই জগতের সকল রং লইয়া সাদা ও কাল, মেটে ও উজ্জ্বল, সৎ ও অসৎ, কুৎসিত ও সুন্দর, সকল রংএ আমার রং মিলাইয়া, সকল রাগ আমার রক্তে রঞ্জিত করিয়া, এক অভিনব চিত্র-কলা সাধন করি।

তাই বলি বর্ণ-ভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। শুধু আমি রঙ্গীন্ নই। সৃষ্টিও যে লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণরূপা। চিত্রকর যেমন চিত্রের রং'এ রং'এ প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিশ্ব-ছবির বর্ণে বর্ণে, রেখায় রেখায়, নীলে সবুজে, সাদায় কালোয়, ফিকে ঘোরে, মেটে উজ্জ্বলে, সেই শিল্পী রংএ রং মিলাইয়া আছেন। তিনি যে রংরাজ।

মন, কর সেই শিল্পের সাধন। একদিন এই শিল্প সাধনা করিতে করিতে এমন এক মুহূর্ত আসিবে, যখন

বিশ্বকর্মা স্বয়ং মূর্তি ধারণ করিয়া আমার শিল্প প্রদর্শনীর উপস্থিত হইবেন। তখন আমার শিল্পাগারের কাজ হইতে অবসর মিলিবে। সেই দিন এই ভাঙ্গাগড়ার ভার, এই গড়িয়া ভোলার ভার, সেই বিশ্বশিল্পীর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিব। তিনি ভাঙ্গিতে থাকুন, গড়িতে থাকুন, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এই বিশ্ববাহু রচনা করিতে থাকুন। আমি কেবল বসিয়া বসিয়া সেই বিশ্বকর্মার হাতের কোণল দেখিব।

তাই আজ বিশ্বস্তূপের একপার্শ্বে বসিয়া ভানিতেছি, ইহার দ্বারা কোন অপূর্ণ শিল্পবস্তু রচনা করি !

শ্রীমরযুলা দাসগুপ্তা।



নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা

পৌষ, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। ফাঁকা	...	১১৯
২। অন্তর্ধামী (কবিতা)	...	১২৯
৩। বুদ্ধ-ধর্ম	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৩৩
৪। ভাষার কথা	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১৪৬
৫। “ডালিম” (গল্প)	...	১৫৯
৬। শক ও শকাব্দ	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	১৭২
৭। শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১৮৫
৮। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পূর্ব-কথা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল	২০১
৯। বিশ্ব-দর্পণে (কবিতা)	শ্রীমতী গিরিজামোহিনী দাসী	২১২

কার্যালয়—১৪৮ নং রসা রোড (সাউথ), কালীঘাট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাণ্ডল সমেত ৩।০ টাকা।

এই সংখ্যার নগদ মূল্য ১।০ আনা, ডাক মাণ্ডল ২।০ আনা।

বিজয়া প্রেসে, ২০ নং পটুয়াটোলা লেনে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

১ম বর্ষ—২য় সংখ্যা]

[পৌষ, ১৩২১ সাল

ফাঁকা

চল্ চল্ চল্, সাম্নে চল্।

চলাই আমার ধর্ম্য। তাই ক্রমাগত চলিতেইছি। নদীর স্রোত যেমন বহিয়া যায়, শূন্যে বায়ু যেমন অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে, সময় যেমন আর ফুরায় না, তেমনি আমারও আর চলার শেষ হয় না। কিন্তু ইহারা অবিরাম একভাবেই চলিয়া যায়; আমি তাহা পারি না। আমি চলিতে চলিতে এক একবার থামিয়া লই। কাব্যের ছন্দে ছন্দে যেমন যতি, রাগিণীর তালের পর সম, হৃৎপিণ্ডের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে একটি বিরাম, আমার গতিতেও তেমনি এক একটি অবকাশ। তাই আমি থেকে থেকে থেমে থেমে চলি। নহিলে আমার তাল কাটিয়া যায়।

কিন্তু কবিতাটির বঙ্কার আশ্বাদ করিতে যেমন তাহার স্বরবিষ্ঠাস ও যতি গুলিকে ছন্দের সুরে গাঁথিয়া লই, গানের সুরটি আয়ত্ত করিতে হইলে যেমন তাহার স্বরপরিম্পরার এককালীন মানস অনুভূতি আবশ্যক, সেইরূপ জীবনটিকে পূর্ণ করিয়া পাইতে হইলে তাহার গতি ও অবকাশগুলিকে মিলাইয়া বুঝিতে হয়। তাই আজ আমার জীবনের গতি ও অবকাশগুলিকে মিলাইয়া দেখিতে বসিয়াছি। এই গতি ও অবকাশ উভয়ই যে আমার জীবনের অঙ্গস্বরূপ।

যখন হইতে চলিতে শিখিয়াছি, তখন হইতেই একটু জ্ঞানের আভাস আসিয়াছে। কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই আমার একটা মস্ত অবসর ছিল। এবং সেই অবসর ছিল মাটির মত অসাড়, আকাশের মত অবাধ, অনন্তকালের মত স্থির। আর সেই তল-হীন অসাড়তার অতলে, সেই চির অঁধারে, আগুন যেমন চক্ষ-মকির ঘর্ষণের অপেক্ষায় অথবা তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশিলা যেমন সূর্য্যোদয়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে, আমার প্রাণশক্তিও সেইরূপ নিয়তির ভবিষ্যবাণীর প্রতীক্ষায় নিঃসাড় অকালনিদ্রায় মগ্ন ছিল। কিন্তু একদিন সেই অকাল-নিদ্রার অবসানে চৈতন্য কালজ্ঞানরূপে ভাসমান হইল, তথাপি জড়তার খনিতে যাহার উৎপত্তি তাহার জড়তা দূর হইল না। সে আপনাকে কিছুকাল সর্ববর্ষের অতীতে রাখিয়া শুধু মূক সাক্ষীরূপে অবস্থান করিল। কক্ষ হইতে অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন বিনা কাজে বৃষ্টি উপভোগ করিয়া থাকেন, সেও সেদিন একপার্শ্বে বসিয়া বিশ্বের কৌতুকময় বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া রহিল।

কে বলিবে কেমনে সেই চিরপুরাতন জড়তায় শক্তির আবেশ আসিল। দেখিতে দেখিতে দূর হইতে এক কল্লোলময় প্রবাহ আসিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই শূন্য জড়রাজ্যকে যেন এক উদ্বেলিত কারণসাগর করিয়া তুলিল। সেই কত যুগের অলীক স্বপ্ন, সেই অঘোর ঘুমঘোর, তমসার আবেশ, কোথায় ভাসিয়া গেল। এবং সেই কারণসাগর হইতেই ‘আমি’র উদয় হইল। কে যে আমাকে “আমি আছি” বলিতে শিখাইল জানি না, কিন্তু সেদিন আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞারে বলিয়া উঠিলাম “আমি আছি”।

তখন দেখি আমারও সেই প্রবাহের দ্বায় ছুটিয়া চলিবার শক্তি আছে। আমি এখন চলিতে আরম্ভ করিলাম। এবং আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ও আকাশের বিভাগ হইল, মাটিতে কত নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হইল, আকাশ সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্ররাশিকে বুকে

করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল, আর সময় খরচের হিসাব না রাখিয়া দৌড়াইতে লাগিল। গিরি-কন্দর-বহির্ভূত নবীন প্রস্রবণের শ্রাব্য আমিও আমার স্বচ্ছ প্রাণটির সহিত নানা ছলে নানা কৌশলে খেলিতে খেলিতে ছুটিতে লাগিলাম। নদীর স্রোত বহিতে বহিতে সাগর-সঙ্গমে প্রাণ হারাইয়া ফেলে; আমি কিন্তু লীলা করিতে করিতে মধ্যপথে আসিয়া ঠেকিয়া গেলাম। সেদিন আমার সকল শক্তি—যাহা সেই শক্তি-প্রদায়িনী ধারা হইতে অর্জন করিয়াছিলাম—তাহা সব নিঃশেষ হইয়া গেল। জলাভূমিতে মরাগানের শ্রাব্য আমি সেই মধ্যপথে প্রাণ হারাইলাম। আমার চলা বন্ধ হইলে, সেদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে সকল পার্থিব বস্তুর গতির রোধ হইল। আকাশেরও ঘোরা বন্ধ হইয়া গেল। এই হইল আমার গতিতে প্রথম বিরাম, জীবনে প্রথম অবকাশ।

আমি থামিয়া রহিলাম। বীজটি রোপণ করিবার পর অন্ধুর হইয়া দেখা দিবার আগে কিছুদিন মাটিতে থামিয়াই থাকে। ধানটি পাকিলে কাজে লাগিবার আগে অন্ততঃ কয়েক মাস কৃষকের গোলা ভরিয়াই থাকে। বাষ্প পুনরায় বারিধারা হইয়া বর্ষিত হইবার পূর্বে কিয়ৎকাল আকাশে অদৃশ্য হয়। তাই, বিশ্বে চেতন অচেতন সকল পদার্থে, এমন কি অণু-পরমাণুর মধ্যেও গতির পর বিরাম দেখা যায়। আর আমি যেমন সকল শক্তি খোয়াইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়াছিলাম, তাহাদেরও এক সময় আসে যখন হায়রাণ হইয়া তাহারা মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া যায়। আর সেই কারণেই মাটির এমন সৃজনী শক্তি, সে যে সকল শক্তির আশ্রয়স্বরূপ, লয়ভূমি।

আমার সেই শক্তি-প্রদায়িনী প্রবাহিণী, সে কোন শূন্যে থাকে ? সেই শূন্যে, সেই কারণ-সাগরে, না ডুবিলে শক্তি সঞ্চয় করিব কেমনে ? এ জগতে সবাই যেখান হইতে আসে সেখানেই ফিরিয়া যায়। সেই স্থানটি মূলধার। তাহাই বিরামভূমি। তাই বিরামের

পর সকল বস্তুই প্রাণময় হইয়া উঠে। তাই কাব্যের ছন্দে ছন্দে যতিই প্রাণ, তাই রাগিনীর তালের মাঝে মাঝে সমই সঙ্গীতজ্ঞের মাতন। আমার গতিতেও সেইরূপ অবকাশই শক্তি, অবকাশই মুক্তি।

কিন্তু এই বিরামের ক্রোড়ে কোথায় থাকি, কি ভাবে অবস্থান করি, তাহা আমার অনির্বচনীয়। যেন পাখীর ডিমের ভিতর থাকা। অথবা যেমন চিত্রটি অঙ্কিত হইবার পূর্বে চিত্রকরের কল্পনায় সেই চিত্রের চাক্ষুষ আভাস ভাসে ভাসে—ভাসে না, অথবা রচনাটি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে লেখকের কাণে তাহার সুরটি বাজে বাজে—বাজে না। আমার অবকাশগুলিও ঠিক সেইরূপ। যেন শক্তির বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে। সেই অবসর হইতেই আজ আমি পুনরায় চলিবার শক্তি পাইয়াছি।

“চল্ চল্ চল্, সামনে চল্”।

অবসর কাটিয়া গেল। আমি সেই শূণ্যের মাঝে হইতে ভাসিয়া উঠিলাম। এখন আমি কেবলই ভাসিয়া যাইতেছি। দূরে, দূরে, আরও দূরে। ক্রমেই আকাশের পর আকাশ পার হইয়া ভাসিয়া যাইতেছি।

অনাদি কাল হইতে এই শূণ্যের মাঝে পথ কাটিয়া কাটিয়া, কোথায়, কোন আদর্শের কল্পনা লইয়া চলিতেছি! শুধু আমি নয়; আমার বিশ্বগোলকও আমাকে যুগে যুগে অনুধাবন করিতেছে। কিন্তু কই আদর্শের রহস্য খুঁচিল কই? দিনে দিনে ত আদর্শ বাড়িয়া যাইতেছে। জ্ঞান যতই বাড়িতেছে, আদর্শের রহস্য ততই জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে।

যেমন দ্রষ্টা কোনও স্থান অধিকার করিয়া চতুর্দিকে যতদূর দেখে তাহাই তাহার দিগ্‌মণ্ডল। সে যদি উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়ায়, তবে তাহার দিগ্‌মণ্ডলের আয়তন পূর্বের তুলনায় প্রসারিত হয়। কিন্তু দ্রষ্টা পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া দেখে, পৃথিবীকে ছাড়াইয়া যায় না। তাই সে পূর্বে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা এখন যাহা

দেখিতেছে তাহার অন্তর্গত হইয়া থাকে। তাহার দিগ্‌মণ্ডলের সীমানা বৃহত্তর হইলেও, সেই পূর্বদৃষ্ট বৃত্তের সহিত একই সম-
তলের অন্তর্ভুক্ত। আমার কিন্তু তাহা নয়। যদিও আমার
আকাশ দিনে দিনে বাড়িয়া যাইতেছে, তবু আমি যাহা পূর্বের
দেখিতেছিলাম এখন আর তাহা দেখি না;—আমি ক্রমেই উর্দ্ধ
হইতে উর্দ্ধতরে উঠিতেছি। ধরাতল আমার পদতল হইতে খসিয়া
- যাইতেছে। বায়ুস্ফোপ যন্ত্রের পরতগুলি যেমন এক একটি করিয়া
চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, সেইরূপ কত বিচিত্র দৃষ্টাবলী
ভাসিয়া গেল, কত ক্ষেত্র, কত অরণ্যানী, কত নদী, কত হ্রদ, কত
উপত্যকা, কত অধিত্যকা, কত শিখরের পর শিখর, বায়ুমণ্ডলের পর
বায়ুমণ্ডল, কত গোলকের পর গোলক, আমার দৃষ্টি হইতে সরিয়া
গেল। কত সৌরজগতের পর সৌরজগৎ, কত তারকামণ্ডলের পর
তারকামণ্ডল, একে একে পার হইয়া কোথায় উঠিতেছি। কত
লোকের পর লোক, স্বর্গলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক সেই সপ্ত-
লোক অতিক্রম করিয়া আসিলাম। কত আলোক অঁধার, অঁধার
আলোক, কত রং বেরং, সেই শুক্ল লোহিত কৃষ্ণ, সেই লোহিত কৃষ্ণ
শুক্ল, সেই কৃষ্ণ লোহিত শুক্ল, কতবার কতভাবে মিলাইয়া যাইতে
যাইতে যেন আজ সব সাদা, ফাঁকা হইয়া আসিতেছে।

এই ব্যোমমার্গই কি সত্যাদর্শের পথ? আমি আজ সেই
পথেরই পথিক, কিন্তু কৈ এ পথ ত চলিয়া শেষ করিতে পারি
না! যতই উঠি না কেন, সে নিত্যধাম ত নিকাটে আসে না।
বালক যেমন মাঠে দাঁড়াইয়া অদূরে মাটি ও আকাশের সীমানা
দেখিয়া তাহার দিকে ছুটিতে থাকে, আমিও তেমনি যে আদর্শের
পিছে ছুটিয়া আসিলাম, আজ বুঝিতেছি সে স্থানে পৌঁছিবার শক্তি
আমার নাই। সে আদর্শ আমার জ্ঞানে একটি পরপারের রহস্য
হইয়াই থাকিবে। সে যে পরব্যোম, অনাদি, অনন্ত, ভূমা, তুরীয়,
আমার সকল শক্তি সকল জ্ঞানের অতীত। তাহাকে ত সীমানার

মধ্যে আনা যায় না, তাই সে যেমন তেমনি রহিল, মাঝ থেকে পৃথিবী ও বৈকুণ্ঠধামের ব্যবধানটাই বাড়িয়া গেল। পৃথিবী পাতাল হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। আর সেই বৈকুণ্ঠধাম মাঝের আকাশ ছাড়িয়া উজ্জ্বল উজ্জ্বল উঠিয়া গেল।

আমি নীচে ঐ পাতালে অঁধারেই ছিলাম। শুনিয়াছিলাম বৈকুণ্ঠধাম নাকি আলোকময়, তাই পাতাল ছাড়িয়া পাতাল ও বৈকুণ্ঠধামের মাঝখানে মর্ত্যে একটুখানি জায়গা দখল করিলাম। উপরের অজ্ঞেয় রহস্য ও নীচে পাতালের কথা ভাবিতে ভাবিতে দুঃখময়ের সেবায় কাল কাটাইতাম। কিন্তু সে মর্ত্যের টান ছাড়া হইয়া আজ যেখানে আসিয়াছি সেখান হইতে কিছুই দেখিতে পাই না। “আরও আরও আলোকের” আশায় এত পথ চলিয়া আসিলাম, কিন্তু কৈ আলোক ত পাইলাম না, এ যে অঁধার হ’য়ে এল। এখন দেখিতেছি যত আলোকের মেলা, যত রংএর ছটা, ওই মাঝ পথেই। মাঝপথ ছাড়িলে সব অঁধার।

আমি সেই মাঝপথ ছাড়িয়া আসিয়াছি। তাই আমার বিশ্ব-ছবি মুছিয়া গেল। সেই হরিদ্বরণ শোভা, সেই নীলাকাশ, সেই শুভ্রফেন অতল জলধি, কোথায় কোন শূন্যসাগরে মিলাইয়া গেল। আমার নয়নের দৃষ্টি ঘোলা হইয়া আসিতেছে। আমার বর্তমান সেই অনতীত অতীতের নিশায় মিলাইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের আশা একদিন প্রত্যক্ষ-জীবন বর্তমান হইয়া উঠিবে ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি বর্তমান শেষে অতীতেই মিলায়।

ইহাই জগতের নিয়ম। বীজ হইতে ফলের সৃষ্টি, কিন্তু ফলের পরিণতি পুনরায় সেই বীজে। ভাব হইতে ভাষা, কিন্তু ভাষার উদ্দেশ্য পূর্বজ্ঞ ভাবকে জাগাইয়া তোলা। অরূপ হইতে রূপের বিলাস, কিন্তু রূপের লয় সেই পুরা-তন অরূপেই। ইহাই বিলোম-গতি। এই বিলোম পথ অনুসরণ করিয়াই দেহী প্রাণ একদিন বিদেহ প্রাণময়ের রাজ্যে উপস্থিত হয়।

আমি ত এই পথেই আসিলাম। এখন দেখি যে প্রাণময়ের রাজ্য কাকা। আমি সেই কাকারাজ্যেই আসিয়াছি। সব আলোক আঁধার মিশাইয়া গিয়াছে। কোথাও ছায়ার লেশ মাত্র নাই, যেন উপর হইতে নিরাবরণ আবরণ নামিয়া আসিয়া আমায় ঘেরিয়া ফেলিল। এই কি পথের শেষ? চক্ষু বুজিয়া আসিল, হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে, সমস্ত শরীর কিম্ব কিম্ব করে। সেই যে আদিতে “আমি আছি” বলিয়া স্বেচ্ছায় স্থানটি অধিকার করিলাম, সে স্থানে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম কৈ? সকল আকর্ষণ বিকর্ষণের উপরে আমার যে একটি নিজের শক্তি ছিল, আজ সে শক্তি অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; আজ সে শক্তি অনাথা, এই টানাটানির ঝোঁকে নিজের টানটি হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি। আর পারি না, আর সামলাইতে পারিলাম না। এ কিসের করাল টানে শূন্য অন্ধরে উদ্ধার স্থায় পড়িতেছি। পড়িতেছি, ক্রমাগত পড়িতেইছি। গেলাম গেলাম বুঝি পাতালেই পড়িয়া গেলাম। কোথায় পড়িলাম কিছুই জানি না।

চক্ষু মেলিয়া দেখি, আমি যে মর্ত্যে আমি সেই মর্ত্যে। দিবালোকে আমি অন্ধপ্নের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

চল চল চল, সামনে চল।

কিন্তু কৈ এত পথ চলি স্বপ্নের ঝোঁক ত যায় না। যেন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিশিপাওয়া ব্যক্তির স্থায় পথ চলিতেছি।

চল চল চল, সামনে চল।

প্রত্যেক প্রাণীর চক্ষের অন্তরালে ভাসে এন্নি একটি আভাস, এন্নি একটি স্বপ্ন। কবে যেন একথানা বিশ্বদর্পণ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই প্রত্যেক জীব, সকল স্থাবর-জঙ্গমে, এক একটি খণ্ড আদর্শ বিকম্বিক করিতেছে। তাই আজ ভুবনে আদর্শের প্রতিভাস নানা; নানা ভঙ্গিমায় নানা রঙ্গিমায় বিচ্ছুরিত। চরমে যে বস্তুর সহিত যাহার সঙ্গমলিপ্সা, যে যাহাকে প্রবতানার

মত লক্ষ্য করিয়া তাহার কক্ষস্থিত গ্রাহের শ্রায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেই পরম বস্তুর আভাসই তাহার জীবনের আদর্শে প্রতিফলিত। সে আদর্শে ভালমন্দ বিচার নাই, সুন্দর কুৎসিতের বিচার নাই, সত্য মিথ্যা, শ্রায় অশ্রায়ের বিচার নাই। সে যে সকল বিচারের উপরে। গ্রহ যেমন মন্দোচ্চ গতিতে তাহার নিজ কক্ষে ভ্রমণ করে, আদর্শ-প্রতিভাসও সেইরূপ মর্ত্যদৃষ্টিতে কখনও উজ্জগামী, কখনও অধোগামী। সে কিন্তু উজ্জাধোবিভাগের বাহিরে। সে খণ্ড আদর্শ প্রত্যেক প্রাণে স্বতন্ত্র। আর জগতের আদর্শ সেই খণ্ড আদর্শের সমষ্টি বই কিছুই নয়। সকল তারকামণ্ডলই ত একটি কেন্দ্র-তারার অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। সেইরূপ মানবসমাজরূপী মহাপ্রাণীর লক্ষ্য হইল সকল জীবের লক্ষ্যসমষ্টির লক্ষ্যমাত্র। এবং সেই কারণে মনুষ্যচরিত্রে যাহা সম্ভব, মনুষ্যস্বভাব যে যে উপাদানে গঠিত, সে সকলই, অর্থাৎ ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, শ্রায় অশ্রায়, প্রণয় অপ্রণয়, আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সকলই এই ভগবৎ আদর্শের অন্তর্গত হইয়া আছে। বৈকুণ্ঠে ভগবান যাহাই হউন, বিশ্বের ভগবান, তোমার আমার উপাশ্র, মুক্ত পুরুষ নহেন। তিনি আমাদেরই মত, আমাদেরই সহিত,—নিরন্তর সিদ্ধির জন্ত সাধনা করিতেছেন! আর এই সিদ্ধির পথে উত্থান পতন আছে! তাই বিশ্বপথ ত সোজাপথ নয়। সে যে ভুজঙ্গগতি (curvi-linear), কুণ্ডলাকৃতি (spiral)।

এই সমষ্টিরূপী আদর্শই বিশ্বচক্রে স্বপ্নের শ্রায় ভাসিতেছে, কোন অলীক শিবসুন্দরের স্বপ্ন নহে। এই বাস্তব ভগবানই জগৎরূপী মহাপ্রাণীর জীবনের গতির কারণ। আর এই বাস্তব আদর্শ অনুধাবন করিতে করিতেই জগৎ দিনে দিনে নূতন মার্গে আসিয়া পড়িতেছে, কত নূতন তত্ত্ব, নূতন জ্ঞান, নূতন ইচ্ছা, নূতন শক্তি, নূতন প্রাণ, দিনে দিনে এই বাস্তব ভগবানে বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাই ঐতিহাসিক আদর্শ মার্গ।

চল্ চল্ চল্, সামনে চল্।

আমার চলায় জগৎও চলে। যেমন কোন নাবিক সাহসমাত্র সম্বল করিয়া আপন জাহাজে এক অজানা পথে উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরু অভিমুখে—যে দিকেই হউক, কোন এক দিকে মুখ রাখিয়া বরাবর সোজাসুজি যাত্রা করে; এবং সে যদি চিহ্নিত উত্তরেরও উত্তরে বা দক্ষিণেরও দক্ষিণে, কোনও নূতন দ্বীপ বা সাগর প্রণালী, কোনও নূতন উত্তম আশাপথ আবিষ্কার করে,—তবে তাহার ইতিবৃত্ত ভূগোল-ইতিহাসে সর্ববাদী সত্য হইয়া চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকে; এবং সেই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর মাটি ও জলের অংশও যেন কিয়ৎ-পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ আজ সেই শূন্যসাগরে ভাসিতে ভাসিতে যে দেশে আসিয়াছি, যে তত্ত্বভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাকে কি জগৎ তাহার তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান, বলিয়া গ্রহণ করিবে না? আমার জ্ঞান, আমার ভগবান, কি আজ জগতের জ্ঞান, জগতের ভগবান, হইবে না? আমার রহস্য কি জগতের রহস্য নয়? আজ আমি যেখানে আসিয়া থামিয়া গেলাম—এই জগৎও কি সেখানে আসিয়া থামিয়া গেল না? আমার বিরামে জগৎও কি বিশ্রাম লাভ করিল না?

আজ বুঝিলাম জীবনে অবকাশের মূল্য কি?—বসনে যেমন ছিদ্র টানা ও পড়েনের দরুন, কার্যে যেমন কারণ, সেইরূপ জীবনের গতিতে অবকাশ। সকল সৃষ্টির মূলেই এই অবকাশ, এই ফাঁকা রাজ্য। সকল ধাতু যেমন খনিতে, সকল তাপ যেমন বসুন্ধরার গর্ভে, সেইরূপ যত উৎপাদনী যত সৃজনী শক্তির মূল এইখানেই, এই ফাঁকে। শিল্পী এখান হইতেই রস সংগ্রহ করিয়া মাটিতে রসান দিয়া শিল্পমূর্তি গঠন করে। এই যে স্বভাব-শোভা, এই যে রাশি-চক্র, এই যে বিশ্বের রাসমণ্ডল, ইহা সব ফাঁকারাজ্যের রসেই গঠিত। এই ফাঁকা হইতেই যত আঁকাজোকা। এই ফাঁকা হইতেই কায়ার সৃষ্টি, নীরূপ হইতেই রূপের বিভ্রম। যাহা ব্যক্ত তাহার স্বরূপ অব্যক্ত, যাহা নির্বচনীয় তাহার মূলে একটি অনির্বচ-

চনীয়। যে ব্যক্তি হইতে অব্যক্ত, রূপ হইতে অরূপে না যায়, বাহার গতির পর অবকাশ না আসে, সে তবের সন্ধান পায় না, রসের স্বাদ জানে না। পরবোঝে যেমন অনাহত শব্দ আছে, তেমনি বাহ্য স্বপ্রকাশ তাহারও পশ্চাতে একটি শূন্য আছে। এই শূন্যটিই সৃষ্টি-স্থিতির সন্ধিস্থল। এই কাঁকার ভিতর দিয়াই যত যাওয়া আসা, যত নিঃশেষ করা ও ভরিয়া তোলা, যত আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ, যত জোয়ার ভাঁটা, যত আলোক অঁধার। এই কাঁকাটি না থাকিলে দুনিয়া কাঁক হইত। এই কাঁকার ভিতর দিয়াই আমি কেবলই যাওয়া আসা করিতেছি।

চল চল চল, সামনে চল।

শ্রীসরযুবালা দাসগুপ্তা।

অন্তর্যামী

[১]

এ পথেই যাব বঁধু ? বাই তবে বাই !—
চরণে বিধুক কাঁটা তাতে কতি নাই !
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল !
পথের তুলিব ফুল, কাঁটা ফেলি দিব,
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব !
শুন শুন গাহি গান পথে চলি যাব,
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব !
দরশন নাহি দিলে কাছে কাছে পে'ক
যদি ভয় পাই বঁধু ! মাকে মাকে ডে'ক !

[২]

তরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখান এই বনপথ দিয়া !
কত না সোহাগভরে তুলিতেছি ফুল,
কত না গরবে মোর হৃদয় আবুল !
কত না বিচিত্ররূপে পরাণ কাঁপিছে,
কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে !
কে যেন কহিছে কথা, হৃদয় মাঝারে
কে যেন অঁকিছে আলো নিশীথ অঁধারে !
কে যেন কি জানি যোরে করায়ছে পান
বাতাসে পত্রের মত মর্দরে পরাণ !

যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
 যেন কার গানে গানে ভরেছি জীবন !
 তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
 ভাবে ভোর তাই বঁধু বুদ্ধিতে পারিনি ।

[৩]

কেমন করে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর
 বুকের মাঝে কেমন করে চোখে বহে লোর !
 দিবস্নিশি কতই তব কথা শুনি কাণে
 প্রাণের মাঝে তোলাপাড়া মানে অভিমানে !
 পরশ্ তব স্বপনসম প্রাণে আনে ঘোর
 নিশাস্ তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর !
 তোমার প্রেমে এত জ্বালা আগে নাহি জানি
 চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি !
 ছেড়ে দাও'ত চলে যাই, তুমি থাক পিছে,
 দরশ্ যদি নাহি দিলে সোহাগ্ করা মিছে !

[৪]

কম অভিমান, বঁধু, কম : অভিমান
 অঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান !
 বাহু বাড়াইয়া দিলে কিছু নাহি পাই
 শূন্য মনে ভূমিতলে কাঁদিয়া লুটাই !
 বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা !—
 তবে ছেড়ে দিখু আজ ! কর গো রচনা
 আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও !
 পরাণের তারে তারে আপনি বাজাও !
 কাঁদিব না আমি আর কথা নাহি কব
 নয়ন মুদিয়া শুধু পথে পড়ে রব !

[৫]

কাঁদিব না মুখে বলি, অঁথি নাহি মানে
 পরাণে কেমন করে পরাণ্‌ই তা জানে !
 রাগ করিও না বঁধু অঁথি যদি করে,
 তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে !
 এত করে চাপি বুক তবু হাহাকার
 ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার বার !
 সে শুধু তোমারি তরে তোমা পানে ধায়
 তোমারে না পেয়ে, মোর বুকে গরজায় !
 এই অশ্রু, এই ব্যথা, এই হাহাকার,
 তুমি না লইবে যদি করে দিব আর ?

[৬]

মরম অঁধারে বঁধু প্রদীপ জ্বালাও !
 আমার সকল তারে বাজাও, বাজাও,
 আপনি বাজাও ! আমি কথা নাহি কব,
 নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব !

[৭]

কোন ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে
 এমন সোহাগভরে প্রদীপ জ্বালালে !
 ওগো ছায়ারূপী ! কোন ছায়ালোকে তুমি
 তুলিতেছ গীতধ্বনি হৃদি-তন্ত্রী চুমি
 মোহন পরশে ? আমি কথা নাহি কই
 বঁধু হে ! নয়ন মুদি শুধু চেয়ে রই !

[৮]

কোথা ওই ছায়ালোক, কোথা প্রাণখানি !
এই প্রাণ-প্রাস্ত হ'তে কতদূর জানি !
কতদূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই
অঁধারের মাঝে শুধু অঁখি মুদে চাই !
একি মোর মরমের অজানিত দেশ ?
এই প্রাণ-প্রাস্ত কিগো পরাণের শেষ ?
একি গো তোমার বঁধু গোপন আবাস ?
হোথা হ'তে মাঝে মাঝে দিতেছ আভাস ?
আমি'ত জানিনা কিছু তুমি সব জান,—
কোথা হ'তে এত করে মোরে তুমি টান !

বৌদ্ধ-ধর্ম

২। নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধধর্মের নির্ব্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয় ; এবং সেই সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন। মোটা-মুটি ধরিতে গেলে নির্ব্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তেমনই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকেনা ; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাটা, শুনিতে যত সোজা, ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল ; কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায় ? একেবারে ‘নিহিল’ হইয়া যায় ? একেবারে ‘এনিহিলেসন’ হইয়া যায় ? একেবারে ‘নাস্তি’ হইয়া যায় ? এই-খানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে ? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্ত ? এ ত বড় শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। এইজন্ত অনেক পাদরী সাহেবেরা বলেন বৌদ্ধেরা নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজেকে কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার ঘেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও, আবার তিনি ঠিক যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার ত কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই

রিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্বাণের পর কি থাকে। সুতরাং নির্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যেরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সে কথার কি জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত বৎসরের পর, কনিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিবার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিস্তা ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি। তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন :—

দীপো যথা নিবৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নাস্তরিক্ষম্ ।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শাস্তিম্ ॥
এবং কৃতী নিবৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নাস্তরিক্ষম্ ।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শাস্তিম্ ॥

“প্রদীপ যেমন নির্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যায় না ; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটিরও শেষ ; সাধকও তেমনই ভাবে, নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান

না, আকাশেও যান না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারও সব ফুরাইয়া গেল, সব শাস্ত হইল।”

এখানে কথা হইতেছে “উপৈতি শাস্তির্ম্”—‘সব শেষ হইয়া গেল’—ইহার অর্থ কি নিহিল ? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ ? অস্তিত্বের লোপ ? অশ্বঘোষও নির্বাণের পর আর কিছু থাকিল কি না, কিছুই বলিলেন না। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অশ্ব কথা পাড়িলেন। কিন্তু এই কবিতা দুইটির পূর্বে যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে, নির্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ, একরূপ বোধ হয় না। সে তিনটি কবিতা এই,—

তজ্জন্মনো নৈকবিধস্ত সৌম্য
তৃষ্ণাদয়ো হেতব ইত্যনেত্য।
তাংশ্চিহ্নি দুঃখাদ্বদি নিশ্চুম্ভা
কার্য্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়ান্তি ॥
দুঃখক্ষয়ো হেতু-পরিক্ষয়ান্ত
শাস্তং শিবং সান্নিকুরুষ ধর্ম্মম্।
তৃষ্ণাবিরাগং লব্ধনং নিরোধং
সনাতনং ত্রাপয়হার্য্যমার্য্যম্ ॥
যশ্মিন্নজাতির্জরো ন মৃত্যুঃ
ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রযোগঃ।
নেচ্ছাবিপন্ন প্রিয়বিপ্রযোগঃ
ক্ষয়ং পদং নৈষ্টিকমচ্যুতং তৎ ॥

“অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে ছেদ কর। যেহেতু, কারণের ক্ষয় হইলে, কার্য্যেরও ক্ষয় হইবে।

“এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি “ধর্ম্ম”কে প্রত্যক্ষ কর। এ “ধর্ম্ম” শাস্তিময়, মঙ্গলময়,

ইহাতে তৃষ্ণার উপর বিরাগ হয়, ইহা গুহার মত, ইহাতে সর্ববর্ধর্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

“ইহাই চরম ও অচ্যুত পদ । ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শত্রুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়-বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মতন জিনিস ।”

যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্বাণশব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই । তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্বাণের পর আর কোনরূপ পরি-বর্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না ।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্বাণের পর কি থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কি উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক । “নির্বাণের পর কিছু থাকিবে কি ?” বুদ্ধদেব বলিলেন “না” । “থাকিবে না কি ?” উত্তর হইল “না” । “থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা হইবে কি ?” বুদ্ধদেব বলিলেন “না” । “কিছু থাকা না থাকা এত্বেই বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইবে কি ?” আবার উত্তর হইল “না” ।

তবে দাঁড়াইল কি ? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় “অস্তি”ও বলিতে পারি না, “নাস্তি”ও বলিতে পারি না । এত্বেই জড়াইয়া কোন অবস্থা নয়, এত্বেই অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয় । ইহাতে পাওয়া গেল কোন অনির্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে ।

এই অবস্থাকেই মহাযানে “শূন্য” বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে । “শূন্য” বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায় । কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন “আমরা করি কি ? আমরা যে ভাষায় শব্দ পাই না । নির্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত । ঠিক কথাটি পাইনা বলিয়াই আমরা উহাকে

“শূণ্য” বলি। কিন্তু শূণ্যশব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। ‘অস্তিনাস্তিতদুভয়াশুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূণ্যম্’।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার তর্কপাদে শূণ্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “যাহাদের মতে সবই শূণ্য, তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কি করিব?” তিনি বৌদ্ধদের “বিনাশবাদী” বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা “অর্কবিনশন” অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেননা, নৈয়ায়িকেরাও বলেন, “অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তি”র নামই “অপবর্গ। সুখদুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা ত পাথর হইয়া গেল। তাই শঙ্করের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ গৌতম ঋষিকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন

মুক্তয়ে যঃ শিলাদ্বায় শাস্ত্রমুচে সচেতসাম্।

গৌতমং তমবেতৈব যথা বিখ্য তথৈব সঃ॥

অর্থাৎ যে গৌতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নামটী সার্থক হইয়াছে, তিনি গৌতমই বটেন—তাঁহার মত গুরু আর দ্বিতীয় নাই।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভাল। কেননা, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূণ্য হইলে ত কিছুই থাকিবে না।

যাহাহোক অশ্বঘোষ যে নির্ব্যাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্ব্যাণ একটি অনির্বচনীয় অবস্থা। শুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কার্ণট ট্রান্সেণ্ডেন্টাল বলিয়া গিয়াছেন? কেননা, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অনির্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করনা কেন?

কিন্তু অস্তি বলিলে, একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ “অহং” এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মূল, তাই রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরও কথা, আত্মা যখন রহিলই, তখন তাহার ত গুণগুণাও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও ত একটি গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবে না? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বুদ্ধদেব বলিতেছেন, “আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না”। তাঁহার প্রথম গুরু অরাড় কালামের সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে ইহারা বলে আত্মা দেহনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নির্ম্মুক্ত হইলেই, মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাকে “চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত” করিয়া, তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূণ্যরূপ, অনির্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ এবং নির্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্বাণ বুঝিতেন। তাহারও পরে আবার যখন তাহারা দেখিল, যে প্রকৃত পক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারতঃ তাহাদিগকে “অস্তি” বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচিরচি ভব নির্বাণা ।

মিছা লোক বন্ধাবএ অপণা ॥

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্বাণও শূন্যরূপ । ভব ও নির্বাণে কিছুই ভেদ নাই । মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্বাণও রচনা করে । এইরূপে তাহারা আপনাদের বন্ধ করে । কিন্তু পর-মার্থতঃ দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয় । সবই শূন্যময় ।

তাহা হইলে ত বেশ হইল । ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য, স্মৃতরাং আত্মা সর্বদাই মুক্ত, স্বভাবতঃই মুক্ত, “শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ” । তবে আর ধর্ম্মেই কাজ কি ? যোগেই কাজ কি ? কঠো-রেই বা কাজ কি ? ধ্যানেই বা কাজ কি ? সমাধিতেই বা কাজ কি ? ধর্ম্ম অধর্ম্মেই বা কাজ কি ? যার যা খুসি কর । তোমরা স্বভাবতঃই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বন্ধ করিতে পারিবে না । পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতিপাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত ।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে । সকলেই স্বভাবতঃ মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বন্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপ-ভোগ করিলে, কিছুতেই বন্ধ হয় না ।

“যেনৈব বধ্যতে বালো বুদ্ধন্তেনৈব মুচ্যতে” । যে পঞ্চকামোপ-ভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্থ লোকে বন্ধ হয়, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া তাহাতেই মুক্ত হয় ।

আর এক উপায়ে নির্বাণ ব্যাখ্যা করা যায় । মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্ম অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে বোধিচিন্ত বলে । বোধিচিন্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্ম্মপথে বা সদ্ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল । ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল । যদি তাহার

উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধদের বিহারে যে সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিক দূর উঠিয়াছে। তাহার উপর একটি গোলের অর্ধেক। তাহার উপর একটি নিরেট চারকোণা জিনিস। তাহার উপর একটি ছাতা। তাহার উপর আর একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়। তাহার উপর আর একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর একটু বড়। চতুর্থটি তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোট, পঞ্চমটি আরও ছোট। এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল। তাহারও উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মাত্র। এই বাঁটের পর আবার আর এক সেট ছাতা, কোন মতে ১৩টি, কোন মতে ১৬টি, কোন মতে ২১টি, কোন মতে ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার খানিকটা ছাতার বাঁট। ইহার উপর আবার মোচার আগার মত আর একটা জিনিস। মোচার আগাটি বেড়িয়া উপরি উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। মোচার আগাটি একেবারে ছুঁচের মত।

বোধিচিন্তা প্রণিধিবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি এই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের নীচের দিকটা ভূত-প্রেত-পিশাচ-লোক ও নরক। তাহার উপর যে গোলের আধ-খানা আছে, সেটি মনুষ্যালোক। বোধিচিন্তা মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিন্তা এইখান হইতেই উঠিতে থাকে। প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা সে ঐ নীরেট চারিকোণায় উঠিল। এটি চারিজন মহারাজার স্থান, তাঁহারা চারিদিকের অধিপতি। তাঁহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিক্রটক, বৈশ্রবণ ও বিক্রপাক। তাহার উপর ত্রয়স্বিংশ ভুবন। এখানকার রাজা ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবতা

এখানে বসবাস করেন। ইহার উপর ভূষিত ভুবন। বোধিসত্ত্বেরা এইখান হইতে একবারমাত্র পৃথিবীতে গমন করেন এবং সেখানে গিয়া সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্মাণরতিলোক, অর্থাৎ, ইহারা ইচ্ছামত নানারূপে নানা ভোগ্যবস্তু নির্মাণ করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ইহাদের পরে যে লোক, তাহার নাম পরনির্মিতবশবর্তী, অর্থাৎ, তাঁহারা নিজে কিছুই নির্মাণ করেন না, পরে নির্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেষ হইয়া গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়া বোধিচিহ্নের আর কোন ভোগের আকাঙ্ক্ষা রহিল না।

এইখান হইতে রূপলোকের আরম্ভ। কাম নাই, রূপ আছে, আর আছে উৎসাহ। সে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিহ্ন ক্রমশঃই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানতঃ, চারিটি লোক; অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারিটিরই অধীন। এই চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হইয়া যায়, কেবল মাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ হইয়া যায়, তখন বোধিচিহ্ন রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চান।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিহ্ন আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপলোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে, সমস্ত বস্তু, এমন কি নীরেট জিনিসটি পর্য্যন্ত তিনি আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা

কিছুই নয়। ইহারও উপর বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাহার চিন্তা হইল এই যে কিছুই নয়, ইহার কোন সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞাও আছে। কিন্তু সংজ্ঞা ত নাই, সে ত অকিঞ্চন। স্মৃতরাং সংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞাও নাই। ইহার পর বোধিচিন্তা সেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই যে স্তূপ ইহাই “ত্রৈধাতুক লোক” তিনি এখন ইহার মাথার উপর। তাঁহার চারিদিকে অনন্তশূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখান হইতে অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন মূণের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বোধিচিন্তাও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম ও বিনয় অনন্তকালের জন্য ত্রৈধাতুক-লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্ব্বাণ বলিতে ‘নাই’ ‘নাই’ই বুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই ‘নাই’ ‘নাই’ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্ব্বাণ হইয়া গেল, একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন; উহার নাম ‘করুণা’। ইহা যেমন তেমন করুণা নয়, সর্ব্বজীবে করুণা, সর্ব্বভূতে করুণা। রূপধাতু তাগ করিয়া অরূপ-ধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ম্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুদ্ধ ‘শূন্যতা’ লইয়া যে নির্ব্বাণ, প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিম্পন্দ, কতকটা পাথরের মত, কতকটা শুকনা কাঠের মত হইয়াছিল; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল; নিষ্কর্জীবে জীবন আসিল, উদ্দেশ্যশূন্যে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য সত্যই শুদ্ধতরু যেন মুঞ্জরিয়া

উঠিল। ঝাঁহারা অর্হং হওয়াই, অর্থাৎ কোনরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সমস্ত জগৎ ঝাঁহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত। জগতের পক্ষে ঝাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা আর তত বড় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিহটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারিদিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতে-
শ্বর সংসারের সকল গন্তী পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা কিছু কাজ, সব সাক্ষ করিয়া, এমন কি ধর্ম্যস্তুপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণাসাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারি-
দিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিহ চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব দুঃখে আর্তনাদ করিতেছে; জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কিসের কোলাহল’। তাহারা উত্তর করিল ‘আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্বাণ লাভ করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে?’ তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন ‘যতক্ষণ জগতের একটিমাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণ লইব না।’

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড় মত আর হইতে পারে না। যখন বোধিসত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্ত পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চ-
শীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভঙ্গিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্যদেব ‘চিন্তা-
বিশুদ্ধিপ্রকরণে’ বলিয়া গিয়াছেন ‘যে জগৎ উদ্ধারের জন্ত কোমর বাঁধি-
য়াছে, তাহার যদি কোন দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্ষ্যই নয়।’

এই বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধর্ম দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এইমতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড় বড় রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিচার যথেষ্ট আদর ছিল, ধর্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এতশত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

চাণক্য শ্লোকে বলে ‘ধন উপায় করা বড় সহজ, কিন্তু ধন রাখা বড় কঠিন।’ জ্ঞানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড় কঠিন। মহাযানেরও এই জ্ঞান বেনীদিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগসাধনা করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ মত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া বজ্রমানদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রহিল না।

কিন্তু নির্ব্যাণের কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক বাহিরের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বোধ হয় এগুলি না বলিলে হইত না। মহাযানের নির্ব্যাণ ‘শূন্যতা’ ও ‘করুণায়’ মিশামিশি। এ নির্ব্যাণের একদিকে ‘করুণা’, আর একদিকে ‘শূন্যতা’, করুণা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু যে সকল যজ্ঞমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেনী নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে শূন্যতা বুঝান বড়ই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন—সেটি “নিরাত্মা”। নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু

এসময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন যে, বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন ‘নিরাত্মা’, শুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন “নিরাত্মাদেবী”, অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল; কেননা সেটা বুঝিতে ত কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্বাণের অর্থ কি দাঁড়াইল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়েই, যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সে কথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল না। স্মরণীয় নির্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্বাণেও সেই অনির্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ভাষার কথা

বহুদিন পূর্বে মফঃস্বলের এক সহরে একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের ইংরাজি লেখার সখটা যত ছিল, ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান ততটা ছিল না। পদে পদেই তাঁর লেখায় ব্যাকরণ ভুল হইত। এইজন্য বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে তন্নি করিলে, তিনি সর্বদাই বলিতেন যে স্কুলের ছেলেরাই ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিবে, লেখকেরা ব্যাকরণের বাঁধাপথ ধরিয়া চলেন না, ব্যাকরণই তাঁদের লেখার অনুসরণ করিয়া আপনার সূত্র সকল রচনা করে। তাঁর উদ্ভট সাহিত্য সৃষ্টির সম্বন্ধে খাটুক আর নাই খাটুক, কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা, এমনও বলা যায় না। ব্যাকরণের কাঁটা-কম্পাস ধরিয়া লিখিতে গেলে, রচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এসকল বাঁধাধরার ভিতরে কোথাও কোনও সরস ও শক্তিশালী জীবন্ত-সাহিত্য গড়িয়া উঠে না।

কিন্তু ব্যাকরণের বাঁধাধরার ভিতর না থাকিলেও, কোনও লেখকই, যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন, ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিকে উলট-পালট করিয়া দিতে পারেন না। ব্যাকরণ যতটা পরিমাণে ভাষার এই মূল গঠন ও প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততটুকু পর্যন্ত সকল লেখককেই ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলিতে হয়। এগুলি ব্যাকরণের মূল কথা। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকল ব্যাকরণেই অনেকগুলি অবাস্তুর বিষয়ও মিশিয়া যায়। এই অবাস্তুর বিষয়গুলিই ভিন্ন ভিন্ন যুগের সাহিত্য-রথীদের লেখার উপরে গড়িয়া উঠে। এসকল অবাস্তুর নিয়মের কোনও বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই। রামমোহন রায়ের সময়ে “আমারদিগের” “তঁহারদিগের” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইত। ক্রমে “আমাদিগের” “তঁহাদিগের” প্রভৃতি চলিয়া গেল। এখন আমরা “আমাদের”, “তোমাদের” “তঁহাদের” লিখিয়া

থাকি। এটা একটা অবাস্তব পরিবর্তন। এক সময় সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাতেও বিশেষ্য পদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে তার বিশেষণ পদেও স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। কোনও কোনও স্থলে আমরা এখনও এই নিয়ম মানিয়া চলি, কোন কোনও স্থলে বা ইহাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া, বাঙ্গালাতেও যে “এব্যক্তির কি বিপুল শক্তি আছে”—এরূপ লিখিতে হইবে, এখন আর কেহ একথা শুনে না; প্রায় সকলেই “বিপুল শক্তি” বলেন ও লিখেন। আবার অন্যত্র এই শক্তি শব্দের বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, অন্যথা তাহা শিষ্ট-প্রয়োগ হয় না। এই জন্য একদিকে যেমন “বিপুল শক্তি” বলি, অন্যদিকে সেইরূপ “মহৎ শক্তি” বলি, কিন্তু “মহতী শক্তি”ই বলিয়া থাকি। এইরূপে আজিকালিকার বড় বড় বাঙ্গালা লেখকেরা নানাদিক্ দিয়াই পুরাতন ব্যাকরণের বাঁধনগুলি আলুগা করিয়া দিতেছেন। ইহাতে কোনও দোষ হয় না। এরূপ করা সর্বতোভাবেই সম্ভব। লেখকদের এই স্বাধীনতাটুকু না থাকিলে, ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও ভাষার মূল গঠন বা প্রকৃতিকে উলট-পালট করিয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই।

যুগে যুগে প্রত্যেক জীবন্ত ভাষারই অশেষবিধ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যেখানে এ পরিবর্তন-ধারা বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে হয় যে জাতি বা সমাজ ঐ ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল তাহাদের নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির ও জ্ঞানার্জনের শক্তি লোপ পাইয়াছে, না হয় তাহাদের প্রতিদিনের বিষয়কর্মের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ও উচ্চশিক্ষার ভাষার একটা অলঙ্ঘ্য প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রভেদ যেখানে দাঁড়ায়, সেইখানেই সাহিত্যের ভাষা মৃত আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই লোকের প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষা ছিল এক, আর সাহিত্যের ভাষা ছিল আর এক। স্ত্রীলোকেরা ও জনসাধারণে আটপহরিয়া ভাষাই সর্বদা ব্যবহার

করিতেন, পণ্ডিতেরাই কেবল সাহিত্যের পোষাকী ভাষাতে কথাবার্তা করিতেন ও গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। এই আটপহরিয়া ভাষার সাধারণ নাম ছিল প্রাকৃত, আর ঐ পোষাকী ভাষার নাম ছিল সংস্কৃত। প্রতিদিনের কর্মাকর্মের ভিতর দিয়াই মানুষের নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। এই কর্মক্ষেত্রেই একভাষাভাষী লোকের সঙ্গে অন্যভাষাভাষী লোকের সাক্ষাৎকার ও আদানপ্রদানের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। সুতরাং এক নিজেদের ভিতরকার অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন বৃদ্ধির এবং অপর বাহিরের লোকের সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের কর্মজীবনের ভাষাতে নূতন নূতন ভাব আদর্শ জ্ঞান ও রস সঞ্চিত হইয়া, নানাদিক দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলে। আর যেখানে লোকের এই প্রতিদিনের ব্যবহার্য ভাষা হইতে তাদের লেখাপড়ার, শিক্ষাদীক্ষার, বিজ্ঞান-দর্শনের এবং বিশেষতঃ ধর্মকর্মের ভাষা পৃথক হইয়া পড়ে, সেইখানেই শেষের ভাষাটা মৃত পদবী প্রাপ্ত হয়। এইভাবেই আমাদের সংস্কৃতভাষা ও ইউরোপের গ্রীক ও ল্যাটিন এই দুই প্রাচীন ভাষা মৃত আখ্যা পাইয়াছে। এ সকল মৃতভাষাতে ব্যাকরণের বাঁধন বড় শক্ত। যে জীবনীশক্তি থাকিলে জীব প্রাচীনকে অতিক্রম করিয়া নূতনকে আপনায় লইতে পারে, সেই জীবনীশক্তির অভাবেই এই সকল পুরাতন মৃতভাষা এমন কঠিন বাঁধাবাঁধির ভিতরে পড়িয়া আছে। প্রতিদিনের কর্মের সঙ্গে এসকল ভাষার কোনও বিশেষ সম্পর্ক নাই বলিয়া, এই বাঁধন কাটিয়া মুক্তিলাভ করিবার কোনও প্রেরণাও এক্ষেত্রে উপস্থিত হয়না। কিন্তু চলতি ভাষাকে এরূপ বাঁধাবাঁধির ভিতরে আটকাইয়া রাখা যায়না। যে চলতে চায়, যাকে চলতে হয়ই, সে কোনওরূপ অলঙ্ঘ্য বিধি-বাঁধন মানিয়া চলিতে পারেনা। সে আপনার বিধি আপনি গড়িয়া তোলে, আপনার বাঁধন আপনি ছিঁড়িয়া ফেলে। ইহা জীবনেরই ধর্ম।

জীবন্তভাষা কতকটা জীবন্ত মানুষেরই মতন। জীবন্ত মানুষকে

সর্বদাই আপনার চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি করিয়া চলিতে হয়, না চলিলে তার জীবন-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রত্যেক জীবকে এই যে তার চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বদা মিশা খাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হয়, এই চেষ্টাকেই আধুনিক জীব-বিজ্ঞান জীবন-সংগ্রাম বা ইংরাজিতে *struggle for existence* বলে। সকল জীবকেই যেমন আপনার জীবন-রক্ষার জন্য আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন করিতে যাইয়া, নিজেকে তাদের প্রয়োজন অনুরোধে কতকটা বদলাইয়া লইতে হয়, জীবন্ত ভাষাকেও সেইরূপ না করিলে চলেনা। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন নূতন শব্দের, নূতন নূতন ভাবের স্ফুর্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন রসের উপাদানের, নূতন নূতন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিচার যুক্তির, আর এই সকল বিচার যুক্তির প্রয়োজনে নূতন নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি হইবেই হইবে। এই নূতন সৃষ্টি প্রবাহের দ্বারা সাহিত্যের ধরণধারণের বা এবারতেরও পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। এক যুগের এবারত বা *style* এই কারণেই অন্য যুগের এবারত হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। মহারানী-এলিজাবেথের সময়ে যে ইংরাজি এবারত ছিল, মহারানী ভিক্টোরিয়ার সমকালে তাহার ঘোরতর পরিবর্তন ঘটে। আবার ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংরাজ লেখকেরা যে ধরণের ইংরাজি লিখিতেন, এই অল্প দিনের মধ্যেই তাহা বদলাইয়া গিয়া, আজিকালিকার ইংরাজি সাহিত্যে একটা নূতন এবারতের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতেই রামমোহন রায়ের এবারতে আর বিদ্যাসাগরের এবারতে, বিদ্যাসাগরের এবারতে আর বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের এবারতে এবং তার পরে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালা গদ্য এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সকলের মধ্যে কত প্রভেদ দেখিতে পাই। কোনও জাতির মানস ও সমাজ-জীবনে

নূতন সৃষ্টিপ্রবাহ যতদিন অপ্রতিহত থাকে, জ্ঞানের ধারা যতদিন না বন্ধ হইয়া যায়, অভিনব অভিজ্ঞতা লাভের পথ যতদিন না রুদ্ধ হইয়া পড়ে, ততদিন প্রত্যেক জীবন্ত জাতির জীবন্ত ভাষাতে একরূপ পরিবর্তন ঘটিবেই ঘটিবে। এ সকল পরিবর্তন দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। এ সকল অপরিহার্য পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াও কোনও ফল নাই। তবে পরিবর্তনের মধ্যেও যে একটা নিত্য আছে, সকল পরিবর্তনই যে ভাল ও ইষ্টকর নয়, এই সকলের যে ইষ্টানিষ্ট, উৎকর্ষাপকর্ষ, আবশ্যক-অবশ্যক, ভিতরের প্রেরণার ও বাহিরের আক্রমণের, স্বাধীনতার ও স্বেচ্ছাচারের ভেদাভেদ আছে,—এই কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। যার হাতে কলম, দোয়াতে কালী ও ঘরে পয়সা আছে, জীবন্ত ভাষা বলিয়া এই জীবনের অজুহাতে সে-ই যে বাঙ্গালা ভাষাটাতে যা' তা' পরিবর্তন চালাইয়া দিবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ স্বাধীনতাকেই বরণ করিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা স্ব-বস্তু আছে, প্রত্যেক ভাষারও সেইরূপ একটা স্ব-বস্তু আছে। আমাদের বিশিষ্ট প্রকৃতিকেই আমরা আমাদের এই “স্ব” বলিয়া থাকি। এই “স্ব” আমাদের নিজস্ব বস্তু, ইহাতেই আমাদের জগতের অপর সকল জীব ও সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। রাম যে শ্যাম নহে, তার এই “স্ব”ই তার প্রমাণ। এই যে “স্ব” বস্তু—তার অধীনতাই স্বাধীনতা। স্বেচ্ছা বস্তু এই “স্ব”এর ইচ্ছা, তার একটা স্বাধীন চাঞ্চল্য মাত্র, এই সকল ইচ্ছা জাগে আর যায়, এই ইচ্ছার সঙ্গে “স্ব”এর কোনও নিত্য সম্বন্ধ নাই। শত শত পরস্পর বিরোধী ইচ্ছা বা বাসনা আমাদের মনে জাগে। আর যখন যে বাসনা একরূপভাবে প্রাণে জাগিয়া উঠে, আমরা যদি তখনই নিজেকে তার

হাতে সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবনে কোনও প্রকারের স্বৈর্য্যভাও ও শক্তিসাধন অসাধ্য হইয়া উঠে। জীবনের খেই রাখাই সে অবস্থায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্মই স্বৈচ্ছাচার আর স্বাধীনতা এক কথা নহে। জীবনের মৌলিক একত্বের বা নিজত্বের বা ব্যক্তিত্বের বা বৈশিষ্ট্যের অনুগত হইয়া, আপনার সম্পূর্ণ সার্থকতা অন্বেষণ করাই স্বাধীনতা; আর ক্ষণিক বাহ্যপ্রেরণাধীন বাসনার বশত স্বীকার করিয়া কখনও এদিকে কখনও ওদিকে চিন্নাভ্রের মতন ভাসিয়া বেড়ানই স্বৈচ্ছাচারিতা। স্বাধীনতা যেমন জীবনকে সর্বতোভাবে সার্থক করে, এই স্বৈচ্ছাচারিতা সেইরূপ তাহার সকল অর্থকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

আমাদের প্রত্যেকের যেমন একটা স্ব-বস্তু আছে, যাহার উপরে আমাদের জীবনের একত্ব প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের নিজস্ব ও সর্বস্ব, যাহার দরুণে আমরা জগতের অপর সকল লোক হইতে পৃথক হইয়া আছি, সেইরূপ প্রত্যেক ভাষারও একটা “স্ব-বস্তু” আছে, এই বস্তুই তার নিজস্ব ও সর্বস্ব। এই ‘স্ব’এর উপরেই ভাষার সকল প্রকারের পরিবর্তন ফুটিয়া উঠে। যেমন মানুষের মধ্যে নিত্যই অশেষবিধ পরিবর্তন ঘটিতেছে, অথচ এই সকল পরিবর্তনে তাহাদের একত্ব বা নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব একটুও নষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক জীবন্ত ভাষাতেও প্রতিদিনই বহুবিধ পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এ সকল পরিবর্তনে তার নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়াই তুলে, কদাপি নষ্ট করে না। এই যে ভাষার স্ব-বস্তু, তাহার অধীনতাই সাহিত্যিকের সত্য স্বাধীনতা। সাহিত্যিক যতক্ষণ ভাষার এই স্ব-বস্তুর অধীনে থাকেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তিনি যে ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাহার মূল, নিজস্ব, বিশিষ্ট প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলেন, ততক্ষণ তিনি যত ইচ্ছা পরিবর্তন প্রবর্তিত করুন না কেন, তাহার অন্ত্য দোষগুণ যাহাই থাকুক না, তাহাকে কখনও স্বৈচ্ছাচারিতা বলা যাইবে না। কিন্তু এসকল পরিবর্তন ঘটাইতে যাইয়া যখন তিনি

ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত উলট-পালট করিয়া দিতে চেষ্টা করেন, তখনই তাঁর এ চেষ্টাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলিতে হইবে।

জীবন্ত ভাষার অশেষ পরিবর্তন ঘটিবে, ইহা জীবনেরই লক্ষণ। ইহাতে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু পরিবর্তন বলিলেই যে তার মূলে একটা নিত্য আছে, ইহা বুঝায়,—এই গোড়ার কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। যেখানে কিছু নিত্য নাই, সেখানে পরিবর্তন হয় না। খোল ও নাড়িটা সবই যদি বদলাইয়া যায়, তাকে পরিবর্তন বলে না। যেখানে কিছু অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয় থাকে না, সেখানে আমরা কোনও পরিবর্তনের কল্পনাও করিতে পারি না। রামের জ্বর হইয়াছে, যত্ন ঔষধ থাইতেছে, শ্যাম আরোগ্য লাভ করিয়াছে, মাধব স্নান-আহার করিয়া আফিসে গেল। এইগুলিকে পরিবর্তন বলে কি? অথচ যে রামের জ্বর হইয়াছে, সেই রামই ঔষধ খাইতেছে, সেই রামই আরোগ্য লাভ করিল, সেই স্নানাহার করিয়া আফিসে গেল—এখানে জ্বর হওয়া অবধি, আফিসে যাওয়া পর্য্যন্ত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও কর্মের প্রকাশ হইল, তাহাকে পরিবর্তন বলি। কারণ এখানে রামরূপ ব্যক্তিটী সকল অবস্থার ও সকল কর্মের মধ্যেই বিद्यমান রহিয়াছে। আমি জন্মিয়াছিলাম একদিন, আমি বালক ছিলাম, আমি যুবক ছিলাম, আমি প্রৌঢ় ছিলাম, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—জন্ম, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা পর পর ঘটিয়াছে বলিয়াই এগুলিকে পরিবর্তন বলি না, কিন্তু এই “আমি” বস্তুটা এসকলের সাক্ষীরূপে বিद्यমান ছিল ও আছে বলিয়াই এগুলিকে পরিবর্তন বলিতে পারি। সেইরূপ যুগে যুগে ভাষার পরিবর্তন ঘটে ও ঘটিতেছে, ইহা বলিলে বা মানিয়া লইলেই, এই ভাষার যে একটা নিত্য ও অপরিবর্তনীয় স্বরূপ আছে, ইহাও মানিতেই হইবে। ঐ নিত্য স্বরূপের উপরে, ঐ স্বরূপের আশ্রয়েই, ভাষার যাহা কিছু বিভিন্ন রূপ ফুটিয়া উঠে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষারও এরূপ একটা নিত্য স্ব-রূপ আছে। ঐ স্বরূপটীই তার প্রাণ। ঐটী গেলে তার সব গেল।

মনের ভাব ব্যক্ত করাই ভাষার ধর্ম। আর এই ধর্মের প্রেরণায় প্রত্যেক ভাষাই মনের অনুগমন করিয়া চলে। আমাদের মন যেরূপ প্রণালীতে চিন্তা করে, ভাষা সেই ছাঁচে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। আমাদের চিন্তার উপাদান তিনটি, এক জ্ঞাতা বা বিষয়ী, ইংরেজিতে ইহাকে সর্ব্জেক্টে subject বলে; দ্বিতীয় জ্ঞেয় বা বিষয়, ইংরেজিতে ইহাকে অব্জেক্টে object বলে; আর তৃতীয় এই জ্ঞাতা বা বিষয়ীর সঙ্গে এই জ্ঞেয় বা বিষয়ের সম্বন্ধ, ইহাকেই ইংরেজিতে প্রেডিকেট্ predicate कहিয়া থাকে। মানুষ যখনই কোনও মনন করে, তখনই সে এই তিনটি বস্তুকে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। এই সর্ব্জেক্টে subject, অব্জেক্টে object, এবং প্রেডিকেট্ predicate'কে কর্তা, কর্ম্ম এবং ক্রিয়াও বলা হয়। জ্ঞানের সম্বন্ধে যে বিষয়ী, কর্ম্মের সম্পর্কে সেই কর্তা। জ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বিষয়, কর্ম্মের সম্পর্কে তাহাই কর্ম্ম। আর জ্ঞানের দিক্ দিয়া যাহাকে বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ বলা যায়, কর্ম্মের দিক্ দিয়া তাহাকেই ক্রিয়া বলিতে হয়। মূলবস্তু এক হইলেও, জ্ঞানের বিশ্লেষণে তাহার এক নাম ও কর্ম্মের বিশ্লেষণে অশ্রু নাম ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ ও বস্তুতঃ যাহা বিষয়ী তাহাই কর্তা, যাহা বিষয় তাহাই কর্ম্ম, যাহা বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ তাহাই ক্রিয়া। আর এই তিনটি তত্ত্বই আমাদের সকল প্রকারের চিন্তার বা মননের বা ধারণার বা জ্ঞানের মূল উপাদান। এগুলির কোনওটিকে ছাড়িয়া কোনও প্রকারের চিন্তন বা মনন বা জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। জ্ঞানের এই তিনটি মূল উপাদান সকল ভাষাতেই পাওয়া যায়; তবে কোনও ভাষাতে বা কর্তার, কোনও ভাষাতে বা কর্ম্মের, আর কচিৎ কোনও কোনও অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও বর্কর জাতির ভাষায় বা ক্রিয়ারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কর্তা, কর্ম্ম, ও ক্রিয়াপদ এই তিনটির কোথায় কিরূপ সমাবেশ হয়, তাহার দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিটা যে কি, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের

সংস্কৃত ভাষায় কর্তৃপদেরই প্রাধান্য বেশী। প্রত্যেক বাক্যের সর্বাপেক্ষা সম্মানের আসনটা আমরা কর্তাকেই দিয়া থাকি। তারপরে কর্ম-পদকে বসাই এবং সকলের শেষে ক্রিয়াপদের স্থান করিয়া দেই। বাংলা প্রভৃতি দেশজ ভাষাও এবিষয়ে সংস্কৃতেরই অনুকরণ করে। এই যে কর্তৃপদ, কর্মপদ, ও ক্রিয়াপদের পরপর সমাবেশ ইহার দ্বারাই সংস্কৃত ভাষার মূলগঠন ও প্রকৃতিটি বুঝিতে পারা যায়। এটি কেবল আমাদের জাতির ভাষার প্রকৃতি নহে, আমাদের জাতীয় চিন্তারও প্রকৃতি এবং গঠন ইহাই। ফলতঃ ভাষার প্রকৃতি ঐ চিন্তার প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। যে যেমন ভাবে চিন্তা করে, তার ভাষাও সেইরূপ ভাবেই প্রকাশিত হয়। যার চিন্তাতে বিষয়ী বা কর্তা সকলের আগে আসে, তার ভাষাতেও কর্তৃপদ আপনা হইতেই সকলের আগে বসিবে। আমরা কর্মের আগে কর্তার কথাই ভাবি, আর সকলের শেষে ক্রিয়াকে লক্ষ্য করি। রাম ভাত খাইতেছে—আমরা এই ভাবেই পদযোজনা করিয়া থাকি। এটি আমাদের জাতির চিন্তার ধাত। এখন যদি আমরা বলিতে বা লিখিতে আরম্ভ করি—ভাত রাম খাইতেছে, কিন্ধা খাইতেছে ভাত রাম, কিন্ধা রাম খাইতেছে ভাত,—রামের আহার ব্যাপারটা সকল বাক্যেই সমানরূপে প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু আমাদের মনের গতির ধরণটা ঠিক সমান আছে বলিয়া প্রমাণ হইবে না। আমরা যে কর্তৃপদকে সকলের আগে বসাই, ইহার অর্থ এই যে, আমরা অতি প্রাচীনতম কাল হইতে, যে যুগের খবর কেবল লিখিত ইতিহাস নহে, কিন্তু খোদিত প্রস্তরফলক বা তাম্রলিপি প্রভৃতিও কিছুই জানে না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে, আমরা যে জাতিতে জন্মিয়াছি ও উত্তরাধিকারীসূত্রে তাঁদের ভাষা ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ভোগ করিতেছি, তাঁদের চক্ষে চিরদিনই বিষয় অপেক্ষা বিষয়ী বড় ছিলেন। অহংটাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল, ইদংটা উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। তাঁরা চিরদিনই কতাকে কর্ম অপেক্ষা ও

কর্মকে ক্রিয়া অপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিতেন। কর্তাটী অপেক্ষাকৃত স্থায়ী-বস্তু, কর্মটী কর্তার তুলনায় ক্ষণস্থায়ী হইলেও, ক্রিয়ার শেষেও তার অস্তিত্ব থাকে বলিয়া, ক্রিয়া অপেক্ষা বেশী স্থায়ী। রাম বিষয়ী, এই রামের অগণ্য ভোগ্যবস্তুর বা বিষয়ের মধ্যে ভাত একটা বিশিষ্ট বিষয় মাত্র, সুতরাং এখানে ইহা রামের চাইতে ছোট। রামের জন্মই আমাদের চোখ ভাতের উপরে পড়িয়াছে। রাম ভাত না খাইয়া যদি ডাল খাইত বা শাক খাইত, বা দই বা মাখন খাইত, তাহা হইলে এই ভাতের দিকে আমরা এ সময়ে চোখ তুলিয়া চাহিতাম না। এইজন্য রামই এখানে মুখ্যবস্তু, ভাত গৌণ। আর সর্বাপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী, সর্বাপেক্ষা ছোট ব্যাপার এখানে খাওয়াটী। রামের খাওয়া শেষ হইলেও ভাতও থাকিতে পারে, রামও থাকিবে; ভাত তখন অপরের জন্ম থাকিবে, রাম তখন অন্য কাজ করিবে, কিন্তু খাওয়ারূপ কার্যের আর অস্তিত্ব রহিবে না। এইজন্য ক্রিয়াটী সকলের ছোট, সর্বাপেক্ষা হেয়; আর এই কারণেই কর্তৃপদ ও কর্মপদ উভয়ের পরে ক্রিয়াপদের সম্মিবেশ হইয়া থাকে। এটি আমাদের ভাষাতেই হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে ও আধুনিক দেশজ ভাষাতে হয়। অন্য দেশের ভাষায় হয় না। এই যে ভাষার গঠন বা প্রকৃতি ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। ইহার সঙ্গে আমাদের জাতির চিন্তার মূলপ্রকৃতির ও প্রণালীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এটি আমাদের জাতির চিন্তার, আমাদের জাতির সাধনার ও সভ্যতার, আমাদের দর্শনের ও ধর্মের নিজস্ব সহি-মোহর। ইহা আমাদের জাতীয়তার মার্ক। এটি ক্ষইয়া গেলে বা মুছিয়া ফেলিলে, ভারতের ভারতত্ব, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মূলগত বৈশিষ্টটুকু—নষ্ট হইয়া যাইবে।

ইংরাজি ভাষার প্রকৃতি একটু ভিন্ন। আমরা যেমন কর্তাকে সকলের আগে বসাই, ইংরাজেরাও তাই করেন। কিন্তু আমরা যেখানে বলি “রাম ভাত খাইতেছে”, সেখানে তাঁরা বলেন “রাম খাই-

তেছে ভাত।” বাঙ্গালা ভাষায় কর্তৃপদের পরে কর্মপদ ও সকলের শেষে ক্রিয়াপদ বসে। ইংরাজিতে কর্তৃপদের পরে ক্রিয়াপদ আর সকলের পরে কর্মপদ বসে। রামের ভাত খাওয়ার ব্যাপারটা ইংরাজিতে Ram is eating rice—রাম খাইতেছে ভাত,—এই ভাবেই ব্যক্ত হইবে। Ram rice is eating ইংরাজি নয়, বাঙ্গালা সেইরূপ “রাম খাচ্ছে ভাত,” বাঙ্গালা নয়, ইংরাজি। এরূপ ভাবে, কথাগুলি উলটপালট করিয়া ব্যবহার করাতে একটা বাহাদুরী আছে। কোনও কোনও স্থলে যে ব্যভিচারও বাহাদুরী বলিয়া গণ্য হয়, ইহাই বা কে না জানে?

ইংরাজিতে যে কর্তৃপদের পরে ক্রিয়াপদ বসে, ইহার অর্থই এই যে অতি প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে, ইংরাজ জাতির চিন্তাটাই এমনি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে তারা ক্রিয়াটাকেই কর্মের চাইতে বড় মনে করে। কর্তা যে সকলের চাইতে বড়, তাহা তাঁর ক্রিয়ার জোরে। ক্রিয়া ভিন্ন কর্তা লোপ পাইয়া যায়। কর্মটা ক্রিয়া অধীন। যতক্ষণ খাই, ততক্ষণই ভাতের দাম আছে; খাওয়া শেষ হইলে ভাতের আর অব্যবহিত প্রয়োজন থাকে না। প্রয়োজন যার নাই, মূল্যই তার আছে কি? তখন ভাতের যা মূল্য থাকে, তাহা ভবিষ্যতের খাওয়ারই বা ক্রিয়ারই জন্ত। সুতরাং ইংরাজেরা ক্রিয়াটাকেই—প্রেডিকেটকেই—কর্ম বা অবজেক্ট অপেক্ষা আগে দেখে ও বড় ভাবে। ক্রিয়াই কর্মকে পূর্ণ করে ও কর্তাকে সার্থক করে। ক্রিয়ার বা কর্মের বিরাম যেমন নাই, তেমনি কোনও নিত্যত্বও নাই। কিন্তু কর্তার একটা নিত্যত্ব আছে। এই জন্ত কর্তা সকলের বড়। তার পরে ক্রিয়া; কারণ, ক্রিয়ার দ্বারাই তাঁর কর্তৃত্বের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্ম ক্রিয়ার অধীন, ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন বা সৃষ্ট হয়। সুতরাং কর্ম সকলের পরে। এইভাবে ইংরাজি ভাষার মূলপ্রকৃতি ও গঠনের তত্ত্বান্বেষণে গেলে, ইংরাজি ব্যাকরণের ভিতরেই ইংরাজের জাতীয় দর্শন বা তত্ত্ববিচার পরিচয় পাই।

ইংরাজ কন্সী, সূতরাং ক্রিয়াটা তার চক্ষে অতি বড় বস্তু। ইংরাজের দেবতা Providence, জগতের তিনি স্রষ্টা, জীবের তিনি পাতা, মানুষের তিনি ত্রাতা, বিশ্বের বিশাল কর্মযাত্রের তিনি নিয়ন্তা। এই সকলই তাঁর নিয়ত-ক্রিয়াশীলতার লক্ষণ। কিন্তু আমাদের ব্রহ্মা নিগুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়। সত্যই তাঁর সকল সত্য। অঘ-টনঘটন-পটীয়সী মায়া বিশ্ব সৃজন করে। ব্রহ্মাকে জগতের স্রষ্টা বলা যায় না। তিনি জীবের পাতাও নহেন, সে কার্য বিমুগ্ধ করেন। তিনি জীবের মুক্তিদাতাও নহেন, কারণ মুক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু, কোনও ক্রিয়ার ফলে তার উদ্ভব হয় না। যাহা নিত্য তারই উপরে আমাদের মনের ঝোঁক, যাহা ক্রিয়াজন্য ও পরিণামী তার উপরে নহে। এই জন্য আমরা প্রথমে কর্তাকে দেখি, তার পরে কর্তার কর্মকে দেখি, সকলের শেষ, অতি চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী যে ক্রিয়া তাহাকে দেখিয়া থাকি। সূতরাং আমাদের ভাষায় যে কর্তা, কর্ম, বস্তু ও ক্রিয়ার পর পর সমাবেশ হয় ইহা একটা অর্ধহীন ব্যাপার বা নিতান্ত অবাস্তুর কথা নহে। ইহার সঙ্গে আমাদের জাতির মূল ধাতের সম্বন্ধ আছে। এখানে ভাষার উলটপালট করিবার খেয়ালটা কেবল ভাষাতে নয়, জাতির মূল প্রকৃতির ভিতরে একটা সাংঘাতিক বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করে।

কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, এই পর্য্যায়টা বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সঙ্গত কারণ উপস্থিত হইলে সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। এই পর্য্যায় সংস্কৃতেরও সাধারণ নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া “অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরুঃ”—বিষ্ণুশর্ম্মার এই নিয়ম-ভঙ্গটাকে কেহই ব্যতিচার বলিবে না। ভাষাটা যে হামেসাই দর্শনের অনুশাসন মানিয়া চলিবে, শ্রবণের কোনও অনুরোধ শুনিবে না, এমনও কোনও কথা নাই। দর্শনটা ভাষার কাঠাম, শ্রবণটা তার রক্তমাংস না হউক, অস্তিত্বঃ অঙ্গকাস্তি ত বটেই। দর্শন সর্বদাই বলে—কর্তাই সকলের বড়, তাহাকেই আগে বসাত। কিন্তু শ্রবণ

কখনও সেই কৰ্ত্তাকেই সাজাইবার জন্ত বলিতে পারে, ক্রিয়া সকলের ছোট হইলেও তাহাকেই এখানে আগে বসাইলে দেখাবে বা শুনাবে ভাল। তখন ঐরূপ করাতে কোনও ব্যভিচার-দোষ হয় না। আর ক্রিয়াতে ক্রিয়াতেও বেশকম আছে। সংস্কৃতে ভূ ধাতু সকল ধাতুর বড়। কৰ্ত্তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কৰ্ত্তা অসংখ্য কৰ্ম্ম করেন, কিন্তু ভূ ধাতু যে ক্রিয়াকে নির্দেশ করে, সে ক্রিয়াটা তাঁর নিত্যক্রিয়া; এটির উপরে তাঁর অপর সকল কার্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্ত “অস্তি”, ক্রিয়াপদ হইয়াও, যতটা জোর করিয়া বাক্যের সকলপদের প্রথমে যাইয়া বসিতে পারে, অপর ক্রিয়াপদে সৰ্ব্বদা তাহা পারে না। যেখানে ক্রিয়ার উপরেই জোর দিতে চাই, কৰ্ত্তা বা কৰ্ম্মের উপরে নহে,—ক্রিয়াটাই যেখানে আমাদের চিন্তার বা মননের বা জ্ঞানের মুখ্যবস্তু, সেখানে ক্রিয়া ত বাক্যের প্রথমে আপনি আসিয়া বসিবেই। “শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ”—এখানে শুনানটাই মূল কথা, সুতরাং “শৃণ্বন্তু” বলিয়া বাক্যের সূচন হওয়াই গত্য ও স্বাভাবিক। বাঙ্গালাতেও “যাচ্ছে কেমন”, “খাচ্ছে কেমন”, “গাচ্ছে কেমন”, এ সকল অতি শিষ্ট-প্রয়োগ। যাওয়া, খাওয়া, গাওয়া, প্রভৃতি ক্রিয়ার উপরেই বক্তার মনের ঝোঁক রহিয়াছে, আর মনের ঝোঁক যার উপরে, ভাষাতে সে’ই সকলের আগে আসিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সচরাচর সহজ অবস্থায় আমাদের মনের ঝোঁকটা কৰ্ত্তার উপরেই পড়ে, ক্রিয়ার উপরে পড়ে না বলিয়া, ভাষার সাধারণ নিয়ম এই যে কৰ্ত্তৃপদই বাক্যের সকলের আগে বসিবে। যেখানে কৰ্ম্ম বা ক্রিয়াপদ প্রথমে বসে সেখানে কোনও বিশেষ কারণে বক্তা বা লেখকের দৃষ্টি কৰ্ত্তার উপরে আগে না পড়িয়া কৰ্ম্ম বা ক্রিয়ার উপরে পড়িয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। আর এই বিশেষ কারণটা সঙ্গত এক যথেষ্ট কি না, তারই উপরে এরূপ প্রয়োগ শিষ্ট-প্রয়োগ না অপপ্রয়োগ, ইহা নির্ভর করিবে।

শ্রীনিপিনচন্দ্র পাল।

“ডালিম”

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ প্রমোদ হাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত কখনও সেই যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক-রক্ত-নীর উৎসবের মত কাটাইয়া দিয়াছি। কখন আরম্ভ হইল কখন শেষ হইল বুঝিতেও পারিলাম না। কোনও সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্ত কোনও আপশোষও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল—আছে তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্বদাই এক বিশাল সমতল ভূমির মত মনে হইত, জীবনের রাজপথে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে আর হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায় কাঁটার অঁচড় লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই প্রাণটাকে আনন্দ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ প্রায় বুড়া হইতে চলিলাম, আজ তার জন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন অন্ধকার হইয়াছে। সে কতদিনকার কথা। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। কত খুঁজিয়াছি—কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে “ডালিম” বলিয়া ডাকিত।

সে দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিত আমি এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তার মুখখানি এখন পর্য্যন্ত আমার প্রাণে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে! মাথায় অন্ধকারের মত এক রাশ চুল, মুখে একটা গভীর পাগল-করা ভাব, আর তার চোখ দুটা?—চাহিবামাত্র আমার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু এমন বিবাদের প্রতিমূর্ত্তি, চোখে এমন গদগদ করুণভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় আর কখনও দেখিবও না।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণ বাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটা খুব বড়, ফটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক দূর গেলে বাড়ীটা পাওয়া যায়। বাড়ীর সামনেই একটা ঘাট-বাঁধান পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই সান-বাঁধান লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইতে হয়। সেদিন বন্দোবস্তের কোন অভাব ছিল না। নানা রকমের প্রচুর সুরা, নানা রকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ-মন্দির দিনের মত জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছিতে একটু দেরী হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। তাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মত সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই স্নানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্বর-ধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটিকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু সর্বদাই হাল্কা মনে ফুর্তি করিতে গিয়াছি। সেদিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়ীতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে, গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাইতেছে—“চমকি চমকি যাও”। ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সেদিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি সপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইতেছে “চমকি চমকি যাও”! আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চোঁচাইয়া উঠিল—“কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ, দাদা আগিয়া”। একজন বলিল, “দাদা এই লাও একপাত্র চড়াও, আনন্দ কর”। আর একজন গান ধরিল “এত গুণের বঁধু হে”। আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইতে লাগিল—“কাঁটা বনে তুলতে গিয়ে কল-ক্লেরি ফুল! ওগো সই কলক্লেরি ফুল!” আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল “দেখলে তারে আপন হারা হই”। আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন “দাদা হেসে নাও দুদিন বইত নয়, কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়!” সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধূঁয়া, গানের ধ্বনি, শারঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তব্‌লার টাটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোকে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেক বার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সেদিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল—বিডন ষ্ট্রীটের সুলীলা, হাতি বাগানের সুরী, পুঁতুল কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক;—কিন্তু সে দিন যেন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল, “ডালিম”। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও মেয়েটাকে আগে কখনও দেখি নাই। সে বলিল “বাস্ ওকে জান না? ও যে ডালিম, সহর মাত্ করেছে, অনেক কাপ্তুন ভাসিয়েছে”। আমি বলিলাম “কাপ্তুন ভাসানর মত চেহারা ত ওর নয়। ও যে এক কোণে সরে বসে আছে।” বন্ধু বলিল “ওই ত ওর ঢং, ও অমনি করে’ লোক ধরে”। আমার মন তাহা মানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সেও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম—তাহার চাহনীতে কি ছিল—আমি কেমন করিয়া বলিব—আমি যে নিজেরই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইল সেই অমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দুটী যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা ত বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল “ডালিম, একটা গাও”। আর একজন বলিল “ডালিম ভাল গাইতে পারে না”। আমি তাহার দিকে চাহিলাম। সে বুঝিল, বলিল—“আমি ভাল গাইতে পারি না”। আমি বলিলাম “গাও না” ? সে একটু সরিয়া আমার সামনে আসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সেগানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না; কিন্তু সেগানে বাহা ছিল, তাহা আর কখনও কোন গানে পাই নাই। মনে হইল ওই গানের জম্মই আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়াছিল। চোখের জলে ভেজা ভেজা সেই সুর, সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিन्दুর মত ঝলিতেছিল। সেই সুরের প্রত্যেক সুর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতই ঝলিতেছে। ডালিম গাহিতেছিল :—

“কেমন করে মনেরা কথ কইব কাণে কাণে ।
 প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে ।
 আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
 গন্ধ টুকু রেখে বঁধু হিয়ার হিয়ায় !
 প্রাণের পাতে ফুলের মত
 রাখব তোমায় অবিরত
 তফাত্ থেকে দেখব শুধু, রাখব প্রাণে প্রাণে ;
 প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে, কাহার কঠিন টানে ॥”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কখনও গান শিখেছিলে ? সে বলিল “না, ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই ।” আমি বলিলাম—আমি এমন গান কখনও শুনি নাই । তুমি কোথায় থাক ? সে কোন কথা বলিল না । আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—এই গানটী আমাকে একলা একদিন শুনাইবে ? সে কোন উত্তর দিল না । আমি বলিলাম—এসব তোমার ভাল লাগে ? তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কোন কথা বলিল না ।

আমার বন্ধুদের তখন প্রায় সকলেরই মত অবস্থা । একজন উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেকট্রিক্ বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিল ।

আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম । সে কিছু বলিল না । তার পর,—তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম । আমিও দাঁড়াইলাম । তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম—আমার সঙ্গে চল । সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল ।

কোথায় যাইব মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই । সিঁড়ি দিয়া নামিলাম । তার পর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতামণ্ডপে গেলাম । তখন চাঁদের আলো আরও স্নান মনে হইতেছিল । পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়া মাত্র পড়িয়াছে । বাতাস বন্ধ । ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে । মনে হইল আকাশে যেন একটু মেঘ উঠি-

যাচ্ছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাই-
 লাম। আমার সর্ব শরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের
 ভিতর ধপ্ ধপ্ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি
 তাহার হাত দুটা ধরিয়া বলিলাম—ডালিম, আমার তোমাকে বড়
 ভাল লাগে। আমার ত এমন কখনও হয় নাই। সে বলিল—“ও
 কথা ত সবাই বলে, মনে করিয়াছিলাম তুমি ওকথা বলিবে না।”
 আমি বলিলাম—তুমি ত আমাকে চেন না। তাহার একখানি হাত
 আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল,—“তোমার কি হইয়াছে?”
 আমি বলিলাম—“জানি না। ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া কোথাও
 পালাইয়া যাই। এত দিনের জীবনযাপন সবই মিথ্যা মনে হই-
 তেছে”। সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার
 বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও
 চোখে জল আসিয়াছিল, কোন কথা বলিতে পারি নাই। সে
 যতই কাঁদিতে লাগিল, ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম।
 মনে হইল ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শাস্ত করি।
 এক নিমেষে আমার সংসারের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশী-
 থের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়, আমার জীব-
 নের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা এক মুহূর্তে
 কোথায় মিলাইয়া গেল! একি সেই আমি? আমার মনে হইতে
 লাগিল আমি যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি, এই মাত্র এক নূতন
 জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থা স্থখের কি দুঃখের আমি
 আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে
 লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগি-
 লাম—হে আমার ব্যথিত, পীড়িত! এস তোমার চোখের জল
 মুছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে
 থাকিও না—আমার বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠ। আমিও তোমাকে
 বুকে করিয়া জীবন সার্থক করি। কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত

হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—“আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল যাও, তাই আমি আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর হইতে বলাইতেছে। শুনিলে?” আমি বলিলাম—শুনিল; শুনিলার জন্তই তোমাকে এখানে আডাল করিয়া আনিয়াছি। সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মত বাজিতে লাগিল,— আজও বাজিতেছে!

সে বলিল :—আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন, ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরামত্ত, তাহার কাছে থেকে কখন ভাল ব্যবহার পাই নাই। মামী আমাকে একটা বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটুস্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমার মামাত ভাই আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বার বৎসর বয়স তখন তিনি মারা যান; তারপর চারি বৎসর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহা তোমার না শুনাই ভাল। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তার পর চার বৎসর শশুরবাড়ীতে ছিলাম। এই চার বৎসরের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে বোধ হয় ছয় সাত দিনের বেশী দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। কখন কখন দুএক দিনের জন্ত বাড়ী আসিতেন। বাড়ীতে আসিলেও বাহির বাড়ীতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই এক বার দেখা হইয়াছিল, কখনও কথাবার্তা হয় নাই। তাঁহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চার পাঁচটা ছেলে মেয়ে ছিল। আমার শাশুড়ী তাঁহার বিমাতা। আমার কথা

কহিবাব কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও থাইয়াছি। বাড়ীতে ঐ ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেজে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ীর কাছে নদী, সেই নদীতে—মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে এই চা'র বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গালা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটি প্রদীপ জালিয়া পড়িতাম। আমার শ্বাশুড়ীর তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেই দিনই মনে স্থির করিলাম এ বাড়ীতে আর থাকিব না। পাড়ার একটি ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, তাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—আমাকে আমার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার ? সে বলিল—কত দূর ? আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল—নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে। আমি বলিলাম—যতদ্রুতই লাগে আমাকে লইয়া যাও। এই বলিয়া তাহার পায় আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—আচ্ছা তুমি এইখানে বস', আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি। সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। তাবিলাম এইবার যমের বাড়ী ছাড়িয়া আমার বাড়ী যাইতেছি। যতদ্রুত নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার

দিকে চাহিয়াছিল, কোন কথা বলে নাই ; শুধু চাহিয়াছিল, আমার মনে হইতেছিল তাহার চোখ দুটা যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চূপ করিয়াছিলাম।

যখন আমার বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায় পড়িয়া কাদিতে লাগিলাম, বলিলাম আমি পালাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আর যাব না। “আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও”। মামী কৰ্কশস্বরে বলিলেন “পালিয়ে এসেছিস্—কার সঙ্গে ?” আমি সে কথার অর্থ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটাকে দেখাইয়া বলিলাম “এর সঙ্গে”। মামী বলিলেন—“এ কে ?” আমি বলিলাম—“জানি না”। মামী বলিলেন, “আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ’বে না”। আমি কোথায় যাব ! মামী বলিলেন ‘গোলায়’, বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

আমি চক্ষু অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব ? কোথা যাব ? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যদিকে লইয়া গেল সেদিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা যাইবে ? সে বলিল ‘কলুকাভায়’,। তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাদিয়া বলিলাম—আমাকে রক্ষা কর ;

আবার আমাকে শশুর বাড়ী লইয়া চল। সে কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিল, তারপর বলিল “আচ্ছা”। কিন্তু ফের সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম।

ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শশুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল, আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শ্বশুরী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়া ‘মা, মা’ বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল—“গোল্লায় যাও”। আমি ফিরিলাম, দেখিলাম সে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঠিক তেমনি করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম—“আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাও”।

তখন নিশ্চয়ই সূর্য উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার—মনে হইল যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোন অদৃশ্য বলিদান-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তার পর ?

তার পর কলিকাতায় আসিলাম। শুনিলাম সে কোন জমিদারের ছেলে। কর্ণওয়ালিশ দ্বীটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া দু’জনে থাকিলাম। সাত দিন সে আমার গায় গায় লাগিয়াছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তার পর ?

এখন আমি কলকাতার ডালিম। আমার স্থখের শেষ নাই। সহরের বড় বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়।

আমার বাড়ীতে সাজ সজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট, হীরার গহনা। বাড়ীতে ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক পাখা, দাসদাসীর অন্ত নাই, আলমারি ভরা কাপড়, বাস ভরা টাকা।

“আমি কল্কাতার ডালিম, কিন্তু”—কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দু’হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নার লেশ মাত্র নাই। সেই লতা-মণ্ডপ গাঢ় অন্ধকারে ভরা। তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। আমি সেই অন্ধকারে তার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—“কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়?”

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। তার পর বলিল “তোমার আমাকে ভাল লাগিয়াছে? তোমার মত আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না? আমি যখন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে? এখন—এখন তোমাকে ত কিছু দিবার নাই”।

এই বলিয়া সে আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম—আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমাকেই চাই। এই বলিয়া দুইজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। সেই অন্ধকারে তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মত জ্ঞান-হারা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম? মনে হইতেছিল আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম,—সে জগতে আর কেহ নাই! চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি।

প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা অতি গভীর পাতাল আছে, সেদিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম—ডালিম !

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া দেখিলাম ডালিম আমার কাছে নাই ! আমি অস্থির হইয়া গেলাম, পাগলের মত ছুটাছুটা করিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল “কি বাবা, একেবারে উধাও”। আমি তাহাকে গালি দিলাম। আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। ফটকে গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম “কোই বিবি চলা গিয়া ?” এক জন গাড়োওয়ান বলিল “হাঁ বাবু, এক বিবি আভি চলা গিয়া”। আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম “ডালিম কোথায় থাকে ?” এবার আর কেহ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটর-কার করিয়া তাহার বাড়ী গেলাম। শুনিলাম, ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না, ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মত ছুটাছুটা করিলাম। পরদিন প্রভাতে আবার ডালিমের বাড়ী গেলাম। বী বলিল, সে শেষরাত্রে এসেছিল, আবার ভোর না হ’তেই চলে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে, তাহাকে বলে গেছে—সকালে একজন বাবু খোঁজ করতে আসবে, তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্।

আমি সেই চিঠিখানি লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানি পড়িলাম :—

তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে করিও

আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই—মরিতে পারিব না! তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাকে সুখ বলে তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাতে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণ সর্বস্ব! আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই!

ডালিম

শক ও শকাব্দ

প্রাচীনকালে শক জাতি ভারতবর্ষে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারত-ইতিহাসের যে যুগকে আমরা আজকাল পৌরাণিক (Traditional) যুগ বলিয়া থাকি, সেই যুগে শকজাতির প্রতিষ্ঠার কথা মহাভারত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগে শকজাতির বৃত্তান্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণ ও জৈনগ্রন্থ প্রভৃতি হইতে জানিতে পারা যায়। এই সকল গ্রন্থেও যে সমুদয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই যে সর্বাংশে সত্য, এরূপ অনুমান করাও সম্ভব নহে। কিন্তু শকজাতি যে ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে বিশেষ ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল, পূর্বোক্ত গ্রন্থসকল হইতে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায়।

শকজাতি কর্তৃক স্থাপিত ‘শকাব্দ’ নামক সুপ্রসিদ্ধ অব্দই অতীত কালে ভারতবর্ষে শকজাতির প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট প্রমাণ। খৃষ্ট জন্মের ৭৮ বৎসর পরে এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বহুস্থানে ইহার প্রচলন আছে। কোন কোন প্রদেশে ইহা ‘শালিবাহন শক’ নামে পরিচিত এবং এই কারণে এদেশের সাধারণ লোকের ধারণা যে, দাক্ষিণাত্যের খ্যাতনামা শালিবাহন নৃপতি কর্তৃকই এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এবং কোন কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালী গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ দেখিয়াছি। কিন্তু বস্তুতঃ এ ধারণাটা নিতান্তই অমূলক। ‘শকাব্দ’ এই নামটিই এই অব্দের প্রকৃত উৎপত্তির পরিচায়ক। কিন্তু এ বিষয়ে আরও নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই অব্দের পঞ্চশততম বৎসরে উৎকীর্ণ বাদামীগুহাস্থিত শিলালিপিতেই প্রথমে এই অব্দের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। “শক রাজার অভিষেকের পঞ্চশত বৎসর পরে”,—শিলালিপির এই সুস্পষ্ট বাক্য

পড়িয়া শকাব্দের উৎপত্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত প্রমাণ ছাড়াও ভারতবর্ষে শকজাতির প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট প্রমাণ স্বরূপ দুইখানি শিলালিপির উল্লেখ করিতে পারা যায়।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ডাক্তার বার্গেস্ মথুরার ভূগর্ভে একখণ্ড প্রস্তর প্রাপ্ত হন। তদুপরি উৎকীর্ণ লিপিতে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি খোদিত রহিয়াছে

১ম পংক্তি “(ন) মো অরহতো বর্দ্ধমানস্ত গোতিপুত্রস পোঠয়সক

২ম পংক্তি কালবালস

৩য় পংক্তি (ভার্য্যায়ে) কোশিকিয়ে সিমিত্রায়ে (শিবমিত্রায়ে ?)

অয়াগপটো প্রতি (প্রতিষ্ঠাপিত)

ডাক্তার বুলার “এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা” প্রথম সংখ্যার ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

“অরহৎ বর্দ্ধমানকে নমস্কার পূর্বক, পোঠয় ও শকজাতির পক্ষে কালসর্পস্বরূপ গোতিপুত্রের পত্নী, কোশিক গোত্র সমুদ্ভূতা, শিবমিত্রা কর্তৃক ‘অয়াসপট’ * প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার মধ্যে গোতিপুত্রের বিশেষণটি আমাদের পক্ষে অনুধাবনার বিষয়। তাঁহাকে “পোঠয় ও শকজাতির পক্ষে কালসর্পস্বরূপ” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে গোতিপুত্র পোঠয় (মহাভারতোক্ত প্রোষ্ঠ) ও শকজাতিকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, ইহাই উক্ত বিশেষণটিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। “বৈরী মন্তেভ সিংহ” প্রভৃতি বিশেষণ ইহার সঙ্গে তুলনীয়। গোতিপুত্রের বিশেষণটি হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, এককালে শকজাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল।

* ভাস্কর্য-কলাকুশলসম্পন্ন প্রস্তরখণ্ডবিশেষ। ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রণীত “এটিকুইটিস্ অফ্ মথুরা” নামক গ্রন্থে কয়েকখানি অয়াসপটের প্রতিকৃতি দেওয়া আছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি মথুরায় প্রাপ্ত ‘সিংহ’ আকৃতি সম্পন্ন স্তম্ভ-চূড়ায় খোদিত। ইহার আবিষ্কর্তা পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই লিপির নিম্নলিখিতরূপ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

“সর্বস্বস সকন্তনস পুয়ায়ে”

অর্থ,—সমগ্র সকস্থানের পুণ্যের নিমিত্ত।

পণ্ডিতজীর মতে সকস্থানের অর্থ শকগণের বাসভূমি। শকস্থান নামক সুপ্রসিদ্ধ দেশ বর্তমান কালের ‘সিষ্টান’ প্রদেশ। কারণ ইসিডোর নামক ১ম শতাব্দীর জনৈক লেখকের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ সময়ে বর্তমানে যেখানে সিষ্টান প্রদেশ তথায় বহুসংখ্যক শকজাতীয় লোক বাস করিতেন এবং তদনুসারে উক্তস্থান শকস্থান নামে সাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিল। ইহাও সহজেই অনুমিত হয় যে সিষ্টান শকস্থানেরই অপভ্রংশ।

উপরোক্ত শিলালিপিটির মর্ম্ম এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে, কোন বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঐ স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকারীগণ স্তম্ভচূড়ায় স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে যাহারা মন্দিরাদি স্থাপনা করিতেন অথবা তথায় দানাদি করিতেন, তাঁহারা স্বীয় নাম, এবং কাহার পুণ্যার্থে উক্ত দানক্রিয়া সাধিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ খোদিত করিয়া রাখিতেন। সুতরাং একথা সহজেই উপলব্ধি হয় যে শকজাতীয় কোন ব্যক্তি উক্ত বৌদ্ধ মন্দির স্থাপনা বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার কর্ম্মের ফলস্বরূপ তিনি যেটুকু পুণ্যের প্রত্যাশা করিতে পারিতেন তাহা সুদূরস্থিত স্বদেশের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছেন। সাধারণতঃ লোকে নিজের বা নিজের আত্মীয় স্বজনের—পিতামাতা পুত্র ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির পুণ্য কামনা করিয়া থাকে—কিন্তু এই স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি তৎসমুদায় উপেক্ষা করিয়া তাঁহার

সমগ্র পুণ্যকল নিজের দেশকে অর্পণ করিয়াছেন, এবং প্রস্তরগাত্রে তাঁহার স্বদেশবাৎসল্য চিরদিনের নিমিত্ত সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই হিসাবে এই সংক্ষিপ্ত লিপিখানির অমূল্য হইলেও, আমাদের নিকট ইহার বিশিষ্ট মূল্য এই যে ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করে যে এক-কালে শকজাতি মথুরায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।*

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল তাহার উদ্দেশ্য এই কথাটি প্রতিপন্ন করা যে ভারতবর্ষে শকজাতির প্রাধান্যবিস্তার কেবল মাত্র আমাদের দেশের পুরাণ-কথা (tradition) নহে, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণেরও অভাব নাই। এত বিস্তার করিয়া লিখিবার কারণ এই যে বর্তমানে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ উক্ত পুরাণকথার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শকজাতি কোনকালেই আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্যলাভ করে নাই এবং শকাব্দাও তাহাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; শকাব্দ নামে যে বর্ষগণনা অধুনা প্রচলিত তাহা হিন্দু জ্যোতিষীগণের কারসাজিমাত্র। ইহার অনুরূপ আর একটি যুক্তি ফাগুর্সন সাহেব কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

তাহার মতে বিক্রম-সংবৎ অর্দ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক স্থাপিত হয় নাই (কারণ বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজাই এদেশে ছিল না) এবং ৫৭ খৃঃ পূর্বাব্দেও তাহার গণনা আরম্ভ হয় নাই। ৫৪৩ খৃঃ অব্দে এই অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ‘ধৃষ্ট ব্রাহ্মণপণ’ ইহাকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ইহার বর্ষগণনা ছয় শত বৎসর পশ্চাৎপদ করিয়া দিয়াছিল। ফাগুর্সন সাহেবের সিদ্ধান্তের শোচনীয় পরিণাম সকলেই অবগত আছেন। আমাদের ভরসা আছে ফ্রীট সাহেব উদ্ভাবিত অপর সিদ্ধান্তের পরিণামও তাহাই হইবে।

* এই দুইখানি শিলালিপির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত বিশেষজ্ঞের জন্য নহে, সুতরাং এবিষয়ে কোন বাদানুবাদ না করিয়া আমাদের মতে যে অর্থটি প্রকৃষ্ট তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

এ বিষয়ে আরও একটু রহস্য আছে। ফাগু'সগ সাহেব বিক্রমাদিত্য ও তৎপ্রতিষ্ঠিত অন্ধের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শকাব্দ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতে বাস্তবিক ৭৮ খৃঃ অন্ধেই ইহার আরম্ভ এবং শকরাজা কর্তৃকই ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। এই শকরাজা কনিষ্ক। ফ্লোট ইহার ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। শকগণ কর্তৃক শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার মতে বিক্রমসংবৎ বাস্তবিকই খৃঃ পূঃ ৫৭ অন্ধে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং এই বিক্রমাদিত্য কনিষ্ক। ফাগু'সগের মতে বিক্রমসংবৎ ধূর্ত ব্রাহ্মণগণের ছলনামাত্র, কিন্তু শকাব্দই প্রাচীন ভারতের প্রকৃত অন্ধ। ফ্লোটের মতে শকাব্দ জ্যোতিষীগণের কারসাজি মাত্র, পরন্তু বিক্রমসংবৎই আর্য্যাবর্তের ইতিহাস-বিখ্যাত অন্ধ (the historic era of Northern India)

আমরা দেখিয়াছি শকজাতি এককালে ভারতবর্ষে প্রাধান্যলা করিয়াছিল। তাহাদের আদি বাসস্থান কোথায়, কবে কিরূপে তাহার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, এখন তারই অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইব।

চীনদেশীয় গ্রন্থ ও গ্রীক লেখকদিগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে শকজাতি জাক্সার্টেস্ (সিরদরিয়া) নদীর তীরে বাস করিত। ক্রমে বংশবৃদ্ধি হইলে তাহারা সিরদরিয়া ও অকসাস্ (আমুদরিয়া) নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ অধিকার করে। এই সময়ের মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত হিয়ংনু নামক জাতি পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং পার্শ্ববর্তী ইয়ু-চি জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করে। পরাজিত ইয়ু-চিগণ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ক্রমে শকরাজ্য অধিকার করিয়া তথায় বসবাস করে। এইরূপে শকগণ তাহাদের আদিম বাসস্থান হইতে তাড়িত হয়। এই ঘটনা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

শকগণ পরাজিত হইয়া পশ্চিমদিকে প্রস্থান করে এবং আমুদরিয়া

পার হইয়া বক্ত্রিয়া প্রদেশ অধিকার করে। তৎকালে এই প্রদেশে গ্রীকগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ আলেকজান্ডার ভারত অভিযানের পূর্বে এই বক্ত্রিয়া প্রদেশ অধিকার করেন, এবং সেই সময় হইতেই গ্রীকগণ এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই গ্রীকবংশের অন্যতম রাজা হেলিওক্লিসের রাজত্বকালে শকগণ বক্ত্রিয়া প্রদেশ অধিকার করে এবং গ্রীকরাজগণ কাবুলে ও ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

বক্ত্রিয়া প্রদেশের যে অংশ আমুদরিয়ার দক্ষিণে তাহাই মাত্র শকগণের অধিকারভূক্ত হয়। আমুদরিয়ার উত্তরে তাহাদের পরম শত্রু ইউ-চিগণ স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। চ্যাং-ফিয়েন নামক একজন চীনদেশীয় দূত এই সময়ে উক্ত প্রদেশে আগমন করেন এবং তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এই সময়ের ঘটনা ও অবস্থা কতক কতক জানিতে পারি।

শকগণ বক্ত্রিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়াই নিরস্ত থাকে নাই। অতঃপর তাহারা পার্শ্বিয়া * রাজ্য আক্রমণ করে। এই পার্শ্বিয়া দেশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ মিথ্রাডেটিসের মৃত্যুর পর শকগণের আক্রমণে পার্শ্বিয়া রাজ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। রাজা দ্বিতীয় ফ্র্যাটেস্ শকগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং পরবর্তী রাজা প্রথম আর্ন্তবেনাসেরও ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটে। অবশেষে দ্বিতীয় মিথ্রাডেটিস তুমুল সংগ্রামের পর শকগণকে পরাভূত করেন।

এইরূপে শকগণ পার্শ্বিয়া হইতে দূরীভূত হইল। বক্ত্রিয়া প্রদেশে-

* বর্তমান কালের পারশ্ব ও তুর্কীস্থানের কিয়দংশ প্রাচীন পার্শ্বিয়ান জাতির সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল। পার্শ্বিয়ার সম্রাটগণ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং বহুবর্ষ পর্যন্ত তাহারা পূর্ববিখ্যাত রোম সাম্রাজ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।

শেও তাহাদের অধিকার অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। যে ইয়ু-চি জাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়া, স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ পূর্বক, দীর্ঘ পথ ভ্রমণ ও বহুক্লেশের পর, অবশেষে তাহারা বস্তুি়া প্রদেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সেই ইয়ু-চি জাতির পরাক্রমেই আবার তাহাদিগকে এই নূতন আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিতে হইল। পূর্বেই বলিয়াছি আমুদরিয়ার দক্ষিণে শকগণ বাস করিত, এবং ইহার উত্তর ভূভাগ ইয়ু-চিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র একটি নদী, কিন্তু ক্রমে ইয়ু-চি জাতি এই ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিল, এবং শকগণের দুর্ভাগ্য আবার তাহাদিগকে নূতন আশ্রয় স্থান অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিল। তাহাদের উত্তরে ও পূর্বে ইয়ু-চি জাতি, সুতরাং এ দুই দিক এক প্রকার বন্ধ। পশ্চিমে পার্থিয়া রাজ্যের সেখান হইতেও বহুকাল সংগ্রামের পর তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ; বাকী এক দক্ষিণ দিক। নিরুপায় হইয়া শকগণ দক্ষিণ দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্তমান আফগানিস্থানের দক্ষিণাংশই সম্ভবতঃ শকগণের প্রথম উপনিবেশ হইয়াছিল, কারণ ইহার অন্তর্গত একটি প্রদেশ তাহাদের নামানুসারে শকস্থান নামে পরিচিত হইয়াছিল। এইরূপে ঘটনাচক্রের প্রভাবে এই শকজাতি মধ্য এশিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

এপর্যন্ত শকগণের সম্বন্ধে যে সমুদয় বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা চীনদেশীয় ইতিবৃত্ত হইতে সংগৃহীত। কিন্তু চীনদেশীয় গ্রন্থে শকজাতির ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ হইয়াছে। শকস্থানে উপনিবেশ স্থাপনের পরে শকদিগের জাতীয় জীবনে আর কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, বিদেশীয় কোন গ্রন্থ হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যেটুকু উদ্ধার হইয়াছে তাহাতে এই শকজাতির বিবরণ কতক জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত

ভারতবর্ষের পুরাণ-কথাও তাহাদের দাহিনী সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রথমতঃ ইতিহাসের দিক দিয়াই দেখা যাউক। তক্ষশিলা এবং তৎসন্নিহিত অপরাপর স্থানে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদায় এবং তক্ষশিলায় প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপির প্রামাণ্যে আমরা পশ্চিম ভারতবর্ষের এক পরাক্রান্ত রাজবংশের পরিচয় পাই। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (সম্ভবতঃ) মগ্ বা মগ। এই বংশের অপরাপর রাজার নাম অ্যাজেস্, অ্যাজিলাইসিস্, অ্যাজেস্ (দ্বিতীয়)। নাম প্রভৃতি দৃষ্টে এই রাজগণকে শক জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রায় সকলেই ইহাদিগকে শকজাতীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে শকজাতিকে আমরা শকস্থানে এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেখিয়াছি তাহাদেরই একদল সিন্ধু-নদ পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করে। ঠিক কোন সময়ে মগ ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মগ সিংহাসন আরোহণ করেন। কারণ মগের মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি কান্দাহার প্রদেশের ভনোনিস্ নামক রাজার সমসাময়িক। এই ভনোনিস্ ও পার্থিয়ার রাজা ভনোনিস্ অভিন্ন ব্যক্তি কল্পনা করিতে পারি, কারণ কান্দাহার প্রদেশের প্রাপ্ত ভনোনিসের মুদ্রায় পার্থিয়ার রাজার পদবী ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মুদ্রা দৃষ্টে জানা যায় যে যদিও কান্দাহার উক্ত ভনোনিসের অধীন ছিল, তথাপি ভনোনিস নিজে কান্দাহার শাসন করিতেন না, তাঁহার ভ্রাতা তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন। ওদিকে আবার ইসিডোর নামক লেখকের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারি যে প্রথম শতাব্দীতে কান্দাহার প্রদেশ পার্থিয়ার রাজার অধীন ছিল। পার্থিয়ার রাজগণ যে ভ্রাতা বা অশ্ব নিকট-আত্মীয়ের দ্বারা দূরস্থিত প্রদেশসমূহ শাসন করাইতেন তাহাও পার্থিয়ার ইতিহাস হইতে

জানিতে পারা যায়। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় কান্দাহারে প্রাপ্ত মুদ্রার ভনোনিষ্ ও পার্থিয়ার ভনোনিষ্ অভিন্ন ব্যক্তি। পার্থিয়ায় ভনোনিষ্ নামে দুইজনে রাজা ছিলেন। পূর্বে-
লিখিত ভনোনিষ্ ইহার মধ্যে কোন জন তাহা জানিবার উপায় নাই।
কিন্তু দুইজনেই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। সুতরাং
ভনোনিষের সমসাময়িক তক্ষশিলার শকরাজা মগও খৃষ্টীয় প্রথম শতা-
ব্দীর লোক এইরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারি।

ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় শকজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।
কালকাচার্য্য নামে জৈনগুরুর জীবন কাহিনী বহু জৈনগ্রন্থে লিপি-
বদ্ধ আছে। ইহা “কালকাচার্য্য কথা” নামে সুপ্রসিদ্ধ। ‘কালকাচার্য্য
কথার’ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে একদা গুরু কালকাচার্য্য স্বীয় ভগিনী-
সহ উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হন। উজ্জয়িনীর রাজা গর্দভিল্ল
কালকাচার্য্যের ভগিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ
করেন। কালকাচার্য্য ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুনদ পার
হইয়া শকরাজ্যে গমন করেন। এই রাজ্যে বহুসংখ্যক সামন্ত
শক নরপতি বাস করিতেন—তাহারই একজনের আশ্রয়ে কালকা-
চার্য্য বাস করেন। ক্রমে তিনি এই নরপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র
হইয়া উঠেন। অবশেষে কালকাচার্য্য এই শকনরপতিকে ভারতবর্ষ
আক্রমণের পরামর্শ দেন এবং নিজে পথ প্রদর্শক হইয়া তাহার সৈন্য
উজ্জয়িনীতে লইয়া যাইবেন এইরূপ অঙ্গীকার করেন। উক্ত সামন্ত
নরপতি এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং অপর কয়েকজন সামন্ত
নরপতির সাহায্যে উজ্জয়িনী আক্রমণ ও অধিকার করেন। রাজা
গর্দভিল্ল নিহত হন, কিন্তু তাহার পুত্র বিক্রমাদিত্য নানাস্থানে ঘুরিয়া
সৈন্য সংগ্রহ করতঃ চারিবৎসর পরে শকগণকে বিতাড়িত করিয়া
পিতৃরাজ্য পুনরায় অধিকার করেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করি-
বার মানসে বিক্রম-সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমাদিত্য ও তাহার
পুত্র-পৌত্রগণ মোট ১৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে

পুনরায় শকগণ উজ্জয়িনী অধিকার করে এবং শকাব্দের প্রতিষ্ঠা করে।

উল্লিখিত কাহিনী সর্বাংশে সত্য কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার কোন কোন ঘটনার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কালকাচার্য্য সিন্ধুনদ পার হইয়া শকগণের রাজ্যে গিয়াছিলেন কাহিনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে। ঠিক ঐ সময়ে যে শকগণ আফগানিস্থানের দক্ষিণভাগে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন আমরা পূর্বের তাহা দেখিয়াছি।

‘কালকাচার্য্য কথা’ হইতে জানা যায় যে শকগণ ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী অধিকার করে এবং ঐ সময়ে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনাটিও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়। ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী এক পরাক্রান্ত রাজবংশ তিন শত বৎসরেরও অধিককাল মালব ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে রাজত্ব করেন, ইহা আমরা শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে জানিতে পারিয়াছি। ইহারা যে শকবংশীয় তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহাদের আদিপুরুষ চফ্টন উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন, তাহা আমরা টলেমির গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। এই চফ্টন কোন সময়ের লোক সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু সম্প্রতি নবাবিকৃত শিলালিপির প্রমাণে প্রতিপন্ন হয় যে চফ্টন আনুমানিক ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।* সুতরাং কালকাচার্য্যের কাহিনীর এই অংশ সর্বথা সত্য বলিয়া মনে হয়।

উজ্জয়িনীর এই শকজাতীয় রাজবংশের আদিম ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। কিন্তু পূর্বের আমরা শকজাতির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার সহিত কালকাচার্য্যের উপাখ্যান সংযোগ

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কারণাবলী যাহারা জানিতে চাহেন তাহারা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত “Date of Chastana” নামক আমার প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। (J.—A. S. B. June, 1914)

করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে শক-স্থান ও তৎসম্বন্ধিত প্রদেশে যে সমুদায় শকজাতীয়গণ বাস করিত তাহাদেরই একদল এইরূপে উজ্জয়িনী অধিকার করে।

উজ্জয়িনীর এই শক রাজবংশের একটি বিষয় বিশেষ প্রাধান্য যোগ্য। তাহাদের মুদ্রা ও শিলালিপিতে তাহারা বরাবর আপনাদিগকে ক্ষত্রপ বা রাজপ্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কোথাও আপনাদিগকে রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন নাই। তাহাদের শ্রায় পরাক্রান্ত রাজবংশের পক্ষে এরূপ করা বিশেষ আশ্চর্যের কথা। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে প্রথমে এই রাজবংশ অপর কোন রাজবংশের অধীন ছিল, এবং তাহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্যশাসন করিত। মারহাট্টা পেশবার শ্রায় পরিণামে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেও তাহারা সেই পূর্ব উপাধিই বজায় রাখিয়াছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার উজীরও এইরূপ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কোন্ রাজবংশের প্রতিনিধি-স্বরূপ ইহারা উজ্জয়িনী শাসন করিত? ইহার কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। তবে এক্ষেত্রে আমরা একটি অনুমান করিতে পারি। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি তক্ষশিলা এবং তৎসম্বন্ধিত প্রদেশে মগ নামক এক শক-রাজা স্থায়ী বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে সম্ভবতঃ এই মগ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। যদি তাহা হয় তবে খুব সম্ভব উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপ চফ্টন ইহারই প্রতিনিধি। এই অনুমানের সমর্থক দু একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উজ্জয়িনীর শক-রাজবংশের আদি পুরুষ চফ্টনের মুদ্রায় খরোষ্ঠি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীতে কিন্তু কোন কালেই খরোষ্ঠি অক্ষরের প্রচলন ছিল না। অপরপক্ষে তক্ষশিলায় এবং তৎসম্বন্ধিত প্রদেশে এই খরোষ্ঠিই প্রচলিত ছিল। সুতরাং চফ্টনের মুদ্রার খরোষ্ঠি অক্ষর তক্ষশিলার বা তদঞ্চলের কোন রাজার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় দান করে।

তক্ষশিলা নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রফলকে উৎকর্ণ একখানি লিপিতে তাহার তারিখ এইরূপ ভাবে দেওয়া হইয়াছে,—“মহারাজা মগের ৭৮ বৎসরে ।” কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“মহারাজা মগ কর্তৃক স্থাপিত অন্দের ৭৮ বৎসরে ।” ‘কালকাচার্য্য কথ্য’ হইতে আমরা জানিতে পারি যে শকগণ উজ্জয়িনী অধিকার করিলে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয় । আমরা দেখিয়াছি মগ সম্ভবতঃ খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন ;—সুতরাং অসম্ভব নহে যে মগই শকাব্দের প্রবর্তক ।

কিন্তু উভয়ের এই পরস্পর সম্বন্ধ সত্য অথবা কল্পিত হউক, তক্ষশিলায় ও উজ্জয়িনীতে যে দুইটী পরাক্রান্ত শকবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি । তক্ষশিলার রাজবংশ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই । সম্প্রতি মার্শাল সাহেব তক্ষশিলার অ্যাজেসের যে তাম্রলেখ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার তারিখ ১৩৬ বর্ষ । ইহা যদি শকাব্দ হয়, তবে এই বংশ ২১৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল বলিতে হইবে । কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ইহার বহু পূর্বেই এই রাজবংশ ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিয়াছিল । যে ইয়ু-চি জাতি, নিদারুণ অদৃষ্টলেখার শ্রায়, সর্বদা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়াইয়া ফিরিতেছিল, তাহাদেরই এক শাখা কুশাণবংশের দ্বারা ভারতবর্ষে শকদিগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয় । কিন্তু অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস ! এই চির-শত্রু কুশাণবংশের রাজা কনিষ্ক শকশ্রেষ্ঠ ও শকাব্দের প্রবর্তক বলিয়া অद्याপি কোন কোন ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন ।

তক্ষশিলার শকরাজবংশ অপেক্ষা উজ্জয়িনীর শকরাজবংশ অধিক-কাল স্থায়ী হইয়াছিল । ৭৮ খৃঃ অব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রায় ৪০০ খৃঃ অব্দে গুপ্তবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক ইহা ধ্বংস হয় । এই সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া শকরাজগণ

ভাবে, ভাষায়, ধর্ম্যে ও আচারব্যবহারে হিন্দু হইয়াছিলেন এবং পরিণামে তাঁহারা বিরাট হিন্দুজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে শকজাতির কাহিনী ভারত-বর্ষের ইতিহাসে একটি বিচিত্র ঘটনা। মধ্য-এশিয়ার সিরদরিয়ার পার হইতে বিতাড়িত হইয়া কত ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আসিয়া অবশেষে এই জাতি ভারতবর্ষে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার অনুরূপ ঘটনা আমরা আরও দেখিতে পাই,—দেখিতে পাই কত সভ্য অসভ্য জাতি ক্ষীণ-কায়া শ্রোতস্বিনীর ন্যায় সুদূর গিরিগাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া, অশেষ বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া, অবশেষে এই ভারতবর্ষের মহা মানব-সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচিত্র কবিপ্রতিভার ও বিরাট কল্পনার সাহায্যে যে মহামিলন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কেবল কবিত্ব হিসাবে নহে ঐতিহাসিক হিসাবেও সত্য।

শকজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে সেই মহান সত্যের একাংশ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।*

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

* প্রবন্ধশেষে পাঠকবর্গের প্রতি আমার এই অনুরোধ যেন তাঁহারা মনে রাখেন, এ প্রবন্ধ সর্বসাধারণের জন্য লিখিত, সুতরাং সবিস্তার বাদানুবাদ বা যুক্তিতর্কের স্থান এ প্রবন্ধে নাই। প্রবন্ধোক্ত অনেক মতবাদই সাধারণ প্রত্নতত্ত্ববিদগণকর্তৃক এখনও স্বীকৃত হয় নাই—তাহা প্রায়ই আমার নিজের মত এবং তাহার দোষগুণও সকলই আমার নিজের।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে ভাল লাগে। তারই জন্ম সুযোগ পাইলেই বৈষ্ণব পদাবলী শুনিতে যাই, আর অমন করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানাভাবে ও নানা অছিলায় কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করি। গত বৎসর নবপর্যায় “বঙ্গদর্শনে” কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্গদর্শন সম্পাদক প্রিয় সূর্য্য শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে “বঙ্গদর্শন” বন্ধ হইয়া গেল, আমার কৃষ্ণকথা ফুরাইল না। ফলতঃ “বঙ্গদর্শনে” এই আলোচনার মুখবন্ধ পর্য্যন্ত শেষ করিবার অবসর মিলে নাই। তাই আবার নূতন করিয়া “নারায়ণে” কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই বয়সে, এতদিন পরে, কৃষ্ণকথা যে মিষ্ট লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে ইহা দোষের কথা, ইহা জানি। কিন্তু এ দোষটা কি বয়সের, না রক্তের, এখনও ঠিক ঠাণ্ডা করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে শিক্ষার দোষ যে নয়, ইহা নিঃশঙ্কোচেই কহিতে পারি। বৈষ্ণব পরিবারে জন্মিয়াও কোনও দিন কোন প্রকারের বৈষ্ণব-শিক্ষা পাই নাই। ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈষ্ঠ সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে কোনও বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের বীজমন্ত্রই কেবল ভিন্ন, নতুবা বিবাহাদি সংস্কার এবং নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ উভয় সম্প্রদায়েরই এক। বীজমন্ত্র অতি গোপনীয় বস্তু, এ মন্ত্র নিজের রসনায় উচ্চারণ করিয়া নিজের কাণেও শুনিতে নাই। তাহাতে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সাধকের প্রত্যবায় হয়। কে কোন মন্ত্র জপ করে, অপরে তাহা শুনিতে পায় না। মা-বাবা কৃষ্ণমন্ত্রই জপ করেন, একটু বড় হইলে ইহা শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই কৃষ্ণমন্ত্র বস্তুটি যে কি, ইহা জানি নাই। বৈষ্ণব গৌসাইরা আমাদের কুলগুরু ছিলেন।

বয়স হইলে শুনিয়াছি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি খুব ভক্ত ও পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেবল দুর্গোৎসবের সময়েই আমাদের বাড়ী আসিতেন। তখন মহাপূজার ধুম লাগিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করিতেন। তন্ত্রধারক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, পুরোহিত সে মন্ত্রের আবৃত্তি করিয়া প্রতিমার পূজা করিতেন। ছাগাদি বলি হইত। দেবতার ভোগ লাগিত। গাঁতবাড় ও খাওয়াদাওয়ার আনন্দকোলাহলের মধ্যেই সকলে থাকিত। এই রাজসিক ব্যাপারের ভিতরে কৃষ্ণকথা বলিবার বা শুনিবার অবসর মিলিত না। আর গোস্বামী প্রভুরাও পূজার প্রণামা লইতেই আসিতেন, শিষ্যের বাড়ী ধর্মশিক্ষা দিতে আসিতেন না। ধর্ম্যে ধর্ম্যে একটা রেষা-রেষী না বাধিলে বিশেষ করিয়া ধর্মশিক্ষা দিবার কোনও প্রেরণাও ভাল করিয়া চাগিয়া উঠে না। বিশেষতঃ মধ্যযুগের গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্য আচারের ধর্ম্য, প্রচারের ধর্ম্য নয়। মতবন্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্যের আক্রমণের মুখে হিন্দু আজ আপনার ধর্ম্যপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, বাঙ্গালা দেশের পল্লিসমাজে, এই প্রচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। সে'কালে হিন্দু-সমাজে শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাও দেখা যায় নাই। শাক্ত গৃহস্থের বাড়ীতে রাসযাত্রা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের বাড়ীতে হামেশাই কালী দুর্গা প্রভৃতির পূজা হইত। শাক্তেরাও রাধাগোবিন্দের ভজন গাইতেন, বৈষ্ণবেরাও কালীদুর্গার নাম লইতেন এবং শ্যামা বিষয়ক মালসী গান ভক্তিভরে শুনিতেন ও গাহিতেন। বৈষ্ণব-সন্তান হইয়াও শৈশবে ও বাল্যে প্রতিদিনই আমি দুর্গানাম লইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম। আপদেবিপদে দুর্গা দুর্গা বলিয়াই ডাকিতাম। বিশেষ বিপন্ন হইলে উদ্ধারকল্পে কালী দুর্গার নিকটেই মানস বা “মানত” করিতাম। শৈশবে ও বাল্যে এক বৈরাগীদিগের মুখে, আর কখনও কখনও সন্ধ্যা আরতির কালেই, রাধা-কৃষ্ণের নাম শুনিতাম; অথবা কৃষ্ণনামের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ ছিল না।

কৃষ্ণকথা শুনিবার ও বুঝিবার সময়ও তখন আসে নাই। কৃষ্ণকথা ধর্মজীবনের আদি কথা নয়, শেষ কথা। ধর্মের গোড়ার কথা ভক্তি নয়, ভয়; রতি নয়, বিস্ময়। বহুদিন হইতেই নাকি আমাদের দেশের ধর্মো একটা উদ্ভট খিচড়ী পাকাইয়া গিয়াছে, তাই বৈষ্ণবেরাও “বিপত্তো মধুসূদন” বলিয়া ডাকেন। কিন্তু প্রকৃত কৃষ্ণোপসনার সাধ্য মধুসূদন নহেন। মধুসূদনকে ডাকে লোকে ভয়ে, কৃষ্ণকে ডাকিতে হয় ভক্তিভরে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভয় বা বিস্ময়ের সম্পর্ক নাই। কিন্তু শৈশবের ও বাল্যের ধর্ম ভয় ও বিস্ময়কে ধরিয়াই ফুটিয়া উঠে। শৈশবে দেবতার শরণ লইতাম ভয়ে বা লোভে। আর্ত বা অর্থার্থী হইয়াই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, কিম্বা ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিবার আশায়ই কালী দুর্গা প্রভৃতিকে ডাকিতাম। ইহাই সে বয়সের সহজ ধর্ম ছিল।

শৈশবের ও বাল্যের ধর্ম শাক্তের ধর্ম, খাঁটি বৈষ্ণবের ধর্ম নয়। সহজ স্বভাবের পথে চলিলে সকলকেই প্রথমে শাক্ত হইতে হয়, আর পরিণামে এই শাক্তধর্ম সাধন করিতে করিতেই তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া ব্রজের পথে দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু ধর্ম এখন আর সহজ পথে ত চলে না। এখন এ বস্তু পৈত্রিক, কৌলিক হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণবকূলে যে জন্মে, সে'ই বৈষ্ণব ধর্ম সাধন করিতে যায়। শাক্তকূলে যে জন্মিল আমরণ সে গতানুগতিকভাবে ঐ শাক্তধর্মই সাধন করে। হিন্দুধর্মে এখন অধিকার অনধিকার বিচার আর নাই। আছে কেবল কূলের বিচার। খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি ধর্ম যেমন মতবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দু-ধর্ম সেইরূপ কুলবদ্ধ হইয়াছে। তাই বালকেরাও বৈষ্ণব সাজিয়া বেড়ায়, বৃদ্ধেরাও শাক্ত থাকিয়া যান। প্রকৃতপক্ষে বাল্যের ধর্ম শাক্তের ধর্ম। কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতাই বাল্যকল্পনাকে জাগাইয়া তুলেন। এরই জন্য বাল্যকালে কালী দুর্গাকেই অমন করিয়া ডাকিতাম। কৃষ্ণনাম কীর্তন হইত, কিন্তু বালককে কেবল নাম দিয়া

ভুলান' যায় না। কৃষ্ণমূর্তির পূজাও বিরল ছিল। এক দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা, আর কোথাও কোথাও রাসের সময়েই কেবল রাধাকৃষ্ণের মূর্তির পূজা হইত। রাসযাত্রাতে মাটির মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইত, কিন্তু দোলযাত্রা বা ঝুলনযাত্রাতে গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহেরই ভোগ-আরতি হইত। এ বিগ্রহ পাথরের বা ধাতুর; আকারে ছোট; সকল সময়ে ভাল করিয়া নজরেও পড়িত না। এ মূর্তি দ্বিভুজ, নরমূর্তি। আর মানুষের বিগ্রহকে পূজা করা বড় কঠিন কথা। এ মূর্তি দেখিয়া প্রাণে ভয় বা বিস্ময়ের উদয় হয় না। কালীমূর্তি বা দুর্গাপ্রতিমা যেমন ভাবে চিত্তকে অভিভূত করিত, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে তেমনটা করিতে পারিত না। কালী দুর্গার মূর্তিতে প্রাণে দেবতা-জ্ঞান ফুটাইয়া দিত, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহেতে এটী করিতে পারিত না। কালী দুর্গাকে দেখিয়া মন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইত। এই ভয় ও এই বিস্ময় জড়াইয়া যে ভাবটা জন্মে, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহাকেই ঐশ্বর্য্য-বোধ কহে। রাধাকৃষ্ণের ভজনায় এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই। এ সকল কথা অনেক পরে শুনিয়াছি। শৈশবে কোনও দিন শুনি নাই, শুনিলেও ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতাম না। এই কথাটাই কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বের মূল কথা। এ কথাটা যে না বুঝে, কৃষ্ণ-কথা কত মিষ্ট সে ইহা জানে না। কৃষ্ণ যে কি বস্তু ইহাও সে বুঝে না। কেন কৃষ্ণমূর্তি দ্বিভুজ মুরলীধর নবীন কিশোর; রাধিকার বিগ্রহ কেন নবীন কিশোরীর অনুরূপ; কেন ইঁহাদের পাঁচটা মুখ বা দশটা হাত নাই; কেন যে ইঁহারা এতটা মানুষের মতন, অথচ সকল দেবতার পরম দেবতা;—বৈষ্ণবদের মধ্যেই কয়জনে বা এ সকল কথা বুঝেন ও জানেন,—অগ্রেপরে কা কথা? এ অবস্থায় বৈষ্ণবকূলে জন্মিয়াও যে বাল্যে বা যৌবনে কৃষ্ণ যে কি বস্তু, বৈষ্ণব ধর্ম্মটাই সত্য সত্য কি, ইহার কোনও সন্ধান পাই নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। বহুদিন এ বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসারও উদয় হয় নাই।

আর জীবনের এই “বেলি অসকালে” এই জিজ্ঞাসাকে বিশেষ

করিয়া জাগাইয়াছে এই কয়টা ইন্দ্রিয়। চক্ষু রূপের জন্ত পাগল। কত রূপ দেখিল, কত রূপ বুকে টানিয়া ধরিল, কিন্তু তার রূপের পিপাসা কিছুই কমিল না। কাণ দুটা মধুর শব্দের জন্ত আকুল। আজন্মকাল শুনিয়া শুনিয়া তার শুনার সাধ মিটিল না। নাসিকা গন্ধের জন্ত সদাই সজাগ, কত গন্ধ শুনিল, কিন্তু তার আশা পূরিল না। এইরূপে সব কটা ইন্দ্রিয় কি যেন চায়, কি যেন পায় না, আর পায় না বলিয়াই চঞ্চল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে। যৌবনে ইন্দ্রিয়গুলি যখন বড় সতেজ, বড় দুর্দান্ত ছিল, সকল বিধিবাঁধন কাটিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার জন্ত যখন চারিদিকে প্রাণটাকে লইয়া টানা-টানি করিত, তখন শুনিয়াছিলাম, এগুলিকে চাপিয়া রাখাই ধর্ম্য। কিছু কিছু যে চাপিয়া রাখিতে চাই নাই, এমনও নয়। ভাবিয়াছিলাম বার্ককে বুঝি বা এরা শান্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইল কৈ? প্রয়াসের শক্তি গেল, কিন্তু পিয়াসার নিবৃত্তি হইল কৈ? বরং বার্ককের সঙ্গে সঙ্গে এ পিপাসা আরও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহা এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না, চক্ষু যে কেবল তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায়। যে মধুর শব্দ আজও কোথাও শুনিলাম না, কাণ যে সর্বদা তারই জন্ত উৎকর্ষ হইয়া আছে। যে গন্ধ আজও শুনিতে পাইলাম না, নাসিকা যে তাই কেবল শুনিতে চাহে। যে স্পর্শ আজও পাইলাম না, প্রতি অঙ্গ যে তারই জন্ত তৃপ্তিত ক্ষুধিত হইয়া আছে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু

নয়ন না তিরপিত ভেল,

সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুননু

শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু

না বুঝিনু কৈছন কেল।

লাথ লাথ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু

তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এ কেবল রাধিকার কথা নহে, ইহা প্রকৃতি মাত্রেই চিরন্তন আক্ষেপ। আর এ পিপাসা কি ইন্দ্রিয়ের, না মনের? একি শরীরের না শরীরীর,—দেহের না আত্মার? যদি সত্যই এ পিপাসা কেবল ইন্দ্রিয়ের হইত, তবে ইন্দ্রিয় যখন শিথিল হইল, তখন ইহা কমিল না কেন? এ যদি শরীরেই হবে, তবে শরীরের অপচয়ে তার ক্ষয় হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবে কে?

প্রশ্নটা নূতন নহে, এ যে বিশ্বসমস্যা। নিজেকে যেই সর্ব-সংস্কারবর্জিত হইয়া, সত্যভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখে, তারই সম্মুখে এ সমস্যা উপস্থিত হয়। কেহ বা ইহাকে চাপিয়া রাখে, কেহ বা কোনও রকমে গোঁজামিল দিয়া ইহার একটা ধামা-চাপা মীমাংসা করিয়া লয়। যে চাপিয়া রাখে না, বা রাখিতে পারে না, এই বিশ্বসমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে পরিণামে কৃষ্ণতন্ড্রে পৌঁছিতেই হয়। এই ইন্দ্রিয় কটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পার। এগুলি ভেদবুদ্ধি-মূলক। অদ্বৈত-অভেদ-জ্ঞানে কে, কাহাকে, কি দিয়া, দেখে? কে, কি, কিসের দ্বারা, শুনে? সেখানে বিষয় নাই, কেবল বিষয়ী আছেন। ভোগ্য নাই, শুদ্ধ ভোক্তা আছেন। এই পথে একরূপ যো সো করিয়া এই জিজ্ঞাসাকে চাপিয়া রাখিতে পারা যায়। আমাদের দেশের নিরুপথাবলম্বী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দল এই ভাবেই এই বিশ্বজিজ্ঞাসার একটা মীমাংসা করিয়াছেন। এই মীমাংসায় ঘাঁরা সম্ভ্রষ্ট থাকিতে পারেন, তাঁদের নিকটে কৃষ্ণকথার কোনও অর্থ নাই। সাধ্য তাঁদের নিগূর্ণ ব্রহ্ম। সিদ্ধি তাঁদের কৈবল্য। সাধন তাঁদের ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। আশ্রম তাঁদের সন্ন্যাস। আনন্দ তাঁদের নির্বিকল্প সমাধিতে।

এই জগৎকে উড়াইয়া দিতে পারি নাই, উড়াইয়া দিতে কোনও দিন চাহিও নাই। ইন্দ্রিয় কটাকে রিপু বলিয়া কোনও দিন নিশ্চূল করিতে পারি নাই, করিতে চাহিও নাই। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধকে “অবিচ্ছাবদ্বিষ্যানি” ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই, করিতে

চাহিও নাই। আর এগুলিকে সত্য জানিয়া ধরিয়ছিলাম বলিয়াই পরিণামে কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি। চক্ষুর রূপের পিপাসা, কাণের শুন্য আকাঙ্ক্ষা, রসনার রসের বাসনা, এগুলির পরিতৃপ্তি হয়, না হয় না? প্রাণের আত্মদানের অভিলাষ, যে দানের ভিতর দিয়াই প্রাণকে আবার প্রাণ পূরিয়া পাওয়া যায়, তার পূর্ণতা সম্ভব, না অসম্ভব? সংসারের সম্বন্ধসকলের কোনও নিত্য আশ্রয় ও সার্থকতা আছে, না নাই? সখাকে ধরিয়াই সখ্য জন্মে; কিন্তু সখাকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু রসের আশ্রয় নষ্ট হইলেই রস ত আর ফুরাইয়া যায় না। প্রাণের রসপিয়াসাও চলিয়া যায় না। এই সখ্য রতির নিত্য আশ্রয় ও পরিপূর্ণ সার্থকতা আছে, না নাই? সেইরূপ বাৎস্যল্যেরও নিত্য আশ্রয় আছে, না নাই? মাধুর্যেরও কোনও নিত্য আশ্রয় আছে, না নাই? যদি না থাকে, তবে প্রচলিত মায়াবাদই সত্য।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন?
মোহমায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন!—

ইহাই জীবনের চরম অর্থ ও পরম সত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই মোহ-মায়াজাল ছেদন করাই ধর্ম হইয়া উঠে। কেহ কেহ এতেই তৃপ্ত হয়। যারা এমন করিয়া এ সকল রসের সম্পর্ককে নিষ্ঠুর মায়াবীর ইন্দ্রজালখেলা বলিয়া গ্রহণ করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, তাদের পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব ভিন্ন আর গতি নাই। জগৎকে মিথ্যা, আর সংসারের স্নেহের, প্রীতির, প্রেমের, সেবার, ভক্তির সম্বন্ধসকলকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি নাই বলিয়াই ঝজুকুটীল বহু পথ ঘুরিয়া শেষে কৃষ্ণতত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি।

আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণায়, সংসার-পথে চলিতে চলিতেই এ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, শাস্ত্র পড়িয়া পাই নাই। আর প্রচলিত শাস্ত্রের পথে যাইয়া যে এ তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই, ইহা পরম সৌভা-

গোর কথাই মনে করি। সে পথে গেলে গতানুগতিক ভাবে, কৃষ্ণতত্ত্বের একটা কল্পিত অর্থ করিয়াই লইতাম। শাস্ত্র আপনার যুগপ্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে যুগে যে শাস্ত্র প্রচারিত হয়, তাহাতে সেই যুগের প্রচলিত মত, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত, আচারবিচার ও রীতিনীতি প্রভৃতি জড়াইয়া থাকে। আর এক যুগের মত, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত ও আচারবিচারাদি পর যুগেও ঠিক পূর্বকার মতন কোথাও থাকে না। যোজনাস্তুর যেমন ভাষা ভিন্ন হয়, যুগে যুগে সেইরূপ জনসমাজের মনো-ভাবের এবং বহিরাচরণেরও বিস্তর পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়। ইহা জগতেরই নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্তী হইয়াই যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যার উদয় হইয়া, নূতন নূতন যুগধর্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক যুগের ধর্ম্য আর এক যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না। এক যুগের শাস্ত্র অবলম্বনে অপরযুগে তত্ত্ব-জ্ঞানলাভ বা ধর্ম্যসাধন করাও সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের বর্তমান শাস্ত্র যে যে যুগে রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সেই সেই যুগেরই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছে। সেই পুরাতন শাস্ত্রের দ্বারা এ যুগের নূতন জিজ্ঞাসার সম্যক মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। চারিশত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা দেশের লোকের মতিগতি যেরূপ ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, সেকালের লোকের মনে যে সকল জিজ্ঞাসার উদয় হইতেছিল, চৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণ্য বাঙ্গালা বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহারই মীমাংসার পথ দেখাইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে কতকগুলি চিরন্তন সত্যের ও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সত্য। কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও, সে কালে যে ভাবে তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই ভাবে সেই তত্ত্বকে বা সিদ্ধান্তকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তাহাতে আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক বা জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করা কখনই সম্ভব হইবে না। এক যুগের প্রামাণ্য শাস্ত্রের পর যুগেও সেইরূপ প্রামাণ্য-মর্যাদা থাকে না বলিয়াই, যুগে যুগে সাধক ও সিদ্ধপুরুষেরা এবং তাঁহাদের অনুগত মনীষী ভক্তগণ আপন আপন যুগ-সমস্যাকে লক্ষ্য করিয়া নূতন শাস্ত্র প্রচার করেন,

কিন্তু পূর্বতন শাস্ত্রেরই নূতন ভাষ্যাদি রচনা করিয়া শাস্ত্রধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। চৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণ্য বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থ, কতকটা নূতন শাস্ত্র, এবং কতকটা পুরাতন শাস্ত্রের নূতন যুগভাষ্য রূপেই গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে বেদ, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, ভাগবতাদি সকল প্রাচীনশাস্ত্রেরই যুগে যুগে বহুবিধ ভাষ্য রচিত হইয়া, তাহাদের প্রামাণ্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যে ভাগবত কৃষ্ণতত্ত্বের বিশেষ অবলম্বন ও উদ্দীপনা, সেই ভাগবতেরই কত না ভাষ্য রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বের শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভাগবতের ভাষ্য লিখিয়া যান, তাঁর পরেও গোড়ীয়-সম্প্রদায়-সম্মত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় আবার তাহার নূতন ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। আর সেই ভাষ্য যতই কেন উৎকৃষ্ট হউক না, তাহাতেই আমাদের যুগের সমস্তারও যে পূর্ণ মীমাংসা হইতে পারে, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। এই যুগের লোকমত ও এই যুগের জিজ্ঞাসাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রের ও পুরাতন ভাষ্যের সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধনের জন্য, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের নূতন ভাষ্যের প্রয়োজন। এতাবৎকাল আমরা কেবল একটা বিরাট বিরোধের মধ্যেই পড়িয়াছিলাম। এখন ক্রমে সমন্বয়ের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছি। এই সমন্বয়মুখে, ক্রমে ক্রমে ভগবদ্দিচ্ছায়, আমাদের এই যুগেও, এই যুগের বিশিষ্ট ভাব, মত, অভিজ্ঞতা ও আদর্শসম্মত ভাষ্যাদি অবশ্যই রচিত হইবে। তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা বসিয়া আছি।

এইরূপ যুগ-ভাষ্য এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই বলিয়া, আমাদের পক্ষে শুদ্ধ শাস্ত্রাবলম্বনে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কিনা, তাহাই বলা কঠিন। কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত যখন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে, বহুলোকের মত ও ভাবকে যখন তাহা অধিকার করিয়া বসে, তখনই প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক স্মারুভূতির সঙ্গে সমন্বয়-সাধন করিয়া যুগভাষ্যের প্রচার হয়। আমাদের এখনও সে অবস্থা উপ-

স্থিত হয় নাই। এই জন্ম আমরা প্রকৃত পক্ষে নিজেদের ভিতরকার প্রেরণা ও অনুভূতির মধ্যেই এখন তত্ত্ব-বস্তুর মুখ্য সন্ধান পাইয়া থাকি।

আমি শাস্ত্র-সাহিত্য পড়িয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাই নাই। অসুখজীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই, শ্রীগুরুর কৃপায়, তিলে তিলে এই তত্ত্বটী আমার জ্ঞানেতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। বোধ হয়, আমার মতন আরো অনেকে স্বল্পবিস্তর এই পথেই যাহা কিছু কৃষ্ণতত্ত্বের আভাস পাইয়াছেন। এইরূপে বহুতর নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের ভিতরকার ভাব ও অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া এদেশে বর্তমানে একটা অভিনব বৈষ্ণবভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। এ ভাবটা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা কোনও মতেই গতানুগতিক নহে। মধ্যযুগের মায়াবাদপ্রধান অপরাপর তত্ত্বসিদ্ধান্তের সঙ্গে আধুনিককালের প্রত্যক্ষ-প্রধান তত্ত্বসিদ্ধান্তাদি যেমন অনেক ভিন্ন, মধ্যযুগের বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত হইতে, বর্তমানে যে বৈষ্ণবভাব আমাদের চিত্তকে অধিকার করিতেছে, তাহাও সেইরূপ বিভিন্ন। এই কথাটা ভুলিয়া গেলে এই নববৈষ্ণবভাবের মর্ম্যগ্রহণ বা মর্যাদাবোধ অসম্ভব হইবে।

ইংরাজি পড়িয়া, যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া, আমাদের অন্তরে পুরুষানুক্রমাগত বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রভাবটা স্বল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষেরা সংসারকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমাদের পক্ষে সে চক্ষে দেখা অসম্ভব হইল। তাঁরা সমাজানুগত্যকে ধর্ম্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ ।

তথাপি লৌকিকাচারঃ মনসাহপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষম হইলেও, কোনও মতেই লৌকিকাচারকে উলঙ্ঘন করিবেন না, ইহাই তাঁদের সংসারধর্ম্যের মূলকথা ছিল। সন্ন্যাসীরাও এ উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইতেন না। ইংরাজি পড়িয়া আমরা সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিলাম। আমা-

দের পুরাতন আদর্শ মানুষকে সর্ববিষয়ে বিষয়বিমুখ করিতে চাহিত। লোকে কতকটা চোরের মতনই এ জগতের রূপরসাদি সংস্কার করিত। মানুষের মনকে শাস্ত্র দিয়া, তার কর্মকে আচার-বিচার দিয়া, তার ধর্মকে বাহ্যক্রিয়াকলাপ দিয়া, তার ভক্তিকে কল্পনা দিয়া, —এইরূপে শত বন্ধনে আমাদের মধ্যযুগের সাধনা আমাদের কাছে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। ইংরাজি শিক্ষা এসকল বাঁধন কাটিয়া দিল। কিন্তু এই নূতন বিদ্রোহে আমরা ঘরের বাহির হইলাম মাত্র, পথেরও সন্ধান পাইলাম না, আর কোথায় যে যাইব তারও ঠিকানা হইল না। ক্রমে সেই সন্ধান পাইয়াই এই অভিনব বৈষ্ণবতাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয় শাস্ত্র-সাহিত্য যে বস্তুর আভাসমাত্র দিয়াছিল কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই, এখানে তারই প্রত্যক্ষ-লাভ করিলাম। যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা যে রসের আশ্বাদনমাত্র দিয়াছিল, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা কোথায় ও পরিণাম কি, ইহা বলিতে পারে নাই, আমাদের বৈষ্ণব সাধনায় তার সেই প্রতিষ্ঠা ও পরিণতির নির্দেশ পাইলাম। এইরূপে ইংরাজি শিক্ষার আশ্রয়ে, যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রেরণাতেই, বিদেশীয় ভাব ও আদর্শ আমাদের চিত্তে যে সকল দুর্ভাগ্য জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিয়াছিল, তারই মীমাংসার সন্ধানে যাইয়া আমরা এই বৈষ্ণবত্বের ও বৈষ্ণব-সাধনার খোঁজ পাইয়াছি। যুরোপীয় সাধনা সত্যের একটা দিক দেখাইয়াছিল, আমরা সেই দিক-টাকেই সকল দিক ভাবিয়া তারই পানে ছুটিয়াছিলাম। ক্রমে সে দিকে সকল প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব দেখিয়া, তার অন্ত দিকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমাদের নিজের যে সাধনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, তারই মধ্যে সেই সত্যেরই অপর দিক দেখিতে পাইলাম। এইজন্য আমরা আজ যে বৈষ্ণব-আদর্শের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা মধ্যযুগের আদর্শ অপেক্ষা পূর্ণতর। বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনা আমাদের চিত্তে যে লোভমাত্র জাগাইয়াছে, কিন্তু তার পরিতৃপ্তির পথ নিজেও জানে না, আমাদেরও দেখাইতে পারে নাই,

আমাদের প্রাচীন সাধক ও সিদ্ধপুরুষ এবং বর্তমান যোগী ও ভক্ত-দিগের উপদেশে ও চরিত্রে সেই পথের আভাস পাইয়া আমরা এই নূতন বৈষ্ণবভাবের অনুরাগী হইয়াছি। কেবল ইংরাজি পড়িয়া এ বস্তু পাইতাম না। ইংরাজি না পড়িয়াও পাইতাম না। কেবল স্বদেশের সাধুসন্তদিকে দেখিয়া ইহার মর্ম্ম বুঝিতাম না। ইহাদেরে না দেখিয়াও বুঝিতাম না। ইংরাজি পড়িয়া, যুরোপীয় সাধনার উদ্দীপনা পাইয়া, গ্রীশীয় সাধনার অপূর্ব সৌন্দর্য্যরস-বিভোর হইয়া, সদগুরু-চরণাশ্রয় লাভ করিয়া, এ সকল উদ্দীপনা ও আশ্বাদনের প্রকৃত মূল্য ও মর্ম্ম যে কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি।

শাস্ত্র এই তত্ত্বকে বাহির হইতে আনিয়া দেয় নাই। শাস্ত্র ত শব্দ। শব্দের নিজের ভিতরে তার অর্থ নাই। শব্দ ত কেবল কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি। শব্দের অর্থ শব্দে নয়, কিন্তু যে বস্তু বা ভাবকে নির্দেশ করে, তাহারই মধ্যে। মা শব্দ এমন মিষ্ট, কেবল ম+আ বলিয়া নহে, কিন্তু স্নমধুর মাতৃস্নেহের স্মৃতিটা প্রাণে জাগায় বলিয়া। শব্দ চিহ্নমাত্র। বস্তুর দ্বারাই শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়। যে প্রকৃত ভক্তকে দেখে নাই, ভক্তি তার নিকটে নিরর্থক ধ্বনিমাত্র। আগে নিজের অন্তরে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, তার পরে শ্রীগুরুর উপদেশে, চরিত্রে, বিশেষতঃ তাঁর দেহের বিবিধ সাত্ত্বিকী বিকারের মধ্যে, সেই জিজ্ঞাসার মীমাংসার সামান্য ইঙ্গিত লাভ করিয়াছিলাম। এই ভাবেই কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি। শাস্ত্র এই তত্ত্বকে দেখায় নাই। গুরুকৃপায় অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তিত তত্ত্বকে শাস্ত্রালোচনা একটু আধটু বিশদ করিয়াছে মাত্র। শাস্ত্র যেমন এই অন্তরের অনুভূতিকে পরিষ্কৃত করিয়াছে, এই অনুভূতিও সেইরূপ শাস্ত্রের সত্য অর্থকে বিশদ করিয়া তুলিয়াছে। এই অনুভূতির বহিঃ-প্রামাণ্য ঐ শাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রের শব্দরাশির সত্য অভিধান এই অনুভূতি। আর এই অনুভূতি ও ঐ শাস্ত্র উভয়কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ধরিয়া

আছেন যিনি, তিনিই সৎগুরু। একদিকে তিনিই “চৈতন্য”রূপে অস্ত-
রের অনুভূতিকে জাগাইতেছেন, অন্য দিকে তিনিই “মোহান্ত”রূপে
নিজের প্রত্যক্ষ সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ
করিয়া, তার ভিতরকার নিগূঢ় সত্যকে বাহিরের কল্পিত সত্যাভাস হইতে
পৃথক করিয়া দিতেছেন। এই ভাবেই এ তত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি।

এই আলোচনার প্রথমেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও কৃষ্ণ-চরিত্র যে ঠিক একই
কথা নহে, এটা বলিয়া রাখা আবশ্যিক। কৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনার
জন্য শাস্ত্রানুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজন। যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-কথা বঙ্কিম-
চন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন; “প্রচার” ও “নবজীবনের” যুগের হিন্দু-পুনরুত্থান
যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান গিয়াছিল; ব্রহ্মসমাজের প্রচারক উপাধ্যায় গৌর
গোবিন্দ রায় যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মের আলোচনা করিয়াছেন, সেই
শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের বস্তু, ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক জীবনের রঙ্গ-
ভূমিতে তিনি বিবিধ লীলা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত, হরিবংশ
প্রভৃতি পুরাণ-কথাতে তাঁর কীর্তিগাথা পড়িতে পাওয়া যায়। সেই
শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণাবতার। এই কৃষ্ণাবতারের
সন্ধান মুখ্যভাবে পুরাণ-ইতিহাসেই কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ইতি-
হাসের শ্রীকৃষ্ণ আর তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এক নহেন। ইতিহাসের
শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের বস্তু, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ ভিতরের বস্তু। ইতিহাসের
শ্রীকৃষ্ণ কে ও কি, তাহার বিচার করিতে হইলে মুখ্যভাবে তাঁহাকে
ইতিহাসেই খুঁজিতে হইবে। তিনি একটা বিশেষ যুগে অবতীর্ণ হইয়া
কতকগুলি বিশেষ কর্ম-সাধন ও বিশেষ লীলা-প্রকাশ করিয়া গিয়া-
ছেন। কিন্তু অবতার মানিলেও যিনি বিশেষ যুগে অবতীর্ণ হন,
সেই যুগের পূর্বেও তিনি অবশ্যই ছিলেন, ইহাও মানিতে হয়।
না মানিলে, তাঁর অবতারের অর্থ এবং প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।
“নাসতঃ সঞ্জায়তে”—অসৎ হইতে কখনও সতের উৎপত্তি হয়
না। যিনি আবির্ভূত হইলেন তিনি আবির্ভাবের পূর্বেও ছিলেন,
তিরোভাবের পরেও রহিয়া গেলেন এবং এখনও আছেন, ইহা না

মানিলে আবির্ভাব তিরোভাবের কোনও অর্থ হয় না। বিশিষ্ট কালে, বিশেষ দেশে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার মানিয়া লইলে,—অবতারের পূর্বেও যেমন তিনি ছিলেন, পরেও সেইরূপই আছেন; অবতারের পূর্বেও তিনি পূর্ণ ছিলেন, পরেও পূর্ণ আছেন; যাহা পূর্ণ তার জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় নাই, হইতে পারে না; সে বস্তু নিত্য, অনাদি, অনন্ত, দেশ-কালের একান্ত অতীত,—এই কথাটাও মানিয়া লইতে হইবে। এই বস্তুর সন্ধান কেবল ইতিহাস দিতে পারে না। অন্তরে, আপনার চৈতন্যের মূলে, এ নিত্য বস্তুর সন্ধান না পাইলে, তার ঐতিহাসিক আবির্ভাব বা প্রকাশেরও মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের আলোচনা করিতে হইলে, বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের প্রামাণ্য কতটা ও অপ্রামাণ্য কি, ইহার বিচার করা আবশ্যিক হয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের তথ্য নির্ণয়ের জন্য মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সন্ধানে ইহা একেবারেই অনাবশ্যক। এখানে ইতিহাসের কথা শুনিয়া ফল নাই। তত্ত্বজ্ঞ, সত্যদর্শী, সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সাক্ষ্যই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুর প্রধান আশ্রয় ও সহায়। কারণ এই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে নাই, ভিতরে। এই বস্তু নিত্য প্রকট ও নিত্যই অপ্রকট। এই কৃষ্ণলীলা নিত্যলীলা। রাধা, কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, সকলি এখানে নিত্য বস্তু, তত্ত্ব-বস্তু, যুগপৎ দেশকালের অতীত এবং দেশকালে প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, কিন্তু অবতারী। সকল অবতারের ইনিই প্রকাশক, সকল অবতারের প্রতিষ্ঠা ইহাতে।

আর ইহাই মহাপ্রভু-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—

অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।

আর এই স্বরূপবস্তুই অবতারী। ভাগবতে সকল অবতারের সীমামাত্র লক্ষণ বলিয়া, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেও গণনা করিয়া,—

তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয় ।

যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥

অবতার সব পুরুষের কলা-অংশ ।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব অবতংশ ॥

আর যত অবতার বলিতে এখানে কৃষ্ণাবতার পর্য্যন্ত বুঝাই-
তেছে । কারণ অবতার মাত্রেই জ্ঞাত, কিন্তু—

“কার অবতার এই বস্তু অজ্ঞাত ।”

জ্ঞাত বা প্রকট অবতারেরা সর্বদা সেই “অজ্ঞাত বস্তুকেই” নির্দেশ
করেন । গীতায় বিভূতিযোগের উপদেশ দিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ আপ-
নিই অর্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন—

বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোহং পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয় ।

বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে আমিই বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি
ধনঞ্জয় । শ্রীকৃষ্ণের বৃষ্ণি তঁার একাংশ মাত্র । আর বাসুদেবরূপেই
তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । সুতরাং তিনি তঁার অবতার অপেক্ষা
যে অনেক বড়, তিনি যে আপনার অবতারেরও অতীত, শাস্ত্র আশ্রয়
করিয়াও একথা অস্বীকার করা যায় না ।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি ।

কেহ কোনরূপে কহে, যেমন যার মতি ॥

এই অবতারী শ্রীকৃষ্ণই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ । এই বস্তুই প্রকৃত
কৃষ্ণ-তত্ত্ব । শ্রীগুরু কৃপায় এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেরই আলোচনা করিতেছি ।
এই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তথা কথিত ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ
কি ও কতটা, তদ্বালোচনা শেষ হইলেই তার আলোচনা সম্ভব । অব-
তারীকে না বুঝিলে, অবতারের মর্ম্ম বুঝা যায় না ।

এক অর্থে অবতারের সাহায্য ব্যতীত অবতারীর জ্ঞানলাভও
অসম্ভব বটে, কিন্তু সে অবতার অতীত ইতিহাসের অবতার নহেন,
বর্তমানের প্রত্যক্ষ অবতার । অন্তরে যদি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হন,
তবে তঁার বাহিরের অবতারের সত্যমিথ্যা, শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বুঝিব কেমন

করিয়া ? তিনি দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা যদি সত্যই হয়, তথাপি দ্বাপরের কথা ত আমরা এই কলিযুগে কেবল কেতাবেই পড়িতে পারি ! আর কেতাবে ত কেবল কথাই পাই, বস্তু পাই কৈ ? প্রাচীন শাস্ত্রের কলকাঠি আমাদের বর্তমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতরেই আছে । এই অভিজ্ঞতার অভিধানকে আশ্রয় করিয়াই ঐ শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হয় । দ্বাপরের কৃষ্ণাবতারের সত্য অর্থ বুঝিতে হইলে, আমাদের সম্মুখে, আমাদের নিজেদের অপরোক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে এই ঘোর কলিযুগে, এই ইংরেজ আমলের সকল প্রকারের নাস্তিক্য ও অনাচারের মাঝখানে আসিয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে । প্রাচীন অবতারে সত্যভাবে বিশ্বাস করিতে গেলে আধুনিক অবতারের প্রত্যক্ষলাভ করা প্রয়োজন । কৃষ্ণাবতারের মর্ম্ম বুঝিবার জন্ত যেমন চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেইরূপ চৈতন্যাবতারকে বুঝিবার জন্তও, এই ১৩২১ বঙ্গাব্দে, “মোহান্ত”রূপ সেই চরিত্রের ও সেই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ হওয়া আবশ্যিক । ফলতঃ এই অবতার-ধারার কোনও দিন বিচ্ছেদ হয় না । যিনি অবতারী তিনিই প্রতিদিন জীবের অন্তরে “চৈতন্যগুরু” ও বাহিরে সদগুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া, তাহাকে সকল তত্ত্বের ও সকল রসের আশ্বাদন দিতেছেন । এই প্রত্যক্ষ গুরুত্বই অবতার-তত্ত্বের কলকাঠি ।

ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ অবতার—বাহিরের বস্তু । তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, অন্তরের নিত্য বস্তু । তিনি সর্বত্র, সর্বদা বিद्यমান । সর্বত্র, সর্বদাই তিনি আপনার লীলাতে আপনি নিমগ্ন । কেউ দেখে, কেউ দেখে না । কিন্তু আমাদের দেখা বা না দেখার উপরে তাঁর সত্ত্বা বা সত্য নির্ভর করে না ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।

বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের পূর্ব-কথা

জগতের প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় নাট্যের স্থান অতি উচ্চ হইলেও কালবশে এই বিশিষ্ট নাট্যকলা ও নাট্যচর্চা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রীসে যেরূপ দায়োনিসাস্ দেবের উৎসব উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ দেবদেবীর পূজা ও উৎসবাদিতেই প্রথম নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয়। বৈদিক সাহিত্যের সংবাদগুলি কথোপকথনাকারে গ্রথিত দেখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকগণ অনুমান করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে ঐ কথোপকথনগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত হইত। ইহাই ভারতীয় নাট্যের অতি প্রাচীন রূপ। ভারতীয় নাটকের এই সূচনা হইতে কালক্রমে যে নাট্য-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা জগতের অন্য সমস্ত নাট্যসাহিত্য হইতে বিশিষ্ট। কিন্তু ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি নাট্যকারের রচনা অমর হইলেও তাহাদের নাট্যনিচয় সর্বসাধারণের বোধগম্য না হওয়াতে কালক্রমে ইহাদের জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রাচীনকালে রাজসভায় বা দেবোৎসবাদিতে অভিনীত নাটকগুলি রচনানৈপুণ্যে মনোহর হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাদের সম্যক রসগ্রহণ করিতে পারিত না। বিদূষক প্রভৃতি পাত্রের ও রমণীগণের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথনগুলি সাধারণ দর্শকের বোধগম্য হইলেও সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুপম শ্লোক-সমূহ তাহারা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিত না। প্রাকৃতভাষাবহুল নাটকগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইত বটে, কিন্তু কথিত ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের ভাষার পরিবর্তন হইল না। আলঙ্কারিকগণ নাট্য-সাহিত্যকে কঠিন নিয়ম-পাশে বাঁধিয়া দিলেন। পরবর্তী সকল নাটকরচয়িতাকেই এই সঙ্কীর্ণ গম্ভীর ভিতর বিচরণ করিতে হইয়াছিল। কাজেই নাটকগুলি বৈচিত্র্য হারাইয়া, অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম

মানিতে গিয়া, কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়া পড়িল ও কালক্রমে তাহাদের ভাষা কথিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া গেল। সাধারণের মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত নাটকগুলি অন্ততঃ শিক্ষিত নৃপতি, অমাত্য, পারিষদ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর আমোদম্পৃহা চরিতার্থ করিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত-ভাষার প্রচার বন্ধ হইয়া আসিলে, সংস্কৃত নাটকও কচিৎ রচিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রাচীন ভারতের নাটকগুলি সময়ের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে না পরিয়া প্রাচীন আকার ও নিয়মসকলকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া, সাধারণের সহানুভূতি হারাইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সংস্কৃত ভাণ, প্রহাসন প্রভৃতি নাট্যে সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এ প্রয়াস সফল হয় নাই। কাজেই সংস্কৃত নাট্যাভিনয় কেবল বিশেষ বিশেষ উৎসবের অঙ্গরূপেই বহুকাল জীবিত ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবৃত রাজারাই এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। অনেকগুলি নাটকের প্রস্তাবনা হইতেই এই কথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কালক্রমে এই শ্রেণীর রাজগণও বিরল হইয়া আসিলেন। ভারতে মুসলমান-প্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুর নাট্যকলা একরূপ নষ্ট হইয়া গেল। কারণ মুসলমান শাসকগণ তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ বলিয়া নাট্যচর্চায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ দান করিতেন না। মুসলমান-প্রভুত্ব-কালেও ভারতের স্বাধীন হিন্দু নৃপতির অধিকারে মধ্যে মধ্যে নাটক অভিনীত হইত বটে; কিন্তু প্রাচীন আদর্শে গঠিত ও সাধারণের দুর্বোধ্য-ভাষায় রচিত বলিয়া এগুলি সর্বজন-সমাদৃত হয় নাই।

বঙ্গদেশে যে সকল প্রাচীন নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ, জয়দেব, রূপগোস্বামী ও কর্ণপুরের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদিশূরের সমসাময়িক ভট্টনারায়ণ বীররস-প্রধান “বেণীসংহার”, জয়দেব “প্রসন্নরাঘব,” রূপগোস্বামী “বিদগ্ধমাধব”,

“ললিতামাধব” এবং কর্ণপুর “চৈতন্যচন্দ্রোদয়” নাটক রচনা করেন । এতদ্ব্যতীত “জগন্নাথবল্লভ” প্রভৃতি নাটকও বাঙ্গালার বৈষ্ণবযুগে (১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে) রচিত হয় । ভট্টনারায়ণ ব্যতীত আর সকল নাট্যকারই বৈষ্ণব ছিলেন । শ্রীচৈতন্যদেব নিজ পার্শ্বদ-সঙ্গে সাধারণের সমক্ষে কৃষ্ণলীলার ভাবাভিনয় প্রদর্শন করিতেন । তাহাতেই বৈষ্ণবধর্মে সংস্কৃত নাটকের রচনা আদৃত হইয়াছিল । চৈতন্যদেবের শিষ্য রূপগোস্বামী তাই রাধাকৃষ্ণপ্রেমময় ‘বিদগ্ধ-মাধব’ ও ‘ললিতমাধব’ নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন । কর্ণপুরও তাই চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।

কিন্তু এ নাটকগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত রীতিতে রচিত । কাজেই এ গুলিও সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় নাই । সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্তৃক মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয় না । যাহারা সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজন সংস্কৃত-রীতি অবলম্বন করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন । মধ্যে কিন্তু এই রীতি সর্বসাধারণের প্রিয় না হওয়ায় সেই অবধি বাঙ্গালা নাটকে ইহা চিরপরিত্যক্ত হইয়াছে । বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত নাটকের বিশিষ্ট রীতি ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে ।

বাঙ্গালা নাটকে এই পাশ্চাত্য রীতির প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র বিশ্বয়ের বিষয় নহে । কারণ, সংস্কৃত নাটকগুলি যখন বিরলপ্রচার হইয়া আসিল তখন জনসাধারণ প্রথমে যে নাট্যরসের আশ্বাদ পাইল, তাহা পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আনীত ও তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন । ইংরাজেরা কলিকাতায় নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য The Play House নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন । তথায় নিয়মিতরূপে অভিনয় হইত । সাধারণ বাঙ্গালীর তখন রঙ্গালয় বা নাট্যাভিনয়

সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অভিযুক্ত ছিল না। ভারতপ্রণীত প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে আমরা “নাট্যমণ্ডপ”, রঙ্গপীঠ (stage), প্রেক্ষকপরিষৎ (Auditorium), যবনিকা প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা পাই বটে এবং প্রাচীন ভারতে যে নাট্যাভিনয়ের জন্য রঙ্গালয় নির্মিত হইত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজের আমলের প্রথমে বাঙ্গালী সে সকল কিছুই জানিত না। অগ্ণাশ্র কলাবিদ্যার স্থায় নাট্যকলাও দেশে লোপ পাইয়াছিল। তাই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ‘Calcutta Theatre’এ যখন Comedy of Beaux Stratagem, Comedy of Foundling, School for Scandal, Mahomet, প্রভৃতি নাটক ও Like Master like Man, Citizen প্রভৃতি প্রহসন অভিনীত হইতে লাগিল, তখন বাঙ্গালী এক নূতন জিনিষ দেখিল। বাঙ্গালীর তখন থাকিবার মধ্যে ছিল এক যাত্রা। পশ্চিমাঞ্চলে এখনও রামলীলা প্রভৃতি উৎসবে, বা বিশেষ বিশেষ পূজাদিতে, দেব-দেবীর বেশে সজ্জিত অভিনেতার। যেরূপ দেবতার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সমগ্র ভারতে অল্পবিস্তর এই শ্রেণীর অভিনয়ই প্রচারিত ছিল। রঙ্গপীঠ (Stage) বা প্রেক্ষক-পরিষৎ (Auditorium)-যুক্ত কোনও রঙ্গালয়ের অস্তিত্বের অথগুনীয় প্রমাণ অতীত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।* বাঙ্গালীর যাত্রাও এইরূপ রঙ্গপীঠ ও দৃশ্যপটাদির সাহায্যব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হইত। ১৮২১ সালে “কলি রাজার যাত্রা” অভিনীত হইয়াছিল, এই বার্তা “সংবাদ-কৌমুদী” নামক পত্রিকাতে পাওয়া যায়।† সঙ্গীতের আদর বাঙ্গালী খুবই

* রামগড় পর্বতে একটি গুহা কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন ভারতের স্থায়ী রঙ্গালয়ের উদাহরণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহরূপে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (Archaeological Annual, Vol. II ও প্রবাসী, কার্তিক ১৩২১, ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,)

† “A new drama called *Kali Raja's Yatra* is being performed.”—Calcutta Review. Vol. XIII. P. 160

করিত । সেকালে ঢপ, কীৰ্ত্তন প্রভৃতি বহুল পরিমাণে আদৃত ছিল । কাজেই সে কালের যাত্রাতে কথোপকথন অপেক্ষা গীতের সংখ্যাই অধিক থাকিত । কৃষ্ণকমল গোস্বামী নবদ্বীপে “নিমাইসন্ন্যাস” ও ঢাকায় “স্বপ্নবিলাস,” “রাইউন্মাদিনী,” “বিচিত্রবিলাস,” “ভরতমিলন,” “সুবল-সংবাদ” প্রভৃতি যাত্রার পালা রচনা করিয়া ও তাহাদের অভিনয় করাইয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন । কিন্তু যাত্রা অধিকদিন ধরিয়া বাঙ্গালীকে তৃপ্ত করিতে পারিল না । ইংরাজদের রঙ্গালয়ে ইংরাজী অভিনয় দর্শনে ও ইংরাজী নাটক পাঠে ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী নূতন ধরণের নাট্যরস আশ্বাদন করিতে লালায়িত হইলেন । কিন্তু তখন ইংরাজী নাটকের ন্যায় কোন গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ছিল না । তাই সর্বপ্রথমে যখন বাঙ্গালীর মনে নাট্যানুরাগ সমুদিত হইল তখন তাঁহারা ইংরাজী নাটকই অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে হোরেস হে’ম্যান উইলসন্ সাহেব কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত “উত্তর-রাম-চরিতের” অভিনয় হয় । সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের অভিনয়ে দর্শকগণ তৃপ্ত হইবেন না ভাবিয়া, ইঁহারা “উত্তর-রাম-চরিতের” অভিনয়ের পরেই সেক্সপীয়রের “জুলিয়াস সীজার” নাটকের শেষাঙ্ক অভিনয় করেন । পরে এই অভিনেতাগণ জাফর-গুলনেয়ারসম্পর্কিত কোনও দৃষ্টকাব্য অভিনয় করেন, এই কথাও শুনা যায় ; কিন্তু ইহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না ।

এই সময় কলিকাতায় সাঁসু’সি (Sans Soci) নামক ইংরাজী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । “সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হে’ম্যান উইলসন্ (Wilson), ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ষ্টকুলার (Stocquler) বোর্ডের সেক্রেটারি টরেন্স (Torrens) এবং কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট হিউম (Hume) প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই নাট্যশালায় অভিনয় করিতেন ।”*

তৎকালীন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি, এন্‌ রিচার্ডসন সাহেব অতিশয় নাট্যানুরাগী ছিলেন ও তিনি ছাত্রদিগকে এই নাট্যশালার অভিনয় দেখিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। এই প্রকারে অধ্যাপকের উৎসাহে ও ইংরাজী নাট্যশালার অভিনয় দেখিয়া ছাত্রগণ বিশেষভাবে নাট্যানুরাগী হইয়া পড়ে ও White House এ নিম্নলিখিত নাট্যসকল অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়,—Merchant of Venice, The King and the Miller, Topsy Tossopot, Lodgings for Single Agent. The Dramatic Aspirant ইত্যাদি। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের অভিনয় দেখিয়া Oriental Seminaryর ছাত্রগণও উৎসাহিত হইয়া উঠে ও Julius Caesar-এর মহলা দিতে থাকে। কিন্তু নানা কারণে ইহার উক্ত নাটকের অভিনয় করিতে পারে নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মেট্রপলিটান একাডেমির ছাত্রগণ জুলিয়াস সিজার অভিনয় করে। ইহার কিছুকাল পরে Oriental Seminaryর কতিপয় ভূতপূর্ব ছাত্র সেক্সপীয়রের Othello, Merchant of Venice. ও Henry IV, এবং Amateurs নামক একখানি নাটক অভিনয় করে। এই সমস্ত ইংরাজী নাট্যাভিনয়ই সর্বপ্রথমে সাধারণের নাট্যানুরাগ উৎপাদন করে ও বাঙ্গলা নাটক রচনায় লেখকগণকে প্রবর্তিত করে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথমে বাঙ্গলা নাটকে বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্তা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ভারতচন্দ্র বাঙ্গলা নাটক রচনা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে “চণ্ডী” নামক যে নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দী, পারসী ও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলা ভাষাও ব্যবহার করিয়াছিলেন। “চণ্ডী” নাটক সংস্কৃত-রীতিতে রচিত। সংস্কৃত নাটকের স্থায় ভারতচন্দ্র ইহাতে নান্দী, সূত্রধার ও নটীর অবতারণা করিয়া প্রস্তাবনায় নিজের ও তাঁহার প্রতিপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে পাত্র-পাত্রী বিশেষ প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় কথাবার্তা

কহিতেন। এই প্রমাণেই বোধ হয় ভারতচন্দ্র চণ্ডীনাটকে বাঙ্গলা, হিন্দী ও পারসী ভাষা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। নিম্নো-
ক্ত যে অংশটুকুমাত্র ভারতচন্দ্র লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহা
হইতে বোধ হয় যে, নাটকখানি সম্পূর্ণ হইলে এক অদ্ভুত জিনিষ
হইত। বহুবিধ ভাষার একরূপ একত্রসমাবেশের উদাহরণ অত্যন্ত
বিরল।

চণ্ডী নাটক।

[সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ]
সংগায়ন্ যদশেষ কৌতুককথাঃ পঞ্চাননো পঞ্চভি-
বঁকৈ-বাচ্যবিশালকৈর্ভমককোথানৈশ্চ সংনৃত্যতি ।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভূজা তালং বিধাতুং গতা
স। দুর্গা দশদিক্ বঃ কলষতু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে ॥

[নটীর উক্তি]

শুন শুন ঠাকুর	নৃত্য বিশারদ	সভাসদ সারি চতুরী।
নূতন নাটক	নূতন কবিকৃত	হাম তৌহি নূতন নারী ॥
ক্যায়সে বাতায়ব	ভাব ভবানীকো	ভীতি ভৈ মুখে ভারি।
দানব-দলনে	ধরণী-মণ্ডলে	তারিণী লে অবতারি।
গুরুসম ধীর	বীরসম শুনহ	সম মণ্ডল মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ	রাজ-শিরোমণি	ভারতচন্দ্র বিচারি ॥

[সূত্রধারের উক্তি]

রাজোহন্ত প্রপিতামহো নরপতৌ রুদ্রোহ ভবদ্রাঘব—
সুতপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্ ।
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী—
সুতপুত্রোহয়মশেষধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ ॥
ভূপশাস্ত্র সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণো ।
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্মৃপঃ ।

রাজ্যাদ্ ভট্ট ইহাগতঃ স নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাস্থিতঃ
মূল্যমোড়পূরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গজাতটে ॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবধে কাব্যানুরাণীন্দবে ।
ভাষান্নোককবিশ্বগীতমিলিতং যন্তেন সঙ্গীতম্ ॥

[চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন]

খট্‌মট্‌ খট্‌মট্‌ খুরোথ-ধ্বনিকৃত-জগতী-কর্ণপূরাবরোধঃ
ফৌ ফৌ ফৌ ফৌতি নাসানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ ।
সপ্‌ সপ্‌ সপ্‌ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্যো
ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী ঘোরগজৈঃ
ভৌ ভৌ ভোরঙ্গ শকৈর্ধন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ ।
ভেরী তুরী দামামাদগড়দড়মসা স্তক্‌ নিস্তক্‌ দেবৈঃ
দৈত্যোহ সৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্কভৌমো বহু ব ॥

[মহিষাসুরের উক্তি]

ভাগেগা দেবদেবী	পাখর পাখর	ইন্দ্রকো বীধ আগে ।
নৈঋতকো রীত দেনা	যমঘর যমকো	আগকো অগনাগে ॥
বার্হোকো রোধ করকে	করন্ত বরণকো	সব তুঙ্গো অব মাগে
ব্রহ্মা সৌ বীশ্বকি সৌ	কতি নেহি ঝগড়ো	জ্যেষ্ঠ কুবেরা না ভাগে ॥

[প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি]

শোনু রে গৌয়ার লোগ্‌, ছোড় দে উপাস্‌ যোগ্‌, মানহ আনন্দ ভোগ,
ভৈষরাজ যোগমে ।
আগমে লাগাও ঘিউ, কাহেকো আলাও জিউ, এক রোজ প্যার পিউ,
ভোগ এহি লোগমে ॥
আপকো লাগাও ভোগ, কামকো আগাও যোগ, ছোড় দেও ঘাগ যোগ,
মোক্‌ এহি লোগমে ।
ক্যা এগানু ক্যা বেগান, অর্থ নার আর জান, এহি ধ্যান এহি জ্ঞান,
আর সর্ব যোগমে ॥

[এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ, প্রথমে হাস্ত করিলেন]

কমঠ করটট	ফণিফণা ফনটট	দিগ্গঙ্গ উলটট	ঝগটট ভ্যাগরে
বসুমতী কম্পত	গিরিগণ নম্রত	জলনিধি ঝম্পত	বাড়বময় রে ॥
ত্রিভুবন ঘুটত	রবিরথ টুটত	ঘন ঘন ছুটত	যেও পরলয়রে ।
বিজলী চট চট	ঘর ঘর ঘট ঘট	অটঅটঅটঅট	আঃক্যায়া হ্যাগরে ॥

অসম্পূর্ণ ।

এই অসমাপ্ত নাট্যখানি ধ্বংসাত্মক শব্দের প্রতি ভারতচন্দ্রের আত্যন্তিক অনুরাগের পরিচয় দিতেছে । সূত্রধার-কণিত সংস্কৃত শ্লোকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উক্কতন চারি পুরুষের নাম, ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে (ভূর-মুট) ভারতচন্দ্রের পিতার রাজত্ব, পরে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভারতচন্দ্রের আগমন ও বাসার্থ ভারতচন্দ্রের মূল্য-যোড় গ্রাম প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে । নাটকে বাঙ্গলা ভাষার প্রয়োগ এই বোধ হয় প্রথম । কিন্তু ‘চণ্ডী’ নাটক বাঙ্গলা নাটক নয় বলিয়া ইহাকে বাঙ্গলা নাটকের মধ্যে ধরিতে পারা যায় না ।

সর্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটক প্রণীত হইলেই যে তাহার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা নহে । আমরা প্রাচীন নাটক-নামধারী মুদ্রিত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে করিতে কলিকাতাস্থ ইউনাইটেড্ রিডিং রুম্স্ নামক পুস্তকাগারে “প্রেম নাটক” ও “রমণী নাটক” নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হই । শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, “বাঙ্গলার আদি-নাটকের নাম প্রেম নাটক । কলিকাতা স্ট্রামপুকুরনিবাসী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রণেতা” । আমরা যে প্রেম নাটক ও রমণী নাটকের উল্লেখ করিলাম তাহা পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত বটে ; কিন্তু নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহার একখানিও তাহা নয় । উভয় গ্রন্থের নামের সহিত ‘নাটক’ শব্দ আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ গ্রন্থ দুইখানি কাব্য,—পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে রচিত । রচনার নমুনা গ্রন্থকারের নিম্নোক্ত আত্মপরিচয় হইতেই বুঝা যাইবে ;—

“যশোর জেলায় ধাম,
কমলাপুর গ্রামে নিকেতন ।

সাগরদহ বন্দ্যধাটী কুলাংশেতে বড় খাটি
 তাঁহার তনয় পঞ্চানন ॥”

[ରମଣୀ ନାଟକ, ୧ୟ ପୃଷ୍ଠା]

গ্রন্থ দুইখানি অতি জঘন্যরুচির পরিচায়ক কাব্য। পাত্রপাত্রী নাই। কথোপকথন-রীতিতেও লিখিত নহে। “কামিনীকুমার” প্রভৃতি যে সকল কদর্য্য পুস্তক ঐ সময়ে প্রকাশিত হইত, এ দুইখানিও সেই ধরণের। উভয় গ্রন্থের মলাট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে পাঠক নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিবেন যে এগুলি নাটক নহে। দীনেশবাবু ইহাদের নামমাত্র শুনিয়া সম্ভবতঃ এই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন।

“রমণী নাটক নামক গ্রন্থ ।

কলিকাতা শ্রামপুষ্করিণীনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
গৌড়ীয় সুসাদু সরল বঙ্গভাষায় পদ্যাদি বিবিধ প্রকার অভিনব ছন্দে দিবা
দিবা নব্য কাব্য সহিত বিরচিত.....সন ১২৫৪ সাল, শকাব্দা: ১৭৬৯, ইং
১৮৪৮ সাল।"

‘রমনী নাটকে’র পর ‘প্রেম নাটক’ প্রকাশিত হয়। ইহার
মলাটে আছে :—

“প্রেম নাটক ।

অর্থাৎ নান্নকনামিকাধটিত আদিরসবর্ণন গ্রন্থ পুঙ্খানন কর্তৃক বিরচিত.....
সন ১২৬০ সাল ।”

এখন একটা কথা হইতে পারে যে পঞ্চানন এই দুইখানি গ্রন্থের নামের সহিত 'নাটক' কথাটি ব্যবহার করিলেন কেন ? পঞ্চানন সংস্কৃত বা ইংরাজী কোনও নাটক পড়িয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ নাই। সুতরাং নাটক কাহাকে বলে, এবিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা

ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পূর্বের আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত নাটকের কথা বলিয়াছি, সেগুলির বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল। যদু-নন্দন দাস রূপগোস্বামীর “বিদগ্ধমাধব” ও “ললিতমাধবে”র, প্রেমদাস “চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে”র ও লোচনদাস “জগন্নাথবল্লভে”র বঙ্গানুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলি পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনসম্বন্ধিত অবিকল বঙ্গানুবাদ নহে। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কাব্যাকারেই নাটকগুলি অনূদিত হইয়াছিল, অথচ অনুবাদকগণ নামকরণের সময় ‘নাটক’ নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। পঞ্চানন এই কাব্যাকারে অনুবাদিত নাটক দেখিয়া নাটকের লক্ষণ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন ও পয়ারাদি ছন্দে লিখিত কাব্যকেও নাটক বলিতে পারা যায়,— এই বিশ্বাসে নিজের “রমণী” ও “প্রেম” নামক ‘কাব্য’ দুইখানির ‘নাটক’ নাম দিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ দুইখানি গ্রন্থ যখন নাটকই নহে, তখন ইহাদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সং-খা

১৯২

বিশ্ব-দর্পণে

কিবা স্বচ্ছ নিরমল এ মায়া-মুকুর,
যাহাতে বিস্থিত তব মুরতি মধুর !
উহারে স্বতন্ত্র করে লইব কি করি,
চূর্ণিয়া ফেলিলে শিস যাবে অপসরি ।

তাই মুকুরে বিস্থিত ছবি, মুকুরে ধরিয়া,
হৃদয়-মুকুর মাঝে রেখেছি ভরিয়া ।
শাস্ত্র-শস্ত্র লয়ে ওগো এস না এখানে
মিথ্যারে করিতে সত্য সহস্র বাথানে ।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যেই শক্তি মূল,
শাদ্ধলে, প্রস্তুরে, জলে, সেই শক্তি স্থল
রয়েছে স্তম্ভিত ভাবে ;—তাই কি তোমার
মানব, ‘মানব’ বলে এত অহঙ্কার !

এই যা রয়েছে মোর সর্ববাস্ত ভরিয়া,
উদ্ভিদে, চেতনে, জড়ে, নিখিল ব্যাপিয়া—
প্রাণ কি চেতনা কিবা কি আখ্যা না জানি,
একই আবেগে পূর্ণ সমগ্র মেদিনী ।

তবে এর মাঝে কই—কোথা সেই আকর্ষণ,
মল যাহে একেতে বুঝিতে পারে অশ্বেশ্বর বেদন ?
এক সূত্রে শত মুক্তা রহিয়াছে গাঁথা,
কেহ পারে নাহি চিনে—আশ্চর্য্য বারতা,
কত দিন রবে স্থপ্ত—গুপ্ত এ মিলন,
কর ভেরী-রবে কবে হবে উদ্বোধন !

শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী ।

নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা

মাঘ, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

বিষয়	লেখক	হিসেব
১। রাসলীলা (কবিতা) ...	শ্রীভূজঙ্গধর রাগচৌধুরী	১০/-
২। সেকালের স্মৃতি (বন্ধিমচন্দ্র)	শ্রীশুরেশ সমাজপতি	১০/-
৩। ভাষার কথা ...	শ্রীমন্মথনাথ বসু	১০/-
৪। চির-কিশোর (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	১০/-
৫। পৌরাণিক কথ্য ...	শ্রীপাচকডি বন্দোপাধ্যায়	১০/-
৬। শ্রোতৃ-ধর্ম ...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০/-
৭। দান (কবিতা) ...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী	১০/-
৮। মাঝে থাক। ...	শ্রীমতী সরযুবাল। দাস	১০/-
৯। কল্যাণী (গল্প) ...	শ্রীহরিন্দাস ভারতী	১০/-
১০। প্রাচীন বাঙ্গাল। নাটক ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল	১০/-
১১। বিরহে ...	শ্রীসুধীরবরজেন দাস	১০/-
১২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্ত ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১০/-

কার্যালয়—২০৮২। ডি, কর্ণওয়ালিস্ ট্রিট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাণ্ডল সমেত ৩০। টাকা।

এই সংখ্যার নগদ মূল্য ১০। আনা, ডাক মাণ্ডল ১০। আনা।

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা]

[মাঘ, ১৩২১ সাল

রাসলীলা

১

ব্রজের মধুর রস যমুনার রূপ ধরি'
আজি কিবা বহি' যায় তর তর তর করি' !
প্রেমের পরশ আজি অতনু মলয় রূপে
নিকুঞ্জ-হৃদয়ে পশি' ঢালে মধু চূপে চূপে ।
উথলি মধুর রসে কুসুমের মৃদু হিয়া
সৌরভের বেদনায় উঠিতেছে শিহরিয়া ।
বিথারিছে উন্মাদনা কদম্বের নব দল,
দিশি দিশি ছুটিতেছে মল্লিকার পরিমল ।
মাধবীর আলিঙ্গনে চূত-হৃদি মুকুলিত,
অকাল বসন্তোদয়ে বৃন্দাবন পুলকিত ।
ধরণীর তপ্ত বুকে চন্দ্রিকা পড়িছে ঝরি'
প্রেমিকার প্রাণখানি আনন্দে উঠিছে ভরি' ।
আকাশে অযুত তারা একটি নয়ন মত
পূর্ণিমার শশী-মুখে চেয়ে আছে মদ্র-হত ।

২

বিভোরা বঁধুর প্রেমে চঞ্চল চরণে রাই
লুটায় অঞ্চলখানি পশিল সঙ্কেত-ঠাই ।

নহিলে
সি-
এ-
ই-
করে
হ—
না
বা
খা-
গ

ফুলময় তনুখানি প্রেম ভরে পড়ে ঢলি',
 বঁধু-মুখ-সোঙরণে পুলকাক্ষ পড়ে গলি' ।
 সহসা অপূর্ব ভাব অন্তরে উদিল তার,
 বহু স্বাদ বঁধুয়ারে দিতে চাহে বার বার !
 সকল সখীরে ডাকি' রাস-মঞ্চ বিরচিল,
 আপনার হিয়াখানি সবারে বাঁটিয়া দিল ।
 অজ্ঞাতে সবার প্রাণে আকুল বাসনা জাগে,
 রাধার হৃদয়-চাঁদে বাঞ্ছে সবে অনুরাগে ।
 যুগল-মিলন লাগি' আকুলা আছিল যা'রা,
 শ্যামেরে ধরিতে হৃদে আজি পাগলিনী তারা !—
 রাধার মনের ভাব অন্তরে জানিল বঁধু,
 সহসা পারশে শ্যাম হেরে প্রতি ব্রজ-বধু !

৩

উতল বিভল হিয়া যতেক আভীরবালা
 ভুলি' লাজ হের ধায় জুড়াতে হৃদয়-জ্বালা ।
 বঁধুরে হৃদয়ে নিয়া কেহ করে আলিঙ্গন,
 নয়ন মুদিয়া কেহ করে রূপ দরশন ।
 অঙ্গের পরশে কার এলাইয়া পড়ে দেহ,
 চুম্বন করিতে গিয়া চেতনা হারায় কেহ !
 কেহ বা গায়িতে গান আপনা পাশরি যায়,
 প্রেমে গদ গদ কণ্ঠ, অক্ষুট কৃজন তায় ।
 আনন্দে নাচিতে গিয়া বিহ্বল চরণ কার
 তাল মান লয় ভুলি' তিলেক না উঠে আর !
 শ্যামের বাঁশরী কাড়ি' কেহ তায় পূরে তান,
 'শ্যাম-শ্যাম-শ্যাম' নাম ফুটে তাহে অবিরাম ।

প্রেমে ডগমগ দেহ, নীরে অন্ধ অঁাখি ছুটি,
বঁধুরে ধরিতে বুকে চরণে পড়িছে লুটি' !

৪

দূর হ'তে দেখি' রাখা প্রেমানন্দে পুলকিত,
সে রাস-মণ্ডপ-ধূলি মাখে অঙ্গে বিমোহিত !
বহু স্বাদ বিনোদিনী বঁধুয়ারে দিল আজ,
একের পিরীতি বঁধু ভুঞ্জিল সবার মাঝ ।
আজি রাই বিশ্বময় আপনারে করি' দান
বহুর ভিতরে এক বঁধুরে করিল পান !
এক শশী কুমুদিনী, এক বঁধু বিনোদিনী,
রসের লহরে আজি বহুরূপ বিকাশিনী !

* * * *

অকস্মাৎ সে সম্মোহ টুটি' গেল স্বপ্ন সম,
নিদ্রোথিত গোপীকুল অবিদিত অনুপম
সুখাবেশে আলুগালু অনল-অবশ-কায়
খুঁজিতে লাগিল সবে ত্রস্তে শ্রাম রাধিকায় ।
কোথা না পাইয়া শেষে নয়ন মুদিল সবে,—
মিলিত যুগলরূপ মরমে ফুটিল তবে !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

নহে
সি
করে
সি
না
বা
খা
না

সেকালের স্মৃতি।—বাজে কথা

১। বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। দুঃখের দিনেও মনে পড়ে, সুখের দিনেও মনে পড়ে। কুচিন্তা যখন উভয়কেই গ্রাস করে, তখনও মনে পড়ে; দুর্ব্বহ জীবনকে বহনীয় ও সহনীয় করে।

জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির পর্যায়ে আনন্দময় পর্ব্বাহের মত মার স্মৃতিপটে সে দিন উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই দিন প্রথম আমি নূতন বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখি; তাঁহার কথা শুনি; তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। সেই দিন প্রথম আমার বঙ্কিম-ভক্তি চরিতার্থ হয়। সে দিনের কথা কি ভুলিবার?

আমি ও মুন্সী—তখনকার মুন্সী—এখনকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই, সি, এসু.—রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট—বঙ্কিম বাবুর দরবারে আমাদের আবে। পেশ করিবার সঙ্কল্প করি। মুন্সী তখন “সাহিত্যে” আমার সহায় ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিম বাবুর কয়েক জন বন্ধুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অর্থাৎ, আমরা যাচিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, এবং কাহারও স্নেহ, কাহারও সহানুভূতি, এবং কাহারও মৌখিক উপদেশ ও তদপেক্ষা সারগর্ভ প্রবন্ধও পাইয়াছিলাম। বঙ্কিম বাবুর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু আমার আবদার কেহ গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা পরিচয়-পত্র দিলেন না। দুই এক জন বলিলেন, “সে বড় কঠিন ঠাই! বঙ্কিম তোমাদিগকে আমল দিবেন না।” আর এক জন বলিলেন, “তোমরা নব্য ছোকরা, বঙ্কিমের ধমক খাইয়া কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে। অনর্থক এ হাস্যামে দরকার কি?”

এক জন বলিলেন, “বন্ধিম বড় অহঙ্কারী। আমার সাহস হয় না।”
বুঝিলাম, সেই সুপারিস পাইব না।

কিন্তু তখন আমাদের নিরাশ হইবার বয়স নয়। “সাহিত্য” ভিন্ন
অন্য চিন্তাও তখন ছিল না। আমি ও মুন্সী পরামর্শ করিলাম, যখন
“রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে” ঘটিল না, তখন
এক দিন “one fine morne” আমরা দুই জনে বন্ধিম বাবুর বাড়ীতে
গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব।

এখন এই “one fine morne”এর একটু ইতিহাস না বলিলে
আপনারা এই ইঁদুরের পরামর্শের মর্ম বুঝিতে পারিবেন না। কবি-
বর দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।
পত্রযোগে তাঁহার সহিত পরিচয়; এবং পত্রে ও কবিতায় সেই
পরিচয় ঘনিষ্ঠতায়—আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি তখন লক্ষ্মী সহ-
থাকিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রত্যেক পত্রে কলিকাতায় আসি-
লিখিতাম। তিনিও প্রায় প্রত্যেক পত্রেই লিখিতেন, one fine
morne তিনি আমাদের আড্ডায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে
করিবেন। বহুদিন হইতে আমরা সেই one fine morne-কে
প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু সেই fine morne আর আসি হ—
কোনও কাজ ঠেলিয়া রাখিবার দরকার হইলে, বা সময়ে কোর্স না
করিতে না পারিলে, আমরা তাহা দেবেন দাদার one fine
morneএর পর্যায়ে ফেলিয়া দিতাম। বন্ধিম বাবুর নিকট যখন
ইচ্ছা যেমন প্রবল, তাড়া খাইবার আশঙ্কাও সেইরূপ সঙ্গীন হইয়া
উঠিয়াছিল। সেই জন্য, উহাকেও আমরা সেই অনির্দিষ্ট one fine
morneএর তালিকাভুক্ত করিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুন্সী আমার কনিষ্ঠ
যতীশের সহিত একযোগে কোনও নব-যশস্বিনী মহিলা-কবিকে কাদ-
ম্বরীর ভাষায় “সাহিত্য” লিখিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। এবং
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন! মহিলা-কবি অপরিচিতের

অদ্ভুত পত্র পাইয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া চিঠির কোণে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—“দেখা হইবে না।” চিঠিখানি ফেরত আসিয়া লজ্জায় যতীশের দেৱাজে লুকাইয়া ছিল! আমি সহসা একদিন তাহা আবিষ্কার করি। মুন্সী এখন ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু তখন কবি ছিলেন। সরল, উদার, ভাবুক কবি, সংসারের প্রহেলিকায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সাহিত্য-রসে ভোরপুর মুন্সীর ভাবোচ্ছ্বাস, এবং যতীশের বাছা বাছা সংস্কৃত কাদম্বরী পড়িয়া আমার খুব আমোদ হইয়াছিল, কিন্তু “দেখা হইবে না”—তেমনই সাংঘাতিক মনে হইল! কেন না, ইহার পর আর তাঁহার রচনা পাইবার আশা করা যায় না।

মুন্সীকে বলিলাম, হাঁড়ী ভাঙ্গিয়াছে, এইবার হাটে পাঠাইব। মুন্সীর সেদিনকার “লাজনত অঁখি” আমার এখনও মনে আছে!—অনেক ব্যক্তিত্বের পর স্থির হইল, এ কাহিনী গুপ্ত থাকিবে।—আজ এথা ছাপিয়া দিলাম। জগৎ শেঠ বলিয়াছিলেন,—

বা “প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।”

সি, আর্ সেই প্রতিহিংসা। জীবনের প্রভাতে ষাঁহাদের ভরসায় “সাহিত্যে” সহায় দিয়াছিলাম, তাঁহারা এখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্য ভোগ করি-
দের। সাহিত্যের ও “সাহিত্যে”র নামগন্ধও তাঁহাদের মনে নাই।
আ একাকী ‘মড়া আগ্লাইয়া’ বসিয়া আছি। মুন্সী “সাহিত্যে”র দানীন্তন মুরব্বীদের অন্ততম। প্রতিহিংসার সাধ হয় না? তাই
সেই পৌরাণিকী বিড়ম্বনার কাহিনী ছাপিয়া শোধ লইলাম। আশা
করি, Less majesty হইবে না!

তখন আর এক জন “সাহিত্যে”র উছোগী, হিতৈষী, কস্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে “সাহিত্যে”র জন্ম গণ্ড-গান রচিয়া এডেন হইতে, সুয়েজ হইতে, মার্সাই হইতে ডাকে দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মালঞ্চ ফুলের

চাষ করিয়াছিলেন, তার পর আইনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন। আমার শাপ ফলিয়াছে। তাঁহাকেও এত দিন পরে রোগে ধরিয়াছে। পরিণত বয়সে সাগর-সঙ্গীত শুনিয়া শব্দের মত সমুদ্রের আরাব ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, দেশে আনিয়াছিলেন। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পরে তিনি নারায়ণের চরণে সোনার তুলসী দিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা সফল হউক। বন্ধুর অশুখ হইলে লোকে বলে, তুমি নীরোগ হও। আমি বলি,—তাঁহার এ রোগ যেন না সারে। এখন দেখুন,—কত ধানে কত চাল। এ নেশার কি মোহ!

আমি এক দিন মুন্সীকে বলিলাম, “চল, বন্ধিম বাবুর কাছে যাই।” সেই “দেখা হইবে না” মুন্সীর মনে বেশ দাগ কাটিয়া, স্থায়ী হইয়া, বসিয়াছিল। মুন্সী বলিল, “গলা-ধাক্কা থাইবার ইচ্ছা হইয়াছে?” আমি বলিলাম, “ঘটকর্ণ হইলে মস্তভেদ হয়। তোমার আমার ধরিয়া ষাট চারি কণ, তাহাতে সে ভয় নাই। গলা-ধাক্কা দু’জনে ভাগ করে লইব। কেহ প্রকাশ করিব না। চল।”

তৎক্ষণাৎ “সাহিত্য-কল্লভ্রম” ও “সাহিত্যে”র কয়েক করে লইয়া আমরা শঙ্কিতচিত্তে বন্ধিম-দর্শনে যাত্রা করিলাম। হ—

বন্ধিম বাবুর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাকে ক’ না বলিয়াই মনে হইয়াছিল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা না বা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা ফুটিবে না।—এই জন্ম ‘বাজে কথা’ গৌরচন্দ্রিকায় এত ‘বাজেতম কথা’ লিখিতে হইল। পরে যাহা লিখিব, তাহাও খুব কাজের কথা নয়। কিন্তু বাজে কথায় বড় বড় চরিত্রের অনেক বড় বড় তত্ত্ব জানা যায়। গভীর গবেষণা ও গভীর বিচারণা তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য হইতে পারে, কিন্তু চরিত্র-চিত্রের তাহাই একমাত্র উপাদান নয়।

এখন বন্ধিম বাবুর বাড়ীতে যাত্রা করি।

তখন বন্ধিম বাবু মেডিকেল কলেজের সম্মুখবর্তী প্রতাপ চাটুর্ঘ্যের

গলিতে বাস করিতেন। বাড়ীখানি সাদা সিঁথে। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে গলির উপর কাশ্মীরী বারান্দা খুঁকিয়া আছে। ইহা একটু নূতন। আমরা পূর্বদিক হইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দক্ষিণে, দ্বারের পার্শ্বেই জলের কল। সেই কলে বন্ধিম বাবুর খানসামা ছুঁকা ফিরাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বন্ধিম বাবু বাড়ী আছেন?” ভূত্য উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনাদের কি দরকার?” আমি চটিয়া লাল। বলিলাম, “বন্ধিম বাবুর কাছে কি দরকার—তা তোকে বলিব কি রে—? তাহা হইলে তোর কাছে আসিলেই চলিত। মর—, তুই খবর দে!”

মুন্সী আমার জামা ধরিয়া টানিতেছিল, এবং মৃদুস্বরে বলিতেছিল, “কর কি? তোমার সঙ্গে কোথাও আসিতে নাই। এসেই দাঙ্গা! চুপ্, চুপ্।” ইত্যাদি।

বন্ধিম বাবুর খানসামা কি বলিতে যাইতেছিল, এখন সময়ে শুনি-বা, উপর হইতে কে বলিতেছেন,—“আপনারা উপরে আসুন।”

চাহিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের দক্ষিণে দ্বিতলের বাতায়নে এক সি, লপ্রাংগু, মহাভুজ, গৌরবর্ণ সুপুরুষ—তাঁহার ডান হাতে বাঁধা আঁণী—তামাক খাইতেছিলেন,—প্রশান্ত মুখে স্নিগ্ধ স্মিতরেখা—উদার সহায়ীট—তখন কি দেখিয়াছিলাম, মনে নাই; কিন্তু এখন মনে দেব আছে, কীর্তিকুম্বের মালা নয়, মনীষার বেদী নয়, প্রতিভার কমলা-স্তম্ভ নয়,—মা’র আশীর্ব্বাদ।

খানসামা বলিল, “বাবু!”

এই বন্ধিমচন্দ্র! বঙ্গদর্শনের বন্ধিম, দুর্গেশনন্দিনীর বন্ধিম, যাদু-কর বন্ধিম, দোদীপ্তপ্রতাপ বন্ধিম! হেমচন্দ্রের বর্ণনা মনে পড়িল,—“পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!” উপর হইতে তাঁহার ভূত্যের সহিত আমার অবিনয়—কলহ বন্ধিম বাবু দেখিয়াছেন! কিন্তু তখন ভাবিবার সময় ছিল না।

খানসামা পথ দেখাইয়া দিল। বামে উপরে উঠিবার সিঁড়ি।

উপরে উঠিলাম। ঘরের মেজের সূচিক্রিত কার্পেট পাতা। প্রাচীরে অয়েলপেণ্টিং। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ-দেবতা ও তাঁহার নিজের ছবি। কোচ, কেদারা প্রভৃতি সুন্দর ও সুবিগ্য়স্ত। এক কোণে একটি টেবিল-হারমোনিয়ম। বঙ্কিমবাবু গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর। গায়ে একটি হাত-কাটা জামা। ধুতিখানি কোঁটানো। পায়ে চটী। পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন। আমরা বাহিরে জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই দিন, সেই প্রথম, ভক্তিভরে অবনত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—“থাক্, থাক্।”

ইহার উত্তরে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না। ঠিক মনেও নাই। এখনকার কথা তখনকার সেই মুহূর্তের উপর আরোপ করিলে আসর জমিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোনও লাভ নাই। কেহ কেহ হামাগুড়ি দিবার সময় হঠাৎ নীল আকাশে চাহিয়া অনন্তের কি মহিমা অনুভব করিয়া তেরো বৎসর বয়সে ‘কাব্য’ লিপিরে বার কি পণ করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস সতের দিন সাড়ে একুশ ঘণ্টা পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সকলের ভাগ্যে তা করে ঘটে না। তবে একটা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, আমাদের কৈশোহ—ভক্তি যেমন স্বাভাবিক ও সার্বভৌমিক ছিল, এখন বোধ হয় ত না তেমন নাই। এখন ভক্তি হয় ত আরও গাঢ়, আরও সংহত, এ কতকটা উদ্দাম হইয়াছে। এখনকার ভক্তি গোঁড়ামীর গন্ধে ভোরপূর—এ ভক্তি ভক্তকে উদার করিতে পারে না,—এক ভক্তি শত ধারায় উচ্ছৃঙ্খিত হইয়া ভক্তকে সহস্রের প্রতি ভক্তিমান করে না, চিত্তকে স্নিগ্ধ করে না—সমাজকে শাস্ত ও দাস্ত করিতে পারে না। এখনকার ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্তির পাত্র ও ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই;—যাহারা বা যাহা তাহার ক্ষুদ্র সীমার অন্তর্গত নয়, তাহা মহান্ হইতে পারে, স্বর্গীয় হইতে পারে, কিন্তু অন্ধ ভক্তির ও তাল-কাণা ভক্তের পক্ষে এ জগতে তাহার অস্তিত্বই নাই। ভক্তির ক্ষেত্রে

যে দেশের সাহিত্য অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই দেশের সংস্কারে সিন্ধু বাদের স্কন্ধবিহারী বুড়ার মত এই নাটুকে সাহিত্য-ভক্তি ভর করিয়াছে। ভক্তির এই কারাদণ্ড দেখিয়া আমরা ত স্থখী হইতে পারি না।

বন্ধিম বাবু বলিলেন,—“বসুন”। আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। বন্ধিম বাবু না বসিলে আমরা বসিতে পারি না। অবস্থা ঠিক—“ন যযৌ ন তশ্চৌ”! বন্ধিম বাবু অঙ্গুলিনির্দেশে একখানি কোচ্ দেখাইয়া দিলেন। আমি বলিতেছিলাম,—“আপনি দাঁড়াইয়া—”

কথা শেষ করিতে না দিয়া বন্ধিম বাবু বলিলেন, “আমার বাড়ী,— আমি বেশ আছি, আপনারা বসুন।” আমি বলিলাম, “আমাদের ‘আপনি’—বলিবেন না। আমাদের অপরাধ হয়।” বন্ধিম বাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন “আচ্ছা, বসো”।

আমরা সেই কোচে বসিলাম। মনে একটু ভরসা হইয়াছিল; বন্ধিম বাবু বাঘ নন, বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, হাসিয়া হাসিয়া

। কন; গলা-ধাক্কার সম্ভাবনাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে!

সি, আমাদের নীরব দেখিয়া বন্ধিম বাবু বলিলেন, “তোমাদের আচনকেই আমি জানি। তুমি ত বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র? তোমার সহায় সুরেশ, নয়?”

দের আমি বলিলাম, “আজ্ঞে হাঁ।”

আমি বিস্মিত হইয়া বন্ধিম বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধিম বাবু বলিলেন, “তোমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে? সেদিন দীন-বন্ধুর পৌত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। দরজার কাছে তুমি, তোমার সঙ্গে বন্ধুদের মজলিস্ করিতেছিলে। আমাদের হেম করের ছেলে পণ্টুও তোমাদের সঙ্গে ছিল। তোমাদের আমোদ দেখে আমাদের ছেলেবেলা মনে পড়ে গেল। দেখলুম, তুমিই জমিয়ে রেখেছ। শরৎকে জিজ্ঞাসা করে শুনলুম, তুমি বিদ্যাসাগরের নাতী, তোমার নাম সুরেশ। পরে বন্ধিমকে বললুম তোমাকে ডাকতে।

বন্ধিম যাচ্ছিলেন,—আমি আবার বল্লুম,—ওরা আমোদ করছে,—করুক ; ডেকো না, বুড়োর কাছে এসে কি হবে ? এখানে থেকেই ওদের হাসি তামাসা দেখি ।”

দীনবন্ধু সেই দিনের বন্ধু, নীলকরের যম, বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ! শরৎ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র । বন্ধিম তাঁহার তৃতীয় পুত্র,—এখন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ, বর্তমানে শূকবি ও দার্শনিক, কলিকাতার ছোট আদালতের জজ । পণ্টু—পি, সি, কর, ওরফে প্রমথচন্দ্র কর, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নী, অধুনা লোকান্তরিত হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র । হেমবাবুও ডেপুটী ছিলেন, বন্ধিম বাবুর সমকক্ষী ।

তাঁহার পর মুন্সীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তোমাকেও আমি জানি । তোমার বাপ ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ । তুমি যেবার বি, এ, দাও, সেবার আমিও ইউনিভার্সিটি-হলে গিয়া-ছিলাম । কৌকড়া কৌকড়া বাবরী চুল, এত অল্প বয়সে বি, এ,র দিচ্ছে দেখে ত্রৈলোক্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এ ছেলেটি কে হে—খুব অল্প বয়সে বি, এ, দিচ্ছে ত ? চেনো ?’ ত্রৈলোক্য বললে করে ‘ঘনশ্যামের ছেলে ।’ তোমার ডাকনাম মুন্সী ? ভাল নাম কি ?—

মুন্সী বলিল, “জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।”

ক না

বন্ধিম বাবু বলিলেন, “তুমি কি কচ্ছ ?”

মুন্সী বলিল, “আমি এম্, এ, দিয়াছি ।”

১৩

আমি বলিলাম, “ও আবার এম্, এ, দেবে বলে পড়ছে । আমরা বলছি, তুমি বিলেতে যাও, সিভিলিয়ান্ হবার চেষ্টা কর ।”

বন্ধিম বাবু বলিলেন, “ওর বাবা কি বলেন ?”

আমি বলিলাম, “তাঁর অমত নাই । বন্ধিম বাবু বলিলেন, “তবে আবার এম্, এ, কেন ?”

তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার হাতে কি ?”

আমি অবসর পাইয়া কল্পিত-হস্তে সেই “সাহিত্য-কল্পদ্রুম” ও কল্প-

ড্রাম-কাটা “সাহিত্য” বঙ্কিম বাবুর হাতে দিলাম। বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, “আগেই বলে রাখি, তোমরা যদি আমাকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দাও, তাতেও আমি রাজী আছি। কিন্তু আমাকে তোমাদের কাগজে লিখতে বলা না।”

গলা-ধাক্কা বটে! কিন্তু কি সুন্দর, কি মিষ্ট প্রত্যাখ্যান! যে আশায় গিয়াছিলাম, তাহাতে ছাই দিয়া, সুবুদ্ধির মত তখনই বলিলাম, “যে আজে!”

দু’জনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধ্যসাধন করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মনে হইল, ফাঁড়াটা অতি অল্পেই কাটিয়া গেল।

বঙ্কিম বাবু “সাহিত্য” সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন। মুন্নী বলিল, “সুরেশকে আমরা সম্পাদক করিয়াছি”।

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, “তোমার দাদা-ম’শায় জানেন?”

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। দাদা-ম’শায় জানেন কি না, তাহা আমি ঠিক জানিতাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন স্নিবে, জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। খুব সম্ভব, তিনি আমাকে এমন অধিকার-চর্চা করিতে দিতেন না। বাড়ীতেই আফিস ছিল। লুকা-সহা জিনিষ নয়, হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, বারণ করেন নাই। মুন্নী দেখে, “বোধ হয়, তিনি জানেন।”

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, “সে কি? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না বলে’ কাগজ বার করে’ ফেলো। তিনি শুনলে রাগ করবেন না?”

আমি বলিলাম, “বোধ হয় শুনেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি নি।”

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “দেখ, লেখা টেখা মন্দ নয়। কিন্তু তোমাদের এখন পড়বার সময়—এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। জীবিকার জন্তে ত কিছু কল চাই। এতে উপার্জননের আশা নাই। আমরা

কলেজ থেকে বেরিয়ে এ সব কাজ করেছি। এই চাকরী করতে করতেই লেখার জন্মে ছুটি নিয়ে এখন ভুগছি। এতদিন পেন্সন নেওয়া যেতো,—আর ভাল লাগে না, শরীরও বয় না, কিন্তু সেই ছুটিগুলো এখন পুষিয়ে দিতে হচ্ছে।”

বঙ্কিম বাবু তখনও পেন্সন গ্রহণ করেন নাই।—আমি নিরুত্তর।

মুন্সী আমাকে উদ্ধার করিল। সে বলিল, “বিদ্যাসাগর মশায় ওদের দু’ ভাইকে স্কুলে দেন নি। বাড়ীতে পড়ান।”

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “কেন? তাঁর নিজের স্কুল কলেজ রয়েছে, নাতীদের স্কুলে পড়ান না? এর মানে কি?”

মুন্সী বলিল, “তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত, আগে সংস্কৃত পড়ে, পরে ইংরিজী পড়লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়ীতে পড়ে। তিনি বলেন, ভাল করে’ পড়া শুনা করে’ ওরা বাঙ্গালা লিখবে। তিনি নিজে সময় পান নি, যা সাধ ছিল, লিখতে পারেন নি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।”

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “তবে ভাল।”

আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “আমি লিখিতে পারিব না, কিন্তু ‘হু—
দের যখন যা জানবার দরকার হবে, জেনে যেও; আমি অনেক না
‘বঙ্গদর্শন’ চালিয়েছি। সব জানি। ম্যানেজারী পর্য্যন্ত।”

আমরা উঠিলাম। আবার বঙ্কিম বাবুর পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিলাম। “সাহিত্যে”র দুর্ভাগ্য ভাবিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর সদাশয়তায় মুগ্ধ—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

মুন্সী বলিল, “একবারে ‘যে আশ্চে’ বলে ফেলেন? এ দিকে মুখে খই ফোটে, একটা কথাও কইতে পারলে না?”

আমি বলিলাম, “তুমিই কোন্ পারলে?”

সেই দিন হইতে তিন দিন তিন রাত্রি বঙ্কিম বাবুর warning-
এর কথা ভাবিতে লাগিলাম। জীবিকা, দারিদ্র্য, বিফলতা,—নানা

শঙ্কায় মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত ছুঁদিকে
তুলিতে লাগিলাম।

তৃতীয় রজনীর শেষ যামে স্থির করিলাম,—“যে কাজের সূত্র-
পাতেই বন্ধিম বাবু আমার ভবিষ্যৎ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাহা ঘটে,
ঘটুক, সে কাজ ছাড়িব না।”

বাগান হইতে বেল, জুই, চামেলী, গন্ধরাজ, বকুলের গন্ধ ভাসিয়া
আসিতেছিল। চন্দ্রকিরণে মৃদু-বিভাসিত উদ্ভানের সৌম্য শ্যাম শ্রী
আমার স্বপ্নকে আরও সুন্দর করিতেছিল। কিশোর বয়সের কল্পনা
আশার যবনিকায় আমার অক্ষমতা, বিফলতা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল!
জীবন বিফল হইয়াছে, সে আশা ধূলায় লুটাইয়াছে,—কিন্তু অতীতের
স্মৃতি আছে। এখন আমার পক্ষে তাহাও সুন্দর। জানি, পাঠকের
পক্ষে নয়। কিন্তু সেই স্মৃতির চিত্রশালা হইতে ক্ষুদ্রের প্রতি বন্ধিম-
ক্ষুদ্রের স্নেহ, তাহার তুচ্ছ ঘটনা মনে করিয়া রাখিবার স্মৃতি আজ
করিয়া দিলাম। যদি পাঠকের মনের মত ও সম্পাদকের
মি হয়, পরে আরও বলিব।

সি
অ
স
দে

শ্রীশুরেশ সমাজপতি।

ভাষার কথা

বাংলা ভাষার স্বরূপ নিয়ে কিছুদিন যাবৎ একটা মহা তর্ক উঠেছে। একদল বলছেন যে ভাষাটা সংস্কৃত ভাষারই রূপান্তর এবং বাংলা ভাষার উন্নতি মূল সংস্কৃত অনুযায়ী হওয়া উচিত। যতক্ষণ আমরা সংস্কৃতের আদর্শ আমাদের সামনে রাখব ততক্ষণ ভুল ভ্রান্তি এড়িয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকব। শব্দটী যতই ব্যবহার হ'ক না কেন, যেখানে সংস্কৃতের সঙ্গে মিল হবে না সেখানেই ভুল হবে এবং আমাদের সেরূপ শব্দ এবং বাক্য ত্যাগ করতে হবে। চলতি কথার আমদানীটা নেহাতই গ্রাম্যতার পরিচয় দেয়, ভাষাটাকেও ক্রমশঃ শ্রীহীন ও আবিল করে ফেলে এবং লেখকদের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করে। এই জন্য ফ্রান্সে Academy আছে। সেখানে পণ্ডিতেরা কথার উপর যখন ছাপ মেরে দেন তখনই সেটা সাহিত্য-বাজারে চলে। আমাদের পূর্বপুরুষের তৈরী সংস্কৃত ভাষাটাই সেই Academyর কাজ করে—আমাদের একটা আলাদা পণ্ডিত-সমাজ গঠন করে নিতে হবে না। সংস্কৃত নিয়ম মার্কিন যে শব্দ চলে সেইটাই গ্রাহ্য—অন্য শব্দগুলার জাত নাই—কাজের জন্য যতই দরকার হ'ক না কেন; তারা এক পংক্তিতে আসন পাবার যোগ্য নয়।

আর একদল বলেন যে সংস্কৃত ভাষাটা যদিও মাতৃভাষা বটে, তবুও বাংলা ভাষার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। মেয়ে হলেও সে এখন অন্য গোত্র-ভুক্ত হয়েছে। তার উন্নতির নিয়ম সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে হবে না। পার্শী, ইংরাজী ও নানাবিধ দেশজ অনার্য ভাষার মিশ্রণে বাংলা তৈরী। তাকে জোর করে সংস্কৃত নিয়মে বন্ধ করলে রীতিমত শৃঙ্খলিত করা হবে—তার উন্নতি হওয়া দূরে থাক, বাঁচা দায় হবে। জীবন্ত ভাষার ছাঁচ—জাতীয় জীবন; যেখানে নানাবিধ উপকরণে সে জাতীয় জীবন গঠিত সেখানে জাতীয় ভাষাতেও জীবনের ছায়া দেখা

যাবে। জীবন-সংগ্রামে জাতিই বল বা ভাষাই বল—যে যত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিল করে নিতে পারবে সে ততই জীবনীশক্তি লাভ করবে। সংস্কৃতের নিয়মগুলো বাংলার উপর সিন্ধুবাদ নাবিকের স্কন্ধে দ্বীপবাসী বৃদ্ধের মত চড়িয়া বসিলে বেচারার প্রাণ সংশয় হবে।

সংস্কৃত ওয়ালাদের প্রথমেই কিন্তু একটা বিষম সমস্যা। সংস্কৃত থেকে যে আমরা বাংলার উৎপত্তি ধরে নিচ্ছি সেটাই গোড়ায় গলদ। প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা জন্মেছে, আর সে প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা নয়, এটা সকলেই এখন জানেন। আজকাল আবার এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেকেই সন্দেহ করেন যে সংস্কৃত ভাষাটার আদৌ মৌখিক ব্যবহার ছিল কি না। কালিদাস, ভারবি, অমরসিংহের ভাষাটা কেবল লেখাতেই চলত, লোকে কহিত কিন্তু নানা রকমের প্রাকৃত ভাষা। পণ্ডিত Rhys David প্রভৃতির মত এই যে, সংস্কৃত ভাষা কোনও কালেই কথিত ভাষা ছিল না, চিরকালই ইহা “schrift-sprache”—পণ্ডিত কাগজ কলমে লিখিতেন। Prof. Rapson প্রমুখ আচার্য্যেরা এ মত খণ্ডন করেছেন। দুপক্ষে এখনও তুমুল তর্ক চলছে—নিশ্চিত হয়ে কোনও মতটাকেই এখনও অবলম্বন করা যায় না। কেবল ইহাই ঠিক বলা যেতে পারে যে এরূপ দুর্বল ভিত্তির উপর আমাদের বাংলার উন্নতির সৌধ স্থাপন করলে চলবে না। যে ভাষা কখনও চলতি ছিল কিনা তারই সন্দেহ, যদি তার নিয়মে একটা জীবন্ত ভাষাকে চালাবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হ'লে আমাদের ইতিহাসের শিকার বিরুদ্ধে চলতে হবে এবং শেষে পসূতাতে হবে।

ভাষাকেই এক সময় না এক সময় এই সমস্যার উত্তর সকল ঠিক করে নিতে হয়েছে। আধুনিক জার্মান ভাষার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রশিয়ার অধীশ্বর Frederick the Greatকে আধুনিক জার্মানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বুলেই চলে। কিন্তু তিনি বরাবরই ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। তাঁর সময়ে ফরাসী আদর্শই ভাষাতে চলিত। সাহিত্যে ত চলিতই, অধিকন্তু শব্দেতেও

তার আধিপত্য কম ছিল না। এ সময়কার জার্মান সাহিত্যকে ভাঙ্গা ফরাসী বলিলেই চলে। সেই সময়ে Leipzig এ কয়েকটি লেখকের আবির্ভাব হয়। গটশেড তারই অগ্রতম। তিনি ভাষা থেকে ফরাসী প্রভাব দূর করতে সম্যক চেষ্টা করেন। একটা সভা স্থাপনা করে সকল ব্যবহৃত শব্দগুলির আভিজাত্য নিরূপণ করা হয়। ঠিক হয় যে, জার্মান ভাষাতে যে Latin, French ও বিদেশী শব্দ আছে, তার জায়গায় জার্মান শব্দ গঠন করা হ'বে, আর যে ভাবটী ল্যাটিন শব্দ ও জার্মান শব্দ দ্বারা সমান রকমেই প্রকাশ করা যায়, সেখানে জার্মান শব্দটিকে গ্রহণ করতে হবে। এই সব নিয়মের আধুনিক ফল জার্মান সাহিত্যে বেশ দেখা যায়। অনেকে ল্যাটিন ও ফরাসী শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন না। গটশেডের পর লেসিং গটশেডের নিয়মগুলি সাহিত্যে জেদ করে ব্যবহার করেছিলেন। তার পর এঁদের গঠিত সাহিত্য, শিলার ও গেটের হাতে ভুবন-বিখ্যাত হ'য়েছে। কিন্তু গেটে ও শিলারের ভাষাও এখন অনেকটা বদলেছে। হাইনার ও নিয়েট্জার ভাষার সঙ্গে গেটে ও শিলারের ভাষার প্রচুর প্রভেদ। মধ্যে মধ্যে বহুরূপ পণ্ডিত সভা স্থাপিত হ'য়ে জার্মান সাহিত্যকে নিয়মে বাঁধবার চেষ্টা করা হ'য়েছে, কিন্তু কোনটাই চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

ইংরাজী সাহিত্যের উদাহরণই দেখা যাক। যখন বেউল্ফ ও লেয়ামন লিখিয়াছিলেন, তখন কোন dialect ইংরাজী বলে গণ্য হবে, সে সমস্যার অনেকেই উত্তর দিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে Earle এর Philologyর গোড়ার কয়েক পৃষ্ঠাতেই বেশ সূচাক-রূপে আলোচনা আছে। তার পর Chaucer ; তাঁর ভাষা আবার অন্তরূপ। Spenser, Shakespeare ও Milton যদিও প্রায় সমসাময়িক, ভাষার ভঙ্গীতে কিন্তু কত প্রভেদ। আবার এই ইংরাজীই Rudyard Kipling কিম্বা Maesfield ব্যবহার করেন তাঁদেরই সঙ্গেই বা Pope ও Dryden এর ভাষার মিল কই ? আজ-কালকার অনেক ইংরাজী-

শিক্ষিত বাঙ্গালী Shakespeare, Johnson ও Burkeএর ইংরাজী ব্যবহার করেন বলে আমাদের Jabberjee বলে কত না ঠাট্টা করা হয়। কই আপনি Macaulay কিম্বা Carlyleএর styleএ লিখে পার পান দেখি ?

কথাটা হ'চ্ছে এই, যে ভাষাবিজ্ঞানেই—Philologyতেই বলুন বা সাহিত্যেই—Literatureএতেই বলুন, কোন খানেতেই এক বাঁধা নিয়ম চিরকাল খাটবে না। যখন যেটার সাহায্যে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হবে, প্রতিভাশালী লেখক তখনই তাহার সাহায্যে অগ্রসর হবেন। যেখানে একটা চলতি কথায় ভাবটা ঠিক প্রকাশ করা যায়, সেখানে ঘুরিয়ে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে কেহই রাজী হবেন না। এটা মানসিক শৈথিল্যের জন্ম নয়, ভাবের ক্ষুণ্ণতার জন্ম। ভাষার গঙ্গা দেশ-দেশান্তর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে; অনেক নূতন শাখানদী অনেক নূতন সম্পদ এনে যোগ দিচ্ছে—পর্বত-বক্ষুর হিমা-চল ক্রোড় থেকে শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, বিভিন্ন রূপে একই নদী দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে। কেহই পদ্মাতে অলকানন্দার অনাবিল স্বচ্ছতা খোঁজে না।

তবে কি লেখকদের উচ্ছৃঙ্খলতার কোনও বাধা নাই ? ক্রিয়াপদ আগে দিয়ে আর সর্বনাম পদ বাক্যের শেষে দিয়ে কি লেখাটাই এদেশে চলে যাবে ? আর কলিকাতার “হালুম হলুম” কি বাঙ্গালা ভাষাতে চির কালই ভয় দেখাতে থাকবে ? থাইলাম লিখি, না “খেলুম” লিখি—না সব পরিত্যাগ ক'রে “ভক্ষণ করিলাম” লিখিব ? ব্রীহট্টের ভাষাই কি বাঙ্গালার আদর্শ হবে, না নবদ্বীপের ভাষাটাকেই আমাদের সকলকেই মেনে চলতে হবে ?

কোন প্রাদেশিক ভাষা শেষে বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হবে তা বলা মুকঠিন। যদি কোনও ভাষা আদর্শ হয়, তাহা হ'লেও এই আদর্শ ভাষা যে চিরকালের জন্ম বাঙ্গালা ভাষাটাকে একটা বিশেষ ছাঁচে বদ্ধ ক'রে রাখবে, এরূপ ভাববারও কোন কারণ দেখি না। আমালী

ভাষা, বিদ্যাসাগরী ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, সব ভাষাগুলিরই বিশেষত্ব আছে। এই সব লেখকদের হাতে তাঁদের ভাষার ভঙ্গী বেশ পরিপুষ্ট লাভ করেছে। ভবিষ্যতে যদি শ্রীহট্ট কিস্বা কুচবিহার হইতে প্রতিভাশালী লেখকের উদ্ভব হয় এবং তিনি তাঁর প্রাদেশিক ভাষাতে লেখেন তা' সকলেই আহ্লাদের সহিত পড়বে এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কিস্বা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নাই বলে কেউ তাঁর দোষ ধরবে না। যে রকম ভাষাতেই প্রতিভা-শালী কবি লিখুন না কেন, জন-সমাজকে তাহা গ্রাহ্য করতে হবে—কেন না 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ'। ভাষাতে লোকে প্রাণ খোঁজে, পোষাক নহে। যৌবনের উদ্দামশক্তির যে বিকাশ হয়, তাহা জীবনীশক্তির পরিচায়ক এবং ভাষাতেও সেই শক্তির বিকাশ আমরা জীবনীশক্তির প্রমাণ বলে আদর করব।

শ্রীমন্নথনাথ বসু।

চির-কিশোর

শৈশবে শিখিনু আমি কন্দুকের ক্রীড়া
তব পাশে ধূলি মাখা সাজে,
তোমার চরণ বেড়ি নাচিয়া নাচিয়া
এই বিশ্ব-বৃন্দাবন—মাঝে ।

কৈশোরে তোমার সহ বনে, পথে, মাঠে
গোষ্ঠে গোষ্ঠে চরাইনু ধেনু,
যমুনার কাল জলে খেলিনু সাঁতার
শিখিলাম বাজাইতে বেণু ।

যৌবনে যা' রসলীলা প্রেমের স্বপন
সেও তব প্রেম-দৌত্য কাজ,
তব দোল-ঝুলনের করি আয়োজন
রচিলাম তব প্রেম-সাজ ।

আজি বৃদ্ধ-গোপ আমি হে চির-কিশোর
তুমি একই করিতেছ লীলা,
আমি শুধু ভাব-মগ্ন কাঁদি, ঝরঝর
গলে যায় হৃদয়ের শিলা ।

আজো তুমি বাজাইছ সুমোহন বেণু
অনন্তের বারতা সে আনে,
বিশ্বভরা তব দোল-ঝুলন হেরিয়া
নাচিবারে সাধ যায় প্রাণে ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

পৌরাণিকী কথা

ধরার ভার ও অবতার

পুরাণ সকল ভাল করিয়া পড়িলে মনে হয়, জর্মন দেশের আধুনিক দার্শনিকগণ যে Super-man বা অতি-মানুষের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবতার। অতিমানুষ-প্রভাবসম্পন্ন যিনি, যিনি সমাজের গ্লানি দূর করিয়া, সমাজে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, ধরার ভার হরণ করিতে পারেন, তিনিই অবতার, তিনিই Super-man। সামঞ্জস্যের নাশকেই ভার বলা যায়; শক্তিসামঞ্জস্যকে যে বাহিরের শক্তি নষ্ট করিতে পারে, সেই বিরোধী শক্তির সাহায্যেই ভারের অনুভূতি হয়। সেই শক্তিই ভারের দ্যোতক। এই শক্তিই অধর্ম; ইহার অভ্যুত্থান হইলেই ধরার ভার বাড়িয়া যায়, আর নারায়ণকে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। জর্মন দার্শনিকগণের State, আমাদের সমাজ এবং পুরাণের ধরা প্রায় একই পদার্থ। যাহার দ্বারা State বা সমাজ বা ধরা স্থির থাকে, সমঞ্জসীকৃত মানব-শক্তির প্রভাবে উন্নতি ও বিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই ধরার বা সমাজের বা Stateএর ধর্ম; কেন না তাহার দ্বারাই সমাজ ধৃত রহিয়াছে। সমাজের ধারণাশক্তিই সমাজের ধর্ম, ধরার ধর্ম, Stateএর ধর্ম। এই ধর্মের গ্লানি হইলেই নারায়ণের অবতার—Super-manএর আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অবতার পাপ-পুণ্যের গণ্ডীর ভিতর থাকেন না; তিনি তেজস্বী, তিনি যাহা করেন, তাহাই পুণ্য, তাহাই তাঁহার লীলা। বালিবধের কথা তুলিয়া আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, তোমার-আমার পাপ পুণ্যের মাপকাটি লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কার্যের বিচার কর কোন হিসাবে? তিনি ধর্মের গ্লানি দূর করিবার জন্ত, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; বালি দুষ্কৃত, ধর্মের অপহরকারী; যেমন করিয়া হউক তিনি তাহার

বধ সাধন করিয়া সমাজের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বালিবধে যখন সমাজের কল্যাণ হইয়াছে, তখন বধের ভঙ্গী লইয়া বিচার করার কোন প্রয়োজন দেখি না। আচার্য্যগণের ও ব্যাখ্যা-গণের এই বিচারপদ্ধতি, এবং জর্জর্জ দার্শনিকগণের Super-man প্রতিষ্ঠার বিচার পদ্ধতি মিলাইয়া দেখিলে একটু বিস্মিত হইতে হয় ; কেন না, সিদ্ধান্ত বাক্যে উভয়েই প্রায় এক স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

অবতার তত্ত্বের মধ্যে, ধরার ভার হরণ-ব্যাপারে ব্যক্তিত্ব—মান-বতা যেন অপরিহার্য্য ব্যাপার। ইচ্ছাময় ভগবান ইচ্ছা করিলে অঘটন ঘটে, ধরার সকল ভার হরণ হইয়া যায় ; তিনি মানুষ সাজিয়া জগতে অবতীর্ণ হনই বা কেন, মানবতার সকল দুঃখ বহনই বা করেন কেন ? ইহার উত্তরে Schleirmacher শ্রিয়রম্যাকরের একটা উক্তি উদ্ধৃত করিব—“The State alone gives the individual the highest degree of life”। সমাজে না থাকিলে মানবতার উন্মেষ, আদর্শ মানুষের সৃষ্টি হইতেই পারে না। ভগবান অবতার গ্রহণ করেন আদর্শের সৃষ্টির জন্য ; সে আদর্শ কাহাদের জন্য ? মানুষের মঙ্গলের জন্য। মানুষের মঙ্গল সাধন হয় কিসে ? বাধা-উত্তীর্ণে, দুঃখ-উপভোগে। তাই যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান কেবল দুঃখের বোঝাই বহিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণ কেবল দুঃখের কাহিনীতেই ভরা—দুঃখের ইতিহাস, ট্র্যাজেডির পরম্পরায় পরিপূর্ণ। কারণ, গ্রানি মানেই দুঃখ, ধরার ভার বোধ হই-তেছে বলিলেই ধরা-বক্ষে দুঃখের উপস্থিতি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সে দুঃখের অনুভূতি বাহার নাই, সে তেমন দুঃখ দূর করিতে পারে না। ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া প্রথমে দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করেন, পরে সেই দুঃখের ক্রোড়ে মানুষ হইয়া, পূর্ণরূপে দুঃখের পরিচয় পাইয়া তবে তাঁহাতে অতিমানুষ-মহত্বের উন্মেষ হয় ; সেই মহত্বের প্রভাবে তিনি দুঃখ দূর করেন, ধরার ভার হরণ করেন। তাই তিনি যে সমাজে ধর্ম্মের গ্রানি উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমাজেই জন্মগ্রহণ

করেন যে সংসার হইতে দুঃখের উৎস ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, সেই সংসারেই অধিকাংশ স্থলে অবতীর্ণ হন। পরশুরাম মাতৃ-কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া তীব্র জ্বালায় অর্ধার হইয়া, একুশ বার ধরাধামকে নিঃ-
ক্রিয় করিয়াছিলেন ; শ্রীরামচন্দ্র পিতার কলঙ্ক-দুঃখের ভার বহন
করিয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মাতুলের কলঙ্কে দুঃখী ; বুদ্ধদেব
প্রজার দুঃখে দুঃখী ; কঙ্কী দুঃখের প্রবাহে দুঃখী। বলির মত দাতা,
জ্ঞানী, পণ্ডিত-সেবক সম্রাটকে সমাজপতির কর্তব্য বুঝাইতে যাইয়া
ভগবান দুঃখে মূগ্ধ ক্ষুদ্রকায় বামন হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অব-
তার তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, দুঃখ ছাড়া অবতার হয়
নাই—হইতেই পারে না।

এইখানে ভাবুকগণ একটি প্রশ্ন করিয়াছেন—সত্য যুগে চারি
পাদ ধর্ম, অথচ চারিটি অবতার ; ত্রেতায় তিন পাদ ধর্ম, অথচ তিনটি
অবতার ; দ্বাপরে দুই পাদ ধর্ম, অথচ দুইটি অবতার ; কলিতে এক পাদ
ধর্ম, অথচ একটি অবতার ? যখন ধর্মের আধিক্য থাকিবে তখন অব-
তারের বাহুল্য কেন ? উত্তরে আচার্য্যগণ বলিতেছেন যে, ধর্মের আধিক্য
থাকিলেই ধর্মের গ্লানির অনুভূতি সদ্যঃ সদ্যঃ হয়। মনুষ্য-সমাজে
ধর্মের গ্লানির অনুভূতি হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। দুঃখ হইতেই
ধরার ভারবোধ, এবং সেই জন্মই নারায়ণের অবতার গ্রহণ। সত্য
যুগে চতুস্পাদ ধর্মের প্রাবল্য ছিল বলিয়াই ধর্মের গ্লানির অনুভূতি
তীব্রভাবে হইত, কাজেই ডাকের মাথায় ভগবানকে আসিতে হইত।
কলিযুগে ধর্মধর্মের অনুভূতি ক্ষীণ ; ধর্মের গ্লানি হইল কি না হইল
তাহাই সামাজিকগণ সহজে বুঝিতে পারেন না ; গ্লানিবোধ না
থাকিলে দুঃখ বোধ হয় না। দুঃখ বোধ না হইলে দুঃখ দূরের চেষ্টা
হয় না। সমাজে দুঃখ দূরের চেষ্টা না হইলে নারায়ণের অবতার
হয় না। পরন্তু, যখন দুঃখের সাগরে মনুষ্য-সমাজ ভাসিয়া উঠে,
তখন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে, দেবতার আস্থানে নহে, নারায়ণকে
দুঃখ দূর করিবার জন্ম ন্যায়ের অবতার সাক্ষিয়া কেবল একবার

আসিতে হয়। এই জন্ম কলিতে একটি বৈ দুইটি অবতার নাই।

আবার ইহার মধ্যে আরও একটু মজা আছে। যে কয়টি কেবল নাশের অবতার, কেবল ধরার ভার হরণ করিয়া চলিয়া যান, সে কয়টি জাতিতে ব্রাহ্মণ ; যাঁহারা নাশও করেন, রক্ষাও করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, কল্কী—ইহঁারা চারি জন ব্রাহ্মণ। দেবতার মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং সংহারকর্তা শিব, উভয়েই ব্রাহ্মণ। একা পালনকর্তা নারায়ণই ক্ষত্রিয়। নারায়ণ স্বয়ং ক্ষত্রিয় ; কিন্তু তাঁহার দশাবতারের মধ্যে কাহারও মতে পাঁচজন, কাহারও মতে চারিজন ব্রাহ্মণ। যখনই সমাজে পালনী শক্তির অপচয় ঘটিয়াছে বা সে শক্তির ব্যাঘাতকারী আর কিছুর উদ্ভব হইয়াছে, তখনই ব্রাহ্মণরূপে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া হয় অপচয়ের উপচয় ঘটাইয়াছেন, নহে ত ব্যাঘাতকে দূর করিয়াছেন। হিরণ্যকশিপু ভাল রাজা ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবী শক্তির বিরোধী ছিলেন ; সে বিরোধের ব্যথা ফুটাইবার জন্ম প্রহ্লাদের জন্ম ; প্রহ্লাদের আহ্বান প্রভাবেই নৃসিংহ অবতার এবং ব্যাঘাতের অপসারণ। বলির দানে, একটা গুণের অত্যন্ত বৃদ্ধিতে সমাজের সামঞ্জস্য নাশ এবং দানের স্পর্ধাবিকাশ, তাই ব্রাহ্মণ বামনের অবতার গ্রহণ। ক্ষাত্র শক্তির উন্মাদ-বিকাশে বিলাসের উদ্ভব, ব্রাহ্মণ্যের অপচয়, তাই জামদগ্ন্যের অবতরণ। কলির প্রভাবে পাপের অতিরিক্তি—অত্যন্ত বিস্তার, তাই বিষ্ণুযশার গৃহে ব্রাহ্মণ কল্কীর জন্মগ্রহণ। পরশুরাম ক্ষাত্র শক্তিকে প্রায় নির্মূল করিয়াছিলেন বলিয়াই বেদব্যাস ব্রাহ্মণরূপে সে শক্তির উপচয় সাধন করিয়াছিলেন। পুরাণের সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য শক্তি সৃষ্টিতে ও নাশে প্রযুক্ত, ক্ষাত্র শক্তি রক্ষায় ও পালনে নিযুক্ত। তন্মধ্যে আদ্যাশক্তির বেলায়ও ঐরূপ জাতিবিচার আছে। যেখানে মা জগদ্ধাত্রী, সেখানে মা নারায়ণী—বৈষ্ণবী শক্তি সম্পন্ন। যেখানে মা সংহারকারিণী, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণী শিবাণী। শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে শ্রীভগবানের

অসংখ্য অবতার হইলেও, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ গুণ অনুসারে তাঁহাদের জাতি নির্ণয় হইয়াছে।

(পুরাণের অবতারবাদের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চাই একটা মানুষ। মধ্যে মধ্যে, যুগে যুগে একটা আদর্শ-মানুষের উদ্ভব না হইলে সমাজ ঠিক থাকে না, ধর্ম ঠিক থাকে না, মানুষের মতি কল্যাণপ্রদ পন্থায় পরিচালিত হয় না। সে মানুষ কিসের আদর্শ দেখাইবে? বর্ণহাড়ার কথায় উত্তরটা দিব—
“Man can only develop his highest capacities when he takes his part in a community, in a social organism, for which he lives and works”। এই সঙ্গে Treischke ত্রিৎসাকের কথাটা তুলিব—The State is a moral community. It is called upon to educate the human race by positive achievement, and its ultimate object is that a nation should develop in it and through it into a real character”। এই জন্য চাই একটা মানুষ। সে মানুষ positive achievement বা কর্মের দ্বারা সমাজের আদর্শ স্থির করিয়া দিবেন। তিনি সমাজের একটা character বা বিশিষ্টতা, তিনিই অবতার, তিনিই Super-man। বৈদিক সাহিত্যে আর পৌরাণিক সাহিত্যে পার্থক্য এই যে, বেদে ও উপনিষদে কর্মীর কর্ম-শৃঙ্খলার উন্মেষ নাই, পুরাণে তাহাই আছে। মানুষ কেমন করিয়া কর্ম করিলে কেমন আদর্শের উন্মেষ ঘটাইতে পারে তাহা পুরাণেতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বের, Individualismএর বিকাশের জন্যই পুরাণের মাহাত্ম্য। আর সেই ব্যক্তিত্ব অবতারবাদেই পরিস্ফুট। ব্যক্তিত্ব কেবল একটা মানুষের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক নহে, উহা State, উহা জাতির বিশিষ্টতার দ্যোতক। শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, জাতির বিশিষ্টতার সহিত জড়ান—মাথান, তাই তিনি সীতাকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখ ত সুখ নহে, তিনি যে রাজা—

State, তাই জাতির পরিবাদের দৃষ্টিতে দেখিয়া সীতাকে বর্জন করিয়া-
ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল বাসুদেব নহেন, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ; তাই তিনি
কুরুক্ষেত্রের মহা-রণ-প্রাঙ্গণে পার্থসারথি, যদুবংশ-ধ্বংসের সময়ে নির্বি-
কার। তাঁহার বংশ থাকিলেই কি, না থাকিলেই বা কি! চাই জাতির
পুষ্টি, বিস্তৃতি এবং বিশিষ্টতার রক্ষা। যাহাতে সে কৰ্ম্ম সুসম্পন্ন হয়,
তাহা তিনি অম্লান-মুখে করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার—
পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণে এই ব্যক্তিত্বের, এই অতিমানুষ প্রভাবের
বর্ণনা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব
দেখিতে পান। পুরাণ সকল বৌদ্ধযুগের পরে রচিত বলিয়া তাঁহা-
দের বিশ্বাস। কেন না, তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলনের পর
ইহাতে ব্যক্তিত্বের Super-manএর পরিকল্পনা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও
সাহিত্যে হইয়াছে। তাহার পূর্বের বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম com-
munal বা বংশানুক্রমিক ছিল। অবতারের বা অতি-মানুষের কৰ্ম্মের
আদর্শে বেদ পরিচালিত হইত না; ধর্ম্মকৰ্ম্মের সাবয়ব, মানব আদর্শ বেদেও
ছিল না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পর জগতে যত ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সকল
ধর্ম্মেই একটা Super-man, একটা অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা
ছাড়া তাঁহারা ইহাও বলেন যে, জন্মান্তরবাদ না মানিলে অবতারবাদ
মানা যায় না। খাঁটি বৈদিক সাহিত্যে জন্মান্তরবাদ নাই। বৌদ্ধ-
ধর্ম্মের প্রচলনকাল হইতেই জন্মান্তরবাদ ভারতে, তথা জগতের
সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই Super-man, এই
অবতারবাদের কল্পনা বৌদ্ধযুগের পর হইয়াছে। সে যাহাইউক, পুরাণ
মানুষ দেখাইয়াছে, মানুষের কৰ্ম্মের ও আদর্শের উন্মেষ-পদ্ধতিও দেখা-
ইয়াছে। অবতারবাদ সেই মানবতা প্রদর্শনের আকারান্তর মাত্র;
ধরার ভারের মাধুরী-মণ্ডিত আখ্যায়িকা এবং State ও Hum-
anityর ধর্ম্মের গ্লানির জন্ত দুঃখের উপাখ্যান মাত্র।

অবতার লইয়া পুরাণে অনেক রকমের মতবাদ আছে। শৈব
ও বৈষ্ণব মতবাদ এক রকমের নহে। শৈব পুরাণগুলিতে প্রধা-

নতঃ ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যই বর্ণিত ; বৈষ্ণব পুরাণে কেবল ক্ষত্রি-
য়ের উপাখ্যানই অধিক । নৃসিংহ, বামন, জামদাগ্ন্য, এবং কন্ধীর
পূজার কথা বৈষ্ণব পুরাণে কোথায়ও পাইবে না ; যদি থাকে ত তাহা
সংক্ষেপে অবান্তর কথার হিসাবে বলা হইয়াছে । মহারাষ্ট্রদেশে নৃসিংহ
ও পরশুরামের মন্দির দেখিয়াছি ; উত্তর ভারতে কুত্রাপি দেখি নাই ;
তবে কাশীধাম নাকি সকল দেবতার আশ্রয় স্থান, কাশীতে খুঁজিলে
ব্রাহ্মণ দেবতার ও অবতারের মন্দির পাওয়া যায় । বৈষ্ণব পুরাণে যে
সকল রাজা বা সম্রাটকে ধর্মের প্রানিকর বলিয়া পরিচিত করা হই-
য়াছে তাহারা সবাই শৈব অথবা শাক্ত । বৈষ্ণবদেবী বলিয়াই তাহারা
রামক্স, দানব, দৈত্য বা অসুর । হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস
প্রভৃতি সবাই শৈব বা শাক্ত । শৈব পুরাণ সকলে ইহার পান্টা
জবাবও পাওয়া যায় । ইহা ছাড়া জৈন-প্রভাবও পুরাণে স্পষ্ট
দেখিতে পাওয়া যায় । পুরাণ এবং উপপুরাণগুলি মন্থন করিয়া
বিচার করিলে হিন্দু জাতির ধর্ম-বিপ্লব সকলের ইতিহাসটা সংগ্রহ
করা যাইতে পারে । বৌদ্ধের প্রভাবও পুরাণে কম নাই ; অব-
লোকিতেশ্বর শিবকে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুকেও বলা হইয়াছে । যাউক,
সে কাজটা যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা পরে সুসম্পন্ন হইতে পারে ।
এখন আমি অবতার সম্বন্ধে দুই তিনটা মতবাদের আলোচনা করিয়া
আমার বক্তব্য শেষ করিব ।

প্রথমে শিবপুরাণের এবং ঐ সম্বন্ধে তন্ত্রের মতবাদটার উল্লেখ করিব ।
জলে যেমন কাটি দিয়া নাড়িলে জলে ফেনা বাঁধিয়া উঠে, তেমনি
বিশ্বব্যাপী আত্মশক্তির সাগরে ব্যথিত জীব আত্মার ইচ্ছার—বাসনার দণ্ড
দিয়া ঘন-ঘন মন্থন করিলে বিশ্বব্যাপী আত্মা হইতে ফেনের মতন
একটি বিভূতির সৃষ্টি হয় । সেই বিভূতি দেহী হইয়া সমাজে প্রকট
হইলেই অবতারের উদ্ভব হয় । ব্যথিতের কামনা যখন যেমন ভাবে
পরিষ্ফুট হয়, তখন সেইভাবে কামী হইয়া বিশ্বব্যাপী আত্মার উদ্ভব হয় ।
বিশ্বব্যাপী আত্মা স্বেচ্ছায় রূপধারণ করেন না, মানুষের ইচ্ছা তাঁহাকে

ষে রূপে ও যেভাবে নামাইতে চাহে, তিনি সেইভাবে ও সেইরূপে প্রকট
 হইয়া থাকেন। কোন একটা মনুষ্য-সমাজের আলোড়নেই যে অবতার
 হয়, তাহা নহে, একজন সাধক একনিষ্ঠ হইয়া কামনা করিলে
 তাহার কামনা পূর্ণ হয়। এইহেতু ভগবানের—পরমাত্মার অবতার
 অনন্ত, অসংখ্য। কেবল সমাজের গ্লানি দূর করিবার জন্তই
 তিনি অবতার হন না, ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ দূর করিবার জন্তও
 তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদের দুঃখ দূর করি-
 বার জন্তই নৃসিংহ অবতার। তন্ত্র এই সঙ্গে ইহাও বলেন যে, যখন
 মনুষ্যমাত্রেরই আত্মার অংশ, মনুষ্যের ইষ্টদেবতা যখন আত্মস্বরূপিণী,
 যখন ইহা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত যে, যত জীব, তত শিব,—শিবের
 ধ্যান করিতে হইলে নিজের মাথায় ফুল দিয়া নিজের আত্মাধ্যান
 চিত্ত ও বুদ্ধির সাহায্যে করিতে হয়, তখন প্রত্যেক সাধকই এক
 একটি অবতার। যে সিদ্ধ, যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে, সে প্রকট
 অবতার; যে অসিদ্ধ, দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন, সে সম্মূঢ় অবতার, তাহার
 আত্মার অবতৃষ্ণ-শক্তি তাহাতে সম্পূর্ণ হইয়া আছে। এই সিদ্ধান্ত
 অনুসারে কেবল নারায়ণেরই অবতার হইবার কথা নহে, যত শক্তি,
 যত দেবতা আছে, সকলেরই অবতার আছে। নারদের ভক্তিশাস্ত্রে
 লিখিত আছে যে, মানুষের মনে একাদশটি আসক্তি আছে, সত্ত্ব, রজঃ
 ও তমোগুণ অনুসারে উহার তেত্রিশটা বিকাশ আছে; প্রত্যেক
 বিকাশের এক কোটি করিয়া আলম্বন আছে। অতএব আসক্তি-
 অনুকূল কামনার প্রেরণায় প্রকট অবতার বা দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ
 কোটি। শৈব ও তান্ত্রিকদিগের এই সিদ্ধান্তটা বৈষ্ণবগণ একেবারে
 অস্বীকার করিতে পারেন নাই; তাই শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন
 যে অবতারের সংখ্যার নির্দেশ করা যায় না; এবং সকল পক্ষ বজায়
 রাখিবার উদ্দেশ্যেই যেন ভাগবতকার বাইশটা অবতার স্বীকার করি-
 য়াছেন। গীতায় বিভূতিবাদের অধ্যায়ে শ্রীভগবান এই মতটার
 সহিত যেন কতকটা আপোষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আনন্দগিরি স্বীয় টীকায় কথাটা একেবারে যেন খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

বৈষ্ণব মত দ্বৈতবাদের মত। বৈষ্ণব, ভগবানের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং জীবের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জীবও নিত্য, নারায়ণও নিত্য। জীবের আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার অভিব্যক্ত নারায়ণের সেবায়—কৈঙ্কর্য্যে; নারায়ণ অনাদিকাল হইতে জীবের সেবা থাইতেছেন, অনাদিকাল পর্য্যন্ত সেবা থাইতে থাকিবেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা নিত্য ভিন্ন, কখনও এক হইবে না, কখনও এক হইবার নহে। যখন জীবের মধ্যে পাপের বৃদ্ধি হয়, জীব যখন নারায়ণের কৈঙ্কর্য্য ভুলিয়া যায়, তখনই নারায়ণ স্বেচ্ছায় অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। দশবার তাঁহাকে ধরাধামে নররূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই চারি অবতারে নরত্বের অভিব্যঞ্জনা আছে। তাই আচার্য্য উহাদিগকে মানুষ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। পুরাণ পড়িলে বুঝা যায় যে, উহারা মানুষ ছাড়া অন্য জন্তু ছিল না। গল্পের রং চড়াইবার হিসাবেই যেন উহাদের কেহ মাছ, কেহ কচ্ছপ, কেহ শূকর, কেহ বা আধা মানুষ আধা সিংহ ভাবেই প্রকট হইয়াছিলেন। কেবল হিরণ্যকশিপুর হিংসার জন্তুই নর বা বিষ্ণু সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সিংহ শব্দ হিংসা হইতেই উৎপন্ন, নর বা নৃ বিষ্ণুর নামান্তর মাত্র। বৈষ্ণবী শক্তির বিকাশ দেখাইবার জন্তুই তিনি নর বা বিষ্ণু, কেবল হিংসা করিবার জন্তুই উদ্ভূত বলিয়া তিনি সিংহ। এই ভাবে আচার্য্য মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এই তিন অবতারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণব বলেন, ভগবান ভাব বিলাইবার জন্তুই ধরাধামে অবতীর্ণ হন; তাঁহার দশটি ভাব দশ অবস্থায় জগৎকে বুঝাইয়া শেষে সকল ভাবের ভাবী, সকল রসের রসিক, মাধুরীর অবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ রূপে তিনি জগৎকে ঐশিক মহিমা বুঝাইয়া গিয়াছেন। “কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্”—এই বলিয়া অনেক বৈষ্ণবে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া মানেন না। শৈব, তান্ত্রিক এবং

বৈষ্ণব, অবতার-তত্ত্বের এই তিনটা মত লইয়াই পুরাণের অনেক আখ্যায়িকা এবং উপাখ্যান রচিত। তন্ত্র বলেন, পৃথিবী কেবল মাটির ঢিবি নহে, পৃথিবীর আত্মা আছে, অমুভূতি আছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আছে, পরমায়ুঃ আছে। তন্ত্রের আত্মার সর্বব্যাপিত্বটুকু গল্পের ছলে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে পুরাণ ধরাকে মানবী করিয়া রচিয়াছেন। ধরার ব্যথা বা বেদনাটা পুরাণের ভাষায় ধরার ভারে পরিণত হইয়াছে।

গীতায় অবতারবাদের সকল মতের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতা যেন আমাদের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বৈষ্ণবী compendium এ কথাটা আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। বচন আছে—

“সর্বোপনিষদো গাবো
দোক্ষা গোপালনন্দনঃ।
পার্শ্বো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা
পানং গীতামৃতং মহৎ ॥”

অর্থাৎ সকল উপনিষদ্ যেন গরু ; শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে, দুগ্ধ দুইতে পারেন ভাল, তাই তিনি উপনিষদ্ গাভীকে দোহন করিতেছেন ; অর্জুন হইলেন বাছুর, তিনি একটা জিজ্ঞাসার ঢুঁ মারিতেছেন আর দুগ্ধ বাহির হইতেছে। যাহারা সুধী তাহারাই এই গীতামৃতরূপী দুগ্ধ পান করিতেছেন। কাজেই বলিতে হয় যে, কর্তারাও গীতাকে সঙ্কলন-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই compendium বৈষ্ণবের তৈয়ারী, এ কথাটা রামানুজ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শাক্তর মতের মাপকাটিতে গীতাকে মাপিলে গীতা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। গীতার ব্যাখ্যা বৈষ্ণব মতানুসারে করিতে হইবে, তবে গীতা বুঝা যাইবে। কথাটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তাহা বলিতে পারি না। শাক্তর মতানুসারে গীতার সকল কথা, সকল সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হয় না। যাউক সে কথা, গীতার অবতার-তত্ত্বের পান্টা জবাব চণ্ডীতে আছে। চণ্ডীতে মায়ের আবি-

ভাবের ব্যাপারটা, সকল মতের সমন্বয় সাধন করিয়া যেন ঘটান হইয়াছে। ফেন যেমন বুদ্ধদের সমাহারে জন্মায়, জগদম্বা তেমনি শুস্ত নিশুস্ত বধে সকল দৈবীশক্তির সমাহারে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। মহিষাসুর, মধুকৈটভ, শুস্তনিশুস্ত, প্রত্যেক অসুরের বধে মাযের এক একটা নূতন বিকাশ; সে বিকাশ যেন শৈব বা শক্তি অবতারতত্ত্বের নানা সিদ্ধান্তের এক একটি সাবয়ব প্রতিমা। গীতা ও চণ্ডী পাশাপাশি রাখিয়া পড়িতে পারিলেই অবতারবাদের ধরার ভারের তত্ত্বের অনেক লুকান কথা ফুটাইয়া তোলা যায়। বলিয়াছি ত পুরাণ—কাম্ভাবাণী; বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী উপনিষদ্ সকলের Theory গুলিকে উদ্ভট গল্পাকারে পরিণত করিয়া তত্ত্বকথা শিখানই পুরাণের উদ্দেশ্য। বৈদিক উপনিষদের মধ্যে কয়েকখানির পঠনপাঠন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে; তান্ত্রিক সকল উপনিষদ্ লোপ পাইয়াছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগে শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কয়েকখানি তান্ত্রিক উপনিষদের সংগ্রহ করিয়াছেন। সেগুলি ছাপা হইলে এবং আমাদের বোধগম্য হইলে অনেক পুরাণের অনেক উৎকট কথা সোজা হইতে পারে। আপাততঃ পুরাণ পাঠ করিয়া আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অবসরমত পাঠকগণকে তাহাই উপঢৌকন দিতেছি। আমি নিজের মত বা নিজের সিদ্ধান্ত কিছুই বলি নাই, সে পরে বলিলেও বলিতে পারি। এখন কেবল সারসংগ্রহ করিয়া ডালা সাজাইতেছি। কথায় কথায় authority দেখাই নাই; কেহ সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসু হইলে তাঁহাকে হৃদিস্ বলিয়া দিতে পারি।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌদ্ধ-ধর্ম

৩। নির্ব্বাণ কয় রকম ?

খেরাবাদী বুদ্ধেরা ও প্রত্যেক বুদ্ধেরা মনে করিতেন, মানুষ যদি সত্বপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজের মনে মনে গড়িয়া লইয়া চারিটি আর্ধ্য-সত্যে বিশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম মানিয়া চলে, তাহা হইলে বহু-কাল অভ্যাসের পর, তাহারা শ্রোতে পড়িয়া যায়। এইরূপ যাহারা শ্রোতে পড়িয়া যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে। শ্রোতে পড়িলে যেমন সেন আর উজান যাইতে পারে না, তাড়িয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন নির্বাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের দিকে তিনি আর কখন ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর উজান বহেন না।

সোতাপন্ন আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি “সকৃদা-গামী” হয়েন, অর্থাৎ, তিনি আর একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব এই ‘সকৃদাগামী’ অবস্থাতেই তুষ্টিভবনে বাস করিতেছিলেন। তিনি আর একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিলেন ও নির্ব্বাণ পাইয়া গেলেন।

সকৃদাগামী আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহাকে “অনাগামী” অবস্থা বলে। এ অবস্থায় আসিলে আর ফিরিতে হয় না। ইহার পরের অবস্থার নাম অর্হৎ। অর্হৎ যদিও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্ব্বাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম “স্বউপাদি সেন নির্ব্বাণ” বা স্ব উপাধি শেষ নির্ব্বাণ। ইহা নির্ব্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে পুনর্জন্মের কিছু কিছু “উপাদান” এখনও শেষ আছে; অথবা সকল কর্ম এখনও ক্ষয় হয় নাই। আরও

সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে—কর্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনও রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ জীবমুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্মের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর হয় না। ক্রমে সব কর্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি “নিরুপাদি সেস নির্বাণ ধাতু”তে প্রবেশ করেন—অর্থাৎ তখন তাঁহার কর্মও থাকে না, কর্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না। তিনি নির্বাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়া যায়।

মহাযানীরা বলেন ‘এই যে হীন-যানীদের নির্বাণ, ইহা নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীন-যানীরা ও প্রত্যেক যানীরা জগতের জন্ত একেবারে ‘কেয়ার’ করেন না। তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না থাকা দুইই সমান। নির্বাণ পাইয়াও তাঁহারা কাঠের বা পাথরের মত হইয়া যান। ও নির্বাণ, যাহারা বুদ্ধিমান, যাহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে, যাহাদের হৃদয় আছে, যাহারা শুধু আপনার সুখের জন্ত বাস করে না, যাহারা পরের জন্ত ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। তাহারা নির্বাণের অন্তরূপ অর্থ করিয়া লইবে।

মহাযানীরা মনে করেন যে, নির্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ ‘না’ ‘না’ করিয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ ‘হাঁ’র দিক্ হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্বাণ, জ্ঞানের নাশের নাম নির্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্বাণ,—এই যে হীনযানীরা ‘না’র দিক্ হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহা বুদ্ধির মনের কথা হইতে পারে না। তিনি ‘চতুরার্য্যসত্য’ ও আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধরিয়া চলার নামই নির্বাণ। তাঁহার মতে মনুষ্য হৃদয়ের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, সব শাস্তি করিয়া দেওয়ার নাম নির্বাণ নহে; সেই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্বাণ। কিন্তু সে

আশা বা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার উর্দ্ধে অবস্থিতি করিতে হইবে।

দেখান গেল যে, মহাযান নির্বাণ 'না'র দিক্ হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে। নিরালম্ব নির্বাণে বোধিচিহ্ন যে কেবল ক্লেশপরম্পরা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন বোধিচিহ্ন ধর্ম্মকায়ের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। দুটি জিনিস তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—(১) সর্বভূতে করুণা, (২) ও সর্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে 'সম্যক্ সবেবাধি' লাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নির্বাণেও তখন তাঁহার একান্ত আস্থা নাই। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে সর্বজীবের পরিত্রাণ ও তাহার জন্ম তিনি আপনাকে বারংবার বন্ধ করিতেও কাতর হন না। তাঁহার সর্বব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তিনি পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান। তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মময় হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বলিতেছে, 'সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত কর ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও।' তিনি নির্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্বাণেও তিনি বসতি করিতে পারেন না, তাঁহার কি ভব, কি নির্বাণ কোনই আলম্বন নাই, এইজন্ম তাঁহার নির্বাণের নাম নিরালম্ব নির্বাণ।

মহাযানীদের আর একরকম মুক্তি আছে। এ মুক্তি ভব ও নির্বাণের অতীত। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মকায়ের সহিত এক। আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীরা তাহাকে তথতা বলে। ধর্ম্মের যে তথতা তাহার নাম ধর্ম্মকায়। যিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিথি তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত হইয়াছেন।

সে পরম সত্যটি কি ? জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্ম্মকায়। ধর্ম্মকায় হইতেই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই

সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়। ধর্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই। তাঁহাদের মতে ধর্মকায় বলিতে বুদ্ধের ধর্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত। অনেকে মনে করেন, ধর্মকায় বলিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সে কথা সত্য নয়। নিগুণ পরমাত্মা অস্তিত্ব মাত্র। ধর্মকায়েই ইচ্ছা আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ, ইহার করুণা আছে ও বোধি আছে। সকল সজীব পদার্থই এই ধর্মকায়েই প্রকাশমাত্র।

নির্ব্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না। নির্ব্বাণে নিরোধ করে কি? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় যে অহং বলিয়া যে, একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে আরও যত ভাব উঠে, সে সবও অলীক। এতটুকু ত গেল কেবল ‘নিষেধমুখে’ অর্থাৎ ‘না’র দিক্ হইতে। বিধিমুখে অর্থাৎ ‘হাঁ’র দিক্ হইতেও ইহার একটা অর্থ আছে। সেটি করুণা—সর্ব্বভূতে দয়া। এই দুইটা জিনিস লইয়াই নির্ব্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদয় এতক্ষণ সঙ্কীর্ণ ও অলস ছিল, তাহা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, নূতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দী বাহির হইয়া পড়িল। এখন সমস্ত জগৎই তাহার, এবং সেও সমস্ত জগতেরই। সুতরাং একটি প্রাণীও যতক্ষণ নির্ব্বাণ পাইতে থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার নির্ব্বাণ পাইয়া লাভ কি? নিজের জন্মই হউক বা পরের জন্মই হউক, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, “অবিজ্ঞা হইতে বাসনার উৎপত্তি এবং সেই বাসনা হইতে আমার পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত সজীব পদার্থ পীড়িত সুতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য লাভ করিবে, তখন আমিও আরোগ্য লাভ করিব। কিসের জন্ম? বোধিসত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের জন্ম।

জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে। যখন জীবের পীড়ার উপশম হয়, বোধিসত্ত্ব রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। যখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তখন পিতামাতারও পীড়া উপস্থিত হয়। সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতামাতাও নীরোগ হন। বোধিসত্ত্বেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মত ভালবাসেন। তাহারা পীড়িত হইলেই তিনি পীড়িত হন, তাহারা নীরোগ হইলেই তিনি নীরোগ হন। তুমি কি শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ত্ব এরূপ পীড়িত হন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।”

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

দান

সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার !
 সতত পারশে আছে ধরিয়া বিবিধাকার ।
 প্রথমেতে সে পার্শ্বতী স্নেহরূপা মূর্ত্তিমতী ;
 পুরুষ-প্রকৃতি ভেদে,—জনক জনমাধার ।—
 সে আমারে কত রূপে দি'ছে প্রেম উপহার !
 কভু সে পরাণ-সখী ; মরমে মরমে রাখি,—
 জাহ্নবী-যমুনা যেন মুক্ত-বেণী—পূতধার ।
 কভু সে অনুজ সাথী ; ক্রীড়া-রসে মাতামাতি—
 কায়া সাথে ছায়া যেন একই রূপে একাকার
 সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার !
 ঘোবনে, দ্বিতীয় অঙ্কে, তুলে সে লইয়া অঙ্কে—
 বঁধুয়া মধুর হেসে তেলে দেছে প্রেমধার !
 পুনঃ সে তনুজ সখা, স্নেহ ভক্তি মধু মাখা ;
 আলম্বন ষষ্টি শেষ স্থবির জীবনাধার—
 সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার !
 আমার অঁথির আগে কত রূপে বঁধু জাগে ;
 নয়নে নয়নে হাসি—দিনে—পলে শতবার !
 পিয়ার আনন মম শতদল নিরুপম ;—
 তুল-তুল চারু সরে—কোথায় তুলনা তার !
 সে হাসি হৃদয়ে অঁকা, সে হাসি সুরভি মাখা,
 সে হাসি সোহাগে ভরা, সে হাসি হাসির সার !
 সতত সমুখে আছে ধরিয়া বিবিধাকার ;
 কতরূপে সে আমারে দেছে প্রেম উপহার !

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ।

যাবে থাকা

“দরশন লাগি বর নাহি মাগি”

আমি ? সাগর-সৈকতে আমি একটি বালুকণা মাত্র । বালুকণা বলিয়া এ সাগরের কুল কিনারার সন্ধান রাখি না, আদি-অন্তের সীমা জানি না, ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান নাই, শুধু মধ্য থাকাই আমার ধর্ম, বর্তমানের প্রকাশই আমার জীবন ।

এ সৈকতে আমার ন্যায় বালুকণা অগণিত । কিন্তু তাহাদের সহিত আমার প্রভেদ আছে । তাহারা সাগরের জোয়ার ভাটার খেলার সামগ্রী—স্থূপীকৃত হ’য়ে পড়ে আছে । সেই জোয়ার ভাটার টানেই তাহাদের অনুভূতি, সুখদুঃখ, উৎসাহ ও অবসাদ, আলো ও অঁধার, ভাসিয়া উঠা ও ডুবিয়া যাওয়া । যদিও তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বধর্ম আছে, তথাপি তাহাদের স্বার্থ বিশ্বরাজার অর্থের অধীনে, তাহাদের স্বধর্ম বিশ্বরাজার বিশ্বধর্মে ঢাপা পড়িয়া গিয়াছে । তাহাদের জঠরে ক্ষুধা আছে, তালুতে পিপাসা আছে, জীবনে সংগ্রাম আছে, জ্ঞানে অসঙ্গতি আছে, কিন্তু সে ক্ষুধার, সে পিপাসার, নিবৃত্তি আছে,—সে সংগ্রামের শাসন আছে, মীমাংসা আছে,—সে জ্ঞানের চরমে সঙ্গতি আছে । “আমি তোমারই অঙ্গ-বিশেষ, অস্তিত্বে আমি তোমাতেই সঙ্গত হইব” এই চিরসঙ্গম আশায় শান্ত হইয়া তাহারা প্রাণিধর্ম ও সংসারধর্ম, সমাজধর্ম ও বিশ্বধর্ম, রক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে । তাহারা হইল বিশ্বরাজ্যের প্রজা, রাজ্যের ধর্মে রাজ্যের এলাকায় স্থখে স্বার্থে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াই তাহাদের অধিকার । আমার কিন্তু তাহা নয় । আমি একটি বিদ্রোহী প্রজা । আমি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি করিতে চাই, হোক না কেন সে বালুকণার রাজ্য । বিশ্বধর্মে আমি স্বধর্ম খোয়াইব না, বিশ্বের মূল্যে বিকাইব না ।

এতদিন কে যেন আমাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আমি পুনরায় মাথা তুলিতে শিখিয়াছি। ডুবি নাই, আর ডুবিব না। যে সাগর হইতে উঠিয়াছি, সে সাগরে ডুবিব না। ধীরে ধীরে জাল পাতিয়া অতল জনবি হইতে শুদ্ধিক। তুলে, আর দৈবক্রমে যদি কোন মুক্তা জাল কাটিয়া ধীরে ধীরে হাত এড়াইতে পারে, তবে—তবে সে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়! আমি কিন্তু অতল জনবি-গর্ভে প্রাণ হারাইব না। উর্নাত সমস্ত জাল বুনিয়া আমাকে তাঁহার ফাঁদে বন্দী করিয়াছিলেন, আমি কিন্তু সে মায়াবীর জাল কাটিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছি। আমি প্রাণ হারাইতে পারি না, ডুবিলেও নিজগুণে স্বধর্ম-প্রভাবে শোনার শ্রায় ভাসিয়া উঠি। সাগরে মুক্তাবাহী নটিলাসের (Nautilusএর) শ্রায় সম্ভরণ করিতে করিতে কোথায় ভাসিয়া যাই!

এ লঘু কি যৌবনের ধর্ম? বার্ককে কি গুরুত্ব মিলে? ওজনে ভারি হইতে শেখা যায়? না, প্রাণের বয়স নাই, জরা নাই। বিশ্বের বশ্যতাই তাহার জড়তার, স্থবিরত্বের, মূল। মহতের অধীনতা-স্বীকার, ভূমার আশ্রয় লাভই, ক্ষুদ্রের প্রকৃত শৃঙ্খল।

চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ড চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, এবং পরিণামে চুম্বকের সহিত সংলগ্ন হয়। পরশমণির সংস্পর্শে বালুকণাও স্বর্ণে পরিণত হয়। মাধ্যাকর্ষণের টানে পার্থিব বস্তুমাত্রই মৃত্তিকার উপর পতিত হয়। আমার সম্বন্ধে কিন্তু তাহা খাটিবে না। পরের মূল্যে নিজেকে বিকাইব না। পরশমণির সংস্পর্শে সোণা হইতে চাহি না। ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া থাকিব সেও ভাল, তবু যেন পৃথিবীতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বৃহদাকার প্রাপ্ত না হই। বেলাভূমিতে এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব। বালুকণা জলে, পুড়ে, কিন্তু ভস্মসাৎ হইয়া মাটিতে মিশাইতে জানে না।

বালুকণার কথা বলিতে বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। বালুকণা হইয়া একপার্শ্বে থাকিতে পারি কৈ? আমি একরত্তি বালুকণা, কিন্তু বালুকণা হইয়া অভ্রের গুণ পাইয়াছি। আমি স্বচ্ছ হইয়াছি। আমি

জলিয়া উঠিলে যে বিশ্বের ছায়া আসিয়া আমার উপর প্রতিবিস্তৃত হয়। আর সেই প্রতিবিস্তৃত আমার প্রাণের আগুন দ্বিগুণ হইয়া জলিয়া উঠে। এই আবছায়া, অর্ধছায়া, খণ্ড আকৃতি দেখিয়া কিন্তু প্রাণে তৃপ্তি আসে না। ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া সমগ্রের প্রতিবিস্তৃত ধারণ করিতে পারি না। তাই রস-ভঙ্গ করাই আমার ব্যবসা! প্রাণের মায়া আছে বলিয়া পতঙ্গের ন্যায় অনলে ঝাঁপ দিয়া ছাই হইতে চাহি না।

পুড়িয়া মরা হইল না। তবে করি কি? আমি মাঝে থাকিতে চাই। কাছাকাছি, পাশাপাশি, মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি। হায়! বালুকণা না হইয়া পাখী হইলাম না কেন? কবিত্বের ডানা মিলিলে ঐ আকাশের কাছে কাছে উড়িয়া গান গাহিয়া গাহিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম। মাটিতে আর নামিতাম না। বালুকণার আবাস বেলাভূমিতে। আকাশে ও বেলাভূমিতে যে অনেক খানি ব্যবধান। ঐ উপরের আকাশ ছেড়ে এত দূরে থাকিতে মন সরে না। আবার আকাশে, শূন্যে, মিলাইয়া যাইতেও পারি না। মাঝে থাকিতে চাই। আকাশের কাছাকাছি, পাশাপাশি, মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি। পাখী হইলাম না কেন? উড়িতে শিখিলাম কেন? দুটা ডানা থাকিলে আকাশের কাছে কাছে উড়িয়া স্থখ পাইতাম।

অথবা ভ্রমর হইতে পারিলে মন্দ হইত না। ভ্রমর ফুলে ফুলে মধুপান করে। কানন ও মধুচক্রের মধ্যে যে পথ আছে সেইখানেই সে বিচরণ করে, আর তৃষিত প্রাণের পিপাসা নিবারণ হইলে মধুচক্র নির্মাণ করিতে বসিয়া যায়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। সে পরের পীষুষ শোষণ করিয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। কিন্তু এই মধুমক্ষিকাবৃত্তি আমাকে রাখিতে পারিল কই? আমার আজ বনপথে বিচরণ শেষ হয়েছে। আজ আমার রসকর্ম নাই, কিন্তু এই রসের ভাণ্ডার লইয়া করি কি? এই রসই আমার বলাই। ফেলিতেও পারি না, পান করিতেও পারি না। এ যে নিজের রস।

তাই অপরকে মধুদান করিবার নিমিত্ত এই রসের বোঝা মাথায় লইয়া বেড়াইতেছি। হায়! জীবের ভাগ্যে স্বতন্ত্রতা কোথায়? বলিতে চাই, না না,—কে যেন বলায়, হাঁ হাঁ। স্কন্ধে যুগভার, মাথা নাড়িয়া ফল কি? এই বাহকবৃত্তিই কি তবে আমার কৰ্ম্ম? ইহাও কি দাসত্ব নহে? হউক, তথাপি দাস্তবৃত্তি করিতে করিতে কোনও প্রভুর হাতে মর্যাদা নষ্ট করিব না। প্রভুর মর্যাদা আছে, দাসীর কি মর্যাদা নাই? রসের বোঝা বহন করিতে করিতে যেন সুধারসে স্বরসে একরসে গলিয়া না যাই। সোহাগিনী আদরিনী হইব না। কেবল আড়ালে থাকিয়া দূরে সরিয়া সরিয়া দাস্তবৃত্তিই জ্ঞেয় মনে করি।

যখন রস বহন করাই আমার ধৰ্ম্ম তখন নিজেকে দাস না বলিয়া বাহন বলি। বুঝিলাম এ ত নিজ রস নয়, কোন দেবতার সুধাসম্ভার বহন করিতেছি। আমি দেবতার বাহন। দেবতা যখন ভক্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তখন বাহনের ও প্রয়োজন আছে।

আমি কেবল দেবতার বাহন নই, আমি আবার ভক্তের ও সোপান। আমি আজ স্রগ ও মর্ত্যের আনাগোনার পথ। কিন্তু পথ শুধু বাস্তবের সঙ্গমে লইয়া যায়। পথের জন্ত সে সঙ্গম নহে।

এতাবৎকাল দুই লইয়া আলোচনা করিয়া আসিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি তিনেরও যে আবশ্যক আছে, নতুবা আমার স্থান কোথায়? ভক্ত ভগবান, সাধ্য সাধনা, কৰ্ম্ম কর্ত্তা, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, লক্ষ্য উপলক্ষ্য,—লইয়া আর কতকাল ঘুরিব। সাধনার সোপানে সাধ্যের অনুগামী হইয়া এতাবৎকাল ছুটিয়া আসিলাম, কিন্তু যতই উঠি, যতই অগ্রসর হই, ততই সাধ্য দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়ে। প্রাণে আবার আকুলতা আসে, আবার অবসাদ, আবার মোহ।

তাই এবার সোপান হইয়া মধ্যে থাকাই স্থির করিয়াছি।—তাহাতে কোন বালাই নাই। সাধ্যের পথের পথিকেরা, সোপানে আরোহণ করিয়া লক্ষ্যের উদ্দেশে যাত্রা করুন। সোপান শুধু বুক

পাতিয়া তোমাদের দেহভার বহন করিবে। এই পাষণ রূপ ধারণ করিয়া মানবের বাহন হইয়া ধন্য হইব। পাষণী অহল্যা ভবিষ্য অবতারের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। আমি কাহারও পদরেণু-স্পর্শে মুক্ত হইবার আশা রাখি কি ?

স্বেচ্ছায় অবগাননার ভার বহন করাই আজ আমার মাথার গণি। আজ সকলকার ধূলা, সকলকার বোঝা, মস্তকে লইয়া স্বেচ্ছায় আপনাব মান খোয়াইয়া পড়িয়া আছি। একদিন যে আমি তাঁহারই পিয়ার ছিলাম। সেদিন ভগবানের সাকীর পানপাত্র বহিবার প্রয়োজন ছিল। আজ আর সাকী হইতে চাহি না। আমি আজ সেই ভাস্ক্রা পেয়ালা, তাঁহার পানের শেষে মাটিতে গড়াগড়ি যাই-তেছি। সংসার আমাকে পদদলিত করিয়া উল্লাস করুক। আর আমি স্বপদভ্রষ্ট হইয়া সেই আনন্দে সহায়তা করি। তবে আজ এই স্বপদচ্যুতি, স্বধর্মের নাশই, আমার ধর্ম হউক।

না, না, কি বলিতে বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। পাষণে আবার উত্তাপ কেন ? বিক্ষোভ কেন ? শীতল, অসাড়, না হইলে সোপান হইব কেমনে ?—

আমি মাঝে থাকিতে চাই। মর্ত্যে মধ্যবর্তীরও প্রয়োজন আছে। মধ্যবর্তীর ভিতর দিয়াই সকল প্রকাশ, সকল পূরণ, সকল মিলন। তাই সূর্যের কিরণধারা যেন কোন দৌত্যচর্যায় সাগরবন্ধ হইতে বাষ্প উত্তলোন করিয়া পৃথিবীর উত্তপ্ত বন্ধ শীতল করে। পীযুষ-ভরাবনত স্তনের ভিতর দিয়া শিশু মাতৃবন্ধ হইতে শোণিত শোষণ করিয়া কলায় কলায় বর্দ্ধিত হয়। ভাষার অভিব্যক্তিতেই ভাব বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। অনাহত ওঙ্কার রূপেই ব্রহ্ম প্রতিপ্রাণে শব্দপ্রমাণ হইয়া অবস্থান করেন। ছায়াময়ী কায়া দেখিয়াই বিশ্বরূপের অস্তিত্বের নিদর্শন পাইয়া থাকি।

কেবল বর্হিজগতে বা অন্তর্জগতে নয়—উভয়ের সঙ্গমক্ষেত্র ঐতিহাসিক জগতেও এই মধ্যবর্তীরই অভিনয় দেখিতেছি। ভগবান ও

মানবসন্তান (Son of Man, Universal Humanity) থাকিলেও লীলার জন্ম পারিষদেরও উপযোগিতা আছে। অবতারী নারায়ণ ও বিরাট জীবসমষ্টি থাকিলেও যুগাবতারের প্রয়োজন আছে। তাই ইতিহাস এক মহাপুরাণ, যুগাবতারকাহিনী, নর-নারায়ণের কথা।

শুধু তাই নয়। জীব চৈতন্যের অস্তিত্বই এই মাঝে থাকায়। ব্রহ্ম ও বিশ্বরূপ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্যের জাগরণও প্রার্থিত। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মনেরও প্রাধান্য আছে, নতুবা এ দ্বয়ের উপলব্ধি করিবে কে ? সঙ্গমস্থল কোথায় ?

সেই নিমিত্তই বুদ্ধি খৃষ্টীয় ধর্মের তিনের উল্লেখ আছে। পিতা, পুত্র, পরিত্র-আত্মা। তাই পুত্র যীশুখ্রীষ্ট মধ্যবর্তীরূপে মানবসন্তানের উদ্ধারের নিমিত্ত আনাগোনা করিবেন। আর তাই বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের অবতার চৈতন্যদেব ঘাটে ঘাটে মাথা রাখিয়া পাপীতাপীদিগকে ‘আয় ‘আয়’ ! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। আজও কি বিশ্বমানব ধর্মসংস্থাপক খ্রীষ্টের আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া নাই ? আজও কি ভক্তগণ হৃদয়ে মহাপ্রভুর সেই “জায় আয়” ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন না ? নতুবা ভক্ত বৈষ্ণব কবি গাহিবেন কেন, “গৌরাঙ্গ আমার, নাচত আবার”।

কে তুমি, মাঝে আসিয়া যুগে যুগে মর্ত্যবাসীকে ডাকিতেছ ! একদিন আমি সেই ডাক শুনিয়াছিলাম। আজ আমিই তোমার ডাক। আমি তোমার হাতে মুরলী। মুরলী কিন্তু নিজে বধির। মুরলীর জন্ম সে ডাক নহে !

কে তুমি ? হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার মুরলী বাজাইয়া বাজাইয়া প্রত্যেককে আকুল করিতেছ ; সেই আহ্বান শুনিয়া কতজনে আপন বুকের ছাড়িয়া সমাজ ও সংস্কারের রুদ্ধ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বেগান অজানা পথে ছুটিতেছে, যেন বন্যার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। সেই স্রোতের টানে কেহ উঠিতেছে, কেহ পড়িতেছে, কেহ ডুবিতেছে, কেহ ডুবিতেছে। কোন কোন মাঝি আপন ক্ষুদ্র তর-

নীটি ঘাটেও বাঁধিতে পারিয়াছে, আবার কেহ কেহ অকুলের সন্ধানও পাইয়াছে।

কে ডাকে ঐ, আবার আবার, “আয় আয়” ! “আয় আয়” !
ঐ কি মায়াবিনী ডাকিনী (Siren) সাইরেন-এর গান, যাহা শুনিলে
সংসারের মায়াবন্ধন সকলই টুটিয়া যায়, অবশেষে কোন অজ্ঞাত
সাগরসৈকতে দেহের জীর্ণ কঙ্কাল শুকাইতে থাকে ! কে গায়
ঐ ! কি গায় ঐ ! ঐ কি নিয়তির তান ?

এ জগতে ডাকার শেষ হইল না। চাওয়ারও শেষ হইল না।
কিন্তু ডাকে কে ? চায় কে ! তুমি না আমি !

আজ আর কেহ ডাকে না। হৃদয়-গহনে সেই চিরপরিচিত
মুরলীধ্বনি বাজে না। আজ যেন কোন গভীর নীরবতা, চিরস্তব্ধতা,
মহাশূন্যের ন্যায় আমাকে বেষ্টিত করিয়া আছে। আপনি মরিয়া
আমাকে ডাকিয়া তুমি পলাইয়াছিলে, আমি তোমার দিকে ধাইয়া
তোমাকে পাইয়াছিলাম ; কিন্তু পরের জন্ম, তোমার জন্ম—শ্রীরাধিকা
যেমন গোপিনীদিগের জন্ম রাসলীলা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—
আমিও সেইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমাকে পাইলে যে
তুমি আর কাহাকেও চাহ না ! তাই আজ আমি পলাতক, তোমায়
অঙ্গীকার করি, দূরে সরিয়া দাঁড়াই !

“দরশন লাগি বর নাহি মাগি !”

কিন্তু কৈ যাহাদের জন্ম আসিলাম, যাহাদের জন্ম কলঙ্কের ডালি
মাথায় করিলাম, তাহারা ত আমাকে গ্রহণ করিল না ! তোমার সঙ্গ-
দোষ যে আমার সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে তাই আর আমাকে কেহ
চিনে না, কেহ ডাকে না, কেহ চায় না। তুমি আমার উপর মান
করিয়া নীরব হইয়া রহিলে, আর অপরে আমাকে ঘৃণা করিয়া বর্জন
করিল ; তাই একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া মাঝে পড়িয়া গেলাম।

“দরশন লাগি বর নাহি মাগি !”

হে আমার নীরব প্রভু ! তুমি আজ গোপনে, অন্তরতলে, নীরব

হইয়া থাক। আজ আর আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া আপনাকে সীমাবদ্ধ করিও না। আপনার নিষ্ফলতা নাশে আপনাকে ক্ষুদ্র ও হীন করিও না। তোমার সেই গুহাহিত অনির্বচনীয় রহস্য হারাইও না। যাহাদের অস্তুদৃষ্টি খোলে নাই, যাহারা আবরণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিরাবরণের সাক্ষাৎ পায় নাই, তাহারাই কেবল রূপের অভাবে অন্ধকার দেখে, সতত বহিঃপ্রকাশ চায়। কিন্তু হে প্রভু! আজ আমি আমার দর্শনে, আমার স্পর্শনে, আমার আশ্বাদে, আমার অনুভূতিতে, তোমাকে পাইতে চাহি না। আজ তুমি তোমাকে ব্যক্ত না করিলেই আমি তোমাকে পাই। আজ তোমার মহাশূণ্যে শুদ্ধ নীরবতা, তোমার অঁধার সাগরে তলহীন স্তব্ধতা, আমার অনুরাগের জ্বলন্ত অননুভূতিতে জাগিয়াছে। তোমার সর্ববাস্তুক প্রণয়মহিমা আমাকে স্তব্ধ করিয়াছে।

টানে “দরশন লাগি, বর নাহি মাগি!”

রো তাই বলি হে আমার দেবতা, তুমি আজ আমার অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, ধাতো অবোধ্য, অনির্বচনীয়। তুমি কি আমার উপর অভিমান করিয়া নীরব হইয়া আছ। আজ তোমার অভিমানেরই জয় হউক! এ জগতে আমার জন্ম, হে স্বামিন্, তোমাকে যেন আর জন্মমৃত্যুর পথে ঘুরিতে না হয়। তাই তোমারই জন্ম তোমার বিদ্রোহী হইয়াছি। আমাকে গা পাইলে যে তুমি আর কাহাকেও চাহ না!

থ “দরশন লাগি, বর নাহি মাগি!”

র কিন্তু নাথ! তোমার অবোধ সৃষ্টির প্রতি তুমি অভিমান করিও নগা। সৃষ্টিকে তুমি ডাকিও। তুমি না ডাকিলেও আমি তোমাকে টি টনি, কিন্তু সৃষ্টি যে তোমার ডাক না শুনিলে, তোমার রূপ না দেখিলে, পথভ্রান্ত হয়। তুমি তাহাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া জন্মে জন্মে যুগে যুগে ডাকিতে থাক। নাথ, সৃষ্টিকে তোমার মণিকোঠার অঁধারে দর্শনের নিমিত্ত ডাকিয়া লও, আর আমি মন্দিরের বহির্দ্বারে তাহাদের সোপান হইয়া পড়িয়া থাকি।

“দরশন লাগি, বর নাহি মাগি !”

আমি শুধু আমার বুক পাতিয়া তাহাদের নিমিত্ত সোপান রচনা করি। তোমার সৃষ্টি এই সোপান অবলম্বন করিয়া উঠিতে উঠিতে ক্রমপরম্পরায় তোমার সহিত মিলিত হইতে থাকুক। আমি যেন তোমার ও তোমার সৃষ্টির সন্ধিস্থল হইয়া থাকি। তীর্থ যাত্রীদের দেহভার বহন করিয়া জগন্নাথের রথযাত্রার পথের শ্রায় ধন্য হই। এই ছায়ার কায়া আশ্রয় করিয়া সকলকে তোমার অনন্তরূপ দেখাই।

ব্যোমকেশ ! উপরে অজ্ঞেয় রহস্যরূপী তুমি, আর নিম্নে মানব-সমষ্টিরূপী তোমার অপরিমেয় সৃষ্টি, মধ্যে শুধু আমি। যেন পাতাল হইতে স্বর্গধামের উদ্দেশে কোন গগনস্পর্শী সোপানাবলি, মাঝে থাকিয়া কেবল সেই শূন্য রহস্যের পানে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িয়া আছি।

শ্রীমতী সরযুবালা দাসগুপ্তা।

কল্যাণী

১

এবারে পূজার সময় পুরুলীয়া গিয়াছিলাম। ছেলেরা ধরিয়া পড়িল, একদিন রাঁচি যাইতে হইবে। রাঁচির পথ নাকি বড় সুন্দর। বাঙ্গালা দেশের আশে-পাশে অমন ঘন নিবিড় জঙ্গল আর কোথাও নাই। রাঁচি রওয়ানা হইলাম বটে, কিন্তু রাঁচি দেখা হইল না। মাঝ-পথে এঞ্জিন ভাঙ্গিয়া গাড়ী আটকাইয়া রহিল। আমার পক্ষে ভালই হইয়াছিল। এটি না হইলে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইত না।

যাত্রীরা অনেকেই নামিয়া পড়িল। আমরাও নামিলাম। সেখান-টাতে কোনও স্টেশন ছিল না। কাছে জনমানবের বসতি নাই। রেলের দুধারে কেবল পাহাড়, খাদ, আর শালবন। লাইনের ধারে ধারে বেড়াইয়া আমরা বনের শোভা দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ গৃহিণী বলিলেন—দেখ, দেখ, ঐ গাছতলায় যেন চাঁদের হাট মিলিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। কল্যাণীকে পঁচিশ বৎসর পরে দেখিলাম। আমি আমার কাজে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। কল্যাণীও কলিকাতায় কচিৎ কখনও যায়। চাইবাসাতে বাড়ী করিয়াছে, সেখানেই থাকে। পঁচিশ বছর পরে দেখিলাম বটে, কিন্তু মনে হইল কাশীতে পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখিয়াছিলাম, আজ যেন ঠিক তেমনটিই রহিয়াছে। তার সে স্বাস্থ্য, সে সৌন্দর্য্য, সে কান্তির কিছুই কমে নাই, কেবল যাহা অপরিষ্কৃত ছিল তাহা যেন আরো ফুটিয়াছে, যাহা অপরিপক্ব ছিল, তাহা পাকিয়াছে, যাহা একটু চঞ্চল ছিল, তাহা স্থির হইয়াছে। তার আশে-পাশে আটটি সন্তান। বড়টির বয়স ছাব্বিশ, ইহা

জানিতাম। ছোটটিকে দেখিয়া মনে হইল, চারি পাঁচ বৎসরের। ছেলেরা কেউ বা দাঁড়াইয়া আছে, কেউ বা ঘাসের উপরে বসিয়াছে, আর বড়টী মা'এর পার কাছে, আপনার বাহুতে ভর করিয়া একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। এই চাঁদের হাট দেখিয়া মনে মনে আনন্দ-স্বামীকে প্রণাম করিলাম।

২

কল্যাণীকে তার বাল্যকাল হইতেই আমি চিনি। কল্যাণীর পিতা, রাধামাধব বাবু আমাদের কালেক্টরের ইংরাজি-অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ বিদ্যা যে জানিতেন না, বলিতে পারি না। কালেক্ট্রে আমরা তাঁর নিকটে ইংরাজিই পড়িতাম, কিন্তু বাড়ীতে যাইয়া দর্শন, ইতিহাস, গণিত, এমন কি সংস্কৃত কাব্য এবং জড়-বিজ্ঞান পর্যন্ত রীতিমত পড়িতাম। পড়ান'তে তাঁর কোনও দিন ক্লান্তিবোধ হইত না। কালেক্টরের অধ্যাপকেরা কেবল নোট লিখাইয়া দিতেন। অনেকেই এগুলি মুখস্থ করিয়া পাশ হইয়া যাইত। রাধামাধব বাবুর কাছে যারা পড়িতে যাইত, তাদের নোট মুখস্থ করিতে হইত না, তারা প্রত্যেক বিষয়ে মূলতত্ত্বগুলি নিজের জ্ঞানে ধরিতে পারিত। আর তাঁর পড়াইবার ধরণটা এমন ছিল যে, তাহাতে সকল বিষয়ই বড় মিষ্ট হইয়া উঠিত। রাধামাধব বাবুর একমাত্র সন্তান কল্যাণী। ছেলেবেলা কল্যাণী অনেক সময় বাবার কাছে বসিয়া তাঁর এ সকল অধ্যাপনা শুনিত।

সেই সূত্রেই কল্যাণীর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে প্রথম পরিচয়ের কথাটা এখনও মনে আছে। আমি সবে এন্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। রাধামাধব বাবু একদিন আমার একটা ইংরাজি রচনা বাড়ী লইয়া গেলেন। আমাকেও সন্ধ্যার পরে তাঁর বাড়ী যাইতে বলিলেন। তখন তিনি শান্‌কিভাঙ্গায় থাকিতেন। একটা ছোট দুতলা বাড়ী। আমি গিয়া দরজার

কড়া নাড়িলাম। “কে ও” বলিয়া একটি আট-নয় বৎসরের বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। “ভিতরে আসুন” বলিয়া সে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া রাধামাধব বাবুর বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—“বাবা বাড়ী নাই।” কল্যাণীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সেই অবধি আমি একরূপ রাধামাধব বাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া গেলাম। যখন তখন তাঁদের বাড়ী যাইতাম। অর্ধেক দিন সেখানেই থাইতাম। কল্যাণী আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, সত্যসত্যই আমাকে তার নিজের সহোদরের মতন দেখিত। বড় হইলেও এ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটিল না। আমারও নিজের ছোট বোন কেউ ছিলনা; কল্যাণীকে পাইয়া আমার সে অভাব দূর হইল।

আমি ক্রমে এম্. এ পাশ করিয়া বছরখানেক কলিকাতাতেই শিক্ষকতা করি। তারপর, ডিপুটী হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গেলাম। কল্যাণীর বয়স তখন ষোল-সতের হইবে। কিন্তু রাধামাধব বাবুকে সেজ্ঞা কোনও দিন চিন্তিত দেখি নাই। প্রথম প্রথম কল্যাণীর বিবাহের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন ছেলের পঁচিশ ও মেয়ের ষোল বছরের কমে কিছুতেই বিবাহ হওয়া উচিত নয়। লোকে বলিত—সমাজে এ নিয়ম চলিবে না। রাধামাধব বাবু বলিতেন—সমাজে যাই বলুক, শাস্ত্রে এই কথাই বলে। তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা বলিতেন—আজকালকার হিন্দুসমাজে অত বড় আইবুড়া মেয়ে রাখা অসম্ভব। রাধামাধব বলিতেন—আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে চিরদিনই আইবুড়া মেয়ে থাকিত। ষাট বৎসর বয়সে আমার নিজের পিসীমার গঙ্গালাভ হয়, তাঁর বিবাহ হয় নাই। এ সকল কথা শুনিয়া লোকে রাধামাধব বাবুকে কেউ বা খৃষ্টীয়ান, কেউ বা ব্রাহ্ম ভাবিত। তাঁর নিজের লোকেরাও ভাবিতেন তিনি ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়িলেন।

চা’র বৎসর পরে আমি পূজার সময় কলিকাতায় যাইয়া দেখি,

বৃদ্ধা বলিলেন—আমাদের ললিত !

তাঁর মুখ অপূর্ব-উল্লাসে ভাসিয়া উঠিল, দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। বলিলেন—কল্যাণীর জন্ম মনে মনে এই বরটি চাহিয়া আমি এ দুবছর কাল প্রতিদিন শিবের মাথায় বেল-পাতা দিয়াছি। ঠাকুর দুঃখিনীর মান রাখলেন।

৩

কল্যাণীর বিবাহে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাধামাধব বাবুর গুরুদেব এ বিবাহে পৌরহিত্য করেন। আনন্দস্বামী রাধামাধব বাবুর কুলগুরু নহেন। বহুদিন পূর্বের একবার गयाধামে রাধামাধব বাবু তাঁর দর্শন লাভ করেন। আনন্দস্বামী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, অনেকে তাঁহাকে সিন্ধু মহাপুরুষ বলিয়া জানিত। তাঁর নিকটে স্বামীশ্রীতে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া, সেই অবধি রাধামাধব বাবু নামব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করেন। কল্যাণীর বিবাহ ঠিক হইলে, তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন ! শিষ্যের আগ্রহে আনন্দস্বামী কলিকাতায় আসিলেন। রাধামাধব তাঁহাকেই কল্যাণীর বিবাহ দিবার জন্ম ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন—বাবা, দেশে যে আর ব্রাহ্মণ নাই, আপনার মুখেই একথা শুনেছি। ব্রাহ্মণ নহিলে কল্যাণীর বিবাহ দেয় কে ? আনন্দস্বামী বলিলেন, কাশী হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাওয়া দিবেন। রাধামাধব বলিলেন—বেদজ্ঞ হইলে কি বাবা মন্ত্রজ্ঞ হয়। বেদ ত আজকাল যে সে পড়ে ; কিন্তু তার অর্থ জানে কয়জন ? আর যারা অর্থ জানে, তারাও ত এ সকলের মর্ম্ম বুঝে না। যদি কচিং কেউ মর্ম্মও বুঝে, তারাও ত মন্ত্রের শক্তি ফুটাইতে পারে না। এটা কেবল আপনিই পারেন। আপনি কল্যাণীর বিয়ে না দিলে তার বিয়ে হয় না। আনন্দস্বামী শিষ্যের আদ্য অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। নিজেই কল্যাণীর বিবাহে পৌরহিত্য

করিলেন। আর বিবাহের পূর্বে সাত দিন ধরিয়া কল্যাণীকে বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধি ও বৈদিক মন্ত্রাদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

রাধামাধব বাবু কল্যাণীকে বেশ ভাল লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এমন কি মোটামোটি জড়বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত সে শিখিয়াছে। গুরুদেবের মুখে হিন্দু বিবাহের মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এ যে কেবল ধর্ম নয়, কিন্তু জীববিজ্ঞান; শরীরতত্ত্ব, মনতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, এমন কি আধুনিক ইউজেক্‌নিস্ বা সুপ্রজনন-বিদ্যার মূলতত্ত্বগুলির উপরে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত। এ সকল কথা বিবাহের মন্ত্রের ভিতরে লুকাইয়া আছে। এতদিনে বিবাহ ব্যাপারটা যে কি কল্যাণী বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া তাহার প্রাণ দমিয়া গেল।

যথাসময়ে আনন্দস্বামী কল্যাণীর বিবাহ দিলেন। যঁারা এ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা একবাক্যে বলিয়াছেন, জন্মে কখনও এমন বিবাহ দেখেন নাই। এই মহাপুরুষ যখন ললিতকে মন্ত্রগুলি পড়াইতে লাগিলেন, তখন প্রত্যেকটি মন্ত্র যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই সকল মন্ত্র-প্রভাবে কল্যাণীর ফুল্ল-যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপরাশি অলৌকিক লাভণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া তাহাকে সান্ধাৎ ভগবতীর মতন দেখাইয়াছিল।

কল্যাণীর বিবাহে সকলের চাইতে বেশী আনন্দ হইল তার পিতামহীর। এই জন্মই যেন তিনি এতকাল পুত্রের সংসারে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। কল্যাণী স্বামীর ঘর করিতে গেলে, তার ঠাকুর-মাও কাশী চলিয়া গেলেন।

কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গেলে আমি আমার কর্মস্থলে ফিরিয়া গেলাম। ললিত বয়সে আমার ছোট হইলেও, সখ্যের হিসাবে একই

বন্ধুদলভুক্ত ছিল। একটি বন্ধু লিখিলেন—ললিতের উদ্বাহ শেষে উদ্বন্ধনে দাঁড়াইয়াছে। আমরা তার টিকি পর্য্যন্ত আর এখন দেখিতে পাই না। তার এখন—

উঠিতে কল্যাণী বসিতে কল্যাণী
কল্যাণী হইল সারা,
কল্যাণী ভজন, কল্যাণী পূজন
কল্যাণী নয়ন-তারা।

আমি লিখিলাম, শৈশবে যেমন দাঁত ওঠা, যৌবনে সেইরূপ বিয়ে-টাও কারও কারও হয়। টিদিং আর বিয়ে—দুয়েতেই ভারি কনষ্টিটিউশ্যন্ ডিস্টারবেন্স্ হয়। ললিতেরও দেখুছি তাই হয়েছে। ললিতকে লিখিলাম—লোকে বলে তোমার নাকি বিয়ে হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে। কল্যাণী কি তোমাকে গিলিয়া বসিয়াছে, না তুমিই তাকে গিলিয়া এখন অজগর হইয়াছ, আর নড়িতে চড়িতে পার না। যেই যাকে গিলিয়া থাক, হজম করা শক্ত হবে। কল্যাণী কথাগুলি পড়ুক, এই জন্ম পোস্ট কার্ডে লিখিলাম। তাহাই হইল। কল্যাণী আমাকে লিখিল—

“আপনার পোস্টকার্ড খানা আমার হাতে পড়িয়াছে। আমি কি বলিব, সত্যি আমার মরিতে ইচ্ছা হয়। আমি ঔকে কত বলি—তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একেবারে ছাড়লে, তাঁরা আমাকে কি যে ভাবছে, তা তুমি দেখ না। উনি বলেন—ওদের হালুকা কথা-বার্তায় তাঁর মাথা ধরে। আমি জমিদারীতে যেতে বলি। তিনি বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া, কোন্ ফ্যাসাদে ফেলে জেলে পুরে দিবে, তার জন্ম যান না। আমি বলি, আর কিছু না করুন, প্রতিদিন ময়দানে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন—হাঁটলে তাঁর প্যালপিটেশন্ হয়। আমি মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যাই, কিন্তু গিয়ে দু’দণ্ড থাকতে পারি না—তাগিদের উপর তাগিদ

যায়। আমি কি করি বলুন? আমি ত হার মেনেছি। আপনি যদি কিছু করতে পারেন, তারই জন্য আপনাকে লিখছি।”

৫

বৈশাখ মাসে ঈশ্টারের ছুটিতে কল্যাণীর বিবাহ হয়। আবার বৈশাখ ঘুরিয়া আসিল। তখন আমি মৈমনসিংহে ছিলাম। তিন মাসের ছুটি লইয়াছি। মৈমনসিংহে সেবারে আমরা একটা সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করি। আমি ললিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। সম্মিলনের পরে কলিকাতায় যাইয়া তার বাড়ীতে কিছুকাল থাকিব, লিখিলাম। ললিত মৈমনসিংহ আসিল। পাঁচ সাত দিন আমার বাড়ীতেই ছিল। পরে দুইজনে কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা পৌছিয়া দেখিলাম, কল্যাণী বাড়ী নাই। ললিতের চাকর আসিয়া বলিল—পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলা কল্যাণী বিছানাপত্র লইয়া কোথায় গিয়াছেন, সে সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, সঙ্গে নেন নাই। এই বলিয়া সে ললিতের হাতে একখানা চিঠি দিল। নিজে পড়িয়া ললিত চিঠিখানা আমার হাতে দিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিল। কল্যাণী লিখিয়াছে—

“প্রাণপ্রতিমেষু,

আমার এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়িবে, তখন আমি অনেক দূরে, কত দূরে তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। তোমার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, জানি। আমারও যে ক্লেশ কম হইতেছে, ইহা ভাবিও না। কিন্তু আমার চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। অনেক দিন ধরিয়া এটাকে এড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, এড়াইতে পারিলাম না। কোথায় যাইতেছি বলিলাম না, মা বাবাও জানেন না। কেন যাইতেছি, তোমাকে বলিতে পারি না, তাঁদেরও পারিব না। তোমাদের সকলের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার খোঁজ করিও না, করিলেও পাইবে না। তোমারই—কল্যাণী।”

দু'জনে রাধামাধব বাবুর বাড়ী গেলাম। রাধামাধব বাবুকেও কল্যাণী একখানা চিঠি লিখিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্বেই সেখানা ডাকে আসিয়াছে। রাধামাধব বাবু চিঠিখানা হাতে লইয়াই বসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া তিনি ললিতের হাতে চিঠিখানা দিলেন। কল্যাণী বাবাকে লিখিয়াছে—

“শ্রী শ্রীচরণেশু,

বাবা, আমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি বলিতে পারিব না। কি হইবে ভগবান জানেন। মা'র প্রাণে খুব লাগিবে, জানি। কিন্তু আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। আমার জীবন আর আমার নয়। স্বপ্নে কোনও দিন ভাবি নাই, তোমাদের এমন কষ্ট দিব! সকলই বিধাতার ইচ্ছা। তোমরা আমার ভক্তিপ্রণাম লইবে। ঠাকুরমাকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইও। সেবিকাধম সেবিকা—কল্যাণী।”

আমরা আসিবার পূর্বেই কল্যাণীর মা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁরা কিছুতেই এ রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। ললিতের চিঠি-খানাও দেখিলেন, তাহাতেও বিষয়টার কোনও কুলকিনারা হইল না।

আমি ছুটির অধিকাংশটাই কলিকাতায় কাটাইব মনে করিয়া-ছিলাম। ললিতের অবস্থা দেখিয়া সে সংকল্প আরও দৃঢ় হইয়াছিল। ললিতের বাড়ীর পাশেই একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, আমার ছেলে-পিলেদেরে আসিতে লিখিলাম। কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। তিন দিন পরে, গৃহিণীর স্বরাসিসার হইয়াছে, তারে খবর পাইলাম। আমাকে তখনি মৈমনসিং ফিরিতে হইল।

৬

পারিবারিক অস্থখ ও অস্বোয়াস্তির ভিতরে মাসেক কাল আমি ললিতের কোনও খবর লইতে পারি নাই। তারপর যখন তাহার

খবর লইলাম, তখন সে আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিল না। কেবল লিখিল,—তুমি যার খবর জানিতে চাহিয়াছ, তার কোনও খবর লই নাই, পাই নাই, লইবও না, পাইতেও চাই না। পোর্ট-কার্ডখানা পড়িয়া বড় উদ্ভিগ্ন হইলাম। বুঝিলাম ললিত একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে। তাহা কি, পরে শুনিয়াছি।

আমি চলিয়া আসিলে ললিত প্রথমে তন্ন তন্ন করিয়া কল্যাণীর বাস, আলমারী, দেওয়াজ প্রভৃতি তন্নাস করিয়া দেখে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তারপর হঠাৎ, তার শোবার ঘরের কোণে একখানা চিঠি কুড়াইয়া পাইল। গ্রাম-সম্পর্কে রাধামাধব বাবুর একটা ভাগিনেয় ছিল। সে প্রথমে আমাদের কালেজেই পড়িত। আমি যখন এম. এ. দেই, তখন সে এফ. এ. পড়ে। তারপর মেডিকেল কালেজে যায়। একসময় মনে হইয়াছিল বুঝিবা তারই সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ হইবে। ললিত সে কথা জানিত। কল্যাণীর বিবাহের পরে সে একদিন মাত্র কল্যাণীকে দেখিতে আইসে। কিন্তু কল্যাণী সর্বদাই তার কথা কহিত, আর সে কেন যে তাকে দেখিতে আসে না, এজন্ত দুঃখ করিত। চিঠিখানা তারই লেখা। সে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, সরকারী কর্ম পাইয়াছে, শীঘ্রই বর্ম্মায় চলিয়া যাইবে। বর্ম্মা তখনও ভাল করিয়া ইংরেজের দখলে আসে নাই। হামেসাই মারা-মারি কাটাকাটি চলিতেছিল। সেখানে ইংরাজের কর্মচারীদের অবস্থা বড় নিরাপদ ছিল না। তাই সে লিখিয়াছে—তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর কখনও দেখা হইবে কি না, জানি না। কিন্তু যতদিন বাঁচিব, যেখানেই থাকি, তোমাদের ভালবাসা ভুলিতে পারিব না। সে বিজন বিদেশের মর্ম্মাস্তিক একাকিত্বের মধ্যে তোমাদের স্মৃতি আমার এক মাত্র সঙ্গী হইয়া থাকিবে। এই চিঠিখানা পড়িয়া ললিত ভাবিল, সব বোঝা গিয়াছে। বাড়ীর চাকরবাকরদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল আবার দিন দুই আগে একটা বাবু সারাদিন কল্যাণীর সঙ্গে কাটাইয়া গিয়াছেন। বর্ম্মার জাহাজের সন্ধান লইয়া জানিল, যে রাত্রিতে

কল্যাণী চলিয়া যায় সেই রাত্রেই বর্ম্মার জাহাজও কলিকাতা হইতে গিয়াছিল। ললিত তারপর আর কল্যাণীর কোনও খোঁজ করিল না। মুখেও আর তার নাম লইত না।

গৃহিণীকে লইয়া যমের সঙ্গে টানাটানি করিতেই আমার ছুটি ফুরাইয়া গেল। তাঁর হাওয়া বদলান আবশ্যক। আবার ছুটি চাহিলাম, কিন্তু পাইলাম না। ললিতের সঙ্গে দেখা করিবার বা কল্যাণীর খোঁজ লইবার আর সুযোগ জুটিল না। তারপর বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় গেলাম। গিয়া দেখিলাম রাধামাধব বাবু পেনশন্ লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। আর বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—ললিত গোলায় গিয়াছে।

শুনিয়া বড় একটা বিস্মিত হইলাম না। ললিতের হৃদয়টা যে বেশী দিন নিরাশ্রয় হইয়া থাকিবে, এ কল্পনা আমি করি নাই। সে প্রকৃতি তার নয়। ললিতের পিতা চারিবার বিবাহ করেন, ললিত তাঁর চতুর্থ পক্ষের সন্তান। ভেরেণ্ডা গাছে যেদিন তেঁতুল ফলিবে, সেদিন ললিতের রক্তে ব্রহ্মচর্য্য ফুটিতে পারে, তার আগে নয়। কল্যাণীকে হারাইয়া, ললিত প্রথমে প্রথমে মনে মনে বিবিধ রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তাঁহারই মধ্যে নিরাশ্রয় প্রাণের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। এ আশ্রয় তার মিলিল। অল্পদিন মধ্যেই সে একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিল। উপন্যাস খানিতে সাহিত্যজগতে একটা প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিল। ললিত বেনামী করিয়া বইখানা ছাপাইল। আমি 'মৈমনসিং'এ থাকিয়াই বইখানি পড়িয়াছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গ্রন্থে এক নূতন যুগ আনিয়াছে, সকলেই বলিতে লাগিল, আমারও তাহাই মনে হইল। ক্রমে থিয়েটারের কর্তারা বইখানি অভিনয় করিতে চাহিলেন। ললিত নিজেই তাহা নাট্যকাারে পরিণত করিল। নাটকখানি তাদের খুব পছন্দ হইল। ললিত তখন লিখিল—এ'খানির অভিনয় করিতে হইলে রিহিয়ার্শেলটা তার মনোমত করিতে হইবে। সে যেরূপ চায়, সেরূপ অভিনয়ের

সম্ভাবনা না থাকিলে তার নাটক খানিকে সে কোনও রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে দিবে না। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা তাহার উপরেই রিহয়ার্শেলের ভার দিলেন। ললিত নিজেই রিহয়ার্শেল করাইতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—এ পথেই সে গোলায় গিয়াছে।

৭

কিন্তু ললিতের সঙ্গে একটিবার দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দু'তিন দিন তার বাড়ী গেলাম,—সকালে গেলাম, দুপোরে গেলাম, সন্ধ্যায় গেলাম, রাত্রে গেলাম—দেখা হইল না। বেহারা বলিল, কখন আসে কখন যায়, ঠিকানা নাই। তারপর থিয়েটারে গেলাম। প্রথম দিন সে সেখানে আছে, শুনিলাম; কিন্তু দেখা পাইলাম না। পরের দিন থিয়েটার ভাঙ্গা পর্যন্ত বসিয়া রহিলাম। তারপর দেখিলাম ললিত একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে গাড়ী করিয়া চলিয়া গেল। আমার ছুটির আর দু'দিন মাত্র আছে, সে রাত্রে ললিতের সঙ্গে দেখা না হইলে এ যাত্রায় আর হয় না। আমিও একথানা গাড়ী লইয়া তার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। অবিলম্বেই আমার গাড়ীও সেই বাড়ীর দরজায় ঘাইয়া দাঁড়াইল। ললিত ও সেই স্ত্রীলোকটী সবে গাড়ী হইতে নামিয়াছে। আমিও গাড়ী হইতে নামিয়া তাদের পিছনে পিছনে বাড়ী ঢুকিলাম। ললিত স্ত্রীলোকটির পশ্চাতে ঘাইতেছিল, দুতালার সিঁড়িতে উঠিবার জন্ত যেহ সে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় আমি তার কাঁধে হাত দিয়া বলিলাম—ললিত!

ললিত চমকিয়া উঠিল, ফিরিয়া নির্বাক্ নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটীও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—“আমায় চিন্তে পার্ছ না? এই পাঁচদিন তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ্ হয়েছি। আমার ছুটি ফুরাইয়াছে, কালই চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারি না। তাই এখানে এসে এ বেয়াদবি করলাম।

স্ত্রীলোকটি বলিল—“আপনারা উপরে আসুন, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন ?” ললিত নিঃশব্দে উপরে উঠিতে লাগিল, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলাম। স্ত্রীলোকটি সিঁড়ির পাশের একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া, আমাদিগকে সেখানে বসিতে বলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তাতে যেন একটা সংযমের ও ভদ্রতার হাওয়া বহিতেছে। আস্বাবগুলি সামান্য মূল্যের, কিন্তু বড় নিপুণতাসহকারে সাজান। আমি একথানা কোচে বসিলাম, ললিত আমার পাশেই বসিল। আমি কি বলিব, ঠিক করিতে পারিলাম না। শেষটা কেবল কথা না कहিলে নয় বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল আছ ত ?” ললিত বলিল “আছি।”

আবার কথা বন্ধ। এবারে আমার স্মৃতি জুটিল। বলিলাম, “স্মরণ্য বইখানা যে তোমার তা’ এই সেদিন শুনেছি। আগেই পড়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অমন উপন্যাস বাঙ্গলায় আর হয় নাই। কোনও কোনও দিক দিয়া মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যা করতে পারেনি, তুমি এখানে তাই করেছ। তোমার চরিত্রগুলি কল্পিত বলে আদৌ বোধ হয় না। দিনরাত যাদের সঙ্গে ঘরকন্না করি, তারাই যেন তোমার বইএর ভিতর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর নাটকখানাও অতি চমৎকার হয়েছে। আজ অভিনয় দেখলাম। অমন অভিনয় এদেশে হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।” ললিতের মুখের বাঁধন খুলিয়া গেল। কি করিয়া প্রথমে উপন্যাসটি লিখিয়াছিল, এই খানি লিখিতে গিয়া তার ভিতরে কি যুগান্তর উপস্থিত হয়, তারপর কি করিয়া এখানিকে নাটকাকারে পরিণত করে, সব বলিতে লাগিল। তারপর অভিনয়ের কথা বলিতে যাইয়া, আর বলিতে পারিল না। কি যেন বুকের ভিতর হইতে তার মুখের কথা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি বলিলাম—“ইনিই না তোমার নাটকের নায়িকা সাজেন ? এরই নাম কি রসমঞ্জরী ? বাঙ্গলারঙ্গমঞ্চে এমন করিয়া কেউ কখনও কোন চরিত্রকে ফুটাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।”

ললিত বলিল—“এখন ইহাকে দেখিলে এ কথা তোমার বিশ্বাস হ’বে না। অমন সামান্য স্ত্রীলোকের ভিতর অমন অসামান্য অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভা কোথাও দেখি নাই, থাকতে পারে বলিয়াও আগে কল্পনা করতে পারতাম না। দেখা করবে?”

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, “এখন থাক্”; কিন্তু মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—“দেখতে ইচ্ছা হয় বটে।”

ললিত তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। দেখিলাম সত্যি এ মানুষ সে মানুষ নয়। সে তেজ, সে দীপ্তি, সে কিছুই নাই। সেখানে একটা বিশ্বগ্রাসিনী, বিশ্ববিজয়িনী শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম। এখানে দেখিলাম অনুপম কোমল-প্রকৃতির একটা হ্রীমতী বাঙ্গালীর মেয়ে। কিন্তু একটা বস্তু সেখানে ঐ রঙ্গমঞ্চের ছিল, এখানে এই ঘরের মাঝেও আছে, তাহা চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বস্তুটিকেই ইংরাজিতে Character বলে। দেখিলাম মুখের ভিতরে এমন একটা কিছু ফুটিয়া আছে, যাহা আপনা হইতে চিত্তে সজ্জম জাগাইয়া দেয়। দেখিয়া বন্ধুদের কথা মনে পড়িল—“ললিত গোলায় গিয়াছে।”

রূপ আছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ ব্যক্তি যে রাজ্যের লোক এ রূপ সে রাজ্যের নহে। এ রূপ দেহ-গঠনের পারিপাট্যে ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যের আভাতে উদ্ভাসিত। ইহার কাস্তি লাভণ্যের। ইহার মধ্যে অপূর্ব স্নিগ্ধতা আছে, জ্বালা নাই। এ রূপ আত্মসম্ভাবিত নহে, ইহাতে আত্মবিশ্বাস আছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যত দেখিতে লাগিলাম, ততই কাণে বন্ধুদের কথা বাজিতে লাগিল—ললিত গোলায় গিয়াছে।

কি কথা কহিব, খুজিয়া পাইলাম না। অভিনয়ের কথাটাই তুলিলাম, কথা খুলিল না। মনে হইল এ যেন কলাজগতের কোন কিছুই জানে না। ভাবিলাম এ মানুষের ভিতরে কি দুটা ব্যক্তিত্ব আছে? এরই নাম কি—Dual Personality?

তার মুখে দু'চারিটা কথার বেশী শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু এ দু'চারিটা কথাতেই বুঝিলাম, এ সামান্য স্ত্রীলোক নয়। জাত, কুল, ব্যবসা তার যাই হউক না কেন, দেবতা ইহার মধ্যে এখনও সজাগ আছেন। উঠিবার সময় সে আমাকে অতিশয় নত হইয়া নমস্কার করিল বটে, কিন্তু আমি তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিলাম।

আমি ললিতকে গোপ্তায় হইতে টানিয়া তুলিতে আসিয়াছিলাম, এই রমণী আমার সে শক্তি হরণ করিল।

৮

ললিতের সঙ্গে তার বাড়ীতেই ফিরিয়া গেলাম। গাড়ীতে দু'জনার কাহারও মুখেই কোনও কথা ফুটিল না। সেই নীরবতা লইয়াই দুজনায়ে ললিতের শোবার ঘরে যাইয়া একথানা কোঁচে বসিলাম। হঠাৎ আমি বলিয়া উঠিলাম—তার পর!—কি ভাবিয়া, কোন্ স্বপ্নঘোরে যে বলিলাম মনে নাই। কিসের পর, কি জানিতে চাহিয়াছিলাম, বস্তুতঃ পূর্বাপর কিছুই ছিল কি না, তাহাও জানি না। কেবল ঐ প্রথম কথাটাই এখনও মনে আছে।

ললিত আগে কড়ির দিকে নিনির্মেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, এবারে মাথা হেট করিয়া আনত চক্ষু দু'টা মেজের উপরে রাখিল। ডান হাতের তর্জ্জনীতে কোঁচার খুঁট জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমি ইহাকে বিবাহ করিতে চাই, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারে মুখে কল্যাণীর নাম বাহির হইয়া পড়িল।

ললিত বলিল—“মানুষকে ভূতপ্রেতে পাইলে দেবতার নামেই শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে।”

আমার মুখে কথা সরিল না। খানিক পরে ললিত আমার

মুখের দিকে চোক তুলিয়া কহিল—“তুমি যে বড় আমায় দেখতে এলে ? এ সংসারে কেহই ত আমার খোঁজ করে না।”

বহু বহু দিন যা করি নাই, আজ তাহাই করিলাম—ললিতকে টানিয়া বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলাম। চোক বুজিয়া আসিল। সেই নিম্নলিখিতনেত্রে কল্যাণীর ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিল। ললিত আমার বুক মাথা গুঁজিয়া শীতল বালকের মতন্ কাঁপিতে লাগিল। কতক্ষণ যে দু'জনায় এ ভাবে ছিলাম, জানি না। তারপর ললিত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—“তোমায় পেয়েছি ভালই হয়েছে। তোমার সামনে আজ হিসাব নিকাশ করব।”

বলিয়াই উঠিয়া তার বসিবার ঘরে গেল। সেখান হইতে এক-তাড়া চিঠি হাতে লইয়া আসিয়া আমার কাছে বসিল। চিঠির তাড়াটা খুলিতে খুলিতে বলিল—

“তুমি আমার কথা সবই জান। একরূপ বাল্যকাল হইতেই জান। তারপরও সব জান। সে কথা তুলিব না। তুমি সেবারে আমাকে কি অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছিলে, তাও জান। তারপর—”

ললিতের কথা আটকাইয়া গেল। একটু পরে ক্ষীণ স্বরে বলিল—“জানিলাম সে বর্ষায় চলিয়া গিয়াছে।”

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—“কি ?”

ললিত আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—“এই দেখ, তুমি চলিয়া গেলে, এখানা ঘরের শোবার কোণে কুড়াইয়া পাইয়াছি।”

আমি চিঠিখানা পড়িয়া বলিলাম—“তুমি পাগল।”

ললিত বলিল—“পাগল হই আর ছাগল হই, আমার জীবনের সে অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। তার স্মৃতি প্রেতিনীর মতন আমাকে তিন মাস কাল দিন রাত তাড়া করিয়া বেড়াইয়াছিল। ক্রমে “সুর-মার” স্বপ্ন রচনা করিতে যাইয়া, সে জ্বালা কমিয়া গেল। কিন্তু দুধের সাধ কি জলে মিটে ? না, স্বপ্নে পাঁচ তরকারী দিয়া পেট ভরিয়া খাইলে জাগ্রতের ক্ষুধার যাতনা নষ্ট হয়। প্রাণের শৃঙ্খলা

গেল না। যতক্ষণ ভাব্তাম ও লিখ্তাম ততক্ষণ বেশ থাক্তাম, তারপর—তারপর তুমি ত সবই দেখলে। যা ভাব্তে ইচ্ছা হয়, তাই ভাব। আমার কোনও ভয় ভাবনা নাই।”

খানিক পরে বলিল—আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, এখনও চাই; কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমি বলিলাম,—না হইবারই কথা।

ললিত একটু গরম হইয়া বলিল—তুমি তাকে জান না বলেই অমন কথা বলছ।

আমি বলিলাম—যা দেখেছি ও জেনেছি, তাতেই একথা বলছি।

ললিত বলিল—তুমি কি মনে কর যে ওরাজ্যে কখনও কোন ভাল লোক থাকতে পারে না।

আমি বলিলাম—ভাল মন্দের বিচার করিবার আমি কে?

ললিত বলিল—তুমি বিশ্বাস করবে না, ওকে না দেখলে আর ওর সকল কথা ভাল কর না জানলে আমিও বিশ্বাস করতে পার্তাম না। এ ভদ্রলোকে’র মেয়ে—

আমি বলিলাম—তা বিশ্বাস করার বাধা কি? অনেকেই ত তাই।”

ললিত বলিল—সে ভাবে নয়। সে অর্থে ভদ্রঘরে তার জন্ম হয় নাই। কিন্তু কুল মন্দ হইলেও, রক্তটা ভাল। আর কেবল আর্টের আকর্ষণেই থিয়েটারে ঢুকিয়াছে, নতুবা জীবিকার ব্যবস্থা বেশই ছিল। মা মরিয়া গেলে, কথা কইবার লোক ছিল না। তখন দুই পথ তার সম্মুখে খোলা ছিল। এক, যে পথে সবাই যায়, আর যে পথ সে ধরিয়াছে। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, থিয়েটারের আলাপ পরিচয়টা তার থিয়েটারের চতুঃসীমানার ভিতরেই আবদ্ধ। আমিই প্রথম এ লক্ষণের গণ্ডী পার হইবার অধিকার পাইয়াছি। আর এইটুকু না পাইলে, আজ আমি কোথায় যাইতাম জানি না।”

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া, ললিত আবার বলিল—ও যে কিছু-তেই বিয়ে করতে রাজি হয় না, না হইলে আমার আর কোনও দুঃখ থাকিত না। আর যে ভাবে আমার বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, তার উপরে আমার কোনও কথাও যে চলে না।

ললিত নীরবে হাতের চিঠির তাড়া হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া, পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা বড় নয়, কিন্তু ললিতের পড়া যেন শেষ হইতে চাহে না। অনেকক্ষণ পরে অতি মৃদুভাবে সে-খানা আমার হাতে দিল। বোধ হইল আমার হাতে দিতে যেন তার প্রাণে কি একটা ভয় জাগিতেছে। আমি পড়িলাম—

“সুহৃদ্বরেষু,—

তোমাকে এই আমি প্রথম পত্র লিখিতে বসিলাম। বাবার মৃত্যুর পরে, একবার কেবল যে থিয়েটারে আমি এখন আছি তার অধ্যক্ষ মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, আর জন্মে কাউকে লিখি নাই। মুখে আমার কথা ভাল ফোটে না, তুমি জান। মুখে সকল কথা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, ভয় হয়। তাই লিখিতে বসিলাম।

আমার জীবনের আগেকার কথা তুমি সবই জান। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি কোন্ পথে আমার জীবনে আসিয়াছ, তাহা জান। আমার জীবনের ঐ একটা পথই বাল্যাবধি খোলা ছিল, আর পথ ছিল না, এখনও নাই। আমি জীবনে যা কিছু পাই-য়াছি, ঐ পথেই আসিয়াছে। সেই পথেই তোমাকেও আমার জীবনের সহায় রূপে বরণ করিয়াছি, সেই পথেই তোমার জীবনের সহচরী হইয়া তোমার সেবা করিবার অধিকার লইয়াছি। অশ্রুপথে আমার এ অধিকার নাই। এই জন্যই তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ, আমি তাহাতে কোনও মতেই সম্মত হইতে পারি না। তুমি আমার জীবনে আসিবার আগে, আমি অপরের রস-মূর্তিকেই রঙ্গমঞ্চে ফুটাই-তাম, নিজে রসমূর্তির সৃষ্টি করিতে পারি নাই। তুমি আমাকে দিয়া

এইটি করাইয়াছ। আমিও তোমার নিত্য নূতন রস-সৃষ্টির সাহায্য করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। তোমার সম্ভানের জননী হইবার অধিকার আমার নাই। তুমি পুরুষ, আমি যে স্ত্রীলোক। পুরুষের পিতৃহ বৃদ্ধদের মতন উপরে ভাসিয়া থাকে, রমণীর মাতৃহ তার হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যায়। আমি বাবাকেও দেখিয়াছি, মাকেও দেখিয়াছি। আর মার কথা ভুলিতে পারি না বলিয়াই তোমার প্রস্তাবে রাজি হইতে পারি না। তুমি আমার জন্মকথা অগ্রাহ্য করিতে পার, আমি যে পারি না। আর আমি ভুলিয়া গেলেই, আমার সম্ভানও কি তাহা ভুলিতে পারিবে? আমি তোমার জন্ম প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে সুখী করিবার জন্মও যারা এখনও জন্মায় নাই, তাদের সম্ভ্রম ও মর্যাদা আগে হইতে জন্মের মতন নষ্ট করিয়া রাখিতে পারি না। আমার প্রাণের বেদনা কি তুমিও বুঝিবে না? মুখে সব কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম না, তাই এই দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। এই কথা ভুলিয়া আর আমাকে ঘাতনা দিও না।”

কতক্ষণ যে এই চিঠিখানা পড়িতে লাগিল, জানি না। পড়া শেষ হইলেও কতক্ষণ যে, এ খানিকে হাতে লইয়া বসিয়াছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না। চিঠিখানা ললিতের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আনমনে বলিলাম—এখন?

ললিত বলিল—এখন, যা দেখলে যা জানলে তাই। তুমি যে আমার বাড়ী, আমাকে খোঁজ কর্তে এসেছিলে, তা আমি জানতাম। প্রতিদিনই আমি বাড়ী ছিলাম। তোমাকে বাড়ী ঢুকতেও দেখিয়াছি। দেখা কর্তে ইচ্ছা হয় নাই, তাই করি নাই। আর আমার বেহারা জানে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। সবাইকে এ’কথা বলে—বাবু বাড়ী নাই। তুমি ত জানই, আমার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই বলে—আমি গোল্লায় গিয়াছি। সত্যি করে বল দেখি, তুমিও কি তাই ভাব?

কি উত্তর দিব ভাবিয়া আকুল হইলাম । বিধাতা বাঁচাইলেন ।
চাকর ঢা লইয়া আসিয়া, দরজা জানালা খুলিয়া দিল । সূর্য্য উঠি-
য়াছে । ললিত বলিল—তাই ত, সারা রাত তোমায় ঘুমুতে দেই
নাই ।

৯

এই বৎসর পূজার সময় আবার এক মাসের ছুটি লইলাম । রাধা-
মাধব বাবু, কোন্ সূত্রে বলিতে পারি না, এ খবর পাইয়া একবার
কাশীতে যাইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে লিখিলেন । আমারও সেই
ইচ্ছা ছিল । পরিবারবর্গকে বৈজ্ঞান্যে রাখিয়া আমি কাশী চলিয়া
গেলাম । রাধামাধব বাবু তাঁর গুরুদেবের ঠিকানা দিয়া, সেই খানেই
যাইয়া আমায় উঠিতে লিখিয়াছিলেন । আমি সেই খানেই গেলাম ।
আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখি, কল্যাণী সেখানে দাঁড়াইয়া ;
কোলে নয় দশ মাসের একটী ফুট ফুটে ছেলে ; মুখে যেন ললিতের
মুখখানি আবার কচি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে । দেখিয়া আমি চম-
কিয়া উঠিলাম । কল্যাণী ছেলে কোলে লইয়াই আমাকে প্রণাম
করিল । আমি বলিলাম তোমার একি অন্তায় কাজ, মামাকে যে
সোণা দিয়া ভাগিনার মুখ দেখতে হয়, আমি এখন সোণা পাই
কোথায় ?

বিকালবেলা আনন্দস্বামী আমাকে নিভূতে ডাকিয়া, কল্যাণী এই
দেড় বৎসর কাল যে তাঁর কাছেই ছিল, সে কেন বাড়ী ছাড়িয়া
চলিয়া আসে, কেন ললিতকে বলিয়া আইসে নাই, কেন পরেও
কোনও সংবাদ দেয় নাই, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন । আমি
বলিলাম—সবই বুঝিলাম, কিন্তু ললিতের কথা ত আপনারা ভাবিলেন
না, আর কল্যাণীর ভবিষ্যতের দিকেও ত চাহিয়া দেখিলেন না ।

আনন্দস্বামী একটু হাসিয়া বলিলেন—সবই ভাবিয়াছি ।

আমি বলিলাম—ললিতের খবর—

আনন্দস্বামী বলিলেন—সবই রাখি, সবই জানি ।

আমি বলিলাম—ললিতের জীবনটা যে নষ্ট হইল, আর কল্যাণীর সংসারও উৎসর্গে গেল ।

আনন্দস্বামী বলিলেন—আপনি জ্ঞানী হইয়া অমন কথা বলিবেন ভাবি নাই । সত্য কি কাউকে নষ্ট করে ?

আমি চমকিয়া উঠিলাম । প্রাণের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন কথা-গুলিতে নাড়িয়া চাড়িয়া দিল । তবু বলিলাম,—আপনি সত্য কাকে বলেন ?

“প্রত্যেকের প্রকৃতিই তার একমাত্র সত্য ।”

“প্রকৃতির কি ভাল মন্দ নাই ?”

“প্রকৃতি যা নয়, তাই মন্দ, তা ছাড়া আর মন্দ কোথায় ?”

“তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ।”

“স্ব-ধর্ম্ম ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই । কল্যাণী আপনার ধর্ম্মের প্রেরণাতেই ললিতকে ছাড়িয়া আসে ।”

“বুঝিলাম না ।”

“বোঝা সহজ । কল্যাণী যতদিন কেবল রমণী ছিল, ততদিন ললিতের সেবাই তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল, যে দিন সে মা হইতেছে বুঝিল, সে দিন এই নূতন মাতৃ-ধর্ম্ম তার পূর্ব্বকার সকল ধর্ম্মাধর্ম্মকে ছাড়াইয়া, তাহাকে এক নূতন নিয়মে বাঁধিল । এরই খাতিরে সে ললিতকে ছাড়িয়া আসিয়াছে ।”

“এখন ?”

“ছেলে বড় হইয়াছে, স্তন ছাড়িলেই কল্যাণী আবার ললিতের কাছে যাইবে ।

“আপনি কল্যাণীর ধর্ম্মটাই কেবল দেখিলেন, ললিতের কথাটা ত ভাবিলেন না ।”

“ভাবিয়াছি । ললিত ধর্ম্মমতে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াও ধর্ম্ম-পত্নীত্ব কোনও দিন বরণ করে নাই । কামপত্নী করিয়াই রাখিতে

লাগিল, ললিত রস চাহিয়াছে, ভোগ চাহিয়াছে, সখ ও স্মৃথ চাহিয়াছে, আপনাকে বহু করিয়া আত্মার যে পরম সার্থকতালাভ হয়, তাহা চাহে নাই । যে যা চায়, সংসারে সে তাই পায় । ললিত যাহা চাহিয়াছিল, তাহা পাইয়াছে ।”

“কল্যাণীকে সে কি আর গ্রহণ করিবে ? কল্যাণীই কি আর ললিতের জীবনের আধখানা লইয়া সম্ভুষ্ট থাকিতে পারিবে ?”

“না পারিলে কল্যাণী এখনও মা হইবার অধিকার পায় নাই । কল্যাণীই কি আর ললিতকে তার জীবনের সবটা দিতে পারে ? এই ছেলে যে তার বড় আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছে ।

আমার বড় খটকা লাগিল । জিজ্ঞাসা করিলাম—কল্যাণী সব জানে ।

“সব জানে । আপনি যে কলিকাতায় এসেছিলেন, তাও জানে ।”

আমি অবাক হইয়া গেলাম । বলিলাম—আপনাদের কোনও অতিলৌকিক শক্তি আছে, নতুবা বহুতর গুপ্তচর নিশ্চয়ই আছে ; নহিলে এ সব কথা আপনারা জানিলেন কেমন করিয়া ?”

“উত্তর বড় সহজ । মঞ্জুরীর মা আমার মস্তশিষ্যা ছিলেন ।” মঞ্জুরী আজ এখানেই আছে । কল্যাণীর কথা সে বিশেষ কিছুই জানিত না । এখন সকল রহস্য ভেদ হইয়াছে, আর তার প্রাণের যে দিকটা খালি ছিল, কল্যাণীর সম্ভানকে বুকে ধরিয়া তাহা পূর্ণ হইতেছে ।

আমি আনন্দস্বামীর পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম । তিনি “নমো নারায়ণায়” বলিয়া আমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া, বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলেন । তারপর কি যে হইল জানি না !

চোখ খুলিয়া দেখিলাম—কল্যাণীর পাশে, তার ছেলেটাকে কোলে লইয়া মঞ্জুরী দাঁড়াইয়া । আমি চোখ খুলিবামাত্র কল্যাণীর কোলে ছেলেটাকে দিয়া সে আমাকে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ।

আনন্দস্বামী বলিলেন—বিশ্বের পরম তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক, রূপতঃ

দুই। এই দুই'এর এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আবার দুইরূপ, একরূপ জগদম্বা আর একরূপ শ্রীরাধিকা, একরূপের আশ্রয়ে সৃষ্টির, আর অপরের আশ্রয়ে লীলার প্রকাশ হয়। এই তিনেতে পুরুষ আপনি আপনার পূর্ণতা সাধন করেন।

চাহিয়া দেখিলাম একদিকে কল্যাণী, আর একদিকে মঞ্জরী, আর মাঝখানে দুজনের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীর সন্তানটী।
আমি এই অভিনব বিশ্বরূপ দেখিয়া, প্রণাম করিলাম।

আনন্দস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুর এরূপ প্রকট কোথায় ?
তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীহরিদাস ভারতী।

প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক

“ভদ্রার্জুন অর্থাৎ অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ” বাঙ্গালা ভাষায় আদিম নাটক।* ইহার রচয়িতা তারাচরণ শীকদার। গ্রন্থখানির প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে,—

ভদ্রার্জুন

অর্থাৎ

অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ।

শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্তৃক প্রণীত।

“মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্ত সহোদরা।

সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সূতা॥”

কলিকাতা

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৭৭৪।

গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহা অধুনা আদি বাঙ্গালা নাটক বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত ‘কুলীনকুল-সর্বস্বের’ এক বংশের পূর্বের রচিত হয়। তারাচরণ এই নাটকখানি পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে গঠিত করিয়াছেন। “ভদ্রার্জুনের” “বিজ্ঞাপনে” তারাচরণ লিখিয়াছেন,—

“এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে।.....এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থলের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটকপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু গল্প পল্প রচনার অগ্রথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই। যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার

* ‘বিষমঙ্গল’ নামক একখানি নাটকের উল্লেখ কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না, ও ইহা যাত্রার পালা বা নাটক তাহাও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না।

ও নটীর রঙ্গ-ভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (Act) এক্টু কহে ; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্টু যেক্রপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাকীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন ! যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত হইত তবে কাকীপুরের রামপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটকনির্গত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়।.....এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলাসুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।”

ভারতচন্দ্র (Scene) সিন্ বুঝাইতে ‘সংযোগস্থল’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য নাটকে Scene শব্দ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাটকের ঘটনাগুলি কোন্ দেশে ঘটিতেছে তাহা বুঝাইবার জন্য নাটকের পাত্রপাত্রীর উল্লেখের পর সেই ঘটনাস্থল বা Scene-এর উল্লেখ থাকে। উদাহরণ—সেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজার নাটকে পাত্রপাত্রীর উল্লেখের পর আছে “Scene—During a great part of the Play at Rome ; afterwards at Sardis and near Philippi” (ঘটনাস্থল—নাটকের অধিকাংশ স্থলে রোম-নগর, পরে সার্দিস ও ফিলিপির নিকটবর্তী প্রদেশ)। এইখানে Scene শব্দটি “সংযোগস্থল”-জ্যোতক। এই অর্থেই পরে বহু বাঙ্গালা নাটকে “সংযোগস্থল” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গিরীশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রকুল’ ও “বলিদান” নাটকে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখের পর আছে ‘সংযোগস্থল—কলিকাতা’।

কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকে Scene শব্দ আর এক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্ক কতকগুলি পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত হয়। এই অংশগুলি আজকালকার বাঙ্গালা নাটকে ‘দৃশ্য বা

গর্ভাঙ্ক' নামে কথিত হইয়া থাকে। ইংরাজী Scene শব্দটি এই 'দৃশ্য' বা 'গর্ভাঙ্ক' অর্থেও প্রযুক্ত হয়। তারাচরণ 'ভদ্রাজ্জুন' নাটকে 'দৃশ্য' বা 'গর্ভাঙ্ক' অর্থে 'সংযোগস্থল' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রয়োগ সমীচীন নহে। পরবর্তী নাট্যকারগণ যে Scene শব্দের দুইটি পৃথক্ অর্থ 'সংযোগস্থল' ও 'দৃশ্য' এই দুইটি পৃথক্ শব্দ প্রয়োগ দ্বারাই বুঝাইয়াছেন তাহাই অধিকতর সঙ্গত।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এইখানে বাঙ্গালা নাটকে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। “অঙ্ক” “যবনিকা” “নট” “নটী” প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত ও প্রায় প্রাচীন-কালে যে অর্থে প্রযুক্ত হইত সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু “দৃশ্য” অর্থে “গর্ভাঙ্ক” শব্দটি অদ্ভুত ধরনে বাঙ্গালা নাটকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাটকের মধ্যে নাটক থাকিলে শেষোক্তটিকে ‘গর্ভাঙ্ক’ বলা হইত। হ্যামলেটে যে রূপ নাটকের মধ্যে নাটকের অবতারণা আছে, সংস্কৃতে ভবভূতির “উত্তর-রাম-চরিত” ও রাজশেখরের “বাল-রামায়ণ” নামক নাটকদ্বয়ের মধ্যে তেমনি ক্ষুদ্র নাটকের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাকেই গর্ভাঙ্ক বলে। বিশ্বনাথ কৃত সাহিত্য দর্পণে আছে,—

“অঙ্কোদরপ্রবিষ্টো যো রজদ্বারামুখাদিমান্ ।

অঙ্কোপরঃ স গর্ভাঙ্কঃ সবীজঃ ফলবানপি ॥”

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২০ শ্লোক]

উদাহরণস্বরূপ বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত বাল-রামায়ণের মধ্যে প্রযুক্ত “সীতা স্বয়ম্বর” নামক ক্ষুদ্র নাট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকে গর্ভাঙ্ক-শব্দের এ অর্থ বজায় থাকে নাই। প্রথমে তারাচরণ ‘দৃশ্য’ অর্থে ‘সংযোগস্থল’ শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি ‘গর্ভাঙ্ক’ শব্দের অপ-প্রয়োগে দোষী নহেন। কিন্তু তাঁহার পর রামনারায়ণ তর্করত্ন নিজ-রচিত “নব-নাটক” ও “রুক্মিণী-হরণ” নাটকে ‘দৃশ্য’ অর্থে ‘গর্ভাঙ্ক’ শব্দ প্রয়োগ করেন। রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।

তাঁহার এইরূপ প্রয়োগ নিতান্তই বিন্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। নব-নাটকে দুই-এক স্থলে গর্ভাক্ষের বদলে ‘প্রস্তাব’ শব্দ ব্যবহারে রাম-নারায়ণের ‘সতর্কনাং পরিচয়ং অল্পমিতং’ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার পর হইতে তাঁহার অনুসরণে বাঙ্গালা নাটকে ‘দৃশ্য’ অর্থে ‘গর্ভাক্ষ’ প্রচলিত হইয়া গেল।

সংস্কৃতজ্ঞ রামনারায়ণই যখন ‘গর্ভাক্ষ’ শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তখন বঙ্গের যে সকল নাট্যকার আদৌ সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্র পাঠ করেন নাই, তাঁহারাও যে সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির অপ-প্রয়োগ করিবেন তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কারণ নাই। ইংরাজী Prologue শব্দের অনুবাদে বাঙ্গালায় “আভাস” “প্রস্তাবনা” ও “সূচনা” প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের সহিত সূত্রধারের কথো-পকথন-সম্বলিত নাটকের প্রারম্ভে প্রযুক্ত অংশকেই প্রস্তাবনা বলে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

“নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা ।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্কতে ॥
চিট্বের্বাট্যৈঃ স্বকার্যোথৈঃ প্রস্তাবান্বেপিভিমিত্যঃ ।
আযুখং তত্ত্বু বিজ্ঞেয়ং নান্না প্রস্তাবনাপি সা ॥”

[সাহিত্য-দর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩১, ৩২ শ্লোক]

আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে কিন্তু নটী, সূত্রধারের কথোপকথনের অবতারণা হয় না। নাটকের প্রারম্ভে নাট্য হইতে পৃথক্ একটি দৃশ্য-কেই এখন ‘প্রস্তাবনা’ বলা হইয়া থাকে। গীতি-নাট্যগুলির প্রারম্ভে একটি সঙ্গীত যোজিত হইলেই তাহা প্রস্তাবনা-নাম ধারণ করে। আদিম বাঙ্গালা নাটকসমূহে সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ প্রস্তাবনা থাকিত। পরে তাহা উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রস্তাবনা শব্দটি ভিন্ন অর্থে তাহার পরও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। “স্বগত” “প্রকাশ্যে”

প্রভৃতি বাঙ্গালা নাটকে ব্যবহৃত নাট্যোক্তিগুলি ঠিক সংস্কৃত অর্থানু-
যায়ীই ব্যবহৃত হয়। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

“অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্ত তদিহ স্বগতং যতম্।
সর্বশ্রাব্যং প্রকাশং শ্রাদ্”

[সাহিত্য দর্পণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১৩৭-৩৮ শ্লোক]

এতদ্ব্যতীত “ক্রোড়াক্ষ” “উপসংহার” “উজ্জ্বল দৃশ্য” প্রভৃতি
কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ বঙ্গীয় নাট্যকারগণ নূতন সৃষ্টি করিয়া
বাঙ্গালা নাটকে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজী নাটকের
*Dramatis Personae*র অনুবাদ আদিম বাঙ্গালা নাটকসমূহে নিম্ন-
লিখিত শব্দ-প্রয়োগে সাধিত হইয়াছে—“নাটক সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের
নাম” (ভদ্রার্জুন), “নাট্যালিখিত ব্যক্তিবৃন্দ” (নব-নাটক), “নাট্যো-
লিখিত পুরুষ ও স্ত্রীগণ” (কুলীনকুলসর্বস্ব) ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা
নাটকে “চরিত্র” শব্দ দ্বারাও *Dramatis Personae* বুঝাইবার
প্রয়াস লক্ষিত হয়। গিরীশচন্দ্রের কতকগুলি নাটকে এই “চরিত্র”
শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে ঠিক *Dramatis*
*Personae*র অনুরূপ কোনও শব্দ পাওয়া যায় নাই। কারণ, তখন
নাট্যাভিনয়ে “প্রোগ্রামের” ব্যবহার ছিল না, ঐরূপ কোনও শব্দ দ্বারা
নাট্যের পাত্রপাত্রীর পরিচয়ও জ্ঞাপন করান হইত না। অধিকাংশ
স্থলেই একজন পাত্র প্রবেশ করিবার পূর্বে আর একজন তাহার
সূচনা করিতেন। উত্তর-রাম-চরিতে অষ্টাবক্র চলিয়া যাইবার সময়
বলিয়া যাইতেছেন “এই যে কুমার লক্ষ্মণ আসছেন”। নাটকের সর্ব
প্রথম দৃশ্যে যে পাত্র প্রবেশ করিত সূত্রধারই প্রস্তাবনায় তাহার
বর্ণনা করিয়া দিত ; যথা,—“এই রাজা দুষ্কৃত যেমন অতিশয় বেগবান
যুগ কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন।” কাজেই প্রোগ্রামের প্রচলন না
থাকায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে *Dramatis Personae*র অনুরূপ কোন
শব্দের বিশেষ প্রযুক্ত প্রয়োজন ছিল না। লিখিত নাটকগুলির
পুঁথিতেও ইংরাজী নাটকের শ্রায় সর্বথায়ে পাত্রপাত্রীর তালিকা

থাকিত না, কাজেই Dramatis Personaeর অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় না। ইহা দ্বারা অবশ্য বলিতে পারা যায় না যে, পাত্র-পাত্রীছোতক কোনও শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নাই। সংস্কৃত নাট্যসমূহের প্রস্তাবনায় বহু স্থলে “ভূমিকা” শব্দ দ্বারা নাট্যের পাত্র-পাত্রীর অংশ সূচিত হইয়াছে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষণে Dramatis Personae শব্দটি যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রোগ্রামাদিতে বা নাটকের প্রারম্ভে ব্যবহারের জন্য সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ কোনও শব্দ-প্রয়োগ আবশ্যিক ছিল না বলিয়া, তাহার ব্যবহার দেখা যায় না। কাজেই প্রথমে যখন ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা নাটকের রচনা আরম্ভ হইল, তখন বাঙ্গালী নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যে Dramatis Personaeর অনুরূপ কোনও শব্দ না পাইয়া নিজ নিজ নাটকে “নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ” প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্তী নাট্যকারগণ “চরিত্র” প্রভৃতি শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং দেখা গেল যে বাঙ্গালা নাটকে যে সকল পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত নাট্য হইতে গৃহীত, কতকগুলি নূতন সৃষ্ট। সংস্কৃত নাট্য হইতে গৃহীত শব্দগুলির কতক বা প্রাচীন অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, আবার কতক বা নূতন অর্থ ধারণ করিয়াছে।

এক্ষণে আমরা “ভদ্রার্জুন” নাটকখানির পরিচয় দিব। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু “মাইকেলের জীবনীতে” লিখিয়াছেন—“তখন বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়োপযোগী নাটক ছিল না। বিলম্বম্ভল, ভদ্রার্জুন প্রভৃতি যে দুই একখানি নাটক ছিল, তাহাও এরূপ কদর্য্য ভাষায় রচিত ছিল, যে পাশ্চাত্যনাটক সমূহের অভিনয় দর্শন করিয়া কাহারও আর সেরূপ নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে বাসনা হইত না।” আমরা বিলম্বম্ভল নাটক দেখি নাই, কিন্তু ভদ্রার্জুন সম্বন্ধে যোগীন্দ্র বাবুর উক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। ভদ্রার্জুন নাটকখানি আদৌ “কদর্য্য

ভাষায়” রচিত নহে। যে অশ্লীলতাদোষে মাইকেল, দীনবন্ধু, রাম-নারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতির নাট্যগুলি দূষিত, ভদ্রার্জুনের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন রায় সম্পাদিত “সংবাদ কৌমুদী” পত্রিকায় তৎকালীন নাটকসমূহের দূষিত রুচির আলোচনা হইয়াছিল। যোগীন্দ্র বাবু সম্ভবতঃ এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ‘ভদ্রার্জুন’ নাটক না দেখিয়াই পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি যে “সংবাদ কৌমুদী”তে ‘নাটক’ নামে যে সকল রচনা নিন্দিত হইয়াছে, ভদ্রার্জুন তাহাদের অন্ততম নহে। ভদ্রার্জুন নাটকের ‘বিজ্ঞাপন’ হইতেই এ কথা প্রমাণিত হইবে। ভদ্রার্জুন প্রণেতা তারាচরণ লিখিয়াছেন,—

এতদেশীয় কবিগণ-প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলাহুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্তে মহাভারতীয় আদিপর্ব হইতে শ্ৰুতদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সকলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।” [ভদ্রার্জুন, বিজ্ঞাপন, ৪ পৃষ্ঠা]

উক্ত পংক্তিগুলি পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে নাটক নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি যাত্রা ও গীতাভিনয়েরই অধিক অনুরূপ ছিল, আমরা এখন নাটক বলিতে যাহা বুঝি তাহা ছিল না। সেকালের যাত্রা ও তারাচরণ বর্ণিত ‘নাটকে’র যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তৎকালীন যাত্রায় গীতবাহুল্য ও সং’এর বাড়াবাড়ি ছিল। “সং যাত্রার অঙ্গীভূত ছিল। বাসুদেব ঠাকুর, সুন্দুরে জেলে, নারদ মুনি প্রভৃতি প্রথমেই হাশ্বরসের উদ্রেক করিয়া আসর হইতে অবসর লইতেন। যাত্রার...অধিকারীরা পরে আসরে অব

তীর্ণ হইতেন। তাঁহারা তখন গান জমাট করিতেন, শ্রোতৃবর্গকে ভক্তি ও করুণরসে আপ্নত করিতেন এবং রাগরাগিনীর মূচ্ছনা দ্বারা মোহিত করিতেন।” [সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতি, “সংকল্প” ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা] “যাত্রার কেলুয়া ভুলুয়া প্রভৃতি সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল।” [জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, “ভারতী” বৈশাখ, ১০২১] ইহা হইতে যদি আমরা অনুমান করি যে “সংবাদ কোমুদী”তে ও ভদ্রার্জুনের বিজ্ঞাপনে নিন্দিত ‘নাটক’ যাত্রা মাত্র, আমরা নাটক বলিতে এক্ষণে যাহা বুঝি তাহা নয়,” তাহা অসঙ্গত হইবে না। অস্তুতঃ যতদিন না ইহার বিপরীত কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ততদিন ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। পূর্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত ‘কলি রাজার যাত্রা’ নামক গ্রন্থ “সংবাদ কোমুদী”তে ‘নাটক’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার নাম হইতেই ইহা যে যাত্রা বা গীতাভিনয়, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। যাত্রাদির ঘৃণ্য রুচি সংশোধন করিবার জন্য ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালায় নাটক রচনা আরম্ভ হয়, ভদ্রার্জুনের বিজ্ঞাপন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। রামনারায়ণ তর্করত্নও ‘রত্নাবলী’র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

“সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত তত্ত্বাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। নির্মল সুধাকরবিনিঃসৃত সুধাধারের আশ্বাদ পাইলে কাঙ্ক্ষকাতে কাহারও অভি রুচি হয় না।”

এই সকল হইতেই বুঝা যাইবে যে রামমোহন রায় ‘কলি রাজার যাত্রা’কে ‘নাটক’ আখ্যা দিলেও, তাহা প্রকৃতপক্ষে নাটক কি যাত্রা, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় আছে। কারণ তৎকালে ‘নাটক’ শব্দটি যাত্রার অভিনয়ার্থ রচিত গ্রন্থ সকলে ও প্রযুক্ত হইত। পূর্বোক্ত ভদ্রার্জুনের ভূমিকায় ‘নাটক’ বলিয়া যে সকল পুস্তক বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যাত্রা বা গীতাভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাত্রা, “কবি” প্রভৃতি প্রাচীনকালের নাট্যাভিনয় অঙ্গীলতা দোষে প্রায়ই দূষিত হইত।

কাজেই শিক্ষিত জনসাধারণের প্রাণে ক্রমে এসকল অভিনয়ের প্রতি বিরাগের সঞ্চার হইল। এই বিরাগ এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, কবিত্বপূর্ণ অথচ অশ্লীলতাবর্জিত “কবি” “পাঁচালী” প্রভৃতির পানাও কেবল “পাঁচালী” ও “কবি” বলিয়া ঘৃণিত হইতে লাগিল। অবশ্য আসর বুঝিয়াই পাঁচালী বা কবিওয়ালাগণ খেউড়ের অবতারণা করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নাট্যকলার আশ্বাদ পাওয়াতে ক্রমশঃ অশ্লীলতাশূন্য পাঁচালী বা কবির পানাও বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন সক্ষম হইল না। আজ তাই গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সখের নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাঁচালী, কবি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। যাত্রাও ক্রমে ক্রমে থিয়েটারের মতই হইয়া উঠিতেছে।

সে যাহা হউক, এই কুরুচিপূর্ণ যাত্রার পরিবর্তে বিশুদ্ধ নাটক অভিনয়ে শিক্ষিত দর্শক সম্মুখ হইবেন, এই আশায় তারাচরণ শীকদার ‘ভদ্রার্জুন’ নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজী নাটকের Prologue-এর স্থায় ভদ্রার্জুনে একটি ‘আভাস’ সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে তারাচরণ নাটক ও নাট্যকলার নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন :—

“সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান।
সর্বস্থলে নাটকের আদর সমান ॥
সত্য কি অসত্য জ্ঞাতি পৃথিবী-নিবাসী।
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষী ॥
দর্শকমণ্ডল-মাঝে করিয়া বিস্তার।
করিতেছি সুধাসম-নাটক-প্রচার ॥
ঐতিয়ুগে দৃষ্টিযুগে প্রবেশি এ সুধা।
তৃপ্তি করে সকলের নিরানন্দ-সুধা ॥”

এইরূপে নাট্যকলার প্রশংসা করিয়া নাট্যকার সমগ্র নাটকের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটী ‘আভাসে’ পয়ারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ‘আভাসে’র পরই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্. এ।

বিরহে

এমন বাদল-দিনে

কোন মধুরায়,

আমার পরাণ ল'য়ে,

গেল শ্যামরায় ।

সেথা কি মধুর নিশি

অঁধারে গিয়েছে মিশি' ?

এমনি পাগল পারা

নেমেছে বাদল ধারা ?

তা'রো কি নয়ন-দুটি

অঁথি জলে ছায় ?

এমন অঁধার বায়

নিঠুর বিজুলী-ঘায়,

তারো কি বিজন-হিয়া,

উঠিতেছে শিহরিয়া ?

সেও কি চমকি উঠি

পথপানে চায় ?

সখি, এমন বাদল দিনে,

কোথা শ্যামরায় ?

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

২

যে শ্রীকৃষ্ণের কথা এই শেষ-বয়সে, শূন্যে ও বলিতে এমন আনন্দ পাই, গুরুকৃপায় এই ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনোবৃদ্ধি-সকল, আপন আপন প্রকৃতির অনুসরণে এই সংসারের বিচিত্র বিষয়-রস ভোগ করিতে করিতেই ক্রমে যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তব্দের শ্রীকৃষ্ণ। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সিদ্ধান্তেও ইহাকে তত্ত্ববস্তুরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ

ইহাই মহাপ্রভুর কথা। ইহাই আমার এই সামান্য কৃষ্ণকথারও মূলসূত্র। তবে এই সিদ্ধান্তকে ধরিয়াই যে আমি কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, এমন নয়। অন্তরে গুরুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছি।

আর এই সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বুঝিয়াই দেখিলাম, মহাপ্রভুর কথা লোকে ধরিতে পারে নাই। তিনি বলিলেন প্রত্যক্ষ তব্দের কথা, লোকে শুনিল কেবল পুরাতন কিস্মদস্তীর দূরাগত প্রতিধ্বনি। তিনি দেখাইলেন চিত্তবস্তু, তারা দেখিল কেবল পৌরাণিকী প্রতিমা। তিনি প্রকট করিলেন ভগবানের নিত্য-লীলা, তারা ভাবিতে লাগিল কেবল দ্বাপরের পুরাণ-কাহিনীর কথা। এই বাঙ্গালার, উড়িষ্যার, তৈলঙ্গ-দেশের ও দক্ষিণাপথের মাঠে ঘাটে তিনি আবিষ্কার করিলেন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব চিন্তামণিময়ী ব্রজভূমি, ভারতের এক কোণে যে সামান্য পরিসর বনভূমিকে লৌকিকী কিস্মদস্তী বলিত শ্রীবৃন্দাবন, তারা চলিল ব্রজের ধূলি মাথিতে, কেবল সেইখানে। তিনি বলিলেন, কৃষ্ণের—

“বিভূতি দেহ সব চিদাকার”

তার মাটি দিয়া, ধাতু গালিয়া, পাথর খুঁদিয়া গড়িতে লাগিল—নব-নটবর শ্যামসুন্দর। মহাপ্রভু, “নূতন” ভক্তি বিলাইবার জন্ত নূতন ভাবের হাট খুলিলেন,—আর জগতের সকল মহাপুরুষেরা যাহা করেন, তিনিও তাহাই করিলেন,—পুরাতন ও প্রচলিত ভাষা দিয়াই এই নূতন ভাবকে সাজাইয়া লোকের নিকটে ধরিলেন। তাঁর ভাবসম্ভার ছিল অজ্ঞাতপূর্ব, এই ভাষার সাজ ছিল চিরপরিচিত। ভাব তাঁর ধরিল সাড়ে তিনজন, ভাষা তাঁর গিলিল লক্ষ লক্ষ লোকে। এই সাড়ে তিনজন খাঁটি বৈষ্ণবের তিরোভাবে মহাপ্রভুর সেই “অভিনব” ভক্তিভাব, নিরাধার হইয়া, যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানেই উড়িয়া গেল, পড়িয়া রহিল কেবল ঐ প্রাচীন প্রাণহীন ভাষা, আর সেই লক্ষ লক্ষ অবোধ লোক। আর তাহারা সেই শূন্যগর্ভ শব্দ-রাশিতে আপনাদিগের চিরাগত সংস্কারকে পূরিয়া দিয়া তাহাকেই মহাপ্রভু-প্রবর্তিত পন্থা বলিয়া ধরিল। মহাপ্রভু যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তার অঙ্কুরোদগম হইল না। কিন্তু সে বীজ অক্ষয়, তাহা কদাপি নষ্ট হইবার নহে। সেই অক্ষয় বীজকে ফুটাইবার জন্তই ভারতের, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশের, আধুনিক ইতিহাসের অভিব্যক্তি।

যে নিবিড় কল্পনাজাল মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সহজ সাধনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিল, ইংরাজি শিক্ষা ও আধুনিক যুরোপীয় সাধনা তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল। যে বৈদান্তিক মায়াবাদ কেবল জীব-ব্রহ্মের ভেদই উড়াইয়া দিতে চাহে নাই, কিন্তু এই ভেদ উড়াইতে যাইয়াই জগৎকে মিথ্যা ও সংসারের সর্ববিধ রসের সম্বন্ধকে বন্ধন-হেতু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বৈষ্ণবেরা তত্ত্বমীমাংসায় তাহাকে বর্জন করিয়াও, ধর্মসাধনে প্রকৃত পক্ষে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আর পারেন নাই বলিয়াই, সত্যভাবে মহাপ্রভুর পথও ধরিতে পারিলেন না। যুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন, বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রীশীয় ললিত-

কলার জীবন্ত রক্তমাংসের প্রবলপ্রেরণা, সেই মায়ার প্রভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। যুরোপের সংস্পর্শ আসিয়া আর যাহা কিছু পাইয়া বা খোয়াইয়া থাকি না কেন, তাহাতে যে এই প্রত্যক্ষ জগৎকে এবং আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মাকর্ম্মকে ও সংসারের সর্ববিধ রসের সম্বন্ধকে সজীব, সতেজ ও সত্য করিয়া তুলিয়াছে, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। তার যুরোপের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে, এই সংসারটা এমন সত্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, মহাপ্রভুর অভিনব ভক্তিপন্থাটিও দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে।

এই ভক্তির পথ সংসারের পথ, সন্ন্যাসের পথ নহে। আর যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতের সভ্যতা ও সাধনা একান্ত সংসার-বিমুখ ও পরলোক-সর্বস্ব হইয়াছিল বলিয়াই, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা মহাপ্রভুর উপদেশ শুনিয়াও তার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম ও সাধন ভজন সকলই, বহুদিন হইতে, সংসার ও সংসারের বিবিধ সম্বন্ধকে উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে একান্ত পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। সংসার মায়ার খেলা; প্রবৃত্তিবশে লোকে সংসার করে, করুক; কিন্তু এ মায়ার বন্ধন না কাটিলে কখনও পরম-পুরুষার্থ লাভ হয় না। ইহাই লোকের ধারণা ছিল। সংসার-বিমুখ সাধনভজন জীবকে কৈবল্যের পথেই লইয়া যাইতে পারে। প্রকৃত ভক্তির পথ সন্ন্যাসের পথ নহে, সংসারেরই পথ, লোকে এ সকল কথা জানিত না ও বুঝিত না। কৈবল্যের সাধ্য নিগুণব্রহ্ম; ভক্তির উপজীব্য সর্বগুণাধার ভগবান। কৈবল্যসাধক চাহেন সকল সংসার-বন্ধন কাটিয়া, সর্বসম্বন্ধাতীত ও সর্বোপাধিশূন্য হইয়া, নিগুণ ও নিরুপাধি ব্রহ্মস্বরূপে মিলিয়া গিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করিতে। ভক্তের প্রাণ চাহে ভগবানের সঙ্গে বিবিধ রসের সম্বন্ধ পাতিয়া, তাঁহাকে পিতা, মাতা, পুত্র বা প্রণয়ীরূপে ভাবিয়া, দাস্য, মিত্র, বাৎসল্য বা মধুর রসে বিভোর ও আত্মহারা হইয়া, সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিম্নলিখিতসাম্যতমূর্তির—তাঁহার সেবা করিতে। কৈবল্য চাহে সর্ব

সম্বন্ধের উচ্ছেদ করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হইতে। ভক্তি চাহে সংসারের সকল সম্বন্ধকে বজায় রাখিয়া ও পূর্ণ করিয়া, সকল রসকে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া, নিত্যকাল এই সকল রসের সম্বন্ধের সাধন করিয়া শ্রীভগবানের লীলার সহায় হইতে। মহাপ্রভু এই কৈবল্যমুক্তির অপূর্ণতা ও এই মায়াবাদের ভ্রান্তি দেখাইয়া জীবকে সত্য ভক্তির পথে লওয়াইবার জন্মই আসিয়াছিলেন। “আপনি আচরিয়া,” তিনি “কলির জীবকে” এই “অনর্পিতচরী” ভক্তির পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। অবতার মাত্রই অমুরবধ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াবাদরূপ অমুরকে নষ্ট করিলেন। কিন্তু এ অমুর মরিয়াও মরিল না। লোকে ভক্তির কথা শুনিয়া, কিন্তু মুক্তির লোভ ছাড়িতে পারিল না। যাহারা হরি-নাম পাইল, জপযজ্ঞে দীক্ষিত হইল, মুখে—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরশ্রুত্যা—

বলিতে লাগিল, তাহারাও বাহ্য-ক্রিয়াকলাপ ও তান্ত্রিক শাস্তিস্বস্ত্যয়ন ছাড়িল না। তারা নামও করিতে লাগিল, কাপড়ও তুলিতে তুলিল না। যারা মহাপ্রভুকে স্বীকার করিল, নিত্যানন্দের আশ্রয় লইল, তারাও তিলক কণ্ঠী ধারণ করিয়া ভেক লইয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যারা গৃহী হইয়া রহিল, তারাও সংসারের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সম্বন্ধের মধ্যে, দাস্যসখ্যবাসলাদি রস সাধন করিয়া নিখিলরসামৃতমূর্তি ভগবানকে পাইল না। আর না পাইয়া এ সকলকে মায়িক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া কল্পিত প্রতীকাদি ধরিয়া এই সকল রস-সাধনে নিযুক্ত হইল। লোকে মহাপ্রভুর এই অনর্পিতচরী ভক্তি পাইল না। আর তাঁর আবির্ভাবের সার্থকতাসম্পাদনের জন্মই মনে হয় ইংরাজের শাসন-দণ্ডে ভয় করিয়া, সংসার-রস-বিভোরা, প্রত্যক্ষপরায়ণা যুরোপীয়সাধনা আসিয়া আমাদের ঘারে ঘারে, অজ্ঞাতসারে, সেই রসই বিলাইতে লাগিল। শয়তানের

দূত হইয়া নহে, কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কিস্কররূপেই যুরোপ আমাদের কাছে আসিয়াছে।

সংসার ও পরমার্থের মধ্যে বিরোধ সকলদেশের সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে এ পর্য্যন্ত এ বিরোধের নিঃশেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। কেহ বা সংসারকে ছাড়িয়া পরমার্থ খুঁজিয়াছে, কেহ বা পরামর্শকে ছাড়িয়া সংসারে মজিয়াছে; আর কেহ বা সংসার ও পরমার্থের মধ্যে, তদর্কং মদর্কং করিয়া, একটা গোঁজামিল দিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এ দু'এর সম্যক সমন্বয় এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া জানি না। মহাপ্রভুই কেবল এই সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের সেবা মানুষ চিরদিনই করিয়াছে। কেহ কেহ এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সেবাকেই ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়াও লইয়াছে। বামাচার কেবল ভারতবর্ষেই প্রবর্তিত হয় নাই। মিশরে, গ্রীশে, সকল—প্রায় সকল প্রাচীন দেশেই, কোনও না কোনও সময়ে, কোনও না কোন আকারে, এই কদাচার প্রবল হইয়াছে। মহাপ্রভু এই কদাচারের সমর্থন বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কিন্তু ভগবদারাধনায় এ সকল ইন্দ্রিয়কে একেবারে বর্জনও করেন নাই। কেবল এই সকল রসের করণকে নিষ্পন্ন করিয়া, শুদ্ধ করিয়া, তাহাদের ভিতরে যে অতীন্দ্রিয়-সংকেত আছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া, সকলরসাধার ভগবানের সেবাতে প্রবর্তিত করিয়াছেন। পূর্ব্বতম সাধকেরা ঈশ্বরে পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—রস ভিন্ন অনুরাগ কোথায়? শুদ্ধ রসের সম্বন্ধেই কেবল সত্য ও অহৈতুকী অনুরাগ ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ অনুরাগ লাভ করিতে হইলে, শ্রেষ্ঠরসাস্বাদন আবশ্যিক। ভগবানেতে এই শ্রেষ্ঠ অনুরাগ অর্পণ করিতে হইলে, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরসের আশ্রয় বা বিষয়রূপে ধরিতে হইবে। অতএব কেবল “সাপরানুরক্তিরীশ্বরে”—বলিয়া ভক্তির সংজ্ঞা দিলে চলিবে না। এ ভক্তি প্রাচীন ভক্তি। এ ভক্তি উপনিষদের ঋষিগণ, শুকনারদাদি

ভাগবতেরা পূর্বের আচরণ করিয়া গিয়াছেন । এ ভক্তি অনর্পিত-
চরী নহে । যে ভক্তি পূর্বের কেউ কোনও দিন আচরণ করে নাই,
মহাপ্রভু জীবকে তাহাই বিলাইতে আসিয়াছিলেন । এই অনর্পিতচরী
ভক্তির নূতন সংজ্ঞা প্রয়োজন । তাই—

“হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে”

অনর্পিতচরী ভক্তির এই সংজ্ঞা হইল । ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, ইন্দ্রি-
য়ের অধীশ্বরের সেবাই ভক্তি ।

উপনিষদ্—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ

কেনঃ প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ

কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি—

“মন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপন বিষয়ের প্রতি গমন
করে ? শরীরের অভ্যন্তরে প্রধানরূপে বর্তমান প্রাণ, কাঁহাকর্তৃক
নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে ? কাঁহার চালনায়
লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, এবং কোন দেবতাই বা চক্ষু
ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন,—বলিয়া যে বস্তুকে
নির্দেশ করিয়াছিল, এবং ক্রমে

“সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং”

সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জিত হইয়াও যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণাভাস—
বলিয়া যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তিনিই হৃষীকেশ । এ সকল
ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা যখন তিনি এ সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতাই বা
তাহাতে ভিন্ন আর কোথায় হইতে পারে ? তাঁর সেবার জন্য ইন্দ্রিয়-
গ্রামকে নিষ্পেষিত করিতে হয় না, যথাযথভাবে বিকশিত করিয়াই
তুলিতে হয় । প্রাচীন সন্ন্যাস-মুখী সাধনা, যে ইন্দ্রিয় সকলকে সাধনার
বৈরী ভাবিয়া নির্যাতন করিয়াছিল, মহাপ্রভু সেই ইন্দ্রিয়গ্রামকেই
সাধনের সহায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।

সংযমে শক্তি বাড়ে, অসংযমে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় শক্তি নষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের শক্তির বৃদ্ধির জন্য সংযম চাই। অনুশীলন ব্যতীত বিকাশ অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের বিকাশের জন্য অনুশীলন চাই। এই অনুশীলনের পথ, অনেক পশুদেরও ইন্দ্রিয় আছে, তারাও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে। এ পথ পাশব। তারা ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে “অবশং প্রকৃতের্বশাং”—প্রকৃতির প্রেরণায়, অবশেষে তারা যদ্বাক্রূড়ের মতন বিষয় রাজ্যে চলাফেরা করিয়া থাকে। আর, এক দিক দিয়া দেখিলে মানুষকে কেবল শ্রেষ্ঠ পশুরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেষ্ঠ পশুরূপী মানুষের একটা ইংরাজি নাম হইয়াছে। ইংরাজিতে আমরা ইহাকে mere man (মিয়ার ম্যান) বলিয়া থাকি। কেবল মাত্র বুদ্ধির দিক দিয়াই এই মিয়ার ম্যান পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মানুষ প্রাকৃত-বুদ্ধি-সম্পন্ন। ইহার অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি ফোটে নাই। সে এখনও আপনাকে আত্মা স্বরূপ বলিয়া জানে নাই। এই প্রাকৃত মানুষের ইন্দ্রিয়ানুশীলন, বিষয়ের প্রেরণায় চলিয়া, বিষয়ের সীমাতেই পড়িয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়ানুশীলন প্রত্যক্ষের উপরে উঠে না। ইন্দ্রিয়ানুশীলনের এ পথকে প্রাকৃত মানুষের পথ বলা যাইতে পারে। এই পথেও হৃষীকেশের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে ইন্দ্রিয়ের ভিতরে অতীন্দ্রিয়ের সাড়া জাগিয়াছে, তারই দ্বারা কেবল হৃষীকেশের ভজনা সম্ভব হয়। যে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের মধ্যে উচ্চাত্মের ললিতকলার উদ্দীপনা নাই, তাহা ভক্তিসাধনের উপযোগী হয় না। তাহাতে রূপের মধ্যে অরূপকে, সান্ত্বের মধ্যে অনন্তকে, সংসারের মধ্যে পরমার্থকে, ধরা যায় না। আর রূপের ভিতরে যে অরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে নাই, যে ভাবাত্মের সাহায্যে হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিতে হয়, সে ভাবাত্মগঠন তার পক্ষে অসম্ভব। এই ভাবাত্মস্ফূর্তিকেই ইংরাজিতে idealisation কহে।

এই ভাবাত্ম-স্ফূরণ বা idealisation ধর্মসাধনে নূতন কথা নহে।

স্বল্পবিস্তর সকল ধর্ম্মেতেই এই ভাবান্ধুস্ফুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই ভাবান্ধুস্ফুর্তি বাতীত জীবের অতীন্দ্রিয়ানুভূতি জাগে না; আর কোনও না কোনও আকারে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি না জাগিলে, কোনও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্ম সাধনে এই ভাবান্ধুর স্ফুরণ কল্পিত ছিল, সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয় নাই। প্রত্যক্ষের উপরে ভাবান্ধুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, মানস-কল্পনার উপরেই হইত। কোনও কোনও স্থলে ললিতকলাতে এ সকল ভাবান্ধু সম্পূর্ণ বস্তুতন্ত্র হইলেও, ধর্ম্মসাধনে চিরদিনই স্বল্পবিস্তর কল্পিত ছিল। মহাপ্রভু ভাবান্ধুসাধনে এই কল্পনার প্রভাবকে নষ্ট করিয়া, ভক্তিকে প্রত্যক্ষ রসের উপরে গড়িয়া তুলিয়া বস্তুতন্ত্র “হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে”

করিলেন। কিন্তু লোকে মুখে এই কথার আবৃত্তি করিয়াও, ইহার মর্ম্ম ধরিল না।

যুরোপীয় সাধনা আসিয়া, এতদিন পরে, আমাদের কাছে এই ভক্তি-পথের সন্ধান দিয়াছে। যুরোপ এই অনর্পিতচরী ভক্তির কথা কিছুই জানে না। কিন্তু ললিতকলার মধ্যে অপূর্ব ভাবান্ধু গড়িবার সংকেতটী সুন্দররূপে সাধন করিয়াছিল। গ্রীশের ললিতকলাতে একদিকে যেমন অপূর্ব বস্তুতন্ত্রতা দেখিতে পাইলাম, অশুদ্ধিকে সেই-রূপ অদ্বুত ভাবান্ধু-স্ফুর্তিও প্রত্যক্ষ করিলাম। গ্রীশীয় ললিতকলার ভাবান্ধুস্ফুর্তি বা idealisation বস্তুতন্ত্রহীন নহে। জড়ের ভিতরে গ্রীশ অজড়কে, প্রত্যক্ষের উপরে অপ্রত্যক্ষকে, চাক্ষুষ রক্তমাংসের আকার ও বর্ণের মধ্যেই অচাক্ষুষ আত্মবস্তুকে যেমন ফুটাইয়াছিল; এ পর্য্যন্ত আর কোথাও তেমন দেখি নাই। ভারতের তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান যুরোপে ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্র ভাবান্ধু-স্ফুর্তি-নিবন্ধন, এই idealisation'এর প্রভাবে, যুরোপীয় সাধনা মানুষকে পশুত্বের ভূমি হইতে তুলিয়া শ্রেষ্ঠতম মানবতার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষকে

যুরোপ এখনও দেবতা করিয়া তুলে নাই। জীবে শিববুদ্ধি যুরোপের এখনও জন্মে নাই। এখনও সর্বদজীবে তার ব্রহ্মভাবোদয় হয় নাই। আমাদের সাধনা ইহা করিয়াছে। কিন্তু করিয়াছে বেশীভাগ কেবল কল্পনার রাজ্যে, বস্তুর রাজ্যে করিতে পারে নাই। আমরা কল্পনা-জগতে মানুষকে দেবতা করিয়াছি, যুরোপ বাস্তব জগতে মানুষকে সত্য জীবন্ত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে। যুরোপীয় সাধনার ভাবান্ধুত্ব বা idealisation বস্তুতন্ত্র, কল্পিত নহে। আর এই জগ্গই এই সাধনা অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভু প্রচারিত অনর্পিষ্টচরী ভক্তির পথ ক্রমে প্রশস্ত ও উজ্জ্বলতর করিয়া দিতেছে।

যুরোপীয় সাধনার প্রেরণায়, জগতের প্রত্যক্ষ রূপ রসাদির অনুসরণ করিয়াই ক্রমে কৃষ্ণপথের সন্ধান পাইয়াছি। এই জগ্গই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ। আর কৃষ্ণবস্তু যে তত্ত্ববস্তু এই গোড়ার কথাটা ভুলিয়া গেলে, আমাদের এই প্রত্যক্ষপ্রধান বৈজ্ঞানিক যুগে, কেউ কখনও শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্টিতে ও ভজিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।



নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচ

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩২১ সাল ।

সূচী পত্র

ক	বিষয়	লেখক	
১।	কবিতার কথা	...	...
২।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্ত	...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
৩।	শাস্তি-স্বপ্ন (কবিতা)	...	শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ
৪।	ভক্তকের বুদ্ধি	...	শ্রীরাধেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ?
৫।	চার্লস-দর্শন	...	শ্রীহরিপদ কাব্য স্মৃতি মীমাংসা
৬।	সেকালের স্মৃতি (বক্তৃতা)	...	শ্রীসুরেশ সমাজপতি
৭।	বিবসনা (কবিতা)	...	শ্রীভূজঙ্গর রায়চৌধুরী
৮।	ধোঁয়া	...	শ্রীমতী সরযুবালা দাসগুপ্তা
৯।	পল্লী-মাঠে (কবিতা)	...	শ্রীগণেশচন্দ্র রায়
১০।	বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ	...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
১১।	জুঃখী দাদা (গল্প)	...	শ্রীমতী উর্মিলা দেবী
১২।	বৌদ্ধধর্ম	...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৩।	আমার কথা	...	শ্রীমতী জগদম্বা দেবী
১৪।	নিবেদন (কবিতা)	...	...

১৫

কার্যালয়—২০৮২ ডি, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট

বার্ষিক মূল্য ডাক মাসিক

এই সংখ্যায়



বিজয়া প্রেসে, ২০ নং পটুয়াটোলা সেনে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরীদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা]

[ফাল্গুন, ১৩২১ সাল

কবিতার কথা

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। আমি ভাষার কথা বলিতেছি না, সাহিত্যেরই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্য বিষয়ে, বিশেষতঃ গীতিকাব্য লইয়া, নানাপ্রকারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার অভাব। আবার কেহ কেহ বলেন ভাবুকতাই মনুষ্যজীবনের সারাংশ। এই ভাবুকতা ছাড়িয়া দিলে কবিতা ফুটিবে কি করিয়া? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ইংরাজি সাহিত্যে Realism ও Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজি সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটি রকমের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়ার্ডসওয়ার্থের Skylarkএর শেষ দুইটি ছত্রে আছে।

Type of the wise who soar but never roam

True to the kindred points of Heaven and Home !

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—এই দু'য়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই কি আমাদের কবিতার আদর্শ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে আমাদের প্রাণের মাঝে দুইটা ভাব সর্বদাই

দেখা দেয়। একটা আমাদের মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের মাটি ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই সংসার ও পরমার্থ, ধরনী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্যজীবন বলিলে যাহা বুঝায় তাহার অঙ্গহানি হয়।

মনুষ্যজীবন কি? আমরা প্রতিদিন যেমন করিয়া জীবনযাপন করি তাহাই কি প্রকৃত জীবন? আমরা সকলেই সকালে উঠিয়া যে যার কর্মে নিযুক্ত হই, সমস্তদিন কর্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসি এবং তৎপরে বিশ্রাম করি। যাহার কর্ম করিতে হয় না সেও শয্যা হইতে উঠিয়া কোন রকমে গল্প করিয়া, তামাক টানিয়া দিনটা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনের বহিরাবরণ। ইহার আর একটি দিক আছে। তাহাকে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতি বলা যাইতে পারে। যে সমস্তদিন কর্ম করিয়া কাটায়, সেও মাঝে মাঝে, ভাবিতে ভাবিতে, তাহার কর্মের সার্থকতা যেখানে, সেই রাজ্যে গিয়া পৌঁছায়। যে সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সেও একেবারে অসার না হইলে, মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশীরবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব মুহূর্তগুলি জীবনের অনন্তমুহূর্ত। এই মুহূর্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি। কৃষকের জীবন লইয়া সেই কবিতা লিখিতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে। কেমন করিয়া কৃষক প্রাতে উঠিয়া পাল্লা ভাত খাইয়া লাঙ্গল লইয়া মাঠে যায়। কেমন করিয়া সে চাষ করে, সে চাষ করিতে করিতে কি গান গায়, সে বাড়ী ফিরিয়া কেমন করিয়া বিশ্রাম করে, কি খায়, কি পরে—এই সব খুব জাঁকাল রকমের ভাষায় বর্ণনা করিলেও কবিতা হয় না। কেবল একখানি সুন্দর আলোক-চিত্র হয়।

আজকালকার দিনের অনেক কৃষক-বিষয়ক কবিতা এই প্রকারের। এই সব কবিতায় প্রত্যক্ষ-বাস্তবতা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বস্তু-তত্ত্বতা নাই;—যাহা লইয়া কৃষকের জীবনের সার্থকতা, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। কৃষক বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাহার দৈনন্দিন বাহিরের জীবনের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির অনুভূতি যার নাই, সে কখনই কৃষকের জীবনকে আপনার করিয়া লইতে পারে না। সে যাহা বুঝে ও যাহা ধরে, তাহা বাহিরের খোসামাত্র। সেই খোসা লইয়া যাহা লেখা যায় তাহা কবিতা নয়। যে কবি সেই জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পাইয়া, সেই জীবনের ভিতর ও বাহির দুই দিকেই সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ কৃষকের কবিতা লিখিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বার্নসের Ploughmanএর কথা বলা যায়। আধুনিক বাঙ্গলা কবিতায় কালিদাস বাবুর “পর্ণপুটে” কৃষকের ব্যথা নামক একটা কবিতা যথার্থ কৃষকের কবিতা—

ক্ষেতের কাজ করিতে গিয়ে উদাস হয়ে যাই
কাজেতে আর নাইক মন, আরামে স্থখ নাই।
তোমার সেই কাজল চোখ মনে যে উঠে ঝলি,
ধানের চারা উপড়ে ফেলি আগাছা কাঁটা বলি’।

* * * *

শান্তিপুরে’, তোমার ডুরে’, এবুকে চাপি ধরি,
চোখের জলে বন্ধ ভাসে মেজেতে রহি পড়ি।

কৃষকের কবিতার বিষয় যাহা বলিলাম, সব কবিতার বিষয়েই তাহা খাটে। শুধু নায়ক নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সক-

লেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে বাস্তু হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্তমুহূর্ত বলিলাম, সেই অনন্তমুহূর্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখনই কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করার অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপূর্ব, গভীর, অনন্ত! দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি, অপূর্ব, অনন্ত! বুঝিলাম, যাহা আত্মা তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই সান্ত্ব, যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলনমন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই—যাহা আছে তাহাই জীবনের স্বরূপ! এই জীবন লইয়াই কবিতা! যে শুধু ছোবড়া খায় সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবড়া না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত-লোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহ নির্মাণ করা যায়

না, সেইরূপ এই কল্লিত-লোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।
এই কল্লিত-লোকের কোন সত্য নাই। এ মিলনমন্দির সত্য। সত্যকে
ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।

আমি দু'একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার কথাটি বুঝাইতে
চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আশ্রয়
করিতেছেন—

“অস্তুর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি”—

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই
মহামিলনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

“কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি !
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়ে যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি !”

আজকাল এরূপ কবিতা শুনিতে পাই না ! আর কি শুনিতে
পাইব না ?

রাধিকার পূর্বরাগের কথা মনে করুন !

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম ?

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,

আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতক মধু,

শ্যাম নামে আছে গো,

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম,

অবশ করিল গো,

কেমনে পাইব সই তারে।

এও সেই মহামিলনমন্দিরের গীতধ্বনি ! যাঁহারা শুধু বাহিরের দিক্‌টা
দেখেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, “পূর্বরাগে আবার মিলন আসিল

কোথা হইতে ?” আমি যে মহামিলনের কথা বলিতেছি তাহাই যে জীবনের স্বরূপ,—পূর্বরাগ, মিলন, সন্তোগ, বিরহ ইত্যাদি সেই স্বরূপেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং পূর্বরাগের গীতই হউক, কি মিলন অথবা বিরহের গীতই হউক, জীবনের সকল গীতই সেই মহামিলনমন্দিরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। যিনি যথার্থ কবি, তিনি সেই মন্দিরে পৌঁছিয়া তাহারি গান বুকে করিয়া বহন করিয়া আনেন। তাই আজ এত বৎসর পরেও এই কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ !

চণ্ডীদাস যে সাধক ছিলেন। তিনি যে নামের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নায়ক-নায়িকার নাম লইয়া লিখিত দুইটি কবিতা আমার মনে পড়িতেছে। একটি এই—

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার—

শুনেছি শুনেছি তাহা
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা !
নলিনী নলিনী বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী নলিনী নলিনী নাম।
বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে
স্বজনেরা তায়, নলিনী নলিনী
নলিনী বলে গো তাকে !
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম !

আর একটি এই,—

ভালবেসে সখি ! নিভুতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ে তোমার
মনের মন্দিরে ।

আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি ভালটি শিখিয়ে তোমার
চরণ-মঞ্জীরে !

বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসের কবিতা যে রাজ্যের, এ দুটি কবিতা সে
রাজ্যেরই নয়—সে মহামিলনমন্দিরের অনেক দূরে ।

প্রেমে ডগমগ-হৃদি রাধিকা নিজের অবস্থা নিজেই বুঝিতে
পারিতেছে না । সে ভাবিতেছে তাহার কি হইল । সে যেন
সংসারে থাকিয়াও সংসারে নাই । সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে
না, অথচ প্রেমের যে প্রভাব তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি-
তেছে,—

সই ! পিরীতি আখর তিন ।

জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাত দিন ॥

পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত ।

রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত ।

পিরীতি মস্তুর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল ।

বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু
নিছি দিগু জাতিকুল ।

সে রূপ সাযরে, নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া ।

সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি না দিয়া ।

থাইতে থেয়েছি, শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে ।

চণ্ডীদাস কহে ইন্দ্রিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে ।

রাধিকার হৃদয়দর্শী চণ্ডীদাস, রাধিকার হৃদয়ের কথা সকলই জানেন । সংসারে থাকিয়াও যে সে সংসারের বহুদূরে তাহা তিনি জানেন । তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ আছিয়ে ঘরে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিত পাইলে অনল দিয়ে দুয়ারে” । আর একটি কবিতাতে কবি বলিতেছেন, “তোমার এ রকম ত হবেই । তুমি যে

পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস ।”

তারপর মিলনের ও সন্তোগের কথা । মিলনের মাঝে রাধিকা বলিতেছে—

কভু না জানিষু, কভু না শুনিষু
শ্যাম কাল কি গোরা !

এ ত শুধু বাহিরের সঙ্গীত নহে, এ যে অন্তর্দৃষ্টি পরিপূর্ণ ! শ্যামের প্রেমে গদগদ-প্রাণ রাধিকা এ কোন শ্যামের অনুসন্ধান করিতেছে ? চণ্ডীদাস জানে ; রাধিকা না জানিলেও তাহার হৃদয় জানে । তাই সে মিলনের মধ্যেও গাহিয়া উঠিল

কভু না জানিষু, কভু না শুনিষু
শ্যাম কাল কি গোরা !

প্রত্যেক মিলনের মধ্যেই একটা বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকে । এ গান তাহারি প্রথম সূত্র । এই বিরহ তারপর সন্তোগে আরও সুন্দর ভাবে, গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

এমন পিরাতি কভু দেখি নাই শুনি ।
 পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি ॥
 দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।
 আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

ইহার পরের অবস্থাই বিদ্যাপতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
 নয়ন না তিরোপিত ভেল
 সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুননু
 শ্রুতিপথে পরশ না গেল ।
 কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
 না বুঝিনু কৈছন কেলি ।
 লাথ লাথ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
 তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ।

কেমন করিয়া নয়ন তিরোপিত হইবে, নয়ন যে অতৃপ্য ! কেমন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, প্রাণ যে জুড়াইবার নয় ! আমরা যে ইন্দ্রিয় দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চাই । তাই প্রত্যেক মিলনের মধ্যে মহা-মিলনের অনুসন্ধান করি, তাই সন্তোগেও এক মহাবিরহের ছায়া পড়ে, তাই সন্তোগ-মিলনের মধ্যেও নায়িকা গাহিয়া উঠিল—

লাথ লাথ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
 তবু হিয়া জুড়ন না গেলি !

এই কবিতা গুলি Realisticও নয় Idealisticও নয় ; আমি যে মহামিলনমন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহারি ধ্বনি । এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি পাওয়া যায় । তাই আমরা এ কবিতাগুলিকে কিছুতেই ভুলিতে পারি না ।

ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব । ইহাই বাঙ্গালীর কবিতার প্রাণ ।

বঙ্গসাহিত্যে—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্য্যন্ত—
এই কবিতার একটা অক্ষুণ্ণ ধারা দেখিতে পাওয়া যায় !

সে ধারা কোথায় লুকাইয়া গেল ? আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না কেন ? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙ্গলা কবিতার যে প্রাণ তাহাই হারাইয়া ফেলিব ? আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের একথা ভাল লাগিতেছে না । তাঁহারা হয় ত বলিবেন, কবিতা কি চিরকাল এক রকমেরই থাকিবে ? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের পরিসর বাড়িয়া চলিয়াছে । সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গম্ভীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমন করিয়া চলিবে ? কিন্তু আমি ত কোনও গম্ভীর কথা বলি নাই, আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্য-লোকের কথা বলিয়াছি । এই কাব্য-লোকের কোন সীমা নাই । এ রাজ্য অসীম, অনন্ত । জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । ইব্‌সেন্‌ হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে । নানা ফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটর্‌লিক্‌সের পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে । আমরা সে বিষয়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি । কিন্তু কবি যদি সেই কাব্য-লোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা । একদিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিস নহে । বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলনমন্দিরের সাধক হওয়া চাই । সে অন্তঃ-প্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক । সে মন্দিরে যে সঙ্গীত-স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই ! নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া, কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না ।

বান্ধলা কবিতায় সেই সরল সত্য প্রাণ আমরা হারাইতে বসি-
য়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা ও ধরণ ক্রমশঃ কিস্তৃত-
কিমাকার হইয়া আসিতেছে। আজকালকার দিনে

এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নি

কি দিলে হইবে ভাল—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক
হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছানিয়া বুনিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া
বলিতে হয়। তা' না হইলে নাকি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা
সবাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি। একটি
ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে
বসি এবং সেই রঙ্গিন জিনিসটাকে লইয়া, বল খেলার মত তাহাকে
আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন
ভাবই সহজে, সরল ভাবে, পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন
তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা
করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর
কবির ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

কিন্তু ইহা ত বান্ধলা কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের
অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বান্ধলা
কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বান্ধলা কবি-
তাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি।

সেই সোজা সরল ধরণের দুই একটি কবিতা মনে পড়িতেছে।
চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা
ঐ ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিতায় অনু-
প্রাসের বাহুল্য থাকিলেও তাঁহার ভাষা ও ধরণ অনেকটা সেই প্রকার
সহজ, সরল, প্রাণময়—

কি হেরিব শ্যামরূপ নিরূপম

নয়ন ত মম মনোমত নয়।

যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন

হতেছিল সন্মিলন ;

নয়ন পলক দিলে, সেই সুখের সময় !

ইহাতে খেলিবার চেষ্টা নাই,—ইহার গতি সরল ! আবার দেখুন,—

মন যে আমার পড়েছে সেই উভয় সঙ্কটে ।

এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব,

আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে র'ব ।

এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখি,

আর এক নয়ন বলে, আমি মুদিত হয়ে থাকি ।

এক করে সাধ করে, ধরে কৃষ্ণ করে,

আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে ।

এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়

আর এক পদে, পদে পদে বারণ করে তায় ।

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অজ্ঞান । সখীরা তাহার কানে কৃষ্ণনাম

উচ্চারণ করিল । অমনি রাধিকার কৃষ্ণস্মৃতি !

বহুদিন পরে মোরে মনে করে

এসেছিল ঘরে বঁধু যে আমার ।

আমি জান্লাম জান্লাম—

বঁধুর শ্রীঅঙ্গের গন্ধে পশি নাসারন্ধ্রে

মৃতদেহে করলে জীবন সঞ্চার ।

সখি ! আমি ছিলাম অচেতনে,

ভাল, তোরা ত ছিলি চেতনে,

হায় হায় ! যতনে রতনে, পেয়ে নিকেতনে,

কেন অযতনে হারালি আবার ।

এইরূপ ভাষা এখন আর শুনিতে পাই না । নিধুবাবুর “তোমারি
তুলনা প্রাণ তুমি এ মহীমণ্ডলে”, কিম্বা বিহারীলালের—

“নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার !”

এইরূপ অনেক কবিতা বঙ্গভাষার আদরের সামগ্রী।

আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ, সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অশ্লীল প্রকারের, আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে সাদাসিধে লোকে বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মতন বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগরাগিণী-আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় ত যথাযথ কারণ আছে। যাহারা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপণ্ডিত তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে ত মন মানে না। প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব-জুড়ান সুধাস্রোত। মন যে চায় সেই বাঙ্গালীর কবিতা। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জীবিত করিতেই হইবে। কবিতা লইয়া আর খেলাধুলা ভাল লাগে না। সংসারের খেলাঘরে খেলিতে গেলিতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষাৎ পায় তাহারা বাস্তবিকই ধম্ম। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু লইয়া খেলা করিতে বসে তাহাদের মত দুর্ভাগ্য আর কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারাণ ধারাকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মত বালুকারাশির মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব সাহিত্য-সেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বড় বড় লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয় ত ভাল করিয়া জানি না। হয় ত আমার বুঝবার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারি গৌরবে আপনাকে

গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই, সত্য। কিন্তু আমি ত সাধক নই, সাহিত্যমন্দিরপ্রাঙ্গণে সামান্য কিস্কর মাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাহাদের আছে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!

আজ পরিণত বয়সে ওপারের কথাই বেশী মনে হয়। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতামন্দিরে আমি যাহাকে বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষুে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের শ্রায় সেই মহামিলনমন্দিরের ধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সকল সাহিত্য সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জগু অপেক্ষা করিয়া আছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

৩

আধুনিক ইউরোপীয় সাধনার প্রেরণায়, জগতের প্রত্যক্ষ রূপরসাদির অনুসরণ করিতে যাইয়া, অভিনব ভাবাস্কুরণের সঙ্গে সঙ্গে, গুরুর কৃপায়, অন্তরে যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াছি, তিনি পুরাতন পৌরাণিক কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তব্দের শ্রীকৃষ্ণ; একথা সত্য হইলেও, ঐ পৌরাণিক কল্পনাকে ছাড়িয়া কোন দিন যে এই কৃষ্ণতব্দের কোনই সন্ধান পাইতাম না, একথাও অসত্য নহে। কৃষ্ণতত্ত্ব কাহাকে বলে, ইহা যখন জানিতাম না, এমন কি কোনও প্রকারের তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় যখন হয় নাই, তখনও ঐ পৌরাণিকী কৃষ্ণকাহিনী শুনিয়াছিলাম। আর সেই পুরাণ-কথা আগে শুনিয়াছিলাম বলিয়াই, এই কৃষ্ণবস্তু যে তত্ত্ববস্তু, কেবলমাত্র কবিকল্পনা নহে, ইহা আজ একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

কেবল আমাদের দেশেই এই অপূর্ব কৃষ্ণকথা প্রচলিত আছে। জগতের আর কোনও দেশে এইরূপ কোনও পুরাণ-কাহিনী আছে বলিয়া জানি না। পুরাতন বাইবেলের সলোমনের গীতে এরূপ একটি কাহিনীর অতি সামান্য আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহুদার ধর্মসাহিত্যে এটি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। আধুনিক খৃষ্টীয়ানেরা এই কাহিনীকে যিশুখৃষ্টের সঙ্গে খৃষ্টীয়ান সজ্জের বা চার্চের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই রূপকথা ছাড়া, সলোমনের গীতের মধ্যে আর কোনও তত্ত্বকথা বীজাকারে লুকাইয়াছিল কিনা, এখন এই প্রশ্নের মীমাংসাও সম্ভবপর নহে। আমরা জগতের যে সকল ধর্মের খবর রাখি, যে সকল ধর্মের তব্দের ও সাধনের ইতিহাস আমরা জানি, যে সকল পুরাতন সাধনার সঙ্গে আজকালকার শিক্ষিত লোকের কোনও

প্রকারের বিশেষ পরিচয় আছে, তাহাতে কোথাও আমাদের কৃষ্ণ-কথার অনুরূপ কোনও কথা পাওয়া যায় বলিয়া জানি না। আর এইরূপ কোনও পুরাণকথা অন্ত্র প্রচারিত হয় নাই বলিয়াই, আমাদের এই কৃষ্ণতত্ত্বের সংবাদও আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

আর আমাদের দেশেও তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণই আগে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, না পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীই আগে রচিত হইতে আরম্ভ করে, একথাও বলা সহজ নহে। হয় ত বা তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই আমরা যে কৃষ্ণকাহিনী এখন শুনিতে পাই, তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল। ভাগবতেই এই কৃষ্ণকাহিনীটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ভাগবত যে উপনিষদের পরে রচিত হয়, এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের মঙ্গলাচরণই তাহার অকাট্য প্রমাণ। “জন্মাচ্যুত যতঃ” ইত্যাদি শব্দেতে ভাগবত এখানে বাদরায়ণ সূত্রকে স্পষ্টতঃ নির্দেশ করিতেছেন দেখিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেই যে ভাগবতের কৃষ্ণতত্ত্ব ফুটিয়াছে, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব হয়। ফলতঃ উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলকে প্রাকৃত জনের বোধগম্য করিবার জন্যই যাবতীয় পৌরাণিকী কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, পুরাণবাদিগণও একথা অস্বীকার করেন না। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বের আশ্রয়ে কৃষ্ণকাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই মতকেও একেবারে সরাসরিভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে সম্ভবতঃ একটি প্রাকৃত কৃষ্ণকাহিনী অতি প্রাচীনকাল হইতেই, কোনও না কোনও আকারে, চলিয়া আসিয়াছিল; উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন কৃষ্ণকাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই ভাগবতাদিতে কৃষ্ণতত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই অনুমানই সমধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বই আগে প্রকাশিত হইয়াছিল আর সেই তত্ত্বকে ধরিয়াই ক্রমে পৌরাণিকী কৃষ্ণকাহিনী ফুটিয়াছে, অথবা কাহিনীটি আগেই কেবল লৌকিক প্রেমের সরল ও সরস চিত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হইলে সেই আদি কাহিনীই এই তত্ত্বের

আশ্রয়ে বর্তমান কৃষ্ণকথার আকারে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ; এই দুই অনুমানের যেটিই সত্য হউক না কেন, এখন কৃষ্ণকাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই যে ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্তরে কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে, একথা অস্বীকার করা অসাধ্য। এখন ভদ্রেতে আর কাহিনীতে এমন একটা ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞাতে এই দুইকে একান্তভাবে পৃথক করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

আর এই জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে বিশুদ্ধতম তত্ত্ববস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াও পুরাতন ও প্রচলিত কৃষ্ণকাহিনীকে বর্জন করেন নাই। বর্জন করিতে পারিতেন বলিয়াও মনে হয় না। তিনি যে কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গুরু-পরম্পরায় প্রাচীনকাল হইতে তাহা উপদিষ্ট হইলেও, অল্প লোকেই তার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিত। এই তত্ত্ব একরূপ অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু পৌরাণিকী কৃষ্ণকাহিনী সকলেরই জানা ছিল। যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা লোকে ভাগবতাদি পুরাণে পড়িত, কিম্বা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনগণের পদাবলীতে শুনিত, তাহারা তাঁহারই ভক্তনা করিত। যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতেন, তাঁহারাও এই সকল লীলা-কথার অনুশীলন করিয়াই সেই অতীন্দ্রিয় রস আশ্বাদন করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণকথা কহিতে যাইয়া তাঁহাদের পক্ষে পুরাতন পৌরাণিকী কাহিনীকে একেবারে বর্জন করাও সম্ভব ছিল না। ফলতঃ তাঁহারা নিজে-রাও যে ঐ পৌরাণিকী কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই ক্রমে কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পান নাই, এমনও বলা যায় না। রূপ আর স্বরূপে যে সম্বন্ধ, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈষ্ণব সাধনায় পৌরাণিকী কৃষ্ণকথার সঙ্গে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কতকটা সেই সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের নিগূঢ় আলাপে ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকে যে ভাবেই বুঝুক না কেন, আপন আপন প্রাণগত সাধনেতে যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্বকে ধরিয়াছিলেন, সেই

সকল সাঁচ্চা বৈষ্ণবের নিকটে পৌরাণিকী কৃষ্ণলীলা-কথা ছিল কৃষ্ণ-তত্ত্বের রূপ ; আর তাঁহাদের অপরোক্ষ অনুভূতিপ্রত্যক্ষ কৃষ্ণতত্ত্ব ছিল এই রূপেরই স্বরূপ । স্বরূপ ভুলিয়া লোকে রূপে সর্বদাই মজিয়া পড়ে । আবার কেহবা রূপকে উড়াইয়া দিয়াও অরূপ স্বরূপের খোঁজে গিয়া থাকে । কিন্তু ইহারা উভয়েই একদেশদর্শী । ইহাদের কেহই সত্যবস্তুর বা তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না । সত্যবস্তু ও তত্ত্ববস্তু কেবল রূপেতেও থাকে না, আর শুদ্ধ স্বরূপেও প্রকাশিত হয় না । রূপের ভিতর দিয়াই সর্বদা স্বরূপের প্রকাশ হয় । রূপ অনিত্য, স্বরূপ নিত্য । রূপ পরিণামী—তার উৎপত্তি, বিকাশ, বিলয়াদি আছে । স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ—তার উপচয় অপচয় নাই । কিন্তু জ্ঞানেতে অনিত্যকে ধরিয়াই নিত্যের প্রকাশ হয় । নিত্যের আশ্রয়েই অনিত্যের অনিত্যতারও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে । নিত্য আর অনিত্য ছায়াতপের মত পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আছে । নিত্যতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে এই সৃষ্টি প্রবাহের বা চঞ্চল জগতের সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে যাইয়া ব্রহ্মবিদেরা এই ছায়াতপের সঙ্গেই ইহাদের তুলনা করিয়াছেন,—“ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি ।” পৌরাণিকী কৃষ্ণকথা কৃষ্ণতত্ত্বের রূপ বলিয়াই, এই কাহিনীকে ছাড়িয়া অন্ততঃ এখন আমাদের পক্ষে ঐ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া একেবারেই অসম্ভব । এই কাহিনীকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের প্রাণে ঐ তত্ত্বের স্ফুরণ হইয়া থাকে । আর এই স্ফুরণমাত্রই এই কাহিনীর প্রকৃত মর্ম্মও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় ।

আর গতানুগতিক বৈষ্ণবমণ্ডলী স্বরূপ ভুলিয়া কেবল কল্পিত রূপেতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই এতটা করিয়া রূপ যে স্বরূপ নহে, এই কথাটা বলিতে হয় । কৃষ্ণতত্ত্বকে ভুলিয়া তাঁহারা কাল্পনিক কৃষ্ণলীলাতে ডুবিয়া আছেন বলিয়াই, পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্যটা এমন জোর করিয়া বলা প্রয়োজন । তত্ত্ববস্তু যে কৃষ্ণবস্তু, তাঁহারই নিত্যলীলাকে পুরাণের কৃষ্ণলীলায়

কবি-কল্পনাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই রূপককল্পনাও “সাধকানাং হিতার্থায়”ই হইয়াছে। সাধনের সৌকর্য্যসম্পাদনই ইহার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কল্পনা হইলেও ইহা নিতান্ত অবস্থ্য নহে। এ কল্পনা সত্যোপেত এবং বস্তুতন্ত্র। পুরাণে, বিশেষতঃ ভাগবতে, যে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে, তাহাতে নিত্যবস্তুকেই ফুটাইতে চাহিয়াছে। নিত্যলীলা দেশকালের অতীত। এই পৌরাণিক কল্পনা সেই লীলাকেই দেশকালের ভিতরে ভাবিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই লীলার দেশকালগত সম্বন্ধসকল কল্পিত হইলেও, যে রস ইহাতে ফুটিয়াছে তাহা সত্য, কল্পিত নহে। আর এই পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার রসটুকু সত্য, সার্বভৌমিক ও সনাতন বলিয়াই, আমরা এই পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর দিয়াই শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার সন্ধান পাইয়া থাকি। অতএব পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের যে একটা নিগূঢ়, ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই কথাটাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

আর আমি যে তত্ত্বকথা বলিতে চাহিতেছি, পুরাণের কৃষ্ণকথার সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব বলি। অন্য কোনও নামে এই বস্তু যথাযথভাবে ব্যক্ত হইতে পারিত না। এই তত্ত্বকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে পারিতাম না। কারণ ব্রহ্ম শব্দের একটা প্রাচীন ও প্রচলিত অর্থ আছে। সেই অর্থের সঙ্গে এই তত্ত্বের কোনও বিরোধ না থাকিলেও, তাহার দ্বারা ইহাকে পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না। ব্রহ্ম শব্দের একটা নূতন অর্থ করিতে পারা যায় বটে। কিন্তু সে অর্থ আপাততঃ লোকে বুঝিবে না। প্রত্যেক শব্দের পশ্চাতে এক একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়িয়া আছে। সেই ইতিহাস-ধারাকে বদলাইতে বিস্তর সময়ের আবশ্যক হয়। দু’এক পুরুষে এটি হইবার নয়। এই চেষ্টা করিলে শব্দের প্রাচীন ইতিহাসের ভূত আসিয়া সর্বদাই তার নূতন ঘরে উৎপাত আরম্ভ করে। নূতন ভাবকে বা অর্থকে ঠেলিয়া ফেলিয়া এই প্রবল ভূতটা সেই পুরাতন

ভাব ও অর্থকেই বারম্বার জাগাইয়া তুলে। ব্রহ্ম শব্দ মুখ্যভাবে উপনিষদেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে তার একটা বিশিষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মের কতকগুলি গুণ বা লক্ষণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই নির্ণীত হইয়া আছে। ব্রহ্ম বলিলেই এখন সেই সকল গুণ বা লক্ষণ আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ এদেশের লোকে ব্রহ্মতত্ত্ব নিগুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার তত্ত্বই বুঝিয়া থাকে। সগুণ ব্রহ্মের কথাও আছে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে এই সগুণ ব্রহ্ম বলিতে সাকার ব্রহ্মই বোঝে। বৈষ্ণবেরা নারায়ণকে সগুণ ব্রহ্ম বলেন। বৈদান্তিকেরা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝেন। এই ঈশ্বর পরব্রহ্ম নহেন। তিনি অপরব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, মায়াবিষ্ঠিত ব্রহ্মচৈতন্য। এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে অনেক কথা উঠে। সূত্রাং শব্দের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি যে বস্তুকে কৃষ্ণ-তত্ত্ব বলিয়া জানিয়াছি, তাহাকে ঠিক ব্রহ্মতত্ত্ব বলা যায় না। এই জগুই ব্রহ্মতত্ত্ব কথাটা ব্যবহার করি নাই। ব্রহ্ম শব্দের প্রাচীন ইতিহাসের কিম্বা আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে, এই ব্রহ্ম-সাধনের মধ্যে এ বস্তুর সন্ধান পাই নাই। এই পথ অতিক্রম করিয়া তবে এই তত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি। তাই এ তত্ত্বকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে পারি না।

অন্যপক্ষে, পৌরাণিকী কৃষ্ণকথার ভিতর দিয়াই এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়া থাকি। ব্রহ্ম শব্দের পশ্চাতে যেমন একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, কৃষ্ণকথার পশ্চাতেও সেইরূপ একটা ইতিহাস আছে। ব্রহ্মজ্ঞানের একটা ধারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। আর কৃষ্ণ-ভজনার একটা ধারাও সেইরূপ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা কৈবল্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। মোক্ষই এ ধারার নিয়তি। কৃষ্ণ-ভজনার ধারা মুক্তি লক্ষ্য করিয়া চলে নাই। নিত্যকাল কেমন করিয়া ভগবানের সেবা করিতে পারিবে, ভক্তেরা

এখানে চিরদিন তাহাই খুঁজিয়াছেন। নির্বাক মুক্তি নহে, নিত্য-ভক্তিই এই ভজনার লক্ষ্য হইয়া আছে। ব্রহ্মের অন্তরালে জ্ঞান-মার্গের ইতিহাসটি লুকাইয়া আছে। কৃষ্ণের অন্তরালে এই অহে-তুকী নিত্য-ভক্তির সমগ্র ইতিহাসটি লুকাইয়া আছে। ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে ঐ জ্ঞানমার্গকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া থাকে। কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে এই ভক্তিপন্থাটিকে বিশেষভাবে দেখাইয়া দেয়। ব্রহ্মজ্ঞানেতেও ভক্তি মিশিয়াছে। জ্ঞানপথেও ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান বলিয়াছেন। আবার ভক্তিপথেও জ্ঞানের মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি ব্রহ্ম বলিলে জ্ঞানের ভাবই বেশি জাগিয়া উঠে, আর কৃষ্ণ বলিলে ভক্তির ভাবই বেশি উদ্দীপিত হয়। ব্রহ্মতে আর কৃষ্ণতে প্রাচীন সাধনার ইতিহাসের দিক্ দিয়া এই পার্থক্য চিরদিনই রহিয়াছে। আর এই পার্থক্যটুকু আছে বলিয়াই, আমি যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি,—এখানে যাহার কথা কহিতেছি,—তাহা পৌরাণিকী কিস্বদন্তীর কল্পিত কৃষ্ণকথা হইতে যতই পৃথক হউক না কেন, তাহাকে কোনও মতেই কৃষ্ণতত্ত্ব না বলিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বলা সঙ্গত হইবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শান্তি-স্বপ্ন

মন্দিরে, মঠে, তব পূজা হেরি, সে পূজা তোমার নয়—
আরতি, অর্ঘ্য, শঙ্খ, ঘণ্টা, দীপ, ধূপে অভিনয় !

আড়ম্বরের মত্ততামাঝে দেখিনাক অনুরক্তি,

তন্ত্র, মন্ত্র অর্থবিহীন, যদি নাহি থাকে ভক্তি !

তুমি চাহ, মাগো, হৃদয়ের পূজা, তুমি চাহ, মাগো, প্রীতি,—
বধির বিশ্বে কে শুনিবে আজ তব আহবানগীতি !

ক্ষমতা দর্প প্রবল বেগেতে খুঁজিছে নিজের পথ,

কুটিল স্বার্থ, বিরামবিহীন, স্বেচ্ছাতে চালায় রথ—

দুর্বল যারা, অসহায় যারা, বুক ভেঙে দিয়ে যায়,

তোমার জগতে কতলোক কাঁদে, ফিরে পথে নিরুপায় !

মন্দিরে, মঠে, গির্জায় তবু উঠে তব জয়-গান,

সেকি পূজা তব!—সে যে পরিহাস—দেবতার অপমান !

স্তব্ব দাঁড়ায়ে মুক্ হিমাচল, আকাশ দেখিছে চাহি,

চরণে পড়িয়া রয়েছে বসুধা, জলধি উঠিছে গাহি !

কূজনে, গন্ধে, গুঞ্জনে, গানে, প্রকৃতির অধিকার,

জ্ঞানের গরিমা, মানের মহিমা, নাহি কোনো অবিচার!—

প্রকৃতির মহা পূজার দালানে বিরোধ ঠাই না পায় ।

বিচিত্র সুরে এক মহাগান উঠে মহা-মহিমায় !

বিরোধ ঘুচায়ে দাঁড়াবে মানব হাতধরে' পাশাপাশি,

তব মুখপানে চাহিয়া বলিবে “মা, তোমারে ভালবাসি !”

তখন ভূতলে নামিবে স্বর্গ—কে খুঁজিবে অধিকার ?

বিশ্ব-মানব মহাপ্রেমে হবে এক মহা-পরিবার !

সে দিন জগতে আসিবে শান্তি, পুণ্যপ্রভাতোদয়—

মানবজীবনে হইবে পূর্ণ তব ইচ্ছার জয় !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ

ভল্লুকের বুদ্ধি

স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের শিকার কাহিনী এদেশের অনেকেই পড়িয়াছেন। মহারাজের অকাল-প্রয়াণে তাঁর শিকার-কথা সকলগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সে কথা “নারায়ণে” শোভাও পাইবে না। কিন্তু মহারাজা বাহাদুর শিকারের কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে বশ্য জীবজন্তুদের আশ্চর্য্য বুদ্ধির কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সময় সময় আমাদের বুদ্ধির অহঙ্কার খাট হইয়া গিয়াছে। সে সকল কথা মনে হইলে, নারায়ণ যে কেবল নরেরই সাক্ষী-চৈতন্য নহেন, কিন্তু সকল জীবেরই অন্তর্যামী, ইহার অনুভব অন্তরে জাগিয়া উঠে। তারই একটি কাহিনী আজ তাঁহার নিজের ভাষায় বলিব। মহারাজ বাহাদুর সেবারে মধুপুরের শিকার-কথা বলিতেছিলেন।

এখন আমি খুব পাকা শিকারী, খুব ওস্তাদ; এখন আর আমার লক্ষ্য একেবারেই ব্যর্থ হয় না। শিকারের স্পৃহাও বাড়িয়াছে। সাহসও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শূন্যে আকাশে পাখী উড়িয়া যায়,— আমার লক্ষ্য—“পপাত ধরণীতলে”। পুকুরে লেজ তুলিয়া বড় বড় চিতল মাছ পালট খেলে, আমার লক্ষ্য তাহার লীলা-খেলা সম্বরণ হইয়া যায়। শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, নদীতে ভোঁস্ করিয়া যে শুশুক ভাসে, আমার অব্যর্থ লক্ষ্য তাহারও তিনটি ঝাঁক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। ইহাতেই আপনারা অবশ্যই বলিবেন, আমি এখন পাকা শিকারী। শিকারে আমার হাত বসিয়াছে।

এবার একটু জমকাল রকমের পার্টি সংগঠন করা হইল। সঙ্গে আটটি হাতী, লোকজন বিস্তর; তাঁবু, রসদ ইত্যাদিও অবস্থা এবং সময় উপযোগী। শিকারী আমরা চারিজন মাত্র। সঙ্গে দুইটি ইংরাজ

বন্ধু, আর বাবু এবং খোদ স্বশরীরে বিদ্যমান আমি ; শিকার-নির্দেশের জন্য পাকা শিকারী খুজি মিঞাও এবার আমাদের সঙ্গে আছেন ।

যেখানে আমাদের শিবির সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সে স্থানটী অতি মনোরম । চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল-ভূমি । শিবিরের সম্মুখ দিয়া কুলুকুলু নাদে একটি ঝরণা প্রবাহিত । অদূরে গভীর বনরাজী, বিজনতার প্রবীণ ছবি, বিদ্যমান । দিবা অবসান প্রায়, আমরা শিবির-সম্মুখে আরাম কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া, নানাবিধ গড্ড-লিকা-শ্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি ; এমন সময় খুজি মিঞা লম্বাহাতে কুর্নিস্ করিয়া জানাইল,—আজ মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ন, চিড়িয়া শিকারের একটা উৎকৃষ্ট দিন, শিকারও যথেষ্ট মিলিবে । সঙ্গে হলো নামে একটি সাহেব ছিলেন । তিনি তখনই সাগ্রহে গাত্রোথান করিলেন এবং চারককে বুট পরাইতে আদেশ করিলেন । দশ মিনিটের ভিতরে আমরা দুইজনে প্রস্তুত হইয়া পাওদলে চিড়িয়া শিকারে বাহির হইলাম । সঙ্গে অপর লোকজন কেহ নাই—মাত্র একটি শিকার-বয় তল্লি তল্লা লইয়া পশ্চাৎ অনুসরণ করিল । ঝরণা ধরিয়া কূলে কূলে খুজি মিঞার নির্দেশ মতই আমরা সেই বিরাট বনভূমির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । বিস্তর শিকার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল । সাহেব একটি বৃহৎ বন্য কুকুট এবং তিন চারিটি তিতোর মারিলেন । আমি বন্দুক স্পর্শও করিলাম না । প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে তন্ময়-হৃদয়ে বনানীর গভীরপ্রদেশে অগ্রসর হইতে লাগিলাম,—দেখিলাম, কত বন্য লতিকা কুসুম-সস্তারে সজ্জিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ-কাণ্ড জড়াইয়া শাখা হইতে শাখাস্তর বাহিয়া সোহাগে হেলিয়া ঢুলিয়া বাতাসে নৃত্য করিতেছে ! কত মধুপ-কুল সেই কুসুম গন্ধে আকুল হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মধুর ঝঙ্কারে বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিতেছে । দেখিতে দেখিতে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ।

অদূরে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া মেঘগর্জন হইল। আমরাও অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সন্ধ্যারও বড় বেশী বিলম্ব নাই। দ্রুতপদে তাঁবুর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। অগ্রসর হইতেছি ; ক্রমে অগ্রসর হইতেছি ; ক্রমে অগ্রসর ;—পশ্চাৎ হইতে শিকার-বালক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, “হজুর ! ভাল্লুক ! ভাল্লুক !” পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, বিশ পঁচিশ হাত দূর হইতে এক ভীমকায় ভাল্লুক আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভীষণনাদে বনভূমি আলোড়িত করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। শিকার-বালক আমার বন্দুকটি একটি গাছের নীচে ফেলিয়া এক লক্ষ্মে গাছের উচ্চ ডালে চড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “হজুর, এ গাছ ভাল, এই গাছে।” চাহিয়া দেখিলাম, গাছ ভাল বটে ; কিন্তু আমাদের চড়িবার শক্তি নাই, সময়ও নাই ; ভাল্লুক একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ভয়ানক বিপদ ! চিন্তার সময় নাই, একটানে উদ্ভূত রুধির মাথায় উঠিয়া গেল। অস্থির, উদ্ভ্রান্ত, কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বন্দুকটি তুলিয়া হাতে লইলাম, সাহেবের মুখের দিকে চাহিলাম,—মুখ রক্তবর্ণ, দৃষ্টি অপলক, স্থির হইয়াই আমার পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন, এক পাও নড়িতেছেন না, ঠিক যেন চিত্রাঙ্গিত মূর্তি। চড়িয়া শিকারে বাহির হইয়াছি, বাঘ ভাল্লুক মারিবার সরঞ্জাম সঙ্গে নাই, মাত্র ছড়রার কাটীজ—আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল তাও আবার শিকার-বয়ের স্ফক্ষে ব্যাগের ভিতর, সেই গাছের উপরে। এমত অবস্থায় সাহেব ঘুরিয়া আমায় বলিলেন, “All right, there you are Maharaja”. চাহিয়া দেখিলাম ঝরণার পাড়ে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, ঠিক তাহার এক রশী পশ্চাতে প্রাচীন অশ্বখমূলারত একটি ভগ্ন মসজিদ। এক নিশ্বাসে উভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; তাহার কোন দরজা কি কবাট কিছুই নাই, মাত্র প্রবেশের একটি ক্ষুদ্র দ্বার। দেখিলাম, তাহার এক কোণে কিছু শুষ্ক খড় পড়িয়া

আছে। ভল্লুক একেবারে আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, মস্জিদের তিন চার হাত অন্তর মাত্র। আমি বন্দুকের নল কয়েকগাছা খড় তুলিয়া দুয়ারের সামনে স্থাপন করিলাম, সাহেব পকেট হইতে দিয়াশলাই-বাঈ বাহির করিয়া খড় ধরাইয়া দিলেন। আর প্রবেশের পথ নাই; চারিদিকে থিলানে আবদ্ধ, দুয়ারে আগুন; আমরা নিরাপদ। ভল্লুক কিছুকাল শুক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং কট মট নেত্রে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।

কে বলে পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী একেবারে জ্ঞানবিবর্জিত, অনুধাবনামূল্য? সূক্ষ্মভাবে পশু-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, অনেক সময় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হইবে এবং বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টিরহস্যের গূঢ়ত্ব পর্যালোচনা করিয়া স্তম্ভিত হইতে হইবে। কুকুর, ঘোড়া এবং হাতী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় আমরা অনেকেই পাঠ করিয়াছি। আমি জীবনের অধিকাংশ সময়ই জঙ্গলে জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাতে হিংস্র জন্তুর বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সব কাহিনী শুনিয়া আপনারা একান্ত আশ্চর্য্যাব্বিত হইবেন। আজ এই ভল্লুকের আচরণে তাহার সামান্য আভাস মাত্র পাইয়াছিলাম।

মস্জিদের ভিতর হইতে আমরা উভয়েই স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ভল্লুকটী আস্তে আস্তে বরণার পারে গিয়া সচকিতে ক্ষণেকের তরে চারিদিকে দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিয়া এক লক্ষ্যে বরণার জলে নিমজ্জিত হইল। দেখিতে না দেখিতে ভল্লুক সিন্ধুদেহে সেই মস্জিদের দ্বারে, যেখানে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল, ঠিক মানুষের মত দুই পায়ে দাঁড়াইয়া তাহার শরীর ঝাড়িয়া জল ছিটকাইয়া আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিল। ভয় ভাঙ্গিয়া আমাদের বিষয় উপস্থিত হইল। এদিকে সাহেব বন্দুকের নল দিয়া অগ্নিতে খড় সংযোগ করিতে লাগিলেন।

দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ভল্লুক আবার লাফাইয়া ঝরণার জলে পড়িল। বিপদ কখন একা আসে না, তারও একটা সাথী চাই, এ কথা সত্য বটে। সাহেব তৃণগুচ্ছে পুনরায় যেমনি বন্ধুকের নল প্রবেশ করাইলেন, অমনি ফৌস করিয়া এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ তৃণ হইতে লক্ষ্য দিয়া বাহির হইয়া কণা বিস্তার পূর্বক আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। আমরা অনুপায়,—বাহিরে ভল্লুক, দুয়ারে আগুন, ভিতরে সাপ! আমাদের অবস্থা যে তখন কি, তাহা কহিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই।

বিপদে যেমন ঐশী শক্তির অনুভূতি, সম্পদে সেরূপ হইলে এ সংসারই স্বর্গ হয়। অনন্যোপায় হইয়া উর্দ্ধনেত্রে বিপদবারণকে স্মরণ করিলাম। সর্প অবনত মস্তকে একটি গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, সাহেব বন্ধুক লইয়া সর্পের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমি দ্বিপ্রকারে সাহেবকে বাধা দিয়া বলিলাম,—“সর্প যখন আমাদের বিপদ বুঝিয়া পথ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে, তখন আর উহার উপর জুলুম করিবার প্রয়োজন নাই।” সাহেব আমার মুখের দিকে চাহিয়া “Quite right” বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম ধীরে ধীরে সর্পটি সশরীরে নির্বিবাদে গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল।

জিঘাংসা লইয়া শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাই বলিয়া যে, সকল অবস্থায় সকল সময় হিংস্রপ্রাণী দেখিবামাত্রই তাহাকে বধ করিব, কিম্বা বধ করিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইব, সে উপাদানে গঠিত করিয়া ভগবান নিশ্চয়ই আমাকে এ সংসারে প্রেরণ করেন নাই। দীন দরিদ্রের সম্ভান আমি,—এক মুষ্টি অন্নের কান্দাল ছিলাম; এ রাজ-ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের ভিতর বিধাতা আমায় টানিয়া লইলেন কেন? অবশ্যই তাঁহার কোন নিগূঢ়-রহস্য সৃষ্টি-রহস্যের গুপ্ত-আবরণে লুক্কায়িত আছে। মানুষ আমরা দেখিয়া শুনিয়া সব বুঝি,—বুঝিয়া আত্ম-গোপন করি, তাই দেবত্বে উন্নীত হইতে অসমর্থ।

আবার ভল্লুক আর্দ্র-দেহে প্রজ্জ্বলিত আগুনের নিকটে আসিয়া,

দুই পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া জল ছিটাইয়া আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল ; এ দিকে সঞ্চিত তৃণগুচ্ছও নিঃশেষিত-প্রায় । সাহেব বন্দুকের নলে করিয়া আবার কিছু তৃণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন ; অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাতে আর একবার মাত্র চলিবে, ইহার পরেই চক্ষুস্থির !

ইঠাৎ পকেটে হাত পড়িল, পাইপের সঙ্গে খট্ করিয়া কি বাজিয়া উঠিল, হাতে লইয়া দেখিলাম—চিড়িয়া শিকারের উপযুক্ত একটি কাটীজমাত্র । ভারবাহী তরণীর বিপন্ন নাবিক অনুকূল বাতাস পাইলে, অথবা বস্ত্রহীন শীতজর্জরিত অশীতিপর বৃদ্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উন্মুক্ত মাঠের ভিতর একখানা কম্বল পাইলে যেমন প্রাণটা হাতে পায়, আমার অবস্থাও তখন ঠিক তাই হইল,—প্রাণে একটা বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইল । সাহেবকে আবার আগুনে অবশিষ্ট তৃণ-সংযোগ করিতে উপদেশ দিয়া, বন্দুকে কাটীজ সংযোগ করিলাম । ভল্লুক দুই পায়ে ভর করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল । আগুনও নিবিয়া আসিতেছে । তখন ‘যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী’ বলিয়া ঠিক ভল্লুকের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া গুড়ুম করিয়া আওয়াজ করিলাম । ভল্লুক এক পালট থাইয়া উর্দ্ধ্বাসে গভীর জঙ্গলের দিকে দৌড়াইয়া পলাইল । লক্ষ্য স্থির ছিল, ছড়রা নিশ্চয়ই ভল্লুকের চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছে । আমার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল ।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ।

চার্বাক-দর্শন ।

চার্বাক-দর্শন ভারতের ষড়্‌দর্শনের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, এক সময়ে যে ইহা কোনও কোনও লোকের মনে প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, ষড়্‌দর্শনের আলোচনা হইতেই, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় । যখন অপরাপর দর্শনে চার্বাকগণের মতের আলোচনা রহিয়াছে, ইহারা যখন চার্বাকমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখন এ সকল সিদ্ধান্ত যে এককালে জনগণের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, একথা বিলক্ষণ বুঝা যায় । অথচ কোথাও স্বতন্ত্রভাবে চার্বাকমতের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়না । এইজন্য সকলের পূর্বে এই চার্বাক-দর্শন কি, আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব । পরে কি ভাবে প্রাচীন দার্শনিকগণ এই চার্বাকমতের খণ্ডন করিয়াছেন, যথাসাধ্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব ।

চার্বাক-দর্শনের তাৎপর্য্য এই,—

“যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃহা ঘৃতং পিবেৎ ।

ভস্মীভূতশ্চ দেহশ্চ, পুনরাগমনং কুতঃ ?”

পুরুষ যত কাল জীবিত থাকিবে, তাহার আর কার্য্যাস্তর নাই ; কেবল সুখান্বেষী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবে । যখন সকল ব্যক্তিকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবেই এবং মরণের অব্যবহিত পরক্ষণেই পুত্রাদি বন্ধুগণ ঐ অস্পৃশ্য মৃত দেহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না, তখন যাহাতে পুত্র-কলত্রসহ সুখে জীবন যাপন হয়, সেরূপ যত্ন করাই বিধেয় । এমন কি, ঋণ করিয়াও ঘৃতদুগ্ধাদি পান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবে । দেহ ত ভস্মীভূত হইল, তাহার আবার পারলৌকিক আত্মা কোথায় ? অদৃষ্ট, অনুকল্পিত, পারলৌকিক সুখলিপ্সায় ধর্ম্মোপার্জ্জনে আত্মাকে নিরতিশয় কষ্ট দেওয়া অতি মূঢ়ের কৰ্ম্ম !

চার্বাকগণ বলেন,—

“অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যানলানিলাঃ ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে ।
কিঞ্চাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যোমদশক্তিবৎ ।
অহং স্থূলঃ কৃশোহস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ ।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাহ্মা নচাপরঃ ।
মম দেহোহয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী ॥”

ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যের সম্মিলনে এই স্থূল, চেতনময় দেহের উৎপত্তি । যদিও ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ প্রত্যেকে অচেতন, তথাপি তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে, তাহাতে চৈতন্য-গুণের আবির্ভাব হয় । যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ, চূর্ণ শুক্ল বর্ণ ; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে তাহাতে রক্তিমার জন্ম হয় ; এবং গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক না হইলেও, ঐ সকল দ্রব্যের দ্বারা যে সুরা প্রস্তুত হয়, তাহাই মত্ততার কারণ হয় ; সেইরূপ এই দেহ অচেতন পদার্থসম্ভূত হইলেও, তাহাতে চিৎশক্তির বিকাশ অসম্ভব নহে । এই স্থূলচেতনময় দেহকে যদি আত্মা বলিতে হয় এবং তাহাই তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, বাধাও নাই । আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ—ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার আত্মাকে প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু স্থূলত্ব কৃশত্বাদি ধর্ম্য সচেতন ভৌতিক দেহেই লক্ষিত হয় । অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই ।

নাস্তিক্যমতাবলম্বী চার্বাকগণ ন্যায়াদি-দর্শন-শাস্ত্র-স্বীকৃত প্রত্যক্ষাদি ছয়প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না । ইহারা মাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন । যাহা দর্শনে, স্পর্শে, শ্রাবণে, শ্রাবণে ও রাসনে অনুভূত হয়, তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য ; অনুমান প্রভৃতির দ্বারা কখনও পদার্থের অস্তিত্ব প্রমিত হইতে পারে না । যদি আত্মা

বা পরলোক বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা অনুভূত হইত। আমরা অনুভবের বশবর্তী, যেখানে অনুভব বিद्यমান তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয়, তাহাই সংস্করণে আদরণীয়। ইন্দ্রিয় যাহা অনুভব করিবে, তাহাই প্রমাণ, তদতিরিক্ত,—ইন্দ্রিয়ের অগোচর—কোন বস্তুসত্তা জগতে নাই।

আর্য্যমনীষিগণ, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়াও, বহু ধনব্যয় ও শারীরিক আয়াস স্বীকারকরতঃ বেদনির্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে অবশ্যই পরলোক থাকিবে, তাহা না হইলে, ঐসকল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ, পরলোকের প্রত্যাশায় এরূপ যত্নস্বীকার ও কায়ক্লেশভোগ করিতে প্রয়াস পান কেন? তাঁহাদের সকল চেষ্টাই কি ব্যর্থ? চার্বাকেরা বলেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তবে যে তাঁহারা ঐসকল বেদোক্ত নিষ্ফল কর্মে প্রবৃত্ত হন, তাহার কারণ এই যে, কতিপয় প্রতারক ধূর্তেরা বেদের সৃষ্টিকরতঃ তাহাতে পাপপুণ্য ও তাহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ও স্বর্গ-নরকাদি নানাপ্রকার বিস্ময়কর ও অলৌকিক পদার্থের বর্ণনা করিয়া সকলকে অন্ধ ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের প্রত্যয়ের জন্ম স্বয়ংও ঐ সকল মিথ্যাকল্পিত বেদবিধির অনুষ্ঠানকরতঃ জনসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে এবং কোটীশ্বর বদান্ত নৃপতিবর্গের প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অজস্র ধনরাশি আত্মসাৎ করতঃ স্বীয় পরিবারবর্গপোষণ ও পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছে। তাহাদের গৃহ অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া পরবর্তী প্রাকৃত জনসমাজও ঐ সকল অনুষ্ঠান করাতে বহুদিন হইতে ঐ সকল পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

বৃহস্পতির মত আশ্রয় করিয়া চার্বাকগণ কহেন,—

“অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদান্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।

বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা সুখকল্পিতা ॥”

অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডধারণ, বিভূতিভূষণ প্রভৃতি বুদ্ধিপৌরুষহীন

ভগুব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। ঐ সকল আড়ম্বরে বিষয়ী-ব্যক্তিদিগকে বশীভূত করিয়া কেবল ধনরাশি গ্রহণ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টিয়াগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরোযাগ করিলে অচিরাৎ বৃষ্টি হয়, শ্বেনযাগে অরাতিকুল নিশ্চল হয়,—এই সকল বেদবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ অনেক ব্যক্তিই ঐসকল কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না। আরও এক কথা,—এখন যাগ করিলে তাহার ফল কি বহুপরবর্তী কালে ফলিতে পারে ?

বেদে একস্থলে বিধি আছে,—“সূর্য্যোদয়ে হোম করিবে” ; অণ্ডস্থলে দৃষ্ট হয়, “সূর্য্যোদয়ে হোম করিবে না”। এইরূপ বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ অনেক স্থলেই আছে এবং উন্মত্তপ্রলাপের স্থায় বহুবার এক কথার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। যখন এই সমস্ত দোষ সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, তখন কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে ? অতএব স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা সবই মিথ্যা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় ও কৰ্ত্তব্যকৰ্ম্ম সবই নিষ্ফল, উন্নতির অন্তরায়, সুখভোগের কণ্টক। ফলতঃ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ক্রিয়াসকল অবোধ, অক্ষম ব্যক্তিগণের জীবনোপায় মাত্র।

আর ঐসকল ক্রিয়ানুষ্ঠাতা জ্যোতিষ্যোমাদি যাগে নিরীহ ছাগাদি পশুর স্বর্গার্থে, তাহাকে বলি দিয়া মুক্তিমার্গে উন্নীত করিয়া থাকে, এই বা কি রীতি ? যদি তাহা সত্যই হয়, তবে ঐ সকল ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকগণ, ঐ সকল যাগে বা মৃন্ময়ী প্রতিমার সমক্ষে স্বীয় পিতা মাতা প্রভৃতি আশু বন্ধুবর্গের স্বর্গতির জন্ম, তাহাদিগকে নিশিত খড়্গপ্রহারে ছেদন-করতঃ স্বর্গস্থলের অধিকারী না করে কেন ? তাহা হইলেই ত অনায়াসে তাহাদের স্বর্গলাভ হয়। পুনশ্চ, তাহাদের স্বর্গার্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্টভোগ এবং ধনব্যয়ও করিতে হয় না। উহা ত কেবল ভণ্ডামি করিয়া প্রতারণার দ্বারা দাতার নিকট ধন গ্রহণের পন্থা।

শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে, তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি ? বাটীতে তাহার উদ্দেশে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই ও তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে ? পরন্তু অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদো-পরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি না হয় কেন ? যাহাতে কিছুদুৰ্গত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তাহাতে অত্যাচ্ছ স্বৰ্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে ? সুতরাং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা ভণ্ড ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে ।

আর, যদি শরীর হইতে আত্মা পরলোক গমন করে এবং তাহার দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে বন্ধুবান্ধবের অনু-রোধে ও স্নেহে ঐ দেহেই পুনৰ্বার আসিয়া অবস্থান করে না কেন ?

ভণ্ড, ধূৰ্ত্ত, ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্ৰ হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে । অশ্বমেধযজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশু গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি বিষয় ভণ্ডকল্পিত, স্বৰ্গনিরকাদির বিষয় সকল ধূৰ্ত্তরচিত, এবং যে সকল অংশে মজ্জমাংস নিবেদনাদির বিধি আছে, তাহা হিংস্র নিশাচরপ্রণীত । অতএব বেদ ও তদ্বোধিত পরলোক, আত্মা ও যাগাদি সবই মিথ্যা । বুদ্ধিমান পৌৰুষসম্পন্ন ব্যক্তি, কোন মতেই তাহা বিশ্বাস করিবেন না, প্রত্যুত তাহাতে অবজ্ঞাপূৰ্বক কর্তব্যরত হইয়া সুখে সপুত্রকলত্রে জীবনযাপন করিবেন ।

সুখের নামই স্বৰ্গ । ভোজনে পলায় ; পরিধানে বহুমূল্য, উজ্জ্বল বসন ; শয়নে বরাঙ্গনা ;—ইহা ভিন্ন এই সংসারে, যাহা কিছু স্বাদু, সুগন্ধি, সুপেয়, সুঠু, তাহাই ভোগ্য, তাহার দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরমপুরুষার্থ । যদিও এই সংসারে এই সকল সুখাস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার সহিত দুঃখও অবশ্যস্ভাবী, তথাপি ঐ দুঃখে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তত্তৎসুখসম্ভোগ করাই সকলের উচিত ।

দেখ,—

“ত্যাগ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং
 দুঃখোপমৃষ্টমিতি মূর্থবিচারণৈষা ।
 ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
 কো নাম ভোক্তৃষকণোপহিতান্ হিতার্থী” ॥

তুষ্ণাদি অসারাংশ সম্বলিত হইলেও কোন মহাজন পুষ্টিকর প্রাণ-
 প্রদ ধান্য পরিত্যাগ করেন ? কষ্টকর কণ্টক ও শল্কজালে জড়িত
 হইলেও কোন ব্যক্তি সুস্বাদু মৎস্যভক্ষণে পরাশ্রুত হন ? পরন্তু
 সকলেই তুষকণ্টকাদি অসারাংশ পরিত্যাগপূর্বক সারাংশ গ্রহণ করিয়া
 তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন । কমল তুলিতে যাইলে কণ্টক-বেধন সহ্য
 করিতে হয় । পশুগণ কর্তৃক শস্ত্রাপচয় হইবে বলিয়া কি কেহ
 ধান্যবীজ বপন করিবেন না ? না যাচকপ্রার্থনায় বিরক্তির ভয়ে
 কেহ অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করিবেন না ? সুতরাং সুখানুষ্ঙ্গী
 অবশ্যস্বাধী দুঃখালোশে ভীত হইয়া সুখোপভোগে বিরত হওয়া অতি
 মূঢ়তার কার্য্য । সুখ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাই স্বর্গ । দুঃখই
 নরক । ইহলোকে কত দুঃসহ যন্ত্রণা অবিরত ভোগ হয় ; তাহাই ত
 নরকের মূর্তি । যিনি ইহলোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—রাজা, তিনিই
 পরমেশ্বর । তাঁহার উপর কে প্রভু ? এই প্রত্যক্ষ দেহ উচ্ছেদ
 হইলেই মোক্ষপ্রাপ্তি । যতদিন দেহ থাকে ততদিনই বন্ধ ; তত-
 দিনই যন্ত্রণায় অধীর, সুখলিপ্সায় ব্যস্ত ; ততদিনই গতাগতি । সুতরাং
 সকল সুখদুঃখের মূল এই দৃশ্যমান ভৌতিক শরীর । ইহার অপগমে
 কোন চেষ্টাই থাকে না, থাকিতে পারে না । সুতরাং আত্মাই বা
 কি ? পরলোক বা কোথায় ? ইহাই নাস্তিকচূড়ামণি চার্ব্বাকের মত ।
 আমাদের পূজ্যপাদ প্রাচীন দার্শনিকগণ কিরূপে এই চার্ব্বাক-মতের
 খণ্ডন করিয়াছেন, বারাস্তরে তাহার আলোচনা করিব ।

শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ ।

সেকালের স্মৃতি—বাজে কথা

২। বন্ধিমচন্দ্র ।

আমাদের যৌবনে পিতামহ ভীষ্মকে My dear friend বলি-
বার অধিকার বা শ্রদ্ধাভাজনকে সাম্যের সমতলে টানিয়া আনিয়া
সমকক্ষভাবে ‘ভিজিট’ দিবার রীতি ছিল না। এই জন্ত একটা উপ-
লক্ষ্য না জুটিলে বন্ধিম বাবুর নিকট যাইতে পারিতাম না। প্রথম
প্রথম মাসে একবার করিয়া সে সুযোগ ঘটত। “সাহিত্য” বাহির
হইলে বন্ধিম বাবুর জন্ত লইয়া যাইতাম। বন্ধিম বাবু প্রথমেই লেখক
ও লেখিকাদের নাম দেখিতেন। নূতন নাম দেখিলে পরিচয় জিজ্ঞাসা
করিতেন।

“সাহিত্যে” “বন্ধিমচন্দ্র” শিরোনামে অনেকগুলি ‘সনেট’ ছাপা
হইয়াছিল। কবি বন্ধিম বাবুর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রায়
প্রত্যেকের উপর এক একটি সনেট লিখিয়াছিলেন। সনেটগুলির
নীচে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। মলাটে নাম ছিল।

এক দিন অপরাহ্নে বন্ধিম বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছি।
তখন একটু প্রশ্রয় পাইয়াছি। সাহস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা
করিতে যাই। বন্ধিম বাবু সে দিন পূর্বকথিত বৈঠকখানায় বসিয়া-
ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—“এস, ভাল ত ?” আমি প্রণাম
করিলাম। বন্ধিম বাবু বলিলেন, “বন্ধিমচন্দ্র আমার বেশ লাগিয়াছে।
তুমি ত বেশ কবিতা লিখিতে পার। এ কথা ত আগে বল নাই।”

আমি বলিলাম, “আজ, আমি লিখি নাই।”

বন্ধিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, “উহাতে নাম নাই দেখিয়া
আমি মনে করিয়াছিলাম,—সম্পাদকের লেখা। না, তুমি লজ্জা
করিতেছ ?”

আমি সেই কবিতাগুলির লেখক হইলে বঙ্কিম বাবুর প্রশংসাটুকু আত্মসাৎ করিতে পারিতাম । সে সৌভাগ্য না হউক, আমি সনেট-গুলি বঙ্কিম বাবুর ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া একটু গর্বের, একটু গৌরবের স্মৃতি ভোগ করিতেছিলাম । কারণ, ঘাঁহার লেখা, তাঁহার গৌরবে আমারও আনন্দিত হইবার কথা ছিল । প্রথম জীবনে পরিবারের বাহিরে আমরা যে বৃহত্তর পরিবারের রচনা করি, লেখিকা সেই পরিবারের এক জন ছিলেন, আমাকে দাদা বলিতেন ।

বঙ্কিম বাবু আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে লিখিয়াছেন ?”

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, “পুঁটীর লেখা ।”

বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “পুঁটী ? পুঁটী কে ?”

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, সরোজকুমারী দেবীর লেখা ।
বাড়িতে পুঁটী বলিয়া ডাকে ।—মুন্নির বোন ।”

বঙ্কিম বাবু ।—“ঘনশ্যামের মেয়ে ?”

আমি ।—“না, মথুর বাবুর মেয়ে ।”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “মথুর বাবুর মেয়ে ? তুমি পুঁটী বলে, ডাকে । তা হলে তোমাদের চেয়ে ছোট ?”

আমি ।—“আজ্ঞে হাঁ,—চৌদ্দ পনের বছরের বেশী বয়স নয় ।”

বঙ্কিম বাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, “বেশ ক্ষমতা আছে । রীতিমত চর্চা রাখলে—ভবিষ্যতে ভাল হবে । তুমি তাকে বলো, আমার খুব ভাল লেগেছে ।”

আমি আবার একটি ‘আজ্ঞে’ বাহির করিলাম । বঙ্কিমবাবু আবার বলিলেন, “আমার বইগুলি এত ভাল করে’ পড়েছে ; আমার উপ-স্থাসের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে এতগুলি কবিতা লিখেছে, এতে আমার আনন্দ হবে, এ কিছু বেশী কথা নয় । আমার নিজের কথা এমন করে’ কেউ লিখলে, খারাপ হলেও হয় ত ভাল লাগতো । কি বল ? সে জগৎ ত আমার আহ্লাদ হবেই । আর তা বলতেই

বা দোষ কি ? কিন্তু আমি সে কথা বলছি না। সত্যই এর কবিতা লেখবার ক্ষমতা আছে। কবিতাগুলি বেশ হয়েছে। তুমি তোমাদের পুঁটীকে বলো, আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।”

আমি বলিলাম, “বলিব। পুঁটী শুনলে খুব খুসী হবে। সেদিন বিহারীবাবুও কবিতাগুলির প্রশংসা কচ্ছিলেন।”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “কোন বিহারীবাবু ?”

আমি বলিলাম, “সারদা-মঙ্গলের বিহারী চক্রবর্তী।”

বঙ্কিমবাবু। “তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ? তিনি কি করেন ?”

আমি যাগু জানিতাম, বলিলাম। বিহারীবাবু পৌরোহিত্য করিতেন। এ প্রশ্নের উত্তরে উহাই বলিতে হয়, তাই বলিয়াছিলাম। কিন্তু “সারদা-মঙ্গলে”র কবি, আমার মনে হয়, সংসারের কিছুই করিতেন না। তিনি করিতেন, সাহিত্যের পৌরোহিত্য ! গুরুদেব হইবার রীতিমত বন্দোবস্ত ও সরঞ্জামও ছিল না ; ধনী ছিলেন না,—অভাবও ছিল না ; সৌভাগ্যক্রমে স্বল্পে সন্তুষ্ট ও তাঁহার গুরু বিদ্যা-সাগরের মত “স্নাতন্ত্রো শেঁকুল-কাঁটা” ছিলেন। যজমান প্রতিপালন করিয়া মঠ গড়িয়া ভক্তি শ্রদ্ধার ‘ব্যাপারে’র জন্য আড়তও করেন নাই। তাঁহার নিমতলার বাড়ীর নীচের ভাঙ্গা ঘরে দুই চারি জন যজমানের সমাগম হইত। তিনি সাহিত্যে মস্গুলা হইয়া থাকিতেন। তাঁহার কাব্য-রসের যজমানের মধ্যে সে সময়ে প্রধান ছিলেন, সাহিত্য-রসিক প্রিয়নাথ সেন ও কবির অক্ষয়কুমার বড়াল। চক্রবর্তী মহাশয় তন্ত্রপোষ বাজাইতেন। সে তন্ত্রপোষে একথানা মাদুরও ছিল না। আর নিজের কথাবার্তায়, আচারে, ব্যবহারে, মস্তব্যে “হোক গে এ বসুমতী যার খুসী তার” এই উক্তির যথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেন। বিহারীবাবু—বঙ্কিমবাবুর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না।—আমি মনে করিয়াছিলাম, বিহারীবাবুর কাছে যেমন বঙ্কিমবাবুর কথা শুনি, বঙ্কিম

বাবুর মুখেও হয় ত—তত উচ্চ গ্রামে না হউক—কিছু শুনিব। কিন্তু বন্ধিমবাবু বিহারীবাবুর দুই একটি গল্প শুনিয়া বলিলেন, “জীবনেও Poet! ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ লোক ত!”

আর একদিন সকালে বন্ধিমবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেদিন বন্ধিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে উত্তর দিকে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুই তিনখানি চেয়ার, পশ্চিমে দুইটি আলমারী। উত্তর ও দক্ষিণের জানালা উন্মুক্ত। বন্ধিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। একটি ছোট গড়গড়া—তাহাতে দীর্ঘ কাঠের নল। দেখিলাম, সচরাচর লোকে নলের যে দিকটা গুড়গুড়িতে লাগায়, বন্ধিমবাবু সেই দিকটায় তামাক খাইতেছেন; অপর দিকটা গড়গড়ার রন্ধু-মুখে সন্নিবিষ্ট। আমি মনে করিলাম, বুঝি ভুলিয়া উন্টা দিকটা মুখে দিয়াছেন। কিন্তু পরে দেখিলাম, তাহা নয়। নলটা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। আবার মুখে দিবার সময় দেখিয়া, উন্টা দিকটাই মুখে দিলেন। বন্ধিমবাবুর টেবিলে চা'য়ের পেয়ালা ছিল। বন্ধিমবাবু পেয়ালাটি ভুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “চা খাবে?”

আমি বলিলাম, “থাক;—আপনার চা ত হইয়া গিয়াছে।—”

বন্ধিমবাবু বলিলেন, “খাও ত?—মুরলী!”

মুরলীধর হাজির হইল। বন্ধিমবাবু আমার জন্য চা আনিতে বলিলেন।

মুরলী সেই বন্ধিমবাবুর খানসামা।—প্রথম দর্শনেই যাহার সহিত আমার দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল। পরে তাহার সহিত আমার আপোষ হইয়া গিয়াছিল। মুরলীর সঙ্গে আমার একটু ‘প্রেম’ও হইয়াছিল। বন্ধিমবাবুর মৃত্যুর পর সে ভবানীপুরে উকীল হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল। মুরলী আর ইহলোকে নাই। বোধ হয় আবার বন্ধিমবাবুর তামাক সাজিতেছে। যদি নরক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত ট্রাম হইয়া থাকে, এবং যমদূতকে সাধিয়া ছুটি পাই, তাহা হইলে বন্ধিম-

বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা আছে। তখন মুরলী দ্বার ছাড়িয়া দিবে, হাসিমুখে ‘আমুন’ বলিবে, এবং লুকাইয়া তামাক সাজিয়া দিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল। বন্ধিমবাবু বলিলেন, “তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত ‘বঙ্গদর্শনে’র অনেক প্রবন্ধ নিজের আবার লিখিয়া দিয়াছি, বলিলেও চলে। আমরা যাহা লিখিতাম, তাহাই সুন্দর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন লেখকেরা এ দিকে বড় উদাসীন। তোমাদের ‘সাহিত্যে’ও দেখি,—অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল বদল করিলে, কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে বেশ হয়। কেন কর না? লেখকরা কি রাগ করেন?”

আমি বলিলাম, “আমরা পারি না; জানিও না। আপনা-আপনি লেখা দেখিয়াও দি। তাহার পরও ঐ রকম থাকিয়া যায়। সকলের লেখা কাটিতে সাহসও হয় না।”

বন্ধিমবাবু।—“তাহা হইলে কেমন করিয়া কাজ চলিবে? এই ক্ষণেই ‘বঙ্গদর্শনে’র আমোলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া ‘রিভাইজ’ না করিয়া কাহারও কাপী প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছ ত; চন্দ্র একবারে বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজী লিখেছিলেন।—খুব খাটিতে হয়েছিল। আমাদের সময়ে এ ক্ষণে কেউ ত রাগ করতেন না।—তবু এখনও শকুন্তলায় ইংরেজী গন্ধ আছে।”

আমি বলিলাম, “আপনাদের আলাদা কথা।”

বন্ধিমবাবু।—“ও কাজের কথা নয়। পরিশ্রমকে ভয় করিও না। এক খুব লিখিতে লিখিতে লেখা যায়। আর এক পরের লেখা কাটিয়াও নিজের লেখা পাকে। তা জান?”

আমি।—“আমরা পারিব কেন?”

বন্ধিমবাবু বলিলেন, “তোমরাও কর। আমি এক রাজকৃষ্ণ ছাড়া

কারও লেখা ভাল করে' না দেখে' প্রেসে দিই নি। রাজকৃষ্ণ বড় সুন্দর বাঙ্গলা লিখতেন। দিব্যি বর্ষারে বাঙ্গলা।—জানতুম, তাঁর লেখা প্রুফে একটু কেটে' কুটে' দিলেই যথেষ্ট হবে।”

“শকুন্তলা” বঙ্গবিশ্রুত সমালোচক ও মনীষী শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসুর “শকুন্তলা-তত্ত্ব”। বোধ হয়, না বলিলেও চলিত। কিন্তু এখনকার লেখকরা ও পাঠক-পাঠিকারা প্রাচীন গ্রন্থকারদের কোনও গ্রন্থই ত প্রায় পড়েন না। এই জন্য এখনকার সাহিত্যের সঙ্গে তখনকার—বিশ পঁচিশ বৎসরের সাহিত্যেরও যেন কোনও প্রাণের যোগ নাই। গত পুরুষের স্থপতিরা যে বনীয়াদ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আছে; তাহার উপর শৈবাল ও আগাছা জন্মিতেছে। এখন ঘাঁহারা গড়িতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই বালির উপর খেলা-ঘরের পত্তন করিতেছেন।

বঙ্কিমবাবুর রাজকৃষ্ণ স্বনামধন্য, বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাসকার শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজকৃষ্ণবাবুর ধীশক্তির, গবেষণার, রচনার, মধুর পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি; দুই একবার সেই প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল নয়নের কোণে দুই এক বিন্দু অশ্রুর উদ্গমও দেখিয়াছি। রাজকৃষ্ণবাবুর ক্ষুদ্র “বাঙ্গালার ইতিহাস” বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব। তাহাই আমাদের ইতিহাসের ভাণ্ডারে প্রথম “বিধি-দত্ত ধন”; তাঁহার “নানা প্রবন্ধ” বাঙ্গালী এখন পড়েন কি না, জানি না; কিন্তু আমরা এখনও পড়ি। রাজকৃষ্ণবাবুই প্রথমে বিদ্যাপতিকে সাহস করিয়া ‘বাঙ্গালী’ বলিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি তাঁহা বড় প্রিয় ছিল। রাজকৃষ্ণবাবু বিদ্যাপতির মিথিলাকে তখনকার বা লার সামিল করিয়া মৈথিল কবিকে বাঙ্গালী বলিতেন। বঙ্কিমের পতাকামূলে স্বদেশের রত্নোদ্ধারের জন্য ঘাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, রাজকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। আমরা যেন এই সকল পুণ্যশ্লোককে কখনও না ভুলি। বর্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনোরম, সান্দের

নাই। কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র। বর্তমান অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিতেছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্বগামীদের যত্ন-সঞ্চিত রত্ন আছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

এই দিন বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “আপনি কি বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গ দেন? আপনার লেখায় কোথাও কোথাও এই রকম দেখিতে পাই, সর্বত্র নয়।”

বঙ্কিমবাবু : আপনার দক্ষিণ কর্ণে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী স্থাপন করিয়া বলিলেন,—“কান। আমার প্রমাণ—কান। যা কানে ভাল লাগে, তাই লিখি। অত নিয়ম মানিতে গেলে চলে না।”

আমরা আজকাল এই নিয়মেই চলিতেছি। সর্বত্র কানই আমাদের অনেকের একমাত্র প্রমাণ বটে। কবিতায় ত কথাই নাই। তবে তাহা সঙ্গত হওয়া চাই। যাহা কানের জন্মই রচা হয়, কান পর্য্যন্তই যাহার গতি, কানেই যাহার স্থিতি, এবং কানেই যাহার চরম পরিণতি বা জীবনমুক্তি, তাহা কান ভিন্ন প্রাণের অপেক্ষা করিবে না। তবে একটা কথা মনে রাখিলে মন্দ হয় না,—আমরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কান লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। আমাদের কান সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কানের অপেক্ষা একটু ‘দীর্ঘ’। তবে হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞানও অবশ্য বিধাতা নিজের ওজনে দুনিয়ায় দান করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে, এই কয়টা কথা বলিবার জন্ম এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না।

শ্রীমুরেশ সমাজপতি।

বিবসনা ।

যমুনার নীল জলে গাহন করিতে রাই
 ভাবেতে ভরল তনু, দেহে আর মন নাই !
 কোথায় লুটিছে তার নীলাশ্রী কেবা জানে,
 আলুখালু কেশপাশ, স্বপন-আবেশ প্রাণে ।
 নীল অঙ্গ বঁধুয়ার—নীল নীর যমুনার—
 আলিঙ্গনে বাঁধিয়াছে নগ্নতনু বিভোরার ।
 ফেনিল তরঙ্গ যেন বাহুর বেষ্টিনে তারে
 জড়ায়ে রেখেছে স্নেহে সোহাগের স্নেহাগারে ।
 কভু বালা উন্মিঠে 'বিমুক্ত হইতে চায়,
 নিবিড় পরশ-পাশে নব উন্মিঠ বাঁধে তায় ।
 রসে ঢর ঢর কায়, চুম্বনে আকুল হিয়া,
 বঁধুর অগাধ প্রেমে যায় বিশ্ব পাসরিয়া ।
 চেতনা ডুবিল প্রেমে, তিরোহিত বাহুজ্ঞান,
 অঁথি বেয়ে পড়ে ধারা, করিছে বঁধুরে ধ্যান !

* * *

মরমের মর্ম্মতল আন্দোলিয়া অকস্মাৎ
 কদম্বের শাখে বসি' বাঁশরী বাজা'ল নাথ ।
 জগৎ সরিয়া গেছে বালার নয়ন হ'তে,
 কেবল বঁধুর প্রেম জাগিতেছে মনোপথে ।
 সহসা মরম মাঝে শুনিয়া মুরলী-ধ্বনি
 প্রেম-উন্মাদিনী সম চমকি' উঠিল ধনী ।
 হিয়ার ভিতরে তার বঁধু কি বাজায় বাঁশী ?
 ইতি উতি চায় গোপী পরিয়া সুরের ফাঁসী ।

চমকি', নয়ন তুলি' কদম্ব-তরুর পানে
চাহিয়া দেখিল—বঁধু পরাণ ঢালিছে গানে ।
মুছে' গেল নদী, তরু ; নিভে' গেল নভ, রবি ;
মুগ্ধ নেত্র-পাটে শুধু জাগিছে বঁধুর ছবি ।
আপনা পাসরি' ধায় পাগলিনী নদা-তীরে,
মনে নাই নগ্নতমু, ধৌত হিয়া প্রেম-নীরে ।

*

*

*

সকল ইন্দ্রিয় তার পুঞ্জীভূত ছ'নয়নে,
কাঁপে বক্ষ খরখর, পয়োধর তার গণে ।
হৃদয়ের যত ভাব বঁধুরে ঘিরিয়া বয়,
বদনের যত বাণী শুধু “বঁধু-বঁধু” কয় ।'
জগতের যত আলো কালো রূপে মিশে' যায়,
মরম চিরিয়া বাল্য বঁধুরে লুকা'তে চায় ।
সে অপূর্ব ভাব হেরি' মহাভাব উপজিল,
বঁধুয়া বাঁশরী ফেলি' প্রেম-নিধি বক্ষে নিল ।—
সে নিবিড় আলিঙ্গনে চেতনা ফিরিয়া আসে,
লাঞ্জে রাই কমলিনী নয়ন মুদিল ত্রাসে ।
জঘন চাপিয়া করে ভূমেতে পড়িল বসি'
চাহিল লুকা'তে যেন দীর্ঘ ধরা-গর্ভে পশি' !—
আরে ছি ছি ! পোড়া দেহ ! কেন এ চেতনা-ছালা ?
বঁধুর চরণতলে কেন না মরিল বাল্য ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ।

ধোঁয়া

আমি খেয়ালী মানুষ, খেয়ালে চলি। আমার স্থিরতা নাই। যখন যে বস্তুতে আপনাকে পাই, তাকে ধরি ও ইচ্ছা হইলেই আবার তাকে ছাড়িয়া বাই। আমার নিত্য নূতন অভিরুচি। আমি বাহাকেই ধরি তাকেই গ্রাস করি। আর তখন তাহার জন্ত আমার প্রাণের মায়া কাটিয়া যায়। তাই সেই বস্তুতে আর আমাতে কোন চিরসম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু “ছুই” না হইলে আবার প্রাণ পাওয়া যায় না। যাহা একবার আমার জ্ঞানে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার ভিতর অজানা কিছু নাই, যাহার ভিতর আর কোন রহস্যের স্বাদ পাই না, তাহাতে আমার প্রাণের দোসর মিলে না, তাকে আমি “ছুই” বলিয়া ধরিতে পারি না। যাহা পাইবার নয়, যাহা জানিবার নয়, তাহার প্রাপ্তির ও জ্ঞানের বাসনাই আমার ভোগের পথ, আর ভোগের শেষে জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ, তাই আমি নিত্য নূতন অজানার আশ্রয়ে আপনাকে অসীম করিয়া রাখি। আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বড়কে ভোগ করিতে গিয়াই বড় হইয়া উঠি। তাই এই ধরা ছাড়া, অজানাকে জানা, অসীমকে সসীম করিয়া তোলাই, আমার জীবন। ভোগেই জীবন পাওয়া যায়। ভোগই বৃদ্ধির কারণ।

আমি শুধু বস্তুতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হই না। আমি আগুনের মত তাকে বেড়িয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সেই বস্তুটিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলি। এই পোড়াইয়া ছাই করাই ত্যাগের পথ, সংহারের পালা।

আমার যেমন ভোগ ও ত্যাগে বৃদ্ধি, বিশ্বপ্রাণের বৃদ্ধিও তেমনি এই ভোগের ভিতর দিয়া। বিশ্বানল নিরন্তর বিশ্ববস্তুকে বেড়িয়া জ্বলিতেছে ও ভস্মসাৎ করিতেছে, আর সেই ভস্মেই নূতন সৃষ্টির বীজ। ভোগ-ত্যাগ-সৃষ্টি ইহাই বিশ্বাণ্ডের বিশ্ব লইয়া খেলা।

জগতে এই ভস্মাবশেষ হইতেই যত সৃষ্টি, এই ক্ষয় হইতেই যত বৃদ্ধি। জঙ্গল পুড়িয়া কি আবাদী জমি তৈয়ারী হয় না? প্রাণীদেহ পুড়িয়াই ত সার হয়। এই পোড়া না হইলে কৃষক জমিতে সার দিত কিसे? নবীন ধানের অঙ্কুর গজাইত কেমনে? আবার পোড়া মাটিতেই ঘরবাড়ী তৈয়ারী হয়। শুধু অন্ন নয়, শুধু আশ্রয় নয়, যত কলাসৌন্দর্য্যও এই পোড়া লইয়া। ভূগর্ভের তাপে পোড়া যে ধাতু ও শিলা, তাহাই ভাস্করগুণ্ডির উপাদান। খনিজ কয়লার রূপান্তরই বর্ণ-কলার উপকরণ। তাই বলি দাহই সকল সৃষ্টির মূলে। শুধু আগুন ও ইন্ধনে চলে না। তাহাদের সমাবেশে যে ভস্মের উদয় হয় তাহাও আবশ্যিক। সেই কারণেই বৃষ্টি আগুন কখনও একেবারে নিবে না। কোথায় না কোথায় জ্বলে। আর এই অবিশ্রাম জ্বলার দরুণই জগতে ছাইয়ের রাশি এমন অমর অক্ষয়! হায়! তাই বৃষ্টি আমার প্রাণের আগুনও বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে বেড়িয়া জ্বলিতে চায়। তাই আজও আমার প্রাণের আগুন নির্বাপিত হইল না। আমি জ্বলিয়া জ্বলিয়া এ কোন্ ভস্ম-স্তূপ গড়িয়া তুলিতেছি?

এই ভস্ম লইয়াই মানব-ইতিহাস। অতীতের পোড়া লইয়া বর্তমানের কত সৃষ্টি, কত কৌশল! পুরাকালের ধ্বংসাবশেষে দেখি নূতনের উদয়। এই পোড়ামাটির উর্বরতাগুণেই, এই ধ্বংসে নূতন সৃষ্টির বীজ থাকে বলিয়াই, একটি রোমের উপর আর একটি রোম, একটি দিল্লীর উপর আর একটি দিল্লী, যেন ধাপে ধাপে আকাশ পানে উঠিতেছে। তাই প্রতীচ্য ভূখণ্ডে রোম, ও প্রাচ্যে দিল্লী, Eternal City হইয়া রহিয়াছে। পুরাতন জয়স্তম্ভ, পুরাতন মন্দির,

ভাদ্রিয়া পোড়াইয়াই কত কুতব মিনার, কত শাস্তা সোফিয়া (Santa Sophia) মসজিদ, কত শাস্তা মেরিয়া (Santa Maria) গির্জা, নির্মিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। প্রাচীন (Coliseum) কলিসিয়মের ভগ্নস্তূপেই যে রোম নগরীতে কত নব্য হস্ত্যাবলির মহল দরদালান স্তম্ভভোরণাদি গঠিত হইয়াছে! আর তাই বুদ্ধি রোমের কলামূর্তিতে আজও সেই (Coliseum) কলিসিয়মের শোণিত পিপাসা জ্বলিতেছে! বিলাসের উদ্যান, সেও শ্মশানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। দেখিয়াছি প্রাচীন বিলাস-ভবন (Pompeii) পম্পেয়ীর দগ্ধাবশেষে নবীন বিলাস-পটন (Naples) নেপল্‌সের রাজপ্রাসাদ সম্বিজিত। কিন্তু এ অটালিকাও ধূলিসাৎ হইয়া, হয়ত একদিন ভেনুভিয়াসের ভাস্মেই আচ্ছাদিত হইয়া, ভবিষ্যৎ বিলাসের বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। গ্রীসীয় ও রোমীয় ভাস্করগণ ভূগর্ভস্থ পোড়াধাতু ও শিলার দ্বারাই কত দেব-মন্দির, কত নাট্যশালা, কত ডোরীয় ও করিন্থীয় স্তম্ভমালা, কত সৌম্য গম্ভীর বিরাট (Jupiter Olympus) জুপিটার ওলিম্পাস, কত ভাস্কর বিবস্বান্ আপলো (Apollo), কত উন্মি-উন্মিতা নগ্নমাতা আফ্রোডাইটি (Aphrodite) মূর্তি রচনা করিল। কালে তাহা ভূমিসাৎ হইল, পুড়িয়া ছাই হইল, মাটির সঙ্গে মাটি হইল, ও কালে তাহাই পুনরুত্থিত হইয়া রেণেসাঁসে নূতন কলামূর্তি ধারণ করিল। আবার সেই রেণেসাঁস-প্রবর্তিত শিল্পসাধনা আজ কি নূতন শিল্পের সূচনা করিয়া রাখিতেছে না? যুগযুগান্তর ধরিয়া কত জাতির পর জাতি, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, সাহিত্যের পর সাহিত্য, শিল্পের পর শিল্প, সভ্যতার পর সভ্যতা, একে একে ইতিহাসের আকাশে অস্ত যাইতেছে। আবার কি, নক্ষত্রের পর নক্ষত্রের ম্যায়, নূতন জাতি, নূতন সাম্রাজ্য, নূতন সভ্যতা, সেই আকাশে উদিত হইতেছে না? তাই ইতিহাসের প্রতিক্রম সেই (Arabia Felix) আরবের ফিনিক্স (Phoenix) ঐতিহাসিক আকাশে অস্ত্রাচলের আগুনে আজ যে ভস্মক হইয়াছে, কাল আবার সেই ভস্মের আগুন হইতেই একটি নতুন

অরুণ নবজীবনের উদয় হইবে। না পুড়িলে নবজীবনের অভ্যুদয় নাই।

জড়জগতেও এক বিরাট আগুনের ক্রিয়া। নদী বহিতে বহিতে শুকাইয়া যায়, সাগর ভরিয়া উঠিতে উঠিতে স্থানে পরিণত হয়, পর্বতশিলাও ক্ষয় হইয়া একদিন সমতল হইয়া পড়ে, আবার যে স্থান পূর্বের সমতল ছিল, কালে সেখানে তুমারাবৃত উদ্ভূত শৈলশিখর দেখা যায়। এই যে পরিবর্তন, এই যে ক্ষয়বৃদ্ধি, ইহাও এক আগুনের খেলা। সে আগুন কেবল পোড়াইয়া ছাই করে না, কিন্তু এক নূতন সৃষ্টির বীজ সঞ্চার করিয়া রাখিয়া যায়। সেই বীজ হইতেই বসুমতী রত্নগর্ভা।

তাই বলি এই যে ভূগর্ভে স্তর রচনা, ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থানের সমাবেশ, এই যে জড়রাজ্যে ভাস্মাগড়া চলিতেছে, ইহা তবে এক বিপুল অগ্নিকাণ্ড বই নয়। এ কোন্ দাবানল পার্থিব সকল বস্তুকে বেড়িয়া কখনও মিটি মিটি কখনও বা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে? আর এ জ্বালার ত শেষ দেখি না! ইহার আদি জানি না! ঐ যে আকাশে নীহারিকার উৎপত্তি কোন্ তাপের বলে? আবার কোন্ আগুনের ধবধব্ তাড়নায় সেই নীহারিকাই আকাশপথে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হইয়া নক্ষত্ররূপে ঘন স্থির হইয়া যায়? আবার পাতালে দেখ, বসুন্ধরার হৃদয় কোন্ জ্বালার জ্বলনে আর না পারিয়া যেন মাটি ফাটিয়া জ্বলন্ত স্রোতে বহিয়া যায়? কোন্ আগুন জ্বলাইয়া পোড়াইয়া বসুন্ধরাকে রত্নগর্ভা করে?

সেই আগুনই কি উদ্ভিদ-জগতে প্রাণরূপে জ্বলিতেছে না? তৃণ লতা বৃক্ষ, বীজ অঙ্কুর ফল, কি সেই প্রাণ-আগুনে জ্বলিয়াই কাঁচা পাকা বর্ণে রঞ্জিত নয়? শুধু সবুজ নয়, নানা বর্ণ নানা ভঙ্গিমায় প্রতিভাসিত হইতেছে। আগুনের লোলজিহ্বাতে যেমন নানা প্রকার বর্ণের অক্ষুট আভাস-রেখা দেখা যায়, সেইরূপ এই বসুন্ধরার দেহে,

শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সেই তাপের উদ্ভাবনী শক্তিতে নানাবিধ বর্ণের আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই আকাশে এমন নীলিমা, এমন ধবলিমা, এমন অনির্বচনীয় রক্তিমতা, আর তাই ধরণী-অঙ্গে কত সবুজ হৃদে গোলাপি লাল এমন রঙ্গাইয়া উঠিতেছে, কখনও কচিহরিৎ কখনও বা পাকা ধানের স্বর্ণপীত। কিন্তু হায়! থাকিয়া থাকিয়া কেন এ আগুন নিবিয়া যায়! তখন ত আর কোন রঙ দেখা যায় না। সব অঁধার হয়ে আসে! তখন সেই মায়াবিনী, দেহের উজ্জ্বলশ্রী তামস আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া, যেন ধরণীর গর্ভে আশ্রয় লন। তাই বলি যত রংএর মেলা, যত আলো অঁধার, সেই আগুনের প্রাণে।

শুধু বিরাট অগ্নিকাণ্ড নয়। প্রতি জীবে এক একটি আগুনের ফুল্কি। এই আগুনই দেহীর প্রাণ, জীবের চৈতন্য। হৃদয়-গহ্বরে ধক্ ধক্ করিয়া দহরাগ্নি হুলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এ আগুনও দিগ্দিগন্ত ছাইয়া ফেলে।

পীঠস্থান ভেদে এ আগুন ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজ করে। সেমিরামিস, আলেকজন্দর, সার্লমেন, নেপোলিয়নের হৃদয়ে এই আগুনের শিখাই বিজয়িনী-মূর্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অসংখ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জনপদ দগ্ধ করিয়াও সেই বিজয়িনী প্রতিমার লোল-জিহবার অনন্ত পিপাসা মিটিল না। তাই করালী আজ (Kaiser Wilhelm) কাইজের বিল্‌হেল্মের হৃদয়ে জলিয়া উঠিয়া দাবানলে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সাগরমন্ডনে সমবেত সুরাসুরগণের সমক্ষে এই অগ্নিশিখাই মোহিনীর রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অগ্নিশিখাই রাবণের হৃদয়ে সীতা, পারিসের হৃদয়ে হেলেন, আর্টনির প্রাণে ক্রিওপেটোর রূপ। তাহাতেই লক্ষা ও ট্রয় দগ্ধ, তাহাতেই রোমরাজ্য বিধ্বংস। ভিন্ন ভিন্ন পীঠস্থানে এই আগুনই কালী করালারূপে জলিয়া উঠে, কখনও শীত কখনও উষ্ণ, কখনও রক্ত কখনও কৃষ্ণ। ওফিসিয়াতে শীত,

আর্টনিতে উষ্ণ, রোমিয়ো'র রক্ত, ওগেলো'র কৃষ্ণ। কে এই করা-
লীর পীঠস্থান গণনা করিতে পারে !

এই আগুনই চিতার আগুন, শ্মশানে শ্মশানে জ্বলিয়া জ্বলাইয়া
নিঃশেষ হয়। প্রাণ-বায়ু প্রাণমরে, দেহ মাটিতে মিশায়, আর আগুন
শূন্যে মিলাইয়া শূন্য হইয়া যায়। ইহাই শাস্তিপথ, ইহাই শুদ্ধিমার্গ।
প্রাণাগ্নিই একমাত্র পাবক। এই আগুনে পুড়িয়া যে ভস্ম হয়,
তাহাই পুত, তাহাই শাস্ত, তাহাই শিব।

এই যে দাবানল বিশ্বকে বেষ্ঠন করিয়া নিরন্তর জ্বলিতেছে পুড়ি-
তেছে পোড়াইতেছে, এই জ্বলাতেই বিশ্বপতির ভোগ ও ত্যাগ, ক্ষয়
ও বৃদ্ধি। এই আগুন কত ভাবে ভোগ করিতে জানে, কত ভাবে
ভোগ করিয়া নিঃশেষ করে ও ভোগের পর ধোঁয়াতে পরিণত করে,
তাহা কে বলিতে পারে ? সেমেলি (Semole) যেমন দেবতেজে
ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছিল, বিশ্ববধুও সেইরূপ বিশ্বপতি বৈশ্বানরের তেজে
ভস্মসাৎ হয়। ইহাই বিশ্বপতির ভোগ, বিশ্বপতির ত্যাগ। ইহাই বৈশ্বা-
নরের ইন্ধন লইয়া খেলা। ইহাই বৈশ্বানরের খেয়াল।

শুধু ইন্ধন ভস্মসাৎ হয় না, আগুনও নির্বাপিত হয়। আগুন
যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন সে ইন্ধনকে আশ্রয় করিয়া জ্বলে ; কিন্তু
জ্বলিতে জ্বলিতে যখন ইন্ধনটি নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন আগুনও
নিবিয়া যায়, ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, আর সেই
ধোঁয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়। সব আগুনের পরিণাম এই ধোঁয়া।
তবে ছোট আগুন ও বড় আগুন, সে কেবল ইন্ধনভেদে। যে যত
বড় জিনিষকে বেড়িয়া জ্বলে, সে তত বড় আগুন। একটি দেশা-
লাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিলে সেও একটি আগুন হইয়া উঠে, এবং
সেই কাঠিটি নিঃশেষিত হইলে সেখানে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই
দেখা যায় না। আবার যে আগুন একটি গ্রাম ব্যাপিয়া জ্বলে
গাছার চরমেও সেই ধোঁয়া—আর সব ধোঁয়াই এক। কিন্তু এই
য জ্বলন, ইহাও কি সর্বত্র এক ?

আগুন জ্বলে পুড়ে ধোঁয়া হয়, কিন্তু সর্বত্র একেবারে নিবিয়া যায় না। আগুন জ্বলম, তাই সে এক আধারে নেবে, কিন্তু নিবিবার আগে ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া যায়। তাই সে বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া জ্বলে। ইহাই আগুনের খেয়াল, ইহাই আগুনের ফুল্কি।

আমার খেয়ালও তাহাই। আমি যে সেই বিশাল অগ্নিরই একটি রূপ! তাই আগুন যেমন কখনও নিবিয়া যায় না, আমিও নিবিতে পারি না। তাই আমি অন্তহীন। তাই আমি অমর অজর। বারে বারে ভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করিতেছি, ও নিত্য পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জ্বলিতে জ্বলিতে আপনার চৈতন্যকে বাড়াইয়া তুলিতেছি। বিশ্বাস্য ভোগের শেষ নাই, তাই আমারও ভোগের শেষ নাই। বিশ্বানল যেমন এই বিশ্বগোলকে বেষ্টিত করিয়া জ্বলিতেছে পুড়িতেছে ও অবশেষে তাহাকে ধোঁয়ায় পরিণত করিতেছে, এবং পুনরায় ধোঁয়ার ছায়া হইতে নূতন কায়া সৃজন করিয়া তাহাকে বেড়িয়া আবার ভোগ করিতেছে, আমিও তেমনি প্রতিবস্তুকে লইয়া কত ভাবে, কত রঙ্গে কত ভঙ্গ, ভোগ করি! এই জ্বলাই আমার ভোগের পথ।

আমার আগুনের যে আশ্রয়, সে আমার বিশ্ব, আমার গোলক। আমি সেই গোলকের অধিষ্ঠাত্রী। আমি এই গোলকটি অধিষ্ঠান করিয়া আমার প্রাণের আগুনে ইহার উপর কত ভিন্ন রংএর ভিন্ন ছবি অঙ্কিত করিতে থাকি। আমার খেয়াল—আগুনের খেলা—এই গোলকটি লইয়াই, ইহার বর্ণভঙ্গিমায়, ইহার রূপ-পরিবর্তনে।

চাঁদের যেমন তিনটি রূপ, আমার গোলকেরও তাহাই। সূর্যের আলোক যখন যে ভাবে চাঁদের উপর পতিত হয়, চাঁদও আকাশে সেই ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে—কখনও পূর্বমুখী কলায়, কখনও পূর্ণিমায়, কখনও পশ্চিমমুখী কলায়। আমার প্রাণের আগুনের তিনটি রূপ—গোম্মান, জ্বলা ও নেবা, আর এই তিন আগুনে

আমার বিশ্বগোলকও একে একে তিনটি রূপে আমার নিকট প্রকাশিত হয়। তাই আমি বিশ্ববস্তুকে তিনভাবে ভোগ করি। আমার ত্রিমূর্তিতে ভোগ। তাই এই বিশ্বগোলকের অধিষ্ঠাত্রীও ত্রিমূর্তি।

আমার আগুন জ্বলিয়া উঠিবার পূর্বের কোথায় অবস্থান করে? সে কোন্ ইন্ধনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কণায় কণায়, প্রবেশ করিয়া গুম-রাইতে থাকে? জানি না এমনই করিয়া কত দেশকাল যুগযুগান্তর ছায়ার মত ভাসিয়া গিয়াছিল। কোন্ নেবুলার রাজ্য হইতে আমার সেই বাষ্পীয় গোলক কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অবশেষে আমার গোলাধার হইয়া দাঁড়াইল! অকস্মাৎ দেখিলাম একটি গুহাস্থিত কণ্ঠিকুণ্ডের অন্তরে নিভূতে আগুন গুমরাইতেছে, আর সেই চিরসঞ্চিত তিমির যেন পর্দায় পর্দায় অনাবৃত হইতে লাগিল। প্রাণের আগুন গুমরাইয়া গুমরাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেও, ঘুম ভাঙ্গো ভাঙ্গো হইয়াও যেন ভাসিল না। সেই আধ আলো আধ অঁধারে, আধ ঘুম ঘোর আধ জাগরণে, দেখিলাম এক দিব্য মূর্তি, আমার গোলকের অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমা, শ্বেতপদ্মাসনা, বিবসনা। সেই যাদুকরী প্রতিমা যেন আমায় যাদু করিয়া লইল। তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে, উষার প্রথম আলোকে আমার গোলকটি দেখিয়া লইলাম। সে যেন এক ছবির রাজ্য—একখানি প্রকৃতি-পট। সে পট শুধু কালিমার অঁচড়ে অঙ্কিত নহে, নানাবর্ণের সংমিশ্রণেই অঙ্কিত, কিন্তু সপ্ত রঙ এখানে মিলাইয়া একটা উজ্জ্বল রসজ্বী আধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির অঙ্গে—তাহার বর্ণে রসে গন্ধে গীতে, যেন বিশ্ব-আগুন গুমরাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই সপ্ত জিহ্বার সপ্ত রঙ পৃথক করিতে পারে নাই। সূর্যের কিরণ এই স্ফটিক গোলকে প্রতিফলিত না হইলে রঙ ফুটিবে কেমনে? এখনও যে কুয়াসার আবরণ, উষার ক্ষীণালোকে অস্ফুট লাবণ্যছায়ার তরঙ্গহিলোল, আকাশে মেঘমালা কোথাও কুণ্ডলতি, কোথাও বলয়িত, কোথাও ফেনপুঞ্জনিভ। সে গোলকে সকল প্রাণ, সকল পদার্থই, মোহা-

বোশে অভিভূত। সে যেন এক মায়াপুরী, পরীর রাজ্য। কোথাও

Fairies dance in fairy rings

In an elfish light on the emerald green!

কোথাও আরব্য-উপন্যাসের সেই অরুণ আলোকে মায়াবিনীর উদ্যান, সেই স্বর্ণালোকমণ্ডিত শুভ্র অট্টালিকা যেথায় কত প্রণয়ীর শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর মূর্ত্তি যাদুমন্ত্রে সংজ্ঞাহীন, কাহারও বা স্ফটিক মীন-পাত্রে স্বর্ণমীনমূর্ত্তি, আর সবাই যাদু হইতে মুক্ত হইবার মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আবার কোথাও সেই উপকথার রান্ধস-পুরীতে কোন্ এক সূর্য্যাস্তের দেশে সপ্তমহল অট্টালিকার অন্তঃপুরে ফেন-শুভ্র-শয্যাশায়িতা সেই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা, সেই Sleeping Beauty, ও তাহার শয্যাপার্শ্বে সেই সোণার কাঠি রূপার কাঠি, সেই ঘুম ভাঙ্গাবার magic wand পড়িয়া আছে, কিন্তু “যুবরাজ” এখনও আসে নাই, তাই রাজকুমারীর ঘুম ভাঙ্গে নাই। আবার অশ্বদিকে দেখিলাম রম্য দেবভূমি। কন্দরে কন্দরে মুগ্ধ বনদেব-তার বিহার। দেখিলাম কোথাও নির্ম্মল প্রস্রবণে (Naiad) নাইয়া-ডের অবগাহন, কোথাও (Nymphs) নিম্ফস্দের জলক্রীড়া, কোথাও বা (Fauns) ফনস্দের দ্রাক্ষারসপান ও নৃত্য। উপরে চাহিয়া দেখি রৌপ্যচাপহস্তা (Diana) ডায়ানা মুচকি হাসিয়া বন্ধিমগ্রীবায় আকাশ-হরিণকে অনুধাবন করিতেছেন, আর নীচে আকাশতলে ধনধান্যভরা বহুকরার প্রতিমূর্ত্তি (Demeter) ডিমীটার মাথায় এক আঁটি পাকা ধানের শীষ বহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন।

এখানে নিত্য দো-আলো। এ দো-আলোয় ছায়া ও কায়ায় কোন ভেদ নাই। এখানকার টাদে টাদিনী আছে, কিন্তু প্রণয়ী-প্রণয়িনীর চোখ আজও অর্ধনিমীলিত। এ সাগরেও তরুণী ভাসমান, কিন্তু মাঝি নাট। বহুকরার গর্ভে আছে রত্ন, কিন্তু গণিমালা দিয়া বিশ্বপতিকে বরণ করিয়া লইবে কে? বান ডাকিবার আগে যেমন গঙ্গাবক্ষ কুলিয়া উঠে, এখানে নরনারীর প্রেমও তেমনি হৃদয়ে হৃদয়ে

কোঁপাইয়া উঠে, কিন্তু বহ্যার শ্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া তটভূমি প্লাবিত করিয়া আজিও হুহুস্বরে বহিতে শিখে নাই। আর বাঁধ ভাঙ্গে নাই বলিয়া সে প্রেমে বিকার নাই, মায়া-বন্ধনও নাই। এ প্রণয়ে মান অভিমান, আশা নিরাশা, মিলন ও সংগ্রাম নাই। যেমন সংগ্রামের পূর্বে কোন সত্ৰাট নিজ সাত্ৰাজ্যের সৈন্য ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে প্রস্তুত করিতে থাকেন, ইহাও ঠিক জীবনসংগ্রামের পূর্বাবস্থা।

ইহাই আমার ছবির রাজ্য। কিন্তু এ ছবি, ও আমার নয়ন, যেন এক ফ্রেমে আঁটা। যত মূর্তি, যত ছবি, যেন দেখিয়াও দেখি না। নয়ন চায় যত মূর্তিকে, যত সুন্দরকে, তাহার ফাঁদে বন্দী করিতে, কিন্তু কৈ কেহ ত ধরা দেয় না! বাঁধিতে চাই বাঁধা মানে না। আমি যেন দেখিতে দেখিতে ছবির সঙ্গে প্রকৃতি-পটে অঙ্কিত হইয়া যাই, সেই ছবির রংএ প্রাণের রং বিসর্জন দিয়া যেন রংহীন হইয়া থাকি। এই ছবির সঙ্গে ছবি হওয়া আমার প্রথম ভোগ। ইহাই বিশ্বগোলকের আদিমূর্তি।

দেখিতে দেখিতে আবার কত দেশকাল ভাসিয়া গেল,—অকস্মাৎ দেখিলাম সেই অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনটিকে বেড়িয়া আগুন দাই দাউ করিয়া পুড়িতেছে। অমনি সেই আমার শাস্তুসুন্দর বিশ্বছবি যেন মুছিয়া গেল, সেই অক্ষুট ফিকে রঙে রক্তিম আভায় ঘোর হইয়া উঠিল, আর বৈশ্বানর যেন রণে মাতিয়া দিগ্‌মণ্ডল দগ্ধ করিবার জন্ত লোল-জিহ্বায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সমগ্র বিশ্ব যেন এক রণক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম আকাশের রক্তিম চক্রে, ধরণীর নিষ্ঠুর বন্ধে, জীবনসংগ্রামের অভিনয় জাগিয়া উঠিয়াছে, আর দেখিলাম সেই বিশ্ব-মঞ্চের অভিনেত্রী, রমণীর দিগম্বরীমূর্তি, লোলকটাক্ষা, রক্ত-পদ্মাসনা। সেই অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখা সেই মূর্তিকে বেষ্টিত করিয়া নিরন্তর লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আগুনের উত্তাপে প্রাণীমাত্র মোহনিদ্রা হইতে উখিত হইয়াছে। যেন চিত্রপট হইতে শিল্পীর প্রাণ বাহির হইয়া আসিল। আর সে চিত্রের মধ্যে আপনাকে

মগ্ন রাখিতে রাজী নয়। প্রাণ আজ প্রকৃতিদর্পণে আপন প্রতিবিশ্ব দেখিয়া ক্ষান্ত নহে, আজ সে নিজে দর্পণ হইয়া সকল রঙ, সকল বিশ্ব, সকল ছায়া আপন অঙ্গে প্রতিফলিত দেখিতে চায়। সেই কুয়াসার প্রহেলিকাময় আবরণ আর নাই। সূর্য্যের প্রথর রশ্মি আমার ফটিক গোলকে এখন প্রতিফলিত। প্রকৃতিরূপসী আজ বর্ণে রসে গন্ধে গীতে সমুজ্জ্বলা, স্মৃতিত্রা, মুখরা, উন্মাদনী। কিন্তু এই উজ্জ্বলরসশ্রীতে শাস্তি নাই, এ যেন বহির সহস্র জিহ্বা লেলিহ-মানা। ইহাই বাসনার রূপ, রূপের বাসনা। ইহাই ভোগাশ্রী।

সৈকতে দাঁড়াইয়া শুনিলাম সাগর অনন্তপিপাসা প্রাণে লইয়া পৃথ্বীর যত নদনদীকে আপন বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত কেবলই গর্জন করিতেছে। পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম নীচে ধরণী-মাতা বহুসন্তানবতী জননীর শ্যায় সহস্র স্তন হইতে সহস্র ধারায় আপন সন্তানদিগকে পীযুষ পান করাইবার নিমিত্ত ক্রোড় পাতিয়া বসিয়া আছেন। আর দেখিলাম, উপরে মহাকাশ সকল ক্ষুদ্র আকাশকে, সকল খণ্ডশূণ্যকে, মহাশূণ্যে বেষ্টিত করিবার জন্ত মুখ-ব্যাদান করিয়া আছে। চোখ বুজিয়া দেখি, অনাত্মনস্ত মহাকাল সকল ক্ষণ পল দণ্ডকে আপন অ-কালে গাঁথিয়া লইবার নিমিত্ত শেষ মুহূর্ত্তের ধ্যানে মগ্ন। বুঝিলাম এ বিশ্বে সর্ব্বত্র এক জন অপরকে গ্রাস করিতে চায়, কিন্তু অপারে সেই করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হইবার জন্ত সতত পরিধির বাহিরে ছটকাইয়া পড়িতেছে। তাই সাগরে প্রবিষ্ট হইলেও যত নদনদী, যত প্রস্রবণ, আবার বাষ্প-আকারে বাহির হইয়া আসে। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণ-মুহূর্ত্ত-পলগুলি সেই মহা-অকালের গ্রাস হইতে নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া পলাইতে পলাইতে কাল ও অ-কালের গণ্ডীর সীমানা সৃজন করিতেছে। এ গোলকের এই নিয়ম। একবার এক হইতে বহুর দিকে, আবার বহু হইতে একের দিকে, আকর্ষণ বিকর্ষণ। একবার বিসর্গ একবার সংসর্গ। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জলিতেছে;—একটি প্রবাহের টানে সকল পদার্থ

কুণ্ডমুখে প্রবেশ করিতেছে, আর একটির উজ্জানটানে কুণ্ডমুখ হইতে বাহির হইতেছে।

এ গোলক এক নিত্য মধ্যাহ্নের দেশ। আর সকল প্রাণই সেই মহান বিজয়া সূর্য্যের এক একটি স্ফুলিঙ্গ,—ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। এখানে স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে রেষারেবি। ইহারা একজন আগুন একজন ইন্ধন নহে, পরস্পরেই পরস্পরের আগুন, তাই আগুনে আগুনে এই রেষারেবি কে কাহাকে ভস্মসাৎ করিতে পারে। কৈ পারিল কি ?

কিন্তু ভোগাগ্নির চরমে কি শাস্তি নাই ? আছে আছে, এ মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আছে,—আলো ও ছায়ার খেলা, এ নিদাঘের পর শরৎ আছে—রোদ ও মেঘের মেলা। রেষারেবির পর মেশাগিশি। নবীনে নবীনে রেষারেবি, নবীনে প্রবীণে মেশাগিশি। আগুন, সে প্রবীণ। ইন্ধন, সে নবীন।

আগুন যে চিরপুরাতন। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া আগুন জ্বলিয়া আসিতেছে, তাহার উৎপত্তির নির্ণয় করিবে কে ? আর ইন্ধন, তার যেন নিত্য নূতন রূপ, নিত্য নূতন বেশ। আগুন যে ইন্ধনকে চায়, সে প্রবীণের নবীনকে চাওয়া। ইন্ধন যে আগুনকে চায়, সে নবীনের প্রবীণকে চাওয়া। এই যে নবীনে প্রবীণে খেলা, ইহাই মানব-জীবন। প্রবীণের প্রবীণতা হইল জগতের যত ইতিহাস, যত কাহিনী, যত দ্রাবনের সঞ্চয়ে ; আর এই প্রবীণতায় তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়াই নবীনা অক্ষয় যৌবনা (Eos) ঈয়সের তৃষা মিটাইতে পারিবে। জানিয়া (Tithonus) টিপোনসের আত্মা অমর প্রবীণতা মাগিয়া লয়, চিরনবীনতা মাগে নাই ! ঈয়সের বরদান, সে যে নবীনের প্রবীণ-প্রাপ্তির আশীষ। এই নবীণের সহিত কারবারেই প্রবীণের পুনর্জন্ম, অক্ষয়বৃদ্ধি, চিরন্তন স্থিতি। নবীনই প্রবীণের প্রাণ, তাহার ভোগের সহায়, ক্ষুধার নিবৃত্তি। নবীনের নবীনতা, সে যে সদ্যোজাত পুষ্পের আসব। কিন্তু তাহা কি প্রাচীন বৃক্ষমূল হইতে রস টানিয়া দ্রবিত হয় নাই ? তাই নবীনের

প্রাণ হইল প্রাচীনকে নিয়তই লুণ্ঠন করায়, খণ্ডে খণ্ডে অংশে অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবীণকে আপন নবীন শরীরে গাঁথিয়া লওয়ায়, আপনার নবীন রসে প্রবীণকে নবজীবনে লাভ করায়। তাই বসন্তের পুষ্প প্রাচীন বৃক্ষে নবীন মূর্ত্তির বিকাশ, তাই কত যুগের কঠিন শিলায় শৈবালের জন্ম, তাই স্তব্ধগম্ভীর হিমাদ্রিকণ্ঠে প্রস্রবণের কল-কলধ্বনি, তাই অগাধ চিরন্তন সাগরবক্ষে ফেনমালা! এ সকল নবীন মূর্ত্তিতে প্রাচীনের পরিচয়।

বুঝিলাম এ জগতে নারীমূর্ত্তিই চিরপ্রবীণা, তাই আজন্মকাল পুরুষ খণ্ডে খণ্ডে নারীশরীরে বিলুণ্ঠন করিয়া, নারীর রক্ত শোষণ করিয়া, জগতে খণ্ডরসের সৃষ্টি করিতেছে। নবীনের প্রাণ এই খণ্ড-রসে। তাই প্রতি প্রাণী প্রতি বস্তুই নবীন, কেবল বসুন্ধরার মাতৃ-মূর্ত্তি যেন চিরপ্রবীণা। তাঁহার দেহে যত ইতিহাসের, যত সভ্যতার, যত সাহিত্যের, যত জ্ঞানের, পলি পড়িয়া আছে।

আবার কত দেশকাল ভাসিয়া গেল, অকস্মাৎ অগ্নিকুণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি ইক্ষনটি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন আমার বিশ্ব গোলকের সেই রক্তিম আভা মিলাইয়া গিয়া যেন এক ধূসর আলো ছড়াইয়া পড়িল। আর সেই আলোকে দেখিলাম বিশ্বনারীর চিরপ্রবীণমূর্ত্তি, নীলাম্বরী, নীল-পদ্মাসনা। নীলাকাশের মত এই মাতৃমূর্ত্তি বিশ্ব-গোলককে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। ভূপৃষ্ঠে দেখিলাম যেন জলপ্লাবনের পর তট-ভূমিতে যুগান্তের পলি পড়িয়া গিয়াছে। সেই পলির উপর গাছের যত পাতা বিবর্ণ হইয়া নিরন্তর ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। যত পক্ক শুক ফল হইতে বীজ বাতাসে উড়িয়া মৃত্তিকা-গর্ভে আশ্রয় লইতেছে, আর বাদলা হাওয়ায় যত পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তর দেশের নীড় ছাড়িয়া দক্ষিণাকাশ অভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে সেই ধূসর আলো ধূম্র হইতে ধূম্রতর হইতে লাগিল। দেখিলাম ছাইয়ের স্তূপ মাটিতে পড়িয়া, আর ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া শূন্যে মিলাইতেছে। বুঝিলাম

ঐ যে বসুন্ধরার পলি, তাহা ভস্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। কত যুগযুগান্তরের—জন্মজন্মান্তরের আগুনের সেই ভস্মে পরিণতি। যত অতীতের অভ্যাস, যত পূর্ববস্তুতি, যত থেয়াল, যত সংস্কার পুড়িয়া গলিয়া ছাই হইয়া বিশ্বে এই ভস্মের পলি সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে এই প্রাচীন পলি যাহাতে সৃষ্টির বীজ নিহিত; অপরদিকে ধোঁয়া, ভোগের শেষে জ্ঞান, যাহা চিরন্তন আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাই আগুনের ভোগের পথ। এই ছাই ও ধোঁয়া, এক আগুনেরই দুই দিকে পরিণতি। একটি matter অপরটি spirit, একটি জড় অপরটি চিৎ, একটি স্ভাব অপরটি পরভাব, একটি রাগ অপরটি জ্ঞান। ছাই হইল ধোঁয়ারই কায়া, মূর্ত-প্রকাশ, খণ্ড-প্রকাশ, আর ধোঁয়া হইল ছাইয়ের মুক্তাঙ্গা, যাহা চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেছে। ভোগের শেষে যত হৃদয়ের ধক্ধকানি, যত পরাণের জ্বলনি-পোড়নি ক্ষান্ত হয়, যত যুক্তি বিচার সংশয়ের মীমাংসা হইয়া যায়, তখন আসে শান্তি, আসে মুক্তি, আসে জ্ঞান। তখন প্রাণের আগুন নিবিয়া ধোঁয়া হয়, আর ধোঁয়ার রাজ্য মহাকাশে মিলাইয়া যায়। অনাদি কাল হইতেই বিশ্বেকন জ্বলিয়া পুড়িয়া মহাকাশকে এই ধোঁয়ায় আবৃত করিতেছে। দিনে দিনে যত ভোগান্তে অভিজ্ঞতা, যত বন্ধনান্তে মুক্তজ্ঞান, যত পাপ-বিক্রের অস্তিম্বে শুদ্ধিবোধ, যত ভ্রান্তের অস্তিম্বে সত্য আদর্শ, ভোগা-গির নির্বাণে নিরন্তর আকাশ পানে উঠিতেছে, আর বিশ্বাদর্শের আকাশে সঞ্চিত হইয়া সেই আদর্শকে পূর্ণ করিতেছে, অজর অমর অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। তাই যজ্ঞাহুতি পুড়িয়া যে ধোঁয়া হয়, তাহাই দেবতার খাদ্য। তাই বৈদিক ঋষির হোমানলে যত ভোগের আহুতি। এই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত না করিলে দেবগণের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত কেমনে? ধোঁয়া না হইলে আকাশে স্থান কোথায়!

এই যে শেষের ভোগ, ভোগের শেষ, ইহা ত দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ হয় না। শুধু আগুন ও ইন্ধনের সমাবেশে চলে না। এখানে তিনের

সংস্থান আছে। মাটিতে ছাই এক দিকে, শূন্য আকাশ অপর দিকে, আর এই সূক্ষ্ম ইন্ধনাগ্নি, এই ধোঁয়া, মাঝখানে। এই ধোঁয়াতেই মাটি ও আকাশের আদানপ্রদান। ইহাই জড় ও চিৎ-এর, ভোগ ও জ্ঞানের, বাস্তব ও আদর্শের, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের সন্ধিক্রম। তাই বলি ধোঁয়াই মধ্যবর্তী।

শ্রীসরযুবালা দাসগুপ্তা।

পল্লী-মাঠে

পল্লীর শেষে গ্রামের কিনারে
চলিয়াছি পথ বাহিয়া,
উল্লাসে প্রাণ আকুল অধীর
পথপাশে দেখি চাহিয়া,—
ধাত্তোর ক্ষেত সবুজ শ্যামল,
রবির কিরণে উজ্জল অমল,
চঞ্চল বায়ে অঞ্চলখানি
উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
শ্যামল মাঠের সবুজ সুষমা
পড়িছে ছাপিয়া ছাপিয়া ।

গগনে ছুটেছে ধাত্তোর ক্ষেত
শ্যামঅঞ্চল উড়া'য়ে !
নিমেষে আমার অন্তরখানি
কেমনে গেল গো জুড়া'য়ে !
শশ্বশীর্ষে অরুণ কিরণ
ধারে ধারে আজি করে বরিষণ !
বিধাতার শুভ আশীষ যেন রে
(তার) সারাদেহে গেছে ছড়া'য়ে !
ছুটেছে গগনে ধাত্তোর ক্ষেত
শ্যামঅঞ্চল উড়া'য়ে !

শ্রীগণেশচন্দ্র রায় ।

বর্তমান হিন্দু ধর্মের দেববাদ ও দেবোপাসনা

আজকাল এ দেশের প্রায় সকল স্কুলেই হিন্দু-বালকেরা স্বল্পবিস্তর সমারোহ করিয়া সরস্বতীপূজা করে। আমার ছোট বালকটি যে স্কুলে পড়ে, সেখানেও এবারে খুব জাঁকাল রকমে পূজার আয়োজন হয়। সে অঞ্জলি দিতে যাইতে চাহিল। আমরা বহুদিন প্রতিমা-পূজা ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু এই বালক এ সকল তত্ত্বকথা ত জানে না ও বুঝে না। বুদ্ধেরাই বা কয়জনে বুঝিয়া থাকেন? সে অঞ্জলি দিতে গেল না বটে। যায় নাই ভালই করিয়াছে, গেলে তার কুলধর্ম রক্ষা হইত না। কিন্তু মনে মনে এজন্ত একেবারেই যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহাও বলিতে পারি না। পরদিন পাড়ার এক প্রতিবেশীর প্রতিমা যখন বিসর্জন করিবার জন্ত লইয়া যায়, তখন আমার বালকটি এদিক ওদিক চাহিয়া, কেউ দেখিতেছে না ভাবিয়া, তাহাকে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল!

এ কি তার রক্তের দোষ? শিক্ষার দোষ যে নয়, একথা বলাই বাহুল্য। সে জন্মিয়া অবধি আমার বাড়ীতে কোন দেবদেবীর পূজা দেখে নাই। সে যাহা কিছু ধর্মকথা শুনিয়াছে, সকলই এই প্রতিমা-পূজার বিরোধী। কিন্তু সেই নিরাকার তত্ত্ব সে বুঝে নাই। সে দোষ যদি কারও হয়, তবে তার কচি বয়সের। এই বয়সে এত “লজিক্” ও যুক্তিবাদ কা’রই হজম হয় না। মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান হইলে, কৌলিক ও পৈত্রিক সংস্কার বশতঃ সে এগুলিকে বুতপরস্ত ও পাপ বলিয়া ভাবিতে পারিত। কিন্তু তার আপনার পরিবারে এ সকল প্রতিমাপূজা না হইলেও, অতি নিকট আত্মীয়েরা ঠাকুরদেবতার পূজা করেন, সে ইহাও জানে। কতবার তাঁহাদের

মুখে ঠাকুরদেবতার নাম শুনিয়েছে। কতবার তাঁহাদিগকে এ সকল প্রতিমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে দেখিয়াছে। আমরা ছাড়া তার অপর গুরুজনেরা একেবারেই অজ্ঞ ও সর্বদা অধর্ম্যচরণে রত, আমাদের জন্ম স্বর্গের অনন্ত উন্নতি আর তাঁদের জন্ম নরকের অনন্ত দুর্গতির ব্যবস্থা হইবে,—এ সকল ধর্মোপদেশ সে পায় নাই। এ অবস্থায় চারিপাশে তার আত্মীয়স্বজনেরা, পাড়াপ্রতিবেশীরা, খেলার সাথী ও বিদ্যালয়ের সতীর্থেরা যে দেবদেবীর প্রত্যক্ষ অর্চনা করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি মহিম্মদীয় বা খৃষ্টীয়-প্রকৃতি-সুলভ অশ্রদ্ধা তার হইতেই পারে না। সরস্বতী কে, সে বুঝে না। যাঁহারা এত ধুমধাম করিয়া বৎসর বৎসর এই দেবতার পূজা-অর্চনা করেন, তাঁহারাই সকলে বুঝেন কি? নিরাকার ব্রহ্মবস্তু যে কি, ইহাও সে জানে না। যাঁহারা নিয়ত এই ব্রহ্মের বাস্তবী উপাসনা বা মানস-কল্পনা রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বা কয়জনে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝেন? এই প্রত্যক্ষ সরস্বতী তার বাল্যকল্পনাকে বরং কিয়ৎ পরিমাণে জাগাইতে পারে, ঐ নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাও পারে না। এ অবস্থায় সে যে আমার ঘরে জন্মিয়াও চোরের মতন ঐ সরস্বতীকে প্রণাম করিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ভাবিতেছি, এ প্রণামের অর্থটা কি? আমি দেবদেবীকে প্রণাম করিতে শিখিয়াছিলাম। মা বাবা শিখাইয়াছিলেন। পরিবারের সকলে ইহাদিগকে প্রণাম করেন, দেখিয়াও শিখিয়াছিলাম। শেষে একদিন প্রণাম করিতে চাহিলাম না, বলিলাম—এ যে পুস্তলিকা, ইহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি কেমন করিয়া? সে দিন যে গোল বাধিয়াছিল, তার জের এই চল্লিশ বৎসরেও মিটে নাই। কিন্তু এ বালককে ত এই প্রণাম কেউ শিখায় নাই। সে এমন করিয়া, ভাই ভগ্নীদের উপহাসের ভয়ে, লুকাইয়া প্রণাম করিতে গেল কেন? কেন, আমি তার কি বুঝি? সেও বলিতে পারিবে কি না সন্দেহ। এই লইয়া তার সঙ্গে একটা বিচারেও ত বসিতে পারি না।

তবে সরস্বতীর সঙ্গে লেখাপড়ার একটা কিছু সম্পর্ক যে আছে, এ কথাটা সে অবশ্যই জানে। নহিলে স্কুলে আর কোনও ঠাকুর-দেবতার পূজা হয় না, কেবল সরস্বতীরই হয় কেন? সরস্বতী বিদ্যা-দাত্রী, তাঁর পূজা করিলে বিদ্যালাভ হয়, ইহা সে শুনিয়াছে। আর এই বিদ্যালাভের জন্মই, মনে হয়, সে অমন করিয়া সরস্বতীকে প্রণাম করিল।

অপর একটি বালক, তার পিতামাতাও আমাদেরই মতন, তাঁদের বাড়ীতেও কোনও দিন কোনও প্রকারের প্রতিমার বা দেব-দেবীর পূজা হয় না, সেও সরস্বতীপূজার পূর্বদিন তার মাকে বলিয়াছিল,—“মা আমি সরস্বতীকে অঞ্জলি দিতে যাইব, আর আমার এল্-জাজ্ঞাথানা তাঁর পায়ের কাছে রাখিয়া দিব। তা’হলে আর ওখানা পড়তে হবে না, সব বিদ্যা আপনি জন্মিবে।” এ বালক আমার বালক অপেক্ষা বয়সে বড়। লেখাপড়াও বেশী করে। কথাটা সে কতকটা তামাসা করিয়াই বলিয়াছিল। অস্তুতঃ আমরা সেটাকে তামাসা বলিয়াই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সে তামাসা করিয়াই বলুক আর না বলুক, তার কথার ভিতরে এই সকল দেবদেবীপূজার একটা দিক্ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সে এল্জাজ্ঞা পড়িতে চাহে না। এল্জাজ্ঞা পড়া তার রোচে না। এত ক্লেশ করিয়া যথারীতি সে এ বিদ্যালাভ করিতে রাজী নহে। অথচ এল্জাজ্ঞা না পড়িয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাও পাশ করা যায় না। সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দিয়া যদি কোনও প্রকারে এল্জাজ্ঞা পড়ার ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও এল্জাজ্ঞার পরীক্ষাটা পাশ হওয়া যায়, সে ত বেশ কথা। প্রাচীনকালে যারা বৈদিক যজ্ঞাদি করিত, তারাও কতকটা এই ভাবেই সে সকল কর্মের অনুষ্ঠানে করিত। যাদুকর যেমন আপনার যাদুগুণে মাটিকে সোনা করে, একটা বীজ মুহূর্তের মধ্যে পুতিয়া তাহাতে ফল ধরায় ও সেই ফল পাকাইয়া অকালে লোককে খাইতে দেয়,—এই সকল যজ্ঞকর্মদ্বারা সেইরূপ কোনও অলৌকিক ইন্দ্রজালপ্রভাবে পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়, কিম্বা এই

লোকেই রূপ, ধন, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য প্রভৃতি লাভ এবং শত্রু জয় হয়। এই বিশ্বাসেই লোকে নানাবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত। ক্রমে এ সকল বৈদিক যাগযজ্ঞের এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা এতই প্রবল হইয়া উঠিল, যে যাজ্ঞিক মীমাংসাকেরা বেদের ইন্দ্রাদি দেবতাকে পর্য্যস্ত উড়াইয়া দিলেন। জৈমিনি মুনি স্বয়ং ইহা করিয়াছেন। আর জৈমিনির যুক্তির নিকটে আধুনিক ইহসর্বস্ব, প্রত্যক্ষ-প্রধান ইউরোপীয় যুক্তিবাদ পর্য্যস্ত হার মানিয়া যায়। জৈমিনি বলেন যে ইন্দ্রনামে যদি সত্যই কোনও দেবতা থাকেন, যিনি ঐরাবতে চড়িয়া যজ্ঞমানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যজ্ঞমান যে মৃৎ-ঘট স্থাপনা করিয়া “ইহাগচ্ছ” “ইহতিষ্ঠ”—বলিয়া এই ইন্দ্রদেবতাকে আহ্বান করে, তিনি অবশ্যই সেই ঘটের উপরে আসিয়া বসেন। যদি তাই হয়, তবে ঘট ত একেবারে চূর্ণ হইয়াই যাইবে। ঘট যখন ভাঙ্গে না, তখন বলিতে হয় যে ডাকিলেও ইন্দ্র আসেন না, আর না হয়, ইন্দ্রনামে কোনও দেবতাই নাই। ডাকিলে আসেন না, একথা মানিলে, বেদমন্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়। বেদ কখনও নিরর্থক হইতে পারে না, কারণ বেদ অপৌরুষেয়, আপ্তবাক্য, অভ্রান্ত। সুতরাং ইন্দ্রনামে কোনও দেবতা নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। বৈদিক মন্ত্রে যে ইন্দ্রদেবতার কথা আছে, তাহা কোন বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করে না, যথাবিধি উচ্চারিত হইলে, নির্দিষ্ট যজ্ঞফল উৎপাদন করে মাত্র। এই ভাবে জৈমিনি যজ্ঞের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার অস্তিত্ব পর্য্যস্ত উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ব্যতীত, কেবল কোনও মন্ত্রাদির প্রভাবে যেখানে কোনও বিশিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, সেখানেই আমরা এই ক্রিয়াকে ইন্দ্রজাল বলি। বৈদিক যাগযজ্ঞের এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা খুবই প্রবল ছিল। আর আমাদের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডেও স্বল্পবিস্তর এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা আছে। সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দিলে, পড়াশুনা না করিয়াও, কেবল তাঁহারই বরে,

আকাশ-কোঁড়া বিছা লাভ হয়। তাঁর পায়ে এলুজাত্রা নিবেদন করিলে, রাত্রে বিছানায় শুইয়াই হয় ত প্রাক্তনজন্ম বিছার মতন, বোজগণিতের সকলপ্রকারের কঠিন আঁক কষিবার শক্তিটা আপনা-আপনি পাওয়া যায়। এইভাবে যে অনেক লোকেই, বিশেষতঃ বহুতর স্কুলের বালকেরা, এমন উৎসাহ করিয়া, এতটা ভক্তিভরে এই বাগ্‌দেবতার পূজা করে না, এই কথা বলা যায় না। এই সকল পূজা-অর্চনার এই ঐন্দ্রজালিক প্রভাবটাই সত্য সত্য অনিষ্টকর। ইহাতেই মানুষকে অমানুষ করিয়া ফেলে।

ঐন্দ্রজালপ্রভাবে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সম্বন্ধে মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের কোনও অবসরই থাকে না। এখানে অন্ধ আনুগত্যই সফলতালাভের একমাত্র উপায়। আর এই জন্মই ঐন্দ্রজালিক ধর্ম্মাচরণে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিস্তেজ, তার জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহাকে পশু এবং পুরুষকারকে ত্রিয়মাণ করিয়া তোলে। আত্ম-চেষ্টিয় যেখানে কোনও কিছু পাওয়া যায় না, যন্ত্রারুঢ়ের মতন কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপ করিয়াই যেখানে ঈপ্সিত ফল লাভ হইতে পারে, সেখানে সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যই ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ঐন্দ্রজাল কেবল তামসিক লোকের তমকেই বাড়াইয়া দিতে পারে। ঐন্দ্রজালিক যাগযজ্ঞাদিতে প্রাচীনকালে ইহাই করিয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের এই অতিপ্রাকৃত ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই সত্য সত্য অনিষ্টকর। ভগবান্ বৌদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা রামমোহন পর্য্যন্ত সকলে হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডের এই ঐন্দ্রজালিক দিক্টার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত দেবোপাসনার একটা ঐন্দ্রজালিক দিক্ যেমন আছে, সেইরূপ একটা রসের এবং কাব্যের দিক্ও আছে। ঐ ঐন্দ্রজালিক দিক্ দিয়া দেখিলে, এগুলিকে প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞেরই জের বলিতে পারা যায়। এই রসের ও কাব্যের দিক্ দিয়া দেখিলে, এগুলিকে পৌরাণিক রূপ-কথার বাহিরের অভিব্যক্তি।

বা প্রত্যক্ষ অভিনয়-চিত্র বলা যাইতে পারে। আর ঐ ঐন্দ্রজালিক দিক্টো যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, এ সকল ক্রিয়াকাণ্ডের এই রসের ও কাব্যের দিক্টো নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। এই পৌরাণিকী দিক্টো সকল উন্নত ধর্ম্মেতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও বা বেশী কোথাও বা কম। আর এই পৌরাণিকী কল্পনার সঙ্গে সর্বত্রই ভক্তি সাধনেরও অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমাদের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের ঐ ঐন্দ্রজালিক দিক্টো নষ্ট করিতেই হইবে। না করিলে ধর্ম্মের সত্য মর্ম্ম এবং সাধনের সম্ভাবনীয় শক্তি কোনও দিনই ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল পূজা-অর্চনার বাহ্য ও অলীক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব নষ্ট করিতে যাইয়া, উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা ও রূপক-রূপে, এই সকল দেবদেবীর কল্পনা আমাদের দেশের ভক্তিসাধনের ধারাকে আশ্রয় করিয়াই যে ক্রমে ক্রমে সাধক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এই কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমরা এই যুগে, বালক-বৃদ্ধ কিম্বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সকলেই যে এই সকল পুরাতন পৌরাণিকী রূপকের আশ্রয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন করিতে পারিব, এমনটাও বলা যায় না। কিন্তু কাহারই পক্ষে এগুলি ভক্তিসাধনের সহায় হইতে পারে না, এমন কথাই বা বলিতে পারি কি? কেহ কেহ যে এইগুলিকে ধরিয়া ভক্তিলাভ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, ইহাও ত অস্বীকার করা অসম্ভব। এই জন্মই কালাপাহাড়ের মতন এগুলিকে ভাসিয়া চুরিয়া দিতে চাহি না; চাহিলেও ভাসিতে চুরিতে পারিব না। অন্য পক্ষে এগুলি যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেই ভাবেই চলিয়া গেলে, তাহাদের দ্বারা বর্তমানের ভক্তিসাধন কখনওই কোনও প্রকারে পরিপূষ্টি লাভ করিবে না। আমাদের সমক্ষে নূতন নূতন সমস্তা ও নূতন নূতন আদর্শসকল জাগিয়া উঠিতেছে। এই নূতন ভাবের সঙ্গে ঐ সকল পুরাতন পৌরাণিকী কল্পনার সম্মতি ও সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। এই জন্ম

সরাসরি ভাবে এগুলিকে অসত্য বলিয়া বর্জন করিলে চলিবে না, কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে ও সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া, এ সকলকে যথা-সম্ভব সার্থক ও সজীব করাই প্রয়োজন।

এদেশের সাধনাকে যাঁহারা বড় করিয়া তুলিতে চাহেন, আপনাদের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্মসম্পদভাণ্ডার এবং নিজেদের জাতির বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া, যাঁহারা এ সকলকে আধুনিক কালে উচ্চতম শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে যথাযথ ভাবে মিলাইয়া, বিশ্ব-সাধনার সনাতন পূত ধারাকে পরিপুষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই যুগ-সমস্তার সমন্বয় সাধনে ত্রুটি হইতে হইবে। বিরোধের ও প্রতিবাদের পূর্ব-প্রয়োজন এখন আর নাই। ভাঙ্গার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে; এখন গড়িতে আরম্ভ করা আবশ্যক। আর এই গড়া নিতান্ত পরামু-চিকীর্ষাপর অথবা একান্ত মনগড়া হইলেও চলিবে না। ইহাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপরে, বস্তুতন্ত্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পূর্বাপরের সঙ্গে প্রাণগত যোগ রাখিয়া, আমাদের জাতির জীবনের মূলসূত্র ও চিরন্তন লক্ষ্যকে ধরিয়াই এই নূতন গড়ার কাজটা করিতে হইবে। আমাদেরই ছাঁচে আমরা যেমন যুগে যুগে নব নব আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছি, এই যুগেও তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। বিলাত বা আমেরিকা হইতে নূতন ছাঁচ আমদানী করিয়া, তাহার উপরে এই নূতন জীবনকে ঢালাই করিলে চলিবে না। আর দেশের এই পূর্বাপর ধারাকে রক্ষা করিয়া এই নূতন সমন্বয় সাধন করিতে হইলে, নিজেদের জাতির ভিতরকার ইতিহাসটা ভাল করিয়া ধরিতে হইবে। এইরূপ সমন্বয়-চেষ্টাই বর্তমানের প্রধান কর্তব্য।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুঃখী দাদা

১।

পিতৃহীন অষ্টমবর্ষীয় দুঃখীর মাতা, যখন প্রতিবেশিনী পুঁটির মাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া, তাহার দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের অবসান করিল, তখন পুঁটি দুই বৎসরের বালিকা। পুঁটির মাতা কায়স্থের ঘরের দরিদ্র বিধবা। তাহার স্বামী রামচরণ বাবুদের বাড়ী খানসামার কাজ করিত,—তাহাতেই তাহাদের সংসার একরকম চলিয়া যাইত।

পুঁটি দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। দরিদ্রের গৃহে এত সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইত।

কিন্তু পুঁটুরাণী যে পরিমাণ সৌন্দর্য্য লইয়া এ সংসারে আসিয়াছিল, সেই পরিমাণ অদৃষ্টের জোর লইয়া আসে নাই। আসিয়া থাকিলেও তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত ছিল,—আপাততঃ কিছুই প্রকাশ পাইল না। পুঁটু যখন দেড় বৎসরের, তখন রামচরণ একদিন রাত্রে মনিব-বাড়ী হইতে আসিতে বৃষ্টিতে বড় ভিজিল। ফলে তাহার পরদিনই তাহার জ্বর আসিল। আট দিন বিষমজ্বরে ভুগিয়া, নয় দিনের দিন ভোর বেলা, পুঁটুরাণীকে ফেলিয়া, পুঁটুর মাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া, সে এ ভবের লীলাখেলা সাদ্ধ করিল। পুঁটু ও তাহার মাতা নিরাশ্রয় হইল।

পুঁটুর মা বুঝিল, শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। পুঁটুর মা দরিদ্র হইলেও কখনও গৃহের বাহির হয় নাই, কাজেই সে চক্ষু অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

দেড় বৎসরের কণ্ঠা লইয়া কোন গৃহে দাসীর কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না, তাহা সে বুঝিত। অনেক ভাবিয়া

সে পাড়ার কৈবর্ত বোঁ দুঃখীর মায়ের শরণাপন্ন হইল। দুঃখীর মা এক গৃহস্থের বাড়ীতে বাসনমাজা ঝিয়ের কাজ করিত। সে পুঁটির মাকে দুই চারি স্থানে লইয়া গেল, কিন্তু তাহার কোলে এত ক্ষুদ্র শিশু দেখিয়া কেহই তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিল না। কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরাশ হইয়া অবশেষে দুঃখীর মা বলিল,—“কায়েত দিদি, কোথাও চাকরি নেওয়া তোঁর হবে না। আর কখনও ঘরের বাঁর হোস্‌নি, সে রকম ঝিয়ের কাজ তুই কর্তেও পার-বিনি! তুই ঘরে থেকেই ঠিকে কাজ কর,—আমি তোকে কাজের খবর দেব।”

তারপর দুঃখীর মা'র প্রসাদাৎ পুঁটির মায়ের দিনগুলি একরকম করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। সে কোন বাড়ীর ঝিয়ের অস্থখ হইলে দুদিন গিয়া বাটনা বাটিয়া দিয়া আসিত। কাহারও ঘরের তোলা বাসন মাজিয়া দিয়া আসিত। কাহারও বাড়ী বড়ি দেওয়া হইবে, সে গিয়া ডাল বাটিয়া ফেনাইয়া দিয়া আসিত। কোথাও বা আমসব্ব তৈয়ার হইবে, পুঁটির মা মেয়ে কোলে করিয়া গিয়া আম গুলিয়া ছাঁকিয়া দিয়া আসিত। কাহারও অবস্থা তেমন ভাল নয়, ধোপার বাড়ী কাপড় দেওয়া কষ্টকর, পুঁটির মা'র ডাক পড়িল, সে গিয়া কাপড়গুলি সিন্ধ করিয়া কাটিয়া দিয়া আসিল। কাহারও বৎসরকার ডাল ঝাড়িয়া বাছিয়া দিয়া আসিল,—কাহারও বা মসলাগুলি ঝাড়িয়া ধুইয়া শুকাইয়া দিয়া আসিল। এই সকল কার্য করিয়া সে যাহা পারিশ্রমিক পাইত, তাহা দ্বারাই তাহার সংসার একরকম চলিয়া যাইত।

এইভাবে ছয় মাস গেল। একদিন অকস্মাৎ তাহার অসময়ের বন্ধু কৈবর্ত বোঁয়ের অসময়ে ডাক আসিল। সে সকালে কাজে গিয়া এক ঘণ্টা পরেই শরীর অস্থস্থবোধ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। তারপর বারদুই ভেদ ও বমি হইয়া তাহার নাড়ী ছাড়িয়া গেল। পুঁটির মা তাহার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে

আরম্ভ করিল। বাকশক্তি লোপ হইবার ঠিক পূর্বের সে পুঁটির মায়ের হাতের উপর দুঃখীর হাতখানা তুলিয়া দিয়া বলিল,—“দুঃখী তোমার, দেখো”—আর কিছু বলিতে পারিল না। পুঁটির মা বলিল,—“তুই কিছু ভাবিস্নি বোঁ, আমার পুঁটিও যে, দুঃখীও সে—তুই ইষ্টি-দেবের নাম কর।” কৈবর্ত বোয়ের মৃত্যু-বিবর্ণ মুখখানা মুহূর্তের জন্ম একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—তারপরেই সব ফুরাইল। দুঃখী “মাগো” “মাগো” বলিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। পুঁটির মা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল।

২।

সে আজ চার বৎসরের কথা। দুঃখী এখন বার বৎসরের বালক, পুঁটি ছয় বৎসরের বালিকা। দুঃখী জাতিতে কৈবর্ত হইলেও পুঁটির মা তাহাকে আপন সন্তানের মতই প্রতিপালন করিতেছে। পুঁটি তাহার সঙ্গে একত্র আহার করে, একত্র খেলা করে। রাত্রে ক্ষুদ্র শয্যায় পুঁটির মা তাহাদের উভয়কে লইয়াই শয়ন করে। দুঃখী নানাপ্রকারে তাহার সাহায্য করে। সে এখন কোথাও কাজ করিতে গেলে আর পুঁটিকে সঙ্গে লইয়া যায় না, দুঃখীই তাহাকে লইয়া ঘরে থাকে। তাহারা উভয়ে মিলিয়া রন্ধনের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখে,—পুঁটির মা আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া রন্ধন চড়াইয়া দেয়। কোন দিন দুঃখী দুই এক পয়সার মাছ কিনিয়া আনে, বা কোন দিন কাহারও বাড়ী হইতে পুঁটির মাকে দু’এক খানি মাছ আনিয়া দেয়। পুঁটির মা নিজের অন্ন ব্যঞ্জন সরাইয়া রাখিয়া ভিন্ন হাঁড়িতে করিয়া তাহাদের সেই মাছ রাঁধিয়া দেয়। দরিদ্র হইলেও পুঁটির মা একবেলা হবিষ্যন্ন ভোজন করে, কলিকাতার সাধারণ কিয়েদের মত সে মাছ মাংস খায় না। তবে সে সিদ্ধ চাউল খায়, আতপ চাউল খাইবার মত অর্থ-সংস্থান কোথায়? পুঁটির মাতা উঠানে লাউ কুমড়া কাঁচা লক্ষা ও নানারকম শাক লাগাইয়াছিল। নিজেদের প্রয়োজন-

মত রাখিয়া বাকী তরকারী ও বড়ি, আমসব ও সময়োপযোগী নানাবিধ আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সে দুঃখীর দ্বারা বাজারে পাঠাইয়া দিত। দুঃখী সে সকল বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিত। দুঃখী তাহার সংসারে আসিয়া যেমন ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছিল, তেমন আয়ও বৃদ্ধি করিয়াছিল।

পুঁটির মা মনে মনে ভাবিত,—“দুঃখী এমন ভাল ছেলে, সে যদি কৈবর্ত না হইয়া কায়েত হইত, তবে আমার পুঁটির বিবাহের ভাবনা থাকিত না। হায়! এ নিরাশ্রয় বিধবার মেয়ে কে বিবাহ করিবে?”

কিন্তু তার এ ভাবনা আর বেশীদিন ভাবিতে হইল না। যম-রাজা দেখিলেন, ইহারা ত বেশ সুখে আছে! কিছুতেই ইহাদের কিছু করা গেল না! তবে আর এক চাল চালা যাক। যম-রাজার খাতায় এবার পুঁটির মায়ের নাম উঠিল, এবং অল্পদিন পরেই তাহার বাহকগণ পুঁটির মায়ের নিতান্ত অমতে ধরিয়া বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া গেল। যাইবার পূর্বে কাঁদিতে কাঁদিতে সে দুঃখীকে বলিল,—“দুঃখী বাবা! ছোট বোনটি তোমার রইল, ভিক্ষে ক’রেই থেও, কিন্তু ওকে ফেলো না”। দুঃখী দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইয়া আকুল স্বরে রোদন করিতে লাগিল। পুঁটি ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, হতভম্ব হইয়া গেল। পাড়ার কয়েকজন লোক আসিয়া মৃত-দেহ সংকার করিল।

দ্বাদশবর্ষীয় বালকের উপর এবার সংসারের ভার পড়িল। পুঁটি দিনরাত “মা” “মা” করিয়া অস্থির হয়,—দুঃখী তাহাকে আদর করিয়া, অনুনয় করিয়া খেলনার প্রলোভন দেখাইয়া কিছুতেই শাস্ত করিতে পারে না। পুঁটির মায়ের বাক্সে সামান্য যাহা কিছু অর্থ ছিল, সংকারের খরচ দিয়া দুই টাকা তের পয়সা রহিল। ঘরে সামান্য কিছু চাল ডাল ছিল, তাই দিয়া দুঃখী এক মাস চালাইল। দুঃখে কষ্টে মানুষ দুঃখী রন্ধনাদি গৃহকর্মে নিতান্ত অপটু ছিল না। সে কোন

রকমে ডাল ভাত রাঁধিয়া লইত,—মাঝে মাঝে দুই এক পয়সার চুনা মাছ আনিয়া একটু অশ্বল রাঁধিত। কচিং দু'এক দিন একটি চিংড়ী মাছ বা কৈ মাছ আনিয়া সে পুঁটিকে ভাজিয়া দিত, নিজেকে লইত না। সন্ধ্যাবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পুঁটুর মাথা কোলে লইয়া সে নানা রকম হাস্যোদ্দীপক গল্প বলিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত। পুঁটি কখনও কখনও মায়ের দুঃখ ভুলিয়া গল্প শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইত, ও মাঝে মাঝে সোৎসুক “তারপর” “তারপর” বলিয়া দুঃখীর আনন্দ বর্ধন করিত। কখনও কখনও কিন্তু সে কিছুতেই ভুলিত না,—“মা” “মা” বলিয়া কঁাদিয়া অশ্রির হইত,—তারপর কঁাদিতে কঁাদিতে অবসন্ন হইয়া সে দুঃখীর কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। দুঃখী তখন আর কিছুতেই তাহাকে জাগাইত না। কষ্টে, অতি কষ্টে ঘুমন্ত পুঁটিকে ভুলিয়া সে ঘরে লইয়া যাইত। পুঁটির জন্ত সে নিজেকে একেবারে ভুলাইয়া দিয়াছিল।

এক মাস গেল।—ক্রমে বাস্তব শূন্য হইয়া আসিল, ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিল। দুঃখী চক্ষুে অন্ধকার দেখিল,—তাহার ক্ষুদ্র মস্তক আলোড়িত করিয়া সে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে এমন দিন আসিল যখন বাস্তব একটি পয়সা নাই, ঘরে এক কণিকা চাউলও নাই। দুঃখী চুপ করিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিল। বেলা হইলে যখন পুঁটু “দুঃখী দাদা, ক্ষিধে পেয়েছে” বলিয়া কঁাদিতে লাগিল, তখন দুঃখী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে বেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বেলা দ্বিপ্রহরে সে ভিক্ষা করিয়া দুই মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া ঘরে ফিরিল এবং অন্ন প্রস্তুত করিয়া অর্ধেক পুঁটিকে খাওয়াইল, বাকী অর্ধেক পুঁটুর রাত্রে জন্ত ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে পুনরায় দাওয়ায় গিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা তাহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে যখন পুঁটির মায়ের প্রদত্ত বড়ি আচারাদি ও শাকসব্জী লইয়া বাজারে যাইত, তখন দেখিত অসংখ্য মুটে ঝাঁকা হাতে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে। তাহারা ত মুটেগিরি করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে,—তবে দুঃখীই বা না পারিবে কেন? অবশ্যই পারিবে! সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। পরদিন পাড়ার একজনের কাছে পয়সা ধার করিয়া সে ছোট দেখিয়া একটি ঝাঁকা কিনিল। সে প্রত্যহ বাজারে গিয়া অশ্রুাশ্রু মুটেদের সঙ্গে রীতিমত কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। দুর্ব্বহ বোঝা মাথায় লইয়া চলিতে চলিতে যখন তাহার শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিত, তখনই পুঁটুর ক্ষুধাক্লিষ্ট মলিন মুখখানি স্মরণ করিয়া সে শরীর মনে অসীম বলের সঞ্চার করিয়া লইত। তাহার দায়ীত্ব-জ্ঞান, তাহার আগ্রত্যাগ, তাহার স্নেহ-ভালবাসা দেখিলে কেহই তাহাকে দ্বাদশবর্ষীয় বালক মনে করিতে পারিত না। মাতৃহীন বালকের নিজের দুঃখ ভুলিয়া মাতৃহীনা শিশুকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস দেখিয়া অশ্রুজল সঞ্চার করা কঠিন হইত। আরও দুই বৎসর কাটিল। দুঃখীর ছোট ঝাঁকার পরিবর্তে বড় ঝাঁকা আসিল।

৩।

রাস-পূর্ণিমায় টালীগঞ্জে ভারি মেলা। বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন চড়াইয়া দিয়া দুঃখী কহিল, “পুঁটি, রাস দেখতে যাবি?” সোৎসাহে আট বৎসরের বালিকা পুঁটি কহিল,—“হ্যাঁ দুঃখী দাদা, যাব।” দুঃখী বলিল,—“রান্নাটা সেৱে খেয়েদেয়ে নি, তারপর যাব।”

কিন্তু পুঁটির কি আর সহ হয়? সে ক্ষণে ক্ষণে “কখন যাব দুঃখী দাদা” বলিয়া প্রাণের আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। দুঃখী হাসিয়া বলিল, “আরে পাগলি, না খেয়েই যাবি? ক্ষিধেয় মরে যাবি যে?” অমনি তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া পুঁটি বলিল, “না দুঃখী দাদা, কখনও ম’রে যাব না। আচ্ছা, তুমি দেখে নিও, আমি এক-বারও বলব না যে ক্ষিধে পেয়েছে।” দুঃখী তাহাকে বুঝাইয়া

বলিল,—“না খেয়ে কি এতটা পথ হাঁটা যায় ? আচ্ছা পুঁটি, তুই হেঁটে যেতে আসতে পারবি ত ?”

হাসিয়া পুঁটি বলিল,—“তা আর পারব না ? আমি রোজ কত হাঁটি তা জান ? এ-ই এখান থেকে অ—ই শিবুদের ঘর পর্য্যন্ত কত বার হেঁটে যাই আসি।”

তাহার দীর্ঘ পথের অভিজ্ঞতা দেখিয়া দুঃখী হান্ত সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল,—“সে যে ওর চেয়েও অনেক বেশী পথ রে ! আচ্ছা, তুই খানিক হাঁটিস্, খানিক আমার কোলে উঠিস্।” সবগে তাহার ঝাঁকড়া চুলভরা মাথাটি নাড়িয়া পুঁটি বলিল,—“না বাপু আমি কোলে টোলে উঠতে পারব না,—এত বড় বড় মেয়ে আবার কোলে ওঠে কি ?”

দুঃখী বলিল,—“আচ্ছা পাগলি, তুই হেঁটেই যাস্, এখন যা ত খালা দুখানা নিয়ে আয়, ভাত হয়ে গেছে।”

আহারাদির পর দুঃখী পুঁটীকে সঙ্গে লইয়া টালীগঞ্জাভিমুখে রওনা হইল। তাহার কষ্টলব্ধ অর্থ হইতে চার আনার পয়সা সে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া লইল। পুঁটু যদি সখ করিয়া কিছু কিনিতে চাহে, তবে আজ প্রাণ ধরিয়া কেমন করিয়া সে কহিবে যে পয়সা নাই। আহা ! পুঁটু যে জীবনে কখনও ঘরের বাহির হয় নাই,—কিছু দেখে নাই !

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া পুঁটু এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিল। কত লোকজন, সারি সারি কত দোকানপাট, তাহাতে রাশীকৃত কত জিনিসপত্র, কত রং-তামাসা, পুতুল-নাচ প্রভৃতি। পুঁটি হতভম্ব হইয়া গেল। দুঃখী তাহাকে দুই চারিটি খেলনা কিনিয়া দিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইলে, দুঃখী বলিল,—“পুঁটি, তুই এই গাছ-তলায় একটু বোস, আমি খাবার কিনে নিয়ে আসি, দেখিস্ যেন এখান থেকে কোথাও যাস্ নি।” দুঃখী খাবার কিনিতে একটু দূরেই গিয়া পড়িল। খাবার কিনিয়া ফিরিবার পথে সে দেখিল একস্থানে

জনতা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া কি দেখিতেছে। দুঃখী কোতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না—থাবারের ঠোঙ্গা হাতে করিয়াই সে অগ্রসর হইল। এক বেদিনী একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে সম্মুখে বসাইয়া তাহার দাঁতের পোকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের ঘিরিয়া কতকগুলি লোক বিষয়-বিমুগ্ধনেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। দুঃখীও ক্ষণেকের জন্ত পুঁটির কথা ভুলিয়া, সেই দৃশ্যের পরিসমাপ্তি দেখিবার জন্ত সেখানে দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পর, বেদিনীর কৃতকার্যতায় সেই জনতা যখন উৎসাহে কোলাহল করিয়া উঠিল তখন সহসা দুঃখীর স্মরণ হইল, গাছতলায় পুঁটি একা আছে।

সে একরকম ছুটিয়াই সেখান হইতে বাহির হইল। সেই গাছতলায় আসিয়া দেখিল পুঁটি সেখানে নাই! প্রথমে সে মনে করিল তাহার স্থান-ভ্রম হইয়াছে। সে সেখানকার সকল গাছতলাই দেখিল, কিন্তু কোথায় পুঁটি! সেই থাবারের ঠোঙ্গা হাতে দুঃখী তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থানটি খুঁজিল, কিন্তু হায়! কোথাও পুঁটির দেখা পাইল না। সে যত প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকে “পুঁটি” “পুঁটি”, তাহার চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহার কর্ণেই ফিরিয়া আসে। তাহার হৃদয়টা শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল! ওরে, পুঁটি যে তার সব! পুঁটিকে না পাইলে সে যে একদণ্ডও বাঁচিবে না। সে একই স্থানে পাঁচবার খুঁজিল, তবু আশা তার যায় না।

অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে অবসন্ন হইয়া যখন সে দেখিল পুঁটিকে পাইবার আর কোন আশা নাই, তখন সে থাবারের ঠোঙ্গা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। রাত্রি ক্রমেই গভীর হইল, সেস্থান জনশূন্য হইল। একজন পাহারাওয়াল, যাইতে যাইতে লণ্ঠনের আলোকে দেখিল, একটি বালক ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া দুই হস্তে মাথার চুল ছিঁড়িতেছে। সে সযত্নে তাহাকে তুলিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অশ্রুসিক্তকণ্ঠে দুঃখী সব কথা

বলিল। কোমলকণ্ঠে পাহারাওয়ালা বলিল, “এখানে পড়ে থেকে আর কি করবে? আজ ঘরে যাও, কাল থানায় খবর দিও, যদি কিছু হয়।”

দুঃখী উঠিল। যন্ত্রচালিতের স্থায় সে গৃহাভিমুখে চলিল। সমস্ত জগৎ আজ তাহার নিকট শূন্য! পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত, কিন্তু দুঃখীর নিকট আজ চতুর্দিক অন্ধকার! বাতাসে যেন হাহাকার, পক্ষীর কণ্ঠে করুণ গীতি, বৃক্ষের মর্ম্মরে দুঃখতান! সমস্ত আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া একটা বিরাট শূন্যতা! বিদীর্ণপ্রায় বন্ধ চাপিয়া ধরিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে দুঃখী শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিল। গৃহের চতুর্দিকেই পুঁটির স্মৃতি,—দুই হাতে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া দুঃখী শয্যার উপর গিয়া পড়িল। তারপর বুকফাটা দুঃখে সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পুঁটিকে যে সে কতখানি ভালবাসিত তাহা ত সে এ ভাবে আগে বোঝে নাই! তা কি বোঝা যায়! প্রিয়জন যে আমাদের হৃদয় কতখানি জুড়িয়া থাকে তাহা ত আগে বোঝা যায় না! অভাবে তাহা আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি করাইয়া দেয়। কিন্তু হায়! তখন ত তাহা বৃথা! তাহাদের প্রতি কত অসমাপ্ত কর্তব্য, কত অকথিত বাণী মনেই রহিয়া যায়। আমাদের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া সেইগুলির স্মৃতি হৃদয় মন জর্জরিত করে!

৪।

সময় কাহারও জন্ত বসিয়া থাকে না। তারপর দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে,—দুঃখী আজিও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু সে দুঃখী আর নাই! মুখে হাসি নাই, পেটে অন্ন নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই। পরিধানে ছিন্ন বাস, মাথার চুলগুলো রুদ্ধ। আজ দশ বৎসর সে পুঁটিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, তবু আশা তার যায় নাই। পুঁটি প্রাণে বাঁচিয়া

নাও থাকিতে পারে, একথা তাহার কখনও কল্পনায় আসে নাই। পুঁটিকে খুজিয়া বাহির করাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে এখনও প্রত্যহ কাঁকা হস্তে বাজারে গিয়া দাঁড়ায় সত্য, কিন্তু লোকে প্রায়ই তাহাকে ডাকিয়া পায় না। সে প্রত্যহ দুই চারিটা পয়সা পাইলেই আর কোথাও যায় না। সে আজ দশ বৎসর রন্ধন করিয়া খায় নাই, দুই চারি পয়সার মুড়ি বা চিঁড়াই তাহার একমাত্র আহার। অবশিষ্ট সময় সে পুঁটির সন্ধান করিয়া বেড়ায়। সে কলিকাতার প্রত্যেক রাস্তার প্রত্যেক গৃহে অসংখ্যবার সন্ধান করিয়াছে, তবু তার মন মানে না। লোকে এখন তাহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে করে। তাহাকে দেখিলে,—“ঐ রে সেই পাগল আবার এসেছে”—বলিয়া সকলে হাস্য বিদ্রূপ করে। কেহ কেহ বা তাহাকে নিকটে ডাকিয়া স্নেহ প্রশ্ন করে, কেহ বা কখনও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আহার করিতে দেয়। তাহার কিছুতেই ভ্রম্প্রাপ্ত নাই। লোকের আদর ও অনাদর তাহার সমস্তান। সেসকল বিষয়ে চিন্তা করিবার তাহার অবসর নাই। এক পুঁটির চিন্তা ব্যতীত তাহার মনে অন্য চিন্তার স্থান কোথায় ?

সুদীর্ঘ দশটি বৎসর সে অনন্তকর্ম্ম হইয়া পুঁটির সন্ধান করিতেছে। এই দশ বৎসরে তাহার প্রাণের ব্যাকুলতার কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই।

লোকে বলে সময়ই প্রকৃত শান্তিদাতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখকষ্টের তীব্রতা কমিয়া আসে। কিন্তু দুঃখীর ত তাহা হইল না। যত দিন যায়, তাহার হৃদয়ে পুঁটির স্মৃতি তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠে।

ওরে পুঁটিরে, তোর মনে এই ছিল! এইরূপ নির্ম্মম নিষ্ঠুরের মতই যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবি, তবে ঐ কোমল বাহু দুটি দিয়া অমন করিয়া জড়াইয়াছিলি কেন? ঐ সরল হাসি মধুর কথা দিয়া হৃদয়টাকে এমন করিয়া বন্ধন করিয়াছিলি কেন? সে যে

ভুলিবার নয়, সে যে ভোলা যায় না রে ! হৃদয়ের এ আর্তনাদ ত কিছুতেই ঘুচিবার নয় !

সুদীর্ঘ দশটি বৎসর সে অনাহারে, অনশনে, পুঁটিকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু কৈ কখনও একটু অবসাদের ভাবও তার মনে আসে নাই।

একদিবস দ্বিপ্রহরে দুঃখী পথপ্রান্তে একটি অটোলিকার থামের গায়ে হেলান দিয়া নীরব নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সে তখন অত্যন্ত অশ্রুমনস্ক, তাহার উদাস দৃষ্টি যে কোথায় নিবদ্ধ তাহা সে বোধ হয় নিজেই জানে না, তাহার মন যে ঠিক কোথায় তাহাও সে জানে কিনা সন্দেহ।

রাস্তার কতকগুলি লোক জটলা করিয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ডেপুটি সতীশবাবুর পুত্রের কাল অন্তপ্রাশন। সতীশবাবু খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুত্রের অন্তপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া, শাঁথারিপাড়ায় বাসা করিয়াছেন। সতীশবাবুর মাতার বড় সাধ, মা কালীর প্রসাদ মুখে দিয়া নাতির অন্তরস্ত করাইবেন। সতীশবাবুরও ইচ্ছা প্রথম পুত্রের অন্তপ্রাশন একটু ধুমধাম করিয়া করিবেন,—বন্ধুবান্ধব লইয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিবেন।

সতীশবাবুর লোকজন বাজারে আসিয়া জিনিসপত্র কিনিয়াছিল মেলা, কিন্তু তাহা বহন করিবার মুটে পাওয়া যাইতেছিল না। ইহাই এত কোলাহলের কারণ।

অনেক কষ্টে কতকগুলি মুটে জুটিল। তিনজনের বোঝা একজনের মাথায় চাপাইয়া দিয়াও দেখা গেল অস্তুতঃ আর একজন না হইলে কিছুতেই চলে না। সহসা একজনের দৃষ্টি দুঃখীর উপর পড়িল। সে বলিল,—“ঐ পাগ্লাকে নেও না।” আর একজন লিল,—“গেলে ত, ওর যে মর্জিমত কাজ।” সতীশবাবুর ক কর্মচারী বলিলেন,—“বেশী পয়সা কবুল করলেও যাবে না ?”

সে কথা শুনিয়া মুটেমহলে হাসির ধূম পড়িয়া গেল। একজন বলিল, “বাবু, ওর কি পয়সার লোভ আছে? পয়সার লোভ থাকলে ও কত কামাতে পারত। ওর কাছে পয়সা আর ধূলা সমান।” সতীশবাবুর সেই লোকটি তখন বলিলেন,—“আচ্ছা, আমি ওকে বুঝিয়ে নিয়ে আসছি।”

দুঃখী কিন্তু এ সকল কিছুই লক্ষ্য করে নাই,—এত কোলাহল তার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই। সেই বাবুটি যখন আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন, তখন সে চমকিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “ওহে বাবু, আমার একটু উপকার করতে পার?”

দুঃখী বলিল,—“কি বাবু?”

“আমাদের বাবুর ছেলের কাল ভাত। বাজার করতে এসে অনেক জিনিসপত্র কিনে ফেলেছি, নিয়ে যাবার লোক পাচ্ছি না। তুমি একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে? তা হলে বড় উপকার হয়।”

ছোট্ট রকমের একটি নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখী বলিল,—“চলুন বাবু, কতদূর যেতে হবে?”

“বেশী দূর নয়, এই ২৯ নং শাঁখারিপাড়া।”

৫।

মোট লইয়া দুঃখী যখন ২৯ নং শাঁখারিপাড়ায় পৌঁছিল, তখন সেই গৃহে মহা কোলাহল লাগিয়া গিয়াছে। দুয়ারের দুই পার্শ্বে কদলী বৃক্ষের সম্মুখে মঙ্গলঘট বসিয়াছে,—বারান্দায় নহবত বাজিতেছে। নহবতের করুণ সুরে, কি জানি দুঃখীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। দুঃখী সকলের সঙ্গে উঠানে আসিয়া মোট নামাইল। সঙ্গে বাবুটি তাহাদিগকে বাহিরে গিয়া পয়সার জন্ম অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অশ্রুশ্রু মুটেরা গেল,—দুঃখী কিন্তু গেল না। সে চিত্রা-পিতের শ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি তখন প্রান্তণের পার্শ্বে ক্রীড়ামণ্ডা, ফুটন্ত মল্লিকা ফুলের মত একটি তিন বৎসরের বালিকা

উপর পড়িয়াছিল। বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া দুঃখী প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল,—তারপর কি এক উদ্বেজনায তাহার সমস্ত শরীর মন কম্পিত হইতে লাগিল।

ওরে তুই কে রে ? তোর মুখে যে সেই মুখখানি বসান ! তাহার ইচ্ছা হইল সে ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার দশ বৎসরের বুভুক্ষিত হৃদয়ের ক্ষুধা মিটায়। সাহসে কুলাইল না,—যদি কেহ দেখিয়া ফেলে ! তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে ! সে একজন রাস্তার সামান্য মুটে,—হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার কোথায় ? সে ক্ষুধিত ভূষিত নেত্রে বালিকার প্রতি চাহিয়া রহিল।

বালিকা কতকগুলি খেলনা লইয়া আপন মনে খেলিতেছিল, ও কত কি বকিয়া ঘাইতেছিল। দুঃখীর স্থির দৃষ্টি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে ফিরিল,—মধুর হাসি হাসিয়া বলিল,—“আমি নান্না ক’চ্ছি, তুমি ভাত খাবে ?”

একি ! একি প্রহেলিকা ? এ যে সেই কণ্ঠস্বর ! এই সময় বালিকার ঠাকুরমা আসিয়া বলিলেন,—“এখানে কি ক’চ্ছিস্ লতি, ঘরে যা। রোদে থাকলে অস্থখ করবে।” তারপর দুঃখীর প্রতি দৃষ্টি পড়াতে বলিলেন,—“ওমা, এই যে এখানে আর একজন মুটে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলে যে পয়সা নিয়ে চলে গেল, তুমি দাঁড়িয়ে কি করছ ? বোমা, একজন মুটের পয়সা বাকী আছে, তাকে পয়সা দিয়ে যাও মা” বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

“যাই মা” বলিয়া, ছয়মাসবয়স্ক গৌরবর্ণ নখরকান্তি শিশুকোড়ে একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া রমণী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দুঃখীর দৃষ্টি সেদিকে ছিল না,—সে পলকহীন নেত্রে ক্ষুদ্র লতিকে দেখিতেছিল। তি ঠাকুরমার আজ্ঞা পালন করিবার জন্ত খেলনা প্রভৃতি গুছাই-
ছিল। রমণী যখন নিকটে আসিয়া বলিল, “পয়সা নাও”—তখন
স অশ্রুমনস্ক ভাবে হস্ত প্রসারণ করিল।

তাহার প্রসারিত হস্তে পয়সা দিতে গিয়া রমণী তাহার মলিন মুখখানার পানে চাহিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। তারপর আবার ভাল করিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—

“তুমি—তুমি কি দুঃখী দাদা?”

দুঃখী এবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। একি স্বপ্ন! না মায়া! এর মুখখানি ত ঠিক পুঁটির মত, কিন্তু তবু পুঁটি বলিয়া ত মনে হয় না! কিন্তু পুঁটি না হইলেই বা তাহাকে “দুঃখী দাদা” বলিয়া সম্বোধন করিবে কে? সে হতভম্ব হইয়া রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিল। রমণী পুনরায় আগ্রহভরে বলিল,—“বলনা, তুমি কি দুঃখী দাদা? তোমাকে দেখে যে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে! বল বল, সত্য করে বল তুমি কে?”

দুঃখী প্রকৃতিস্থ হইল। অক্ষুট স্মরে একবার বলিল, “পুঁটি!” তারপর আর কথা বলিতে পারিল না। অশ্রুজলে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল,—দৃষ্টি লোপ পাইল। সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আজ দশ বৎসর পর সে পুঁটির সাক্ষাৎ পাইয়াছে কিন্তু কি ভাবে! এর চেয়ে যে না পাওয়া ভাল ছিল! পুঁটি আজ ধনীর গৃহিণী, আর সে সামান্ত রাস্তার মুটে। আর কি সে তাহাকে সেইরূপ স্নেহ ভালবাসা দিবার অধিকার পাইবে? আর কি পুঁটি তাহার আদরে গলিয়া গিয়া তাহাকে সেই রকম করিয়া “দুঃখী দাদা” বলিয়া ডাকিবে! এখন যে তাহাদের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

আর যে সহ্য হয় না রে! বুকটা যে ফাটিয়া যায়! কেন সে পুঁটির দেখা পাইল! সে যে দশ বৎসর অনাহারে, অনিদ্রায় রাস্তায় রাস্তায় পুঁটিকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে,—তাহার মধ্যে দুঃখ থাকিলেও একটা সুখও ছিল, একটা বিরাট আশা ছিল। আর আজ! আজ! যে তাহার সকল আশার অবসান! পুঁটির নিকটে থাকিয়া পরে

মত ব্যবহার করা যে তাহার পক্ষে অসম্ভব ! পুঁটি আজ ডেপুটির গৃহিণী ও সন্তানের জননী হইলেও, দুঃখীর নিকট সে ত চিরকাল তাহার আদরের ছোট বোনটিই থাকিবে ! হায় ভগবান ! তাহার অদৃষ্টে সকলই লিখিয়াছিল, কেবল মৃত্যুই লেখ নাই !

সতীশবাবু ঘর হইতে ডাকিলেন,—“পুঁটু, সেকরা গোকার গয়না এনেছে, পছন্দ হয় কিনা দেখে যাও ।”

পুঁটু দৌড়িয়া গিয়া স্বামীর হস্তধারণ করিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল,—

“ওগো, দেখ, দুঃখী দাদা এসেছে,—কিন্তু সে কেবলই কাঁদছে. কোন কথার উত্তর দিচ্ছে না ।” সতীশবাবু বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন,—

“দুঃখী দাদা এসেছে ! তুমি কি বলছ পুঁটি ! দুঃখী দাদাকে কোথা থেকে কেমন করে পেলে ?” পুঁটু চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে

বলিল,—“আজ বাজার থেকে যে সব মুটে জিনিষপত্র এনেছে, পয়সা দিতে গিয়ে দেখি, তাদের মধ্যে একজন দুঃখী দাদা । তুমি শীঘ্র এস, তাকে তুলে ঘরে নিয়ে যাবে ।” পুঁটি ফিরিয়া আসিয়া দুঃখীর হাত ধরিয়া বলিল,—“দুঃখী দা, ঘরে চল ।” সতীশবাবু সস্নেহে বলিলেন,—“দুঃখী দা, কাঁদছে কেন ?” দুঃখী মুখ তুলিয়া দেখিল, উভয়ের মুখে কোমল দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর স্নেহমাখা । দুঃখী ভাবিল ইহারই নাম কি দয়া ! পুঁটির ও তাহার স্বামীর কি তাহার মলিন বসন, ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া দয়া হইতেছে ? ওরে না রে সে যে আরও অসহ ! পুঁটির নিকট দয়ার দান সে ত কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না ! তাহা অপেক্ষা পুঁটি তাহার হস্তে বিষপাত্র তুলিয়া দেয় না কেন ?

কিন্তু না, তাহা ত নয় । পুঁটি ত তাহাকে সেই পূর্বের মতই “দুঃখী দাদা” বলিয়া ডাকিয়াছে ! সতীশবাবুও ত চিরপরিচিতের শ্রায়ই ব্যবহার করিতেছেন । সে যে কি ভাবিবে তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না,—কাতর দৃষ্টিতে একবার পুঁটি ও একবার তাহার স্বামীর পানে চাহিতে লাগিল । সাক্ষ্যনয়নে পুঁটি

বলিল,—“কি হয়েছে দুঃখী দা, অমন করছ কেন ? চলনা ঘরে । ওগো, তুমি একবার ধরনা, দেখছ না দুঃখী দা কি রকম করে কাঁপছে !”

সতীশবাবু সম্বন্ধে তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন । পুঁটি তাহার কন্যাকে ডাকিয়া দুঃখীর নিকট বসাইয়া দিয়া, পুত্রকে তাহার কোলে দিয়া বলিল,—“এই নাও দুঃখী দা, আজ থেকে ওদের জন্ত নিশ্চিন্ত হনুম । লতি, এই যে তোর দুঃখী মামা ।”

দুঃখীর প্রাণটা জুড়াইয়া গেল ।

৬ ।

তারপর পুঁটি দুঃখীর স্নানের আয়োজন করিয়া দিল । স্নানান্তে দুঃখী সতীশবাবু-প্রদত্ত শুভ্র বস্ত্র ও জামা পরিয়া আহারে বসিল । সতীশবাবুর আহার অনেক পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল,—তিনি আসিয়া দুঃখীর নিকট বসিলেন । পুঁটি কাছে বসিয়া যত্নপূর্বক তাহাকে ভোজন করাইল । সতীশবাবুর মাতাও তাহার আহারিক পূজা সমাপনান্তে, আহারাদি করিয়া সেখানে আসিলেন । দুঃখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“এতকাল পরে তোমায় পেয়ে বড়ই সুখী হয়েছি বাবা ! বৌমার মুখে তোমার কথা আর ধরে না,—সেই জন্তই তোমায় অচেনা মানুষ ব’লে মনে হোচ্ছে না ।” দুঃখী কৃতার্থ হইয়া গেল ।

আহার শেষ হইলে পুঁটি তাহার জন্ত একটি ঘরে শয্যা পাতিয়া দিল । পান আনিয়া দিয়া তাহার নিকট বসিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল,—

“দুঃখী দা, সেই মেলার দিন তুমি যখন খাবার আনতে গিয়ে দেরী করতে লাগলে, আমার বড় ভয় হোল, আমি কেঁদে ফেললাম । একটি আধ-বয়সী ভদ্রলোক আমার কাশা শুনে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন “কাঁদছ কেন, খুকি ?” তারপর আমাকে কোলে করে :

তোমায় কত খুঁজে বেড়ালেন,—কোথাও তোমায় পাওয়া গেল না। তখন তিনি আমায় বল্লেন, “আমার সঙ্গে আজ আমার বাড়ী চল, কাল তোমার দুঃখী দাদাকে খুঁজে দেব।” আমি তখন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, কিছুই বললাম না। তিনি যখন গাড়ী করে আমায় নিয়ে তাঁর বাড়ীতে নাবলেন, তখন যেন সব বুঝতে পারলাম। ‘দুঃখী দাদা’ বলে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলাম।”

দুঃখীর নয়নপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল।

পুঁটি বলিতে লাগিল,—

“তিনি আমায় কোলে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন,—“সুশী, এই মেয়েটি একা একা গাছতলায় বসে কাঁদছিল,—আমি নিয়ে এলাম।”

সেই স্ত্রীলোকটি আমায় কত আদর কর্লেন, কত চুম খেলেন, কিন্তু আমার বুকটা ফেটে যেতে লাগল। আমি আরও কান্না জুড়ে দিলাম। তাঁরা দু’জনে আমায় অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন,—“কেদনা লক্ষ্মীটি, কাল সকালেই তোমার দুঃখী দাদার কাছে দিয়ে আসব।” আমি সেই কথা শুনে একটু শান্ত হয়ে তাঁদের দেওয়া খাবার খেয়ে, তাঁদের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সেই স্ত্রীলোকটি আমার কাছে শুয়ে, আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সেই ভদ্রলোকটি এসে বিছানার পাশে বসে বল্লেন,—“সুশী, তোমার সম্ভান নেই বলে বড় দুঃখ, তাই বুঝি ভগবান একে ক্ষুটিয়ে দিয়েছেন। একে দিয়েই সম্ভানের সাধ মিটিয়ে নিও।” রমণী আমায় বুকে চেপে ধরে বল্লেন,—“তুমি সত্যি বলছ ? একে আমায় দেবে ? আবার ছিনিয়ে নিয়ে যাবে না ত ?” তাঁর চক্ষে তখন জল। ক্ষুদ্র শিশু আমি, তখন কিছুই বুঝি নি, অবাক হয়ে তাঁদের কথা শুনছিলাম। এখন বুঝতে পারি সম্ভানহীনা রমণীর বুভুক্ষিত হৃদয়ের বেদনা সেই কথাগুলির মধ্যে কেমন করে ফুটে উঠেছিল !

পুঁটুর নয়নে অশ্রু দেখা দিল,—সে অঞ্চল দ্বারা তাহা মার্জনা করিয়া কহিতে লাগিল,—“আমি তখন আট বৎসরের বালিকা, কিন্তু সেই দিনকার কথাগুলি যেন ছবির মত আমার মনে আঁকা রয়েছে। আমি একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লাম,—কিন্তু তারপর আমি তাঁদের কাছে শুনেছিলাম যে রাত্রে অনেকবার ‘দুঃখী দাদা’ ‘দুঃখী দাদা’ বলে কেঁদে উঠেছিলাম। তারপরদিন সেই ভদ্র-লোকটি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের বাসা কোথায়? আমি ক্ষুদ্র শিশু, কিছুই বলতে পারলাম না। তারপর আমরা কি জাত জিজ্ঞাসা করলেন। বাঙ্গালীর মেয়ে আর কিছু না জানলেও জ্ঞান হয়েই সে কি জাত তা জানে। আমি বললাম “আমরা কায়েত”—শুনে তাঁর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সে প্রফুল্লতার কারণও শেষে বুঝেছিলাম। পরে শুনেছিলাম তাঁরাও জাতিতে কায়েত। তিনি তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের ঘরে আর কে আছে?’ আমি বললাম, ‘দুঃখী দাদা’। তিনি বললেন, ‘আর কেউ না?’ ‘না’—‘দুঃখী দাদা কে?’ ‘দুঃখী দাদা, দুঃখী দাদা—আবার কে?’ আমি আর কি বলব?”

তারপর গদগদকণ্ঠে পুঁটু বলিল,—

“দুঃখী দাদার পরিচয় কি বলে দেব তখন ত বুঝি নি। মনের ভাব প্রকাশ করবার মত ভাষা আট বৎসরের বালিকা কোথায় পাবে? এখন বলি দুঃখী দাদা আমার সব। আমার বাপ মা ভাই বন্ধু সব।”

দুঃখীর চোখ দিয়া বর্ বর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুঃখীর নয়নও সিক্ত। সে বলিয়া যাইতে লাগিল,—

“সেই রাত্রেই তাঁরা আমায় নিয়ে অশ্রু স্থানে চলে গেলেন। পরে শুনেছিলাম সে জায়গার নাম কিশোরগঞ্জ ও তিনি সেখানকার উকিল। তাঁরা আমায় নিজের মেয়ের মত পালন করলেন,—একটু আধটু লেখাপড়া শেখালেন। ক্রমে আমি তাঁদের

ভালবাস্তে শিখলাম, সেই ভদ্রলোককে ‘বাবা’ ও তাঁর স্ত্রীকে ‘মা’ ডাক্তে শিখলাম। আমাকে পেয়ে তাঁদের বহুদিনের সঞ্চিত স্নেহরাশি যেন উথলে উঠল। কিন্তু দুঃখী দাদা, অত সুখের মধ্যেও তোমার কথা একদিনের জন্তও ভুলতে পারি নি। থেকে থেকে মনটা ছ ছ করে উঠত। সেই সব ফেলে আমাদের সেই ভান্সা ঘরে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হোত।”

সতীশবাবু ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া দুঃখীর বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

“বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে কিশোরগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বন্ধু পুলিনবিহারীর বাপ সেখানকার একজন ছোটখাট জমিদার। সেইখানে তাঁদের বাড়ীতে একদিন পুঁটুকে দেখে তার পরদিন থেকে আর হৃদয়টাকে খুঁজে পাই না। অনেক সন্ধান করে দেখি সেটা শরৎবাবু উকীলের বাড়ী প’ড়ে রয়েছে। পুলিনের কাছে শুন্লাম কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বলে কেউ পুঁটুকে বোঁ করতে চায় না। লোকগুলোর আহাম্মুকি দেখে রাগও হোত। আবার আনন্দও হোল। ভাগ্যি কেউ এর আগে তাকে নিয়ে যায় নি! তারপর পুলিনবিহারীর সাহায্যে পুঁটুরাণীকে গৃহলক্ষ্মী করে, সর্বস্ব তার পায়ে সমর্পণ করে আজ পাঁচ বৎসর, আঃ পরম সুখে আছি। বুঝেছ দুঃখী দা, বেশ আছি।”

তারপর সতীশবাবু হাত পা ছড়াইয়া বেশ আরাম করিয়া শুইয়া বলিলেন,—“ভাগ্যি পুঁটু কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে ছিল,—না হোলে এ হতভাগার উপায় কি হোত দুঃখী দা?”

পুঁটু এবার ভৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল। সতীশবাবু ক্রক্ষেপ মাত্র না করিয়া কহিয়া যাইতে লাগিলেন,—“এই পাঁচ বৎসরে এমন একটি দিনও যায় নি, যেদিন আমাদের মধ্যে তোমার কথা হয় নি। এমন একটি দিনও যায় নি, যেদিন তোমার কথা বলে পুঁটু চোখের জল ফেলে নি। তুমি এসেছ, এবার আমি

বেঁচেছি। একা একা সংসারটা নিয়ে মাঝে মাঝে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ি। তখন একটু সাহায্য করে এমন একটা লোক পাই না। ত্রিসংসারে এ হতভাগার ত কেউ নেই! বাপের এক সম্ভান ছিলাম। এবার তুমি এসেছ, আমি নিশ্চিত হোলাম। আর কিন্তু পালাতে পাচ্ছ না দুঃখী দা!”

দুঃখীর হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইয়া গেল। এই সময়ে সতীশবাবুর মাতা নাতিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া সেখানে আসিয়া বলিলেন—“বলি বোমা, আজ কি খাওয়া দাওয়া নেই? ভাত যে শুকিয়ে ছাই হয়ে গেল? এ আবাগের বেটীর কি পেটে ক্ষিধেও লাগে না?”

শ্রদ্ধাকে দেখিয়া পুঁটু অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল,—সতীশবাবু ভাল মানুষের মত পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন। পুঁটু শ্রদ্ধার কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া দশ বৎসর পরে দুঃখী গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। দশ বৎসরের পর দুঃখীর হৃদয়ে শান্তি আসিয়াছে!

শ্রীমতী উর্মিলা দেবী।

বৌদ্ধ-ধর্ম

৪। কোথা হইতে আসিল ?

বৌদ্ধ-ধর্মের আদি কি ? এ কথা লইয়া বহুকাল হইতে বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মত ; এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই। ষাঁহার যেমন পড়াশুনা, ষাঁহার যে শাস্ত্রে কৃতিত্ব, যিনি যে শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করেন, তিনিই আপনার মনের মত একটা আদি ঠিক করিয়া লন এবং সেই মতই প্রচার করেন। অনেকে আবার দুই চারি জনের মত লইয়া একটা সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন। এইরূপে মত বহুসংখ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মত লোকে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না, যতই আলোচনা করে ততই ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। তাই সেই মত-গুলির একবার চর্চা করা আবশ্যিক হইয়াছে।

বৌদ্ধ-ধর্মের
আদি কি ?

প্রথম মত এই যে, বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ হয় দেখিয়া দয়ায় গলিয়া যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই জন্ম অহিংসা পরমধর্ম—এই মত প্রচার করেন।

যজ্ঞে পশুবধ
নিবারণ।

বাস্তবিক তখন যজ্ঞে যে বিস্তর পশু বধ হইত সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে একটি ঘোড়া ও একটি ভেড়া মারার কথা আছে। কিন্তু যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে ঐ একটি ভেড়ার জায়গায় একটি হাজার ভেড়াবধের কথা আছে। তাহার পর সোমযাগ ত পশুবধ ভিন্ন হইতেই পারিত না। সোমযাগ যে কতরকম ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সূতরাং কত পশু যে মারা হইত তাহারও ইয়ত্তা নাই। তাই দেখিয়া পশুবধ নিবারণের জন্ম বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রচার করেন। এ মত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও

আছে। রামচন্দ্র কবিভারতী—যিনি বঙ্গদেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হন এবং বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী এই উপাধি পান—তিনি নিজে প্রথমে -ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধদেব যে বেদনিন্দা করিতেন একথা তিনি সহ্য করতে না পারিয়া বলিয়াছেন,—বুদ্ধদেব শুদ্ধ সেই সকল ঐশ্বর্যের নিন্দা করিয়াছেন যাহাতে পশুবাদের কথা আছে। সমস্ত বেদের নিন্দা তিনি একেবারেই করেন নাই।

জয়দেবও বুদ্ধ অবতারের স্তুত করিতে গিয়া বলিলেন,

“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ ঐশ্বর্যজাতম্
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্

অর্থাৎ তিনি মাত্র যজ্ঞবিধির ঐশ্বর্যগুলির নিন্দা করিয়াছেন, অন্য ঐশ্বর্যের নিন্দা করেন নাই।

দ্বিতীয় মত এই যে, বুদ্ধদেবের পূর্বের উপনিষদের অদ্বৈত মত চলিয়া আসিতেছিল, বুদ্ধদেব সেই মতই আশ্রয় করিয়া ধর্মপ্রচার করেন। তাঁহার একটি নামই অদ্বৈতবাদী। তাঁহার

উপনিষদ্-ধর্মের
পরিণাম।

নির্ব্বাণ ও উপনিষদের অদ্বৈতবাদে বিশেষ কিছু তফাৎ নাই। তবে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনীর গ্রন্থকার

চিরঞ্জীব শর্মা যেমন বলিয়াছেন, তুমি বল “আছে আছে আমি বলি নাই।” তোমার আমার এই কথার ভেদমাত্র, বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে রামানুজের দল—

মায়াবাদমসচ্ছাত্ত্বং

প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ।

বলিয়া গালি দিয়াছেন। তবে এ গালিতেও ঐ মতে একটু তফাৎ আছে। রামানুজীরা বলেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, আর ওমতে বলে, উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন।

তৃতীয় মত এই যে, বৌদ্ধ-ধর্ম সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্য-মত বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যমতে যেমন দর্শনসম্বন্ধীয় তত্ত্ব-গুলি গণিয়া সংখ্যা করিয়া রাখে, বুদ্ধমতেও তাই।

সাংখ্যমতের
পরিণাম।

সাংখ্যের অষ্টবিকৃতি, তিন প্রমাণ, পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদি, বুদ্ধেরও সেইরূপ পঞ্চ স্বক, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি। সাংখ্যদর্শন যেমন ত্রিতাপ-নাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল, বুদ্ধদর্শনও তেমনি ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল। সেই ত্রিতাপ নাশ করিতে গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছিল, আত্মাকে কেবল, অর্থাৎ অশ্রু বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য, করিয়া দিতে পারিলেই ত্রিতাপ নাশ হয়। বুদ্ধ বলিলেন, না, সে হইতেই পারে না, কারণ আত্মা থাকিলেই তাহা “কেবল” হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব আত্মাই নাই বলিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে বড় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভূদেব বলিয়া মনে করিতেন।

ব্রাহ্মণদের অত্যাচার
ও প্রাধান্য দমনের
জন্যই বৌদ্ধ-মত

অশ্রু যে কেহই হউক না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াই থাকিতে হইবে। বুদ্ধদেব এত অত্যাচার সহ করিতে পারিলেন না। তিনি আপামর সকলকেই মুক্তির উপদেশ দিতে

লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার ঘেঁষই ধর্মপ্রচারের কারণ। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত একথা একবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মো কিছুমাত্র ঘেঁষভাব ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি চন্দ্রকীর্্তির টীকার সহিত আর্যদেবের চতুঃশতিকার কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে আচার্য্য সংঘাসেন একজন বালকের সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৌদ্ধ-ধর্মো দীক্ষা লইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, “আর কিছুদিন যাউক, আমি দীক্ষা লইব।” মাস খানেক পরে সে আসিয়া বলিল, “আচার্য্য, আমি

এখন ‘দীক্ষিত’ ।” আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসে তোমার দীক্ষা হইল ?” সে বলিল, “এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই আমার ইচ্ছা হয় যে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলি, সুতরাং আমি বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত ।”

আবার একদল আছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিয়াছিলেন । শাক্য শব্দ শক শব্দ হইতে উৎপন্ন । সুতরাং তিনিও

বুদ্ধদেব শকজাতীয়,
তাঁহার ধর্ম্ম শক-
জাতীয় ধর্ম্ম ।

শক ছিলেন । শকদেরই ধর্ম্ম তিনি প্রচার করেন । শকেরা কোনও কালে হিমালয়ের উচ্চ শিখর উত্তীর্ণ হইয়া কপিলবাস্তুতে বাস করিয়াছিল, তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিত,

সুতরাং তাহারা কিছুতেই আর্য্য হইতে পারে না । অনেক শকজাতীয় রাজারাও আপনাদিগকে শাক্যবংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি বলিয়া গৌরব করিতেন ।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের গল্পটি সত্য নহে । উহা ইতিহাস নহে, উহা সূর্য্যসম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন

সূর্য্যদেবের
গল্প ।

কল্পিত আখ্যায়িকা মাত্র । শাল গাছে ভর করিয়া মা দাড়াইলেন ও মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, ইহা পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় ভিন্ন

আর কিছুই নহে । আবার দুইটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত দিয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও সূর্য্যের অন্তঃগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে । যাহারা এই আখ্যায়িকা সাজাইয়াছেন, তাঁহাদের স্রষ্টারচনায় বাহাদুরী খুব আছে ।

যাঁহারা ভারতবর্ষের যাহা কিছু সবই গ্রীকদিগের কাছ হইতে লওয়া মনে করেন, তাঁহারাও বুদ্ধদেব গ্রীকদিগের কাছ হইতে কিছু লইয়াছেন, একথা বলিতে পারেন না । কেননা

জেরোসাষ্টারের
গল্প ।

যখন তাঁহার জন্ম হয়, অথবা যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন পর্য্যন্ত গ্রীকজাতি ভারতবর্ষের দিকে

কেহ আসেনই নাই । কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকিতে পারে,

একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ও মার আর কেহই নহে, জোরোয়ার্টারের মতের অহুরমজদা ও আহরি-মান মাত্র। জোরোয়ার্টারের মতে যেমন ভাল ও মন্দের লড়াইয়ে শেষ ভালরই জয় হইল, মন্দ হারিয়া গেল, এমতেও তেমনি বুদ্ধ জিতি-লেন ও মার হারিয়া গেলেন। জিহোবা ও সয়তান যদি ভাল ও মন্দের লড়াই হয়, তবে বুদ্ধ ও মার না হইবেন কেন?

যেখানে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বের বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এখন সেইখানে খাড়ু নামে এক জাতি বাস করে। উহারা বিশেষ সভ্য

খাড়ু জাতির
ধর্ম।

নহে। পূর্বের উহাদিগকে চেরো বলিত এখন খেড়ো হইয়া গিয়াছে। ছোটনাগপুরের অনেক অসভ্য-

জাতিই বলেন যে তাহারা চেরোদের সন্তান, রোটাসগড়ের দিক হইতে অথবা তাহারও উত্তর হইতে তাহারা ছোট-নাগপুরে আসিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গ বগধ ও চের নামে তিন জাতি আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। উহাদের মধ্যে চেররাই এখনকার খেড়ো, উহাদের ধর্ম্মই বুদ্ধদেব সংস্কার করিয়া উত্তর ভারতের অনেক স্তম্ভ্য দেশে প্রচার করেন। এও একটা মত আছে।

এই সকল মতের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু

বুদ্ধদেব আর্য্য
কি না।

এবিষয়ে বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে বুদ্ধদেব আর্য্য কি না। তিনি যে আর্য্য নন একথা বলিবে কিরূপে? তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মান।

ইক্ষ্বাকুবংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। তাঁহারও গোত্র আছে, গোতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদিগুরু। গোতমের নাম হইতেই শাক্য-সিংহকে গোতম বলিয়া ডাকা হয়। তখন গুরুর গোত্র লইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য্যজাতির গোত্র হইত, প্রমাণ অশ্বঘোষের উক্তি :—

একপিত্রোর্থখাত্রাত্রোঃ পৃথক্ গুরুপরিগ্রহাৎ
রামএবাতবৎ গার্গো বাস্তুভজোপি গোতমঃ ॥

এক বাপের দুই ছেলে ; রাম ও বাসুভদ্র । পৃথক পৃথক গুরু স্বীকার করায় রাম হইলেন গার্গ্য এবং বাসুভদ্র হইলেন গৌতম । সূতরাং বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষগণ অশ্ব জাতীয় লোক হইয়া গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া গৌতম হওয়া বিচিত্র নহে । শাক্যগণ ইক্ষ্বাকু বলিয়া গর্ব করিতেন । কিন্তু এটা ত ঠিক তাঁহাদিগকে ইক্ষ্বাকুরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৈমাত্র ভাইয়ের উপকারের জন্তই তাড়ান হয় । পাটরাণীর ছেলেকে ত তাড়ান শক্ত, সূতরাং তাঁহারা অশ্ব রাণীর ছেলেই হইবেন । রাজারা তখন অনেক বিবাহ করিতেন এবং বিবাহে জাতিবিচার বড় একটা করিতেন না । সূতরাং ভরত-বংশ যেমন পাকা আর্য্য, শাক্য যে তেমন পাকা একরূপ বোধ হয় না । আর্য্যাবর্ত্তও সে সময়ে যে উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও বোধ হয় না । আর্য্য ও বঙ্গবগধ জাতির সন্ধিস্থলে শাক্যবংশীয় রাজধানী ছিল । এইরূপ নানা কারণে শাক্যেরা যে পাকা আর্য্য ছিলেন, সে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয় ।

তারপর যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখিয়া বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্মের উদ্রেক হয়, এটা ত বুদ্ধের কোনও জীবন-চরিতে বলে না । ললিত-বিস্তার বলে না, মহাবস্তু-অবদামে বলে না, বুদ্ধচরিতে বলে না । পালি গ্রন্থেও বলে না । তবে সেটার উপর বিশেষ ভরও দেওয়া যায় না । ঐটাই যদি প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার এত জীবনী, একখানি না একখানিতে একখাটা থাকিত যে বুদ্ধ পশুহত্যা দেখিলেন, তিনি করুণায় গলিয়া গেলেন ও যাহাতে পশুহত্যা নিবারণ হয়, তাহারই জন্ত ধর্ম্ম-প্রচার করিতে বসিলেন । অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম, তাঁহার পূর্বেও লোকে জানিত । যাহারা সৌভাগ্যক্রমে বুদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পল্লহিতেন ও ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা ত হিংসা করিতেন না । জৈনেরা বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব হইতে অহিংসাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছিল । অতএব ওকথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না ।

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের উৎপত্তি, একথা

তা-

স্বীকার করা কঠিন। কারণ উপনিষদ, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি? ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদগুলি, যথা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ত্রাঙ্ক-
ণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনও উহা
যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। শঙ্করাচার্যের মত ব্যাখ্যা
তাহারা করেন না। সেকালে যে কোন সার কথা গুরুর কাছ
হইতে শিখিতে হইত, তাহারই নাম উপনিষদ ছিল। অর্থশাস্ত্রের
উপনিষদ ছিল, কামশাস্ত্রের উপনিষদ ছিল। বৌদ্ধেরাও উপনিষদ
শব্দ বেশ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মোক্ষশ্লোপনিষৎ সৌম্য বৈরাগ্যমিতিগৃহ্যতাম্ ।
বৈরাগ্যস্তাপি সংবেগঃ সংবিদো জ্ঞানদর্শনম্ ॥
জ্ঞানশ্লোপনিষচ্চৈব সমাধিরূপধার্যতাম্ ।
সমাধেরপ্যুপনিষৎ সুখং শারীরমানসম্ ॥
প্রস্রক্তিঃ কায়মনসোঃ সুখোশ্লোপনিষৎ পরা ।
প্রস্রক্তেরপ্যুপনিষৎ প্রীতিরপ্যবগম্যতাম্ ॥
তথা প্রীতেরূপনিষৎ প্রামোদ্যং পরমং মতম্ ।
প্রামোদ্যস্তাপ্যহলৈখঃ কুরুতেষকৃতেষু চ ॥
অবিলেখস্ত মনসঃ শীলস্তূপানিষচ্ছৃতি ।

মোক্ষের মূল বৈরাগ্য ; বৈরাগ্যের মূল আগ্রহ ; আগ্রহের মূল
জ্ঞানদর্শন ; জ্ঞানের মূল সমাধি ; সমাধির মূল শরীর ও মনের সুখ ;
সুখের মূল শরীর ও মনের শান্তি ; শান্তির মূল প্রীতি ; প্রীতির মূল
ক্ষুতি ; ক্ষুতির মূল কুকার্য্য করিয়া অথবা কর্তব্য কর্ম না করিয়া
হৃদয়ে ব্যথা না থাকা। ব্যথা না থাকার মূল বিশুদ্ধ শীল ।

আর উপনিষৎ বলিয়া একটি দর্শনের মত আমরা সর্ব প্রথম
ইচ্ছাচারিতে দেখিতে পাই। ইচ্ছাচারিতে ইচ্ছা যখন দিবাকরের আশ্রমে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় নানা সম্প্রদায়ের ছাত্র পাঠ

করিতেছে দেখিতে পাইলেন ; তাহার এক সম্প্রদায় উপনিষদ । কালিদাসও তাঁহার বিক্রমোর্বশীতে বলিয়াছেন, “বেদান্তষু যমাহুরেক পুরুষম্”—এখানেও বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ । সুতরাং কালিদাস ও হর্ষরাজার সময়েই উপনিষদ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে ত বুদ্ধের বহুকাল পরে । উপনিষদের যে এত প্রাচুর্য এখন দেখা যাইতেছে, ইহা ত শঙ্করাচার্যের পর হইতেই হইয়াছে । তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম, এটা বিশ্বাস করা কঠিন । আরও কথা, বৌদ্ধ-ধর্মটাই কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল ? সেটা মহাযানীরাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে ?

শকজাতি হইতে শাক্যজাতির উদ্ভব, এ কথাটাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না । কারণ শকেরা ত শুঙ্গরাজাদের সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতে ভারতবর্ষে আসে । তাহাও আবার সুদূর পশ্চিমে পাঞ্জাবের কোলে । হিমালয় অতিক্রম করিয়া শকেরদের আসা কোথাও দেখা যায় না । ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসই নাই, তবে কোন কথা শুনা যায় নাই বলিয়া তাহা একেবারে মিথ্যা, এরূপ জোর করিয়া বলা যাইবে কিরূপে ? কিন্তু আমরা শাক্য শব্দের আর এক প্রকার ব্যুৎপত্তি পাইয়াছি । তাহাতে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় । অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, শাক নামে এক রকম গাছ আছে । সেই গাছে ঘেরা জায়গায় বাস করেন বলিয়া বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষদের শাক্য বলিত । এ কথাটা বেশ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় । নেপালের তরায়ে এখনও শকিয়া শালের গাছই অধিক । শাক গাছ শকিয়া শাল হইলে, শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য হিমালয় ও তিব্বত পার হইয়া শকজাতির দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই ।

বৌদ্ধ-ধর্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ এক প্রকার বলিয়াই গিয়াছেন । বুদ্ধদেবের গুরু আডার কলম ও উদ্রক দু'জনেই সাংখ্যমতাবলম্বীছিলেন । দু'জনেই বলিয়াছিলেন, ‘কেবল’ অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারিলেই মুক্তি হয় । বুদ্ধ

তাঁহাদের মত না মানিয়া বলিয়াছিলেন, “কেবল” হইলেন! অস্তিত্ব ত
রহিল ; অস্তিত্ব রহিলে নিঃসম্পর্ক হইবার জো নাই। এ কথা পূর্বেই
বলিয়াছি।

যদি বৌদ্ধ-ধর্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে ত উহা আর্য্য-ধর্ম হই-
তেই উৎপন্ন হইল। আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্যমত কি
বৈদিক আর্য্যগণের মত ? শঙ্করাচার্য্য ত উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ম্যায়
অবৈদিক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এত যত্ন করিয়া
ও মত খণ্ডন করেন কেন ? মন্বাদিভিঃ কৈশিচিৎ শিষ্টৈঃ পরিগৃহী-
তহাৎ। মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন
বলিয়া। সাংখ্যমত কপিলের মত চিরকাল প্রবাদ। কপিলের বাড়ী
পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গবঙ্গধচেরদিগের দেশে। গঙ্গাসাগর যাইতে কপিল-
আশ্রম আছে, কবতকের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিলবাস্তুও
কপিল মুনির বাস্তু। কারণ অশ্বঘোষ বলিতেছেন, গোতমঃ কপিলো
নাম মুনিধর্ম্মভূতাং বয়ঃ। তাঁহারই বাস্তুতে কপিলবাস্তু নগর। বাস্তু-
বিকও কপিলকে কেহ ঋষি বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই
বলে আদিবিন্দান্। বাল্মীকি যেমন আদি কবি, তিনিও তেমনি আদি-
বিন্দান্। শ্বেতাশ্বতরে তাঁহাকে “পরমর্ষি” বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাব
ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে নিতাস্ত অল্পদিনের পুস্তক বলিয়া
বোধ হয়।

কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সাংখ্য,
যোগ ও লোকাইত; কৌটিল্য ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। তাঁহার
সময় অন্য দর্শন হয়ই নাই, হইলে তাঁহার মত সার্বভৌম পণ্ডি-
তর তাহা অবিদিত থাকিত না। সেই তিনটির মধ্যে লোকাইত
মত, লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ঐ নাম পাই-
য়াছে, উহার আদি নাই, ও মত সর্বত্র সকলেরই মত। খাও দাও
হুখে থাক—এমত আবার কে প্রচার করিতে বাইবে ? সকলেই জানে,
সকলেই বুঝে ও সকলেই সেই মতে কার্য্য করে সুতরাং উহার

কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। যোগমত সাংখ্য-দর্শনেরই রূপান্তর মাত্র। দুইই দ্বৈতবাদী।

সাংখ্য ও যোগের যে সকল পুস্তক আছে সকলগুলিই নূতন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই তাহাদের মধ্যে পুরাণ। ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃষ্টীয় পাঁচ শতের লোক। কিন্তু তাঁহার পূর্বেও সাংখ্যমতের পুস্তক ছিল; মাঠর ভাষ্যের কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্চশিখের দু'চারিটি বচন যোগভাষ্যকার ধরিয়াছেন। আশুরির একটি কবিতা একজন জৈনটীকাকার তুলিয়াছেন। মহাভারতে আশুরির নাম নাই, পঞ্চশিখের নাম আছে। তিনি জনক রাজার সভায় মিথিলায় উপস্থিত ছিলেন। কপিলের নিজের কোন বচন এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যে ২২টি সূত্র কপিলসূত্র বলিয়া চলিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা দেখিয়া লেখা বোধ হয়। কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কোটিল্যের উক্তি দেখিয়া সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয়।

সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আদিবিদ্বান্ কপিলের নামও নাই গন্ধও নাই। আমাদের এখানকার ব্যবহারেও সাংখ্যমতের বড় বড় লোক-গুলি মানুষ। ঋষিও নন মুনিও নন। আমরা যে নিত্যতর্পণ করিয়া থাকি তাহাতে—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ

কপিলশ্চাশুরিশ্চৈব বোতুঃ পঞ্চশিখস্তথা।

বলিয়া যাহাদের তর্পণ করি, রঘুনন্দন বলেন তাঁহারা মানুষ। এই কবিতায় যাহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য।

উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝা যায়, যে সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরাণ, উহা মানুষের করা এবং পূর্ব দেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্ষ্যদের মত নহে, বঙ্গ বগধ ব চেরজাতির কোন আদিবিদ্বানের মত। গাঁহার পুত্র পশু প্রভৃতি

লাভের জন্য, পুষ্টি তৃষ্টির জন্য বড় জোর স্বর্গকামনায়, যাগযজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিতাপনাশের জন্য “আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নিলেপ নির্বিকার” ইত্যাদি মত উদ্ভব হওয়া কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে এই মত অশ্রুত উদ্ভূত হইয়া ক্রমে কোন কোন আর্য্য পণ্ডিত কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আর্য্যগণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। হেমাদ্রি বেনীদিনের লোক নহেন, তাঁহার সময় খৃষ্টীয় তের শতে, তিনি বলিতেছেন যে, যে ব্রাহ্মণ সাংখ্য মত ভাল জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের স্থায় পংক্তি-পাবন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ কাপিল সে পংক্তিবাহু। ইহাতেও অনুমান হয়, কপিলের কোন কোন সম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মণগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আর কোন কোন সম্প্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই।

যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যমত হইতে উহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম আরও অনেক জিনিষ আছে যাহা আর্য্য-
আশ্রম পালন ধর্ম্মের খুব বিরোধী। আর্য্যগণ তিন আশ্রম পালন

না করিয়া ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। আপস্তম্ব প্রভৃতি সকল সূত্রকারেরই মত এই যে, ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বান-প্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু হইবে। কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে। এমন কি অতি শিশুকেও ভিক্ষু করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কয়েকটি নাবালগকে ভিক্ষু করায় কপিল-বাস্তুতে বড় গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে বুদ্ধদেবের পিতা বুদ্ধকে দুঝাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, নাবালগকে শিষ্য করিতে হইলে তাহার পিতামাতার অনুমতি লইতে হইবে। ক্রমে বৌদ্ধ কর্ম্মবাচায় দেখিতে পাওয়া যায়, একুশ বৎসরের পূর্বে কাহাকেও দীক্ষা দেওয়া হইত না। যে কেহ দীক্ষা লইতে আসিত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা

ইহঁত, তোমার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে ত ? বহুকাল পরে শঙ্করাচার্য্য এই মত প্রকাশ করেন যে, ‘যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ’ । এটি জাবালোপনিষদের বচন । সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের পূর্বেই এই উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল । উহা কোন ব্রাহ্মণের অস্তুভুক্ত নহে, সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব নহে ।

বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ হইতেও দেখা যায় উহা আর্য্যবিরোধী বেশ । আর্য্যগণ উষ্ণীষ ও উপানহ ভিন্ন চলিতেন না । মাথায় পাগড়ী ও
বেশ পায়ে জুতা সবারই থাকিত । কিন্তু বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর মত খালিমাথায় থাকিতেন এবং উপানহ ব্যবহার করিতেন না ।

এই সকল নানা কারণে বোধ হয় যে, পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ বগধ ও চের নামে যে তিনটী সভ্য জাতি বাস করিতেন, তাহাদের সঙ্গে আর্য্যগণের মেলামেশায় বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে । যে জায়গায় আর্য্যগণের পশ্চিমসীমা ও ঐ জাতিসকলের পূর্বসীমা, সেইখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি । উহা পূর্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমাঞ্চলে উহার প্রাদুর্ভাব কখনই এত অধিক হয় নাই । পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র ও মৎস্যদেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, ইহার প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।

আমার কথা

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ পদার্থকে আমি আগে চিন্তে পারি নাই। এদের রকম-সকম আমি বুঝতে পারতাম না। অথচ একটা দেহের মধ্যে এদের পাঁচজনাকে নিয়েই জন্ম লয়েছিলাম। জন্মাবধি এরা আমার চিরসঙ্গীই হয়ে আছে। এতকাল এক সঙ্গে থাকলে যে জানাটুকু হয়, এদের নিয়ে এতদিন আমার তা হয় নি, কখনও যে হবে তাও মনে করি নাই। আমার সঙ্গে এসে এরা এই দুঃখপোষ্য শিশুকে নিয়ে, কি করেছিল না করেছিল তার খবর আমি রাখি না। আমি একটা কলের পুঁতুলের মত শোওয়া থেকে বসা, বসা থেকে দাঁড়ান এবং দাঁড়ান থেকে চলন শিখলাম। একজন, কে, যে এই বেগার খাটতেন, তা বুঝবার মত বুঝ তখনও আমার হয় নাই। এরা পাঁচজনে মিলে তখন যেমন আমার উপর আধিপত্য করত, তেমন আবার অসহায় শিশু ব'লে করুণাও জানাত। এদের ছাড়িয়ে আমার যাবার জায়গা ছিল না। সে সময় এদের কাজ ছিল মিলেমিশে আমাকে গড়ে তোলা। শব্দ আমাকে দিয়ে “মা” ডাকিয়ে আরাম পেত, পরশ আমাকে একটা মায়ের বুকে রাখিয়ে ঘুম পাড়াত। চোখের সান্নে একটা মাতৃরূপ দেখে আমি মাতো-য়ারা হয়ে যেতাম। সে মা আমাকে হাতে করে বা মুখে তুলে দিতেন তাই আমার বড় মিষ্টি লাগত। আমি সেই লোভে এতই মায়ের বশ হয়েছিলাম যে তার অঁচল ছাড়তাম না। আমার মায়ের গায়ের সুগন্ধে আমার সর্বদা আমোদিত হ'ত। আমি তখন বেল, ঘুঁই, গোলাপ, চামেলী ছিঁড়েখুঁড়ে দূর করে ফেলে দিতাম। তাদের গন্ধ কটু লাগত। এ রকমে সুখে আমার শিশু কালটা কেটে গেল, আমি শৈশবে এসে পৌঁছিলাম। তখন আর কেবল মা-জগতে বাঁধা পড়ে

থাকতে পার্লামনা। মেলা বাজি লোক এসে, আমাকে খেলার লোভ দেখিয়ে, একরকম জোর করে আমার মায়ের আঁচলের বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে, আমাকে হাত ধরে টেনে বাইরে লয়ে গেল। প্রথম প্রথম কাঁদতাম, মাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। শেষে মা যখন বুঝিয়ে বলেন, তখন একেবারে এদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেলাম। সঙ্গীদের ডাক তখন বেশ লাগত, তারা যখন হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত, তখন আর মায়ের মুখ মনে পড়ত না, তাদের মুখপানে চেয়ে মাকে ভুলে যেতাম। মায়ের দেওয়া ছাড়াও অনেক জিনিস মিষ্টি লাগত, ফুলের গন্ধে তখন বিরক্ত হ'তাম না। এইভাবে একটু একটু করে এই পাঁচভূতে মিলে, আমাকে এক রকম মা ছাড়া করে দিল। দিয়ে, আমার সাম্নে একটা ছোট “আমিকে” এনে খাড়া করল। আমি না জেনে শুনে তার বশ হয়ে পড়লাম। সে হোল এখন আমার হঠা, কর্তা, বিধাতা। সে যা করায়, আমি তাই করি, আছি মন্দ না। কিন্তু কতদিন পরে দেখি, কে এসে, এই আমার শৈশবের সঙ্গে চুপে চুপে নিত্যই কথা বলে। একদিন কান পেতে শুনি, সে বলছে “আর কেন ভাই! এবারে সরে পড়, আমায় আসতে দেও, অম্নিতে না দেও জোর করে আসবে।” মহা তন্নি। আমি ত ভয়ে মরি! কে আবার আসবে! এসে না জানি কি করবে। এ দেহটার মধ্যে কটাকেই বা জায়গা দিব! শেষকালে এরা ঝগড়া বাঁধালে মারা যাব যে! তা দুইজনে দেখি ভাবসাব করে কিছুদিন গল্পেসল্পেই কাটিয়ে দিলে। কিন্তু কচি শৈশব কৈশোরের চালা-কির সঙ্গে পেরে উঠবে কেন! সে কথার অছিলায় এসে দেহটাকে দখল করবার চেষ্টায় রইল। বলে,—এইটুকু পুরীতে থাক কেমন করে, আমার কেমন হাঁপ ধরে। আমি একে কেটে ছেঁটে ছেনে বিনে দেখ না কেমন নুতন করে গড়ে তুলি। আর দেখ, তা না করে আমি পারি না। আমি যার আদেশ পালন করতে এসেছি, তার এসব কোন মতেই পছন্দসই হবে না। আমাকে তাই তিনি

অগ্রদূত পাঠিয়ে দিয়েছেন সব ঠিক ঠাক করতে। তিনিত্ত যে এখানে আসবেন এবং এসে কিছুদিন থাকবেন। আমার পক্ষেশ্রিয় কৈশোরকে পেয়ে একেবারে এর দাসানুদাস হয়ে পড়েছে। ও যা বলছে, ওরা তৎক্ষণাৎ তা করছে। শৈশব বেচারী নিকুপায় দেখে আস্তে আস্তে একেবারে চম্পট দিল। তখন ওরা মুখ চাওয়া-চায়ি করে খুব হাসল। কৈশোরের আমার আগেকার কিছুই মনাসিপ্ নয়। আমার দেহটাকে নিয়ে একটা লগুভগু কাণ্ড উপস্থিত করল। দেহের মধ্যে আছি বটে কিন্তু এরা কিছুতেই আমাকে আমল দিচ্ছে না। আমি কেবল বসে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছি আর ভয়ে কাঁপছি। ওমা! একদিন হঠাৎ পায়ে চলতে গিয়ে দেখি পা দুটো জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে, কিছুতেই সোজা হয়ে এগুতে পারছি না। কি হবে, কোথায় গেল আমার সেই চঞ্চল অবাধ গতি। খুঁজতে খুঁজতে দেখি কিনা সে আমার চখের চাহনিত্তে গিয়ে বসে আছে, আর সেখানকার সরলতাটুকু পক্ষম-পংক্তি চুরী করেছে! দেখে হাসিও পেল, ফের কান্নাও আসল। আমার হাত পা সবেই গড়ন বদলে গেছে, বন্ধের ভারে আমার দেহ আনত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাতে দৃষ্টি কটু হয় নাই। কৈশোর কিন্তু কারিগর ভাল, বলতে লজ্জা করে! সবই বড় সুন্দর হোল। এত সুন্দর যে পাছে কারো নজর লাগে বলে, বন্ধ ক্রমাগত আমার শাসাচ্ছে “ঢাক ঢাক”, গলার স্বর বলছে “চাপ চাপ”, আর চোখের চাহনি ইসারা করছে, “রোথ, রোথ”—আমি যে কি করতে কি করি ভেবে ভেবাচেকা খেয়ে গেছি। আমার যে আঁচল মাটিতেই লুটপুটি খেত, সাবধানে তাকে তুলে ধরে অঙ্গের আবরণ করলাম। কৈশোর তখন আমায় অমন জড়সড় দেখে হেসে বলে, “ভীক! কেন ভয় পাচ্ছ? যে তোমার ঘরে আসবে বলে এত আয়োজন, সে যে মাতৃহের আগমনী। তাকে ভয় কিসের? যে মাকে পেয়ে তুমি বেঁচে গিয়েছিলে, তোমায় আবার সে মা সাজতে হবে জান?” একথা শুনে আমার আরো ভয়

বাড়ল, বুকটা ধড়ফড় করে উঠল, দুই হাতে চেপে ধ'রে রাখি তবু
 মানেন না। ভয়ে ত্রাসে শঙ্কায় আমার যেন কথা বন্ধ হয়ে এল,
 কারোকে মুখ দেখাতে ইচ্ছা করেনা, কেমন কুণো হয়ে পড়লাম।
 এভাবে আছি এমন সময় আচম্বিতে ধীর পদবিক্ষেপে, কে আমার
 নূতন ঘরে প্রবেশ করল, যেন কৈশোরের কাজ তদারক করবার জন্ত।
 কিন্তু কৈশোরের কাজ নিপুণ হাতের কাজ, খুঁৎ ধরবার ঘো নেই।
 তবে এখনও অসমাপ্ত, সময় পায় নাই শেষ করবার। যৌবন শক্তি-
 শালী, শেষ করবার তার সে নিজের হাতে নিল। সঙ্গে অনেক
 সরঞ্জাম এনেছিল, চটপট কাজ এগুতে লাগল। সর্বশেষে তার
 ভাণ্ডার থেকে লাভগ্যের ভাণ্ড এনে সবটা আমার গায়ে মাথিয়ে
 দিল। আমি আর আমাকে চিন্তে পারছি না। আমার আপন দেহের
 কমনীয় কাস্তি দেখে গর্ব করিতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার 'আমি' তখন
 একজন হয়ে উঠল। সে আর কারো ভোয়াকা রাখে না। সে কেবল
 আমাকে কুপরামর্শ দিতে চায়। তাকে ছাড়া আর কারোকে মুরব্বি
 মানতে নিষেধ করে। আমি মহা মুন্সিলেই পড়লাম। যিনি আমার
 হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এত করলেন, যার প্রসাদে এই দেহ-সম্পদ পেলাম,
 তাকে কি অবহেলা করতে পারি! অথচ এই 'আমি'র ভয়েও যে
 মরি! তাই ত যৌবন আমাদের ঘরে এসে আমাদের ভাবগতিক
 দেখে, দু'দিন যেতে না যেতেই, যাই যাই বুলি ছাড়ে, বেশীদিন
 তিষ্ঠিতে চায় না। তা না হবে কেন? এত খেটেখুটে, একটা নগণ্য
 দেহকে অমন করে তুললেন, আর তুমি কিনা তাকে গ্রাহ্যই করছনা।
 তোমার ধারণা যে, এ তোমার চিরদিনের সম্পদ হোল? যাক না যৌবন
 যেতে চায় ত? এ তমুর তালিশ নিবে কে? নির্বোধ জানে না এ যে
 স্নায়ু দেবতা, তার ক্ষমতা কি। আমার পাঁচ মাতব্বর তখন বেগ-
 তিক দেখে যৌবনের ভোয়াজ করতে লেগে গেল। তখন কথায়
 কথায় লড়াই। এরা যা বলে তাতে 'আমি' কর্ণপাতও করে না, আবার
 'আমি' যা বলে তাতে এদেরও ক্রক্ষেপ নাই। তোমরা—পুরুষেরা

একথা শুনে হাস্ছ জানি, কেননা একে তোমরা গায়ে বলবান, তাতে স্বভাবতঃ খোসামুদে, তোমাদের কথা আলাদা। এই দেখ না আমরা যতই এদের ভয়ে মুয়ে মুয়ে পড়ি, তোমরা ততই পায়ের উপর ভর দিয়া সিঁধা হয়ে দাঁড়াও। আমাদের চলন যত থেমে থেমে যায়, তোমরা তত দ্রুত চল। আমাদের গলার আওয়াজ যতই আড়ম্বৃত হয়ে আসে, তোমরা তত গলা ছেড়ে কথা কও। আমরা হাসি চেপে যাই, তোমরা আরো প্রাণখুলে হাস। আমরা কারো দিকে চাইতে ভীত হই, আর তোমরা তখন ডাগর করে চাও। মোট কথা তোমরা পায়ে তেল দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে জান, আমাদের তা আসে না। কি করেই বা আসবে! চিরটা কাল আমাদের অতিমানের উমেদারী করে কাটাতে হয়, এবং আমাদের উপর তার অনুশাসন রয়েছে—“বুক ফাটবে ত কখনও মুখ ফোটাতে না, বিশেষতঃ এই খরতর যৌবনের জিন্দায় আছ যদি, কাজেই আমরা নাচার! যারা এই অতিমানের আধিপত্যকে শুধু আপনাদের স্বভাবের জোরে আমল না দিয়া পারে, তারা কি বুঝবে আমাদের বিড়ম্বনা। যাক সে কথা।

একদিন কিস্কণে আমার “আমি”র মুহূর্তের অন্তর্দ্বানে, আমি আছি বসে আনমনে, এমন সময় আমার এই পঞ্চ প্রভু আমাকে একলা পেয়ে বল্ল, “করু কি? জান না যে এখনও তুমি শুধু তোমার আধখানা। এই তোমার অঙ্গের ভিতর দিয়েই তোমার অপরাধকে খুঁজে নিতে হবে, তখন পূর্ণতা লাভ করে প্রেয়কে পেয়ে কৃতার্থ হবে।” আমি ভাবলাম প্রেয় কি! তাকে কেমন করে পাওয়া যায়! প্রিয় ত অনেক আছে, কিন্তু তারা ত এতদিন কেউ আমাকে পূর্ণ করতে পারে নি। আমি আমার এই আধখানাকে নিয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে আর কতদিন থাকব! এতদিন ত আমি জানি নাই, আমি তাই পূর্ণতাও খুঁজি নাই। যৌবনের এই কুসুম-শোভন লোভনীয় বিকাশকে নিয়ে কি করব, কোথা যাব, তাই কেবল ভাব-

ছিলাম। আজ আমার শব্দ, আমার স্পর্শ, আমার রূপ রস গন্ধ
 মিলে বন্ধে তারাই সেই অক্ষয় বস্তুকে মিলাবে। কিন্তু তাকে
 দূরে রেখে দেখলে চলবে না, শুধু তার বিগ্রহ নিয়ে খেলা করলে
 হবে না। সেই বিগ্রহের চৈতন্যটুকুকে আত্মসাৎ করা চাই। করে,
 তাকেই পাই কি আপনাকেই হারাই। কিন্তু এরা এত বন্ধে,
 যে এই “আমি”র ব্যবধান না সরালে কিছু করতে পারবে না।
 হোল না, হোল না, কিছুই হোল না। এই শব্দের কথায়, স্পর্শের কথায়,
 রূপের কথায়, রসের কথায়, গন্ধের কথায় কারো কথায় কিছু হোল
 না, কিছুতেই আমার সেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু আত্মধন মিলিল না।
 সাম্নে থেকে আমার “আমি”কে কেহ সরাতে পারল না; আমার
 দৃষ্টিও পরিষ্কার পথ পেল না। সব শত্রু সওয়া যায় কিন্তু গৃহ-
 শত্রুকে আর বরদাস্ত হয় না। এর জ্বালায় কিছুই করতে পেলাম
 না। আজ কত আশা প্রাণে ছিল, প্রথম দেখবার মত দেখা পাব
 বলে। আমিও এই ‘আমি’র মূর্তি ছাড়া এতদিন দুই চক্ষে আর
 কিছুই দেখি নাই, দেখবার যে কিছু আছে তাও জানতাম না।
 প্রাণটা আজ বন্ধে—করছ কি? তোমার সেই বিশিষ্টাঙ্গকে খোঁজ
 করতে বেরোও না? দেখার মত একবার দেখে লও না সব শূন্য
 করে, দিক সকলকে ফাঁকি দিয়ে, তবেই দেখতে পাবে যার জন্ম জন্ম
 লয়েছ। পাগলের মত ছুটে গিয়ে তাই শব্দের পায়ে ধরলাম,
 “ওগো শোনাও সে স্বর, যাতে করে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে, আমি
 তাকে পাব, পূর্ণ হব।” শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কে ও আসছে? অতি
 সন্তুর্পণে আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার অঙ্গে যেন অমৃতরস ঢেলে
 দিচ্ছে। সেই রসের ধারায় দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে আসছে,—বস্ আমিও
 অন্ধ। রূপ এসে ধাক্কা দিচ্ছে। জলভরা চোখে দেখব কি ছাই।
 সব যে ঝাপসা। ধাক্কার চোটে ছোঁওয়াটুকু মিশে গেল। কে নিয়ে
 গেল গো, রূপকে ত আমি চাই নাই। জোর জবরদস্তি করে সৈ
 আমায় কি দেখাবে। চোখে আমার দৃষ্টিশক্তি থাকলে ত! সব কেড়ে

নিয়েছে ঐ পরশ ! রূপ ! তুমি বলছ, এই রাঙা হাত নইলে এত কি মিষ্টি লাগত শুধু একটা পরশ ? আমাকে ছাড়া তুমি তাকে পাবে কোথায় ? হুঁস হোল তাই ত ! তবে চেয়েই দেখিনা কেন কার হাতখানি, কেমন হাতখানি । যা ! সব মাটি হয়ে গেল । তার চথে চোখ পড়ল । সে চোখের কি দীপ্তিময় প্রভা । সে জ্যোতির আলোকে আমার চোখের কুয়াসা কেটে গেল । আমি সুন্দরকে দেখলাম । নয়ন পলকহীন, আর কথা কানে যায় না, গায়ে পরশ লাগে না । মূর্তি, মূর্তি ! সর্বত্র এই নীরব মূর্তি ! আকার যে আমায় পীড়া দিচ্ছে । ওগো সরাও একে নয়ন-পথ থেকে, নয় ত মরলাম । আনন্দ অসহ্য হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চাচ্ছে । এসেছ রস ! নেমে এসেছ রূপের সন্ধান, একা সে কি করতে পারে দেখতে ! তুমি আসতেই এর আকার বদলে গেল । সে ত আর এখন একা নয়, সে যে এখন 'সরস' হয়েছে । আমি চিন্তে পারি নাই । ডাক না শব্দকে । স্পর্শ কোথায় গেল ? শুধু রূপ ! তুমি ! আমার তা ভাল লাগছে না । এই কি আমার প্রেয় ! একে পেয়েই কি আমি পূর্ণ হ'ব ! প্রেম জানব ! মন বলছে "নয় নয়, এ সে নয়" । অনেক ডাকা-ডাকির পর শব্দ এসে হাজির হোল । তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—
আচ্ছা, শব্দ ! তুমিই বলনা স্পর্শকে ছেড়ে তোমার গতি আছে কি ? কি বললে তার মুখ দেখবে না ! কেন ? সে তোমার সব কেড়ে নিতে চায় ! পাগল, সব কেড়ে নিতে চায় ব'লেই ত তোমার আরও বেশী জোর চলে । ডাকাডাকি ভিন্ন তুমি ত আর কিছু জান না । কাছে থাকার সুখ বিধাতা তোমার কপালে লিখেন নাই । সে বরং পরশ বলতে পারে । ছোঁওয়ার মত মধুর তুমি হ'তে জান কি ? কি বলছ—“কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল প্রাণ”—
কি ছোঁওয়া নয় ? তবে আমার ছোঁওয়ার ধরণ আলাদা তা বলতে পার । আমি গ্রাস করবার জন্তু পাগল নই, তাই কাছে মিশে থাকা আমার আবশ্যক হয় না । স্পর্শ সে স্পর্শ রাখে বটে, তাই তার

জুলুম চলে। তার বিশ্বাস যে, সে কাছে গেলেই আদর পাবে। তার মনে শঙ্কা আছে, ভয় নাই, সে পীড়ন জানে কিন্তু নিজে জ্বালা বোঝে না। আমার সঙ্গে ওর তুলনা! মোট কথা সে সুখী করতে চায়, আর আমি সুখী হ'তে চাই। আমি স্বার্থপর? তা বলতে পার। প্রেমে স্বার্থত্যাগ চাই। হবে! আমি তা পারব না। শব্দ! তোমার কথা শুনে স্পর্শ হাচ্ছে। সে বলছে “আমায় ছেড়ে ওর আধিপত্য? শুধু ডাকে মানুষ জাগে বটে, কিন্তু চিন্ময়কে পায় কি?” এখন তবে কি উত্তর দিবে তুমি? হাজার হোলেও তুমি হ'চ্ছ বহিরঙ্গ, আর স্পর্শ একেবারে অন্তরঙ্গ। কেন? একথায় তুমি আপত্তি করছ যে? ডাকও অন্তরঙ্গ হ'তে পারে। কান ছাড়াও কি ডাক পৌঁছায়? স্বর ভিন্নও কি শোনা সম্ভব? হাঁ সম্ভব তুমি বলছ, কেমন করে বল দেখি? আমার এই “আমি”র কাছে তা বলবে না। সে সব ভুল করে দিবে। “যদি কোন দিন একে সরাতে পার, তবে দেখবে আমার শক্তি কি পর্য্যন্ত! এই “আমি” শব্দই তখন শব্দাতীত হয়ে তোমার অন্তরে এসে অধিষ্ঠান লাভ করবে, তখন তোমার “আমি” আর কাছে ঘেঁসতে পাবে না। তোমাকে ছাড়তে বাধ্য হবে, আমার প্রভুত্ব দেখে। এই “আমি”র অন্তর্কানে তুমি বড় মিষ্ট বস্তু। তখন আর কি আমি তোমার বহিরঙ্গ থাকতে পারি?” শব্দের এই কথা শুনে একটু চিন্তা করে দেখলাম, কথাটা সত্য বটে। দেখা যাক এখন প্রশ্ন কি বলে। কিন্তু তাকে পাই কোথায়? শব্দকে স্মৃতির ভাঙারে জোর করে বেঁধে রেখেছিলাম, তাই অত সহজে ওকে পেলাম। কিন্তু স্পর্শ যে ওর আধারের সঙ্গে আসা-যাওয়া করে। তাকে তেমন করে না চাইলে সে কারো খাতিরে কাছে আসে না, এই হয়েছে মুস্কিল। এখন তেমন চাওয়া চাই কি করে? সে চাওয়ার আমি জানি কি? সে শুভলগ্ন আমার কে ঘটাবে? গৃহশত্রু যে সদা প্রহরী। শত্রু পাহারা। জন্মাবধি এই “আমি”র দৌরাণ্ডো মারা পড়লাম। কেউ একে সরাতে পারলে না। মানুষ বুঝে

সবাই নির্জীব হয়ে পড়ে, আসল কথাই তাই। নয় ত এমনও ত
ডের দেখেছি যে এক পরশই সমগ্র মানুষটাকে কাবু করে রেখেছে।
দেখেছি বলেই সাধও হয়েছিল পেতে। কিন্তু পেলাম কৈ? এরা পাঁচ
জনাই নাকি আমার প্রেয়ের প্রাণ স্বরূপ। এদের ছাড়া তবে সে দাঁড়াবে
কার জোরে? শব্দের সাড়া ভিন্ন, স্পর্শের মোহ বিনা, রূপের চটক
নইলে রসের ধারা বহে না, গন্ধে অন্ধ করে না ত। তাই বলছিলাম—
হোল না, হোল না, কিছুই হোল না। আমি আমার বিশিষ্টাঙ্গকে খুঁজে
পেলাম না, আমার প্রেয় মিলিল না, আমি নিত্য বস্তু কি জানলাম
না। এরা সবাই মিলে আমাকে নিয়ে একটা হটুগোল বাঁধাল।
তাতে আমারও সাধ মিটল না, ইস্টসাধন হোল না, এদেরও তুষ্টি
দেখলাম না। আমি কি জানি যে এদের নিয়ে কেবল বেগার খেটেই
মরব।

এবারে সকলকে তাড়াব। তাড়িয়ে দিয়ে আপনার মনে একা থাকব।
এতে প্রেয়কে পাই বা না পাই, কোন আপঘোস নাই। চাই না
আমি মাতৃহ, আমার যৌবনে কাজ নাই। আবার কানের কাছে
ফিসির ফিসির, কে ও কথা বলতে চায়? শুধু নাম শোনাবে? কে
তুমি শব্দকে আশ্রয় করে এসেছ? তুমি কি প্রেম বাঁচাতে জান?
তাই ত এ যে শুধু নাম শোনান নয়। নাম শোনাতে শোনাতে একে-
বারে বুকে নাম জাগিয়ে দেওয়া। সে নামধ্বনি শুনে, সে নামকে
নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছা হচ্ছে আপনা-আপনি মনের মধ্যে।
এ কার প্রেরণা! সে নাম জপ্তে জপ্তে জগৎটা সে নামময় হয়ে উঠল।
এখন যে সে নামে বাঁধা পড়লাম, আর যাই কোথা। শব্দ! তুমি
একি করলে! আমি যে পাগল হয়ে যাব। পরশ তখন আমার
চৈতন্যকে নিয়ে বসে রইল! এ কার পরশ! এ স্পর্শনে আমি
ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠছি। এই কি আমার অজানা অর্ধ? আমাকে পূর্ণ
করে দিতে এসেছে? যার এ প্রাণ-জাগান পরশ, তার তবে রূপ
কেমন? এতদিন যে রূপ দেখে এলাম, দেখে ভুলে রইলাম, এ ত

সে নয়। এ যে আমারি চৈতন্যে সে রূপ প্রতিফলিত হয়ে আমারি স্বরূপ দেখাচ্ছে। তবে কি তার সঙ্গে এক হয়ে গেছি? তাও কি হয়? অত বড়, অত মহান নিত্য বস্তু, আর আমি এক? সেও যা আমিও তা? হতেই পারে না।

আবার ধাঁধা। চোখ দু'টাকে রগড়াতে রগড়াতে রক্তবর্ণ করে ফেললাম, তবু ধাঁধা ছাড়ে না। আমি দূরে বসে সে রূপের—সে দেবতার পূজা করতে চাইছিলাম। ভক্তিতে মুক্তি জেনে তার আরাধনা করবার আমার বাসনা হয়েছিল। কিন্তু এ আত্মরূপকে কেমনে পূজা করব। হে বিধাতাপুরুষ, এ তোমার কি রঙ্গ? আমি ত কিছুই ঠাণ্ডা করতে পাচ্ছি না। এতদিন আমি আমার অঙ্গের লাবণ্যছটা দিয়ে, আমার ভোক্তাকে আমার প্রিয় জেনে, কত কত ভাবে আমার স্বরূপ দেখিয়ে এলাম তাকে ভোলাব বলে, আর তিনিই কিনা কৌশলে সে বহিঃ-প্রকাশকে আপনা-অঙ্গে ধারণ করে আমায় দেখাচ্ছেন—আমায় লজ্জা দিতে। এমনি করে আক্কেল দিবে জানলে, হে রূপ! আমি পায়ে ধরে তোমায় পূজা করতে চাইতাম না। আমি স্বচ্ছ কাচের ভিতর আপন রূপ দেখে দেখে মোহিত হতাম বটে, কিন্তু তাতে আমার আত্ম-বিস্মৃতি, আত্ম-তৃপ্তি ঘটাতে পারত না বলেই ত তোমার খোঁজে বেড়িয়েছিলাম। হে আমার পূর্ণকারয়িতা! শুধু কি তব নামে মধু ঝরে? পরশে মোহ আনে? তোমার কোন আত্মরূপ নাই। এতদিন চক্ষুতে বেরূপ দেখিয়েছ তবে তাই দেখতে দাও, আমি দূরে বসে তোমার পূজা করি। এই দূরে রেখে দেখতে চাই বলেই তুমি কি আমাকে অতৃপ্ত রেখে অমন আঘাত দিচ্ছ? দেখা ত শোনা নয় যে কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে মরমে পৌঁছাবে? সে ত পরশ নয় যে অঙ্গেই লেগে থাকবে? দেখা হোল দৃষ্টিতে, সে দৃষ্টিকে দেহ থেকে বের ক'রে না দিলে, সে কেমন করে দেখবে বল? বাইরের চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করে দিয়ে তুমি আমার অন্তঃচক্ষু হয়ে বসবে? আমি তা চাই না, আমি তোমার চক্ষে দেখতে

চাই না। আমি আমারি চক্ষু লয়ে তোমার সে দর্শন চাই, যাতে আমি চোখ চেয়ে তোমাকে দেখে বলতে পারি, “জনম অবধি হাম রূপ নেহারিশু, নয়ন না তিরপিত ভেল।” তা হতে পারে না কেন? চোখ বুজেই সে রূপ দেখা যায়, চোখ মেলে নয়। তাই তুমি কেবলি সরে সরে যাচ্ছ? কেবল অদর্শন, কেবল অদর্শন! ধ্যান ধারণা আমার আসে না। “কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণায়”—একথার মর্ম্ম আমি বুঝতে পারি না। আমি চাই আকার। জানি আকারে পীড়া দেয়, মিলনে বিরহের আশঙ্কা জাগায়। তবু আকার না দেখলে আমার অবসাদ আসে, আমি ধরতে ছুঁতে না পারলে ক্ষুব্ধ হই। হে নির্ম্মম! হে পাষণ প্রতিমা! কৃপা করে দরশন দাও, আর লুকিয়ে থেক না। তুমি আমার যাত্রা-মত দেখা দিলে আমি কখনও তোমাকে পাব না? কেন? দূরত্ব ঘুচবে না বলে? তবে শেখাও দেখতে সে দেখা, যে দেখায় আত্মরূপ দেখে সমগ্র তোমাকে পাব, পেয়ে পূর্ণ হব। তোমাতে মিলে এক হোলে, তবেই আনন্দের উদ্ভব হবে। তখনই যথার্থ আমার মাতৃহ আসবে, যার আগমনী হয়ে যৌবন এসেছে! যার জন্মে আমার ঘরে এত আয়োজন! তখন বুঝি নাই। অঙ্গ থেকে অঙ্গীকে ধরা, আনন্দকে কোলে করা! এ ক্ষেত্রে কেহ তবে বন্ধা নয়! সকলেই মা হবার যোগ্য! সকলেরই সে অধিকার আছে! অঙ্গ যখন মাতৃহের যোগ্য উপাদানে গঠিত হবে, তখন প্রেয়ের পিতৃহের পূর্ণতা এসে ইহাতে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই আনন্দকে গড়ে তুলবে, বন্ধে তখন আপনিই ক্ষীরধারা বইবে। এক আনন্দের উৎপত্তিতে জগৎ-সংসার আনন্দময় হয়ে উঠবে। আর অবসাদ থাকবে না। আকাঙ্ক্ষার বস্তু কিছুই রবে না। আমি পূর্ণতাকে পেয়ে বলতে পারব “আনন্দংরূপমমৃতম্”। তখন অমৃত আন্বাদন করে আমি অমর হব। এই অনিত্য অঙ্গের আশ্রয়ে এসে, এই পক্ষে-ক্রিয়ের সংস্পর্শে আমার জীবন সার্থক হবে, আমি ধন্য হব। তখন

আমার সৌরভে বিশ্বলোক আমোদিত হবে। তখন জানব, যে শব্দ সেই স্পর্শ; যে স্পর্শ সেই রূপ; যে রূপ সেই রস; যে রস সেই গন্ধ। পৃথকভাবে সকলেই একের সন্ধানে আমায় লয়ে যাবে। আমি তখন এই পাঁচটেই আমার প্রিয়কে প্রত্যক্ষ করব, ক'রে ভক্তিভরে প্রণতমস্তকে ইহাদের সেবা-দাসী হয়ে থাকব। আমার আত্মার পরিতৃপ্তি এইখানে। তবে হে আমার আনন্দ-দাতা! যদি মাতৃহে গরীয়সী করবে তবে সন্তানকে কখনও বুক ছাড়া করো না, আমার এ পাওয়া কেড়ে নিও না। বুক জুড়ে এ আনন্দ থাকলে, যৌবন গতেও আমার জরা আসবে না; বার্দ্ধক্যের জড়তা আমি জানব না; আমার দেহগ্রন্থী শিথিল হবে না। আমি এক উদ্দাম-স্রোতের ম্যায় সংসারের সকল আবর্জনা ঠেলে নিয়ে, সেই অতলের অন্তঃসাৎ করাইব। তখন ছোটয় বড়য় মিশে একাকার হয়ে গিয়ে, নিয়ত এক মহান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে বিভোর হয়ে বলতে থাকব “সান্দ্রানন্দং স্পৃশতি বাটিতি ব্রহ্ম পরমম্”।

শ্রীজগদম্বা দেবী !

নিবেদন

হে মোর বিজয়ী রাজা ! এস তবে আজ
সমর-উল্লাস-ভরা বিজয় হুকারে,
দর্পভরে সর্গোরবে ! ওগো রাজ রাজ !
এস আজ রুদ্ধ এই অন্তর দুয়ারে !
ছিন্ন কর বন্ধ মোর কৃপাণে তোমার,
চূর্ণ করে দাও মোর সোনার মন্দির !
ধূলিসাৎ হ'য়ে যাক পরাণ আধার
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গন্তীর !
আমি অশ্রুজল চ'খে পরাইব আজ
জয়-মালা তব কণ্ঠে, ওগো রাজ রাজ !

“নারায়ণ” সংক্রান্ত নিয়মাবলী ।

বর্ষ-গণনা—১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নারায়ণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । অগ্রহায়ণ হইতে কার্তিক পর্যন্ত নারায়ণের বৎসর পরিগণিত হইবে ।

মূল্য—নারায়ণের বার্ষিক মূল্য সর্বত্রই সাড়ে তিন টাকা । ভি, পি, ডাকে লইলে তিন টাকা নয় আনা লাগিবে । স্বতন্ত্র ডাক-মাণ্ডুল লাগিবে না ।

প্রতিসংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা । মফঃসলে ডাকমাণ্ডুল সহ ছয় আনা ! ভি, পিতে সাত আনা ।

নারায়ণের মূল্য অগ্রিম দেয় ।

বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না ।

বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব-বর্ষী অগ্রহায়ণ হইতেই তাঁর বার্ষিক-চাঁদার হিসাব চলিবে ।

পত্র-প্রাপ্তি—নারায়ণ প্রতি বাঙ্গলা মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে । কোনও গ্রাহক যথাসময়ে কোনও মাসের নারায়ণ না পাইলে স্থানীয় ডাক-ঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন । না হইলে তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা একটু কঠিন হইবে ।

ঠিকানা-পরিবর্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের নাম, ধাম, পোস্ট অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন । ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে, কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্বদা নিজের গ্রাহক-নম্বরটি লিখিয়া দিবেন ।

বিজ্ঞাপনাদি—নারায়ণে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার নিয়মাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকটে চিঠি লিখিলে বা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া কথা কহিলেই জানিতে পারা যাইবে।

প্রবন্ধাদি—নারায়ণে কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন, আর সর্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

নারায়ণ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। এজন্য লেখকগণ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

চিঠিপত্র—সম্পাদকের নামীয় পত্রাদি ও নারায়ণে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে—১৪৮নং রসারোড, (সাউথ) কালীঘাট কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

চাঁদার টাকা ও অন্যান্য বিষয়ের যাবতীয় চিঠিপত্রাদি নারায়ণের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় নারায়ণ কার্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবামাচরণ সেন,

“নারায়ণ” কার্য্যাধ্যক্ষ।

নারায়ণ কার্যালয়, ২০৮।২। ডি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা

চৈত্র, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। পৌরাণিকী কথা	... শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১১
২। বৃন্দাবন	... শ্রীযুক্ত জলধর সেন	৪২৫
৩। জীবন পণে (কথা-নাট্য)	... শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৪৩৭
৪। অন্তর্ধামী (কবিতা)	...	৪৫৬
৫। বৌদ্ধ-ধর্ম	... শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৪৫২
৬। আরও কিছু আমার কথা	... শ্রীমতী জগদম্বা দেবী	৪৬৮
৭। সেকালের স্মৃতি (বঙ্কিমচন্দ্র)	... শ্রীযুক্ত হরেশ সমাজপতি	৪৭৭
৮। বংশী-ধ্বনি (কবিতা)	... শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	৪৮৮
৯। বাহালার আদি নাটক	... শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল	৪৯১
১০। শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	... শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	৫০৫

কার্যালয়—২০৮২। ডি, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাণ্ডল সমেত ৩।০ টাকা।

এই সংখ্যার নগদ মূল্য ১।০ আনা, ডাক মাণ্ডল ১।০ আনা।

বিজয়া প্রেসে, ২০ নং পটুয়াটোলা লেনে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরীদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা]

[চৈত্র, ১৩২১ সাল

পৌরাণিকী কথা ।

তত্ত্ব ও ভক্তিসূত্র ।

পুরাণ বুঝিতে হইলে সৰ্ব্বাগ্রে শাস্ত্রের উপাসনা-তত্ত্বটা একটু বুঝিতে হইবে । উপাসনা-তত্ত্বের দুইটি শাখা আছে ; এক, তাত্ত্বিকী উপাসনা, দ্বিতীয়, বৈষ্ণব উপাসনা । বৈষ্ণব উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে যে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নাই, এমন কথা বলি না ; তবে যামুন মুনি এবং রামানুজাচার্য্য যে ভাবে ও পদ্ধতিক্রমে উপাসনা-তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহা তত্ত্ব হইতে অনেকটা পৃথক, কতকটা বিরোধীও বটে । পুরাণে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই বহু অধ্যায়িকা এবং উপাখ্যান রচিত হইয়াছে ; কাজেই প্রথমে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তেরই একটু আলোচনার আবশ্যক হইতেছে । বলিয়া রাখা ভাল যে, তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপনিষদের বিরোধী নহে ; অনেক স্থলে বৈদিক উপনিষদের প্রমাণস্বরূপ বচন গ্রহণ করিয়া তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন । তাত্ত্বিক উপনিষদ্ একসময়ে এদেশে প্রচলিত ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে । বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগে ত্রীমুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কয়েকখানা তাত্ত্বিক উপনিষদের আবিষ্কার করিয়াছেন । সেসকল মুদ্রিত না হইলে বুঝা যাইবে না তাত্ত্বিক এবং বৈদিক উপনিষদে পার্থক্য কিসে এবং কতটুকু ।

তত্ত্ব বলেন জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান লইয়াই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বস্তুর পরিচয় সংগ্রহ করিতে হয়। আমি আছি, আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি, ইহাই আমার মূল জ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই অশ্রু জ্ঞানের উৎপত্তি। উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, আত্মাই জ্ঞানের প্রকাশক; অতএব আমি আছি—এই জ্ঞানটাই আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই আমি বুঝিতেছি যে, আমার আত্মা আছে। আমি ছাড়া জগতে—বিশ্বস্থিতিতে আর যাহা কিছু আছে বা থাকিতেছে, তাহা যখন আছে তখন সেসকলের মধ্যেই আত্মা আছে; নহিলে সেসকল সামগ্রী থাকিত না, এবং তাহাদের অস্তিত্বের বোধ আমার হইত না। বিশ্বব্যাপী আত্মার এবং দেহব্যাপী আত্মার মিলনচেষ্টা হইতেই উপাসনার উৎপত্তি। একা আমি থাকিতে পারি না, আমার একটা অবলম্বন চাই, তাই বাহিরের ভোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই। এই অনুসন্ধানই উপাসনা। উপাসনা-তত্ত্বের গূঢ় সিদ্ধান্তসকলের আবৃত্তি এখন করিব না, তাহা গভীর ও বিশাল। উহার বিচার-পদ্ধতিও অতিশয় কঠোর ও সূক্ষ্ম। আপাততঃ পুরাণের উদ্দেশ্য বুঝিতে মতটুকুর প্রয়োজন, স্বতঃসিদ্ধরূপে ততটুকু গ্রহণ করিয়া আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, বিশ্বব্যাপী আত্মা চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিগুণ, নেতি নেতি সিদ্ধ, অবাঙমনসগোচর; তাহার উপাসনা করি কেমন করিয়া? কুলার্ণব তত্ত্ব শ্রীরামতাপনীয় ঋতি অনুসারে বলিতেছেন—

“চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যশরীরিণঃ।

উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥”

অর্থাৎ উপাসকের কার্যসিদ্ধির জগুই চিন্ময়-জ্ঞানময়-অদ্বিতীয়-অখণ্ড-অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই হেতু রুদ্রযামলে বলা হইয়াছে যে,

“সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বমল্লময়ীং পরাম্ ।
আগ্নানং চিস্তয়েদেবীং পরমানন্দরূপিণীম্ ॥”

যখন আত্মা আমাতেও আছেন এবং সর্বভূতে, সর্বদেবতায়, সৃষ্টির সর্বস্বৈর বিরাজ করিতেছেন, তখন সেই আত্মাকেই পরমানন্দরূপিণী ইষ্টদেবী মনে করিয়া আত্মারই উপাসনা করিবে। গন্ধর্ববতন্ত্র শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন ; তাহা এই,—

“যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাভুখিতং মূনে ।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগদাত্মনি লীয়তে ॥

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে যেমন সমুদ্রের ফেন ও তরঙ্গ উখিত হয় এবং সমুদ্রেই লীন হয়, তেমনি আত্মা হইতেই জগৎ উখিত এবং আত্মাতেই লীন হইবে। আমার উপাস্য ইষ্টদেবতা ও আমি বা আমার আত্মা—অহং দেবি ন চান্যোহস্মি—আমিই দেবী, আমি ছাড়া অন্য কেহ নাই, থাকিতে পারে না। শেষে তন্ত্র বলিতেছেন,—

“আত্মস্থং দেবতাং ত্যক্ত্ৱাবহির্দেবং বিচিন্বতে ।
করস্থং কৌস্তভং ত্যক্ত্ৱা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া ॥

অর্থাৎ আত্মস্থ দেবতাকে পরিহার করিয়া যে বাহিরের দেবতার উপাসনা করে সে সাধক স্বীয় করস্থিত কৌস্তভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচের অন্বেষণে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল বহু বচন পাওয়া যায়। প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন আমার হরি আমাতেও যেমন ভাবে বিরাজ করিতেছেন, বিশ্বচরাচরে তেমনই প্রকটভাবে বিরাজ করিতেছেন। পিতা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন—এই স্ফটিক স্তম্ভ তোমার হরি আছেন ? যদি থাকেন ত, তাঁহাকে প্রকট হইতে বল। প্রহ্লাদের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, আত্মা নরহরিরূপে স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া প্রকাশ হইলেন। দ্রব পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে

খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে গহন বনে প্রবেশ করিল ; একনিষ্ঠ-
বুদ্ধি হেতু সে সিংহ শার্দূলকেও হরি বলিয়া আহ্বান করিল । কিন্তু
সর্ব্বাঙ্গে দেহস্থ আগ্নাকে না চিনিতে পারিলে বাহিরের বিশ্বাত্মাকে
ঠিকমত চেনা যায় না বলিয়াই দেবর্ষি নারদ আসিয়া ধ্রুবকে দীক্ষিত
করিলেন । ধ্রুব দীক্ষা পাইয়া তপস্যা করিল এবং শ্রীহরির দর্শন
লাভ করিল । মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা হয় । সে মন্ত্র কি ?

“মননাত্ৰায়তে যস্মাদ্ভস্মান্নম্নঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥”

মনন হইতে অথবা চিন্তা হইতে যাহার সাহায্যে ত্রাণ পাওয়া
যায় তাহাই মন্ত্র । বেদ মন্ত্র স্মীকার করিয়াছেন, গায়ত্রী মন্ত্রই বেদের
প্রধান মন্ত্র । মন্ত্র জপের প্রভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, মন
নির্ব্বাতনিকম্প প্রদীপের স্থায় এক চিন্তায় মগ্ন থাকিতে পারে ।
চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই আত্মদর্শন সম্ভবপর হইতে পারে । এইহেতু
যামলে লিখিত হইয়াছে যে, “দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপত্ততে
ধ্রুবম্”—ইষ্টদেবতার রূপ বীজ-মন্ত্র জপ করিতে করিতে আপনা-
আপনি ফুটিয়া উঠে ; “তস্মাৎ বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ”
অতএব বীজাত্মক মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মময় হইতে পার । বৈষ্ণব সাধক
হরিনামকেই মহামন্ত্র জ্ঞান করিয়া নামজপের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া-
ছেন । বিশ্বসার তন্ত্র বলেন,—

“অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বকালেহপি সর্ব্বদা ।

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥”

অর্থাৎ শুচি অশুচি বিচার না করিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় ইষ্ট-
মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবীর মানস অর্চনা করিবে । “হেলয়া শ্রদ্ধয়া
বা” বৈষ্ণবের এই উক্তিও তন্মধ্যে পাওয়া যায় । তন্ত্র আবার বলিয়া-
ছেন—“জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ” বার বার তিনবার
বলিলাম জপেই সিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

ইহাই ইহল তদ্ব্যক্ত উপাসনা-পদ্ধতির গোড়ার মূল কথা ।
তদ্ব বলেন, ধ্যান কর আর নাই কর, মন্ত্র জপ করিতে করিতে তোমার
ভাবামুকুল রূপ তোমার হৃদয়পটে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে । সেই
রূপ দেখিয়া ভক্ত সাধক ভক্তির সম্যক উন্মেষের উদ্দেশ্যে স্তবস্ততি
করেন, রূপ বর্ণনা করেন । সেই স্তবস্ততি এবং রূপ বর্ণনা শুনিয়া
শিষ্য একটা রূপের কল্পনা করিয়া দেবীপ্রতিমার স্রষ্টি করেন ।
ইষ্টদেবীর সেই প্রকটমূর্তি দেখিয়া সাধারণ লোকে তাহারই ধ্যান
করিতে চেষ্টা করে ; এই ধ্যানের ফলে চিন্তবৃত্তির নিরোধ হয়, সাধ-
কের জীবন ধন্য হয় । আমাদের বাঙ্গালা দেশে আজকাল যেমন
মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয়, পূর্বে এমন ছিল না । পূর্বে
বাঙ্গালার হিন্দু যন্ত্রের পূজা করিতেন, যন্ত্রের উপর হোম করিতেন
এবং মন্ত্র জপ করিতেন । রাজা জগদ্রাম রায়ের সময় (১৪শ
শতাব্দী) হইতে বাঙ্গালায় আধুনিক প্রথামত দুর্গোৎসব প্রচলিত
হইয়াছে । গৃহস্থের গৃহে কালী গড়াইয়া পূজা আগমবাগীশ কৃষ্ণা-
নন্দই (১৬শ শতাব্দী) ঢালাইয়া গিয়াছেন । জগদ্ধাত্রী পূজা মহারাজ
কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে । সরস্বতী পূজা কখনই
মাটির প্রতিমা গড়াইয়া হইত না ; গ্রন্থের পূজা হইত এবং দেবী-
সূক্ত পাঠ করিয়া হোম হইত । প্রতিমা গড়াইয়া সরস্বতী পূজা বোধ
হয় শত বৎসরের অধিক হইবে না । বাঙ্গালা ছাড়া ভারতের আর
কোন প্রদেশে এমন ভাবে মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা হয় না । মহারাষ্ট্র-
দেশে গণপতি উৎসবে গণেশের মূর্তি গড়াইয়া পূজা হয় বটে, কিন্তু
সে মূর্তি-গঠন উৎসবের অঙ্গ বিশেষ, উপাসনার আলম্বন রূপে গ্রাহ্য
নহে । ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে ঘটস্থাপনা করিয়া, মন্ত্র অঙ্কিত
করিয়া হোমবাগাদি যথারীতি হয়, প্রতিমা পূজা হয় না । তবে প্রতি-
ষ্ঠিত দেবতার মন্দিরে বাইয়া পূজার ব্যবস্থা আছে বটে । সেসকল
মন্দিরে শিবলিঙ্গ ছাড়া যদ্ব্যক্ত প্রস্তরখণ্ড থাকে, তাহারই উপর
সোনারূপার মূর্তি গড়াইয়া আরোপ করা হয় মাত্র । কাশীর অন্ন-

পূর্ণা আমাদের তদ্ব্যাক্ত অন্নপূর্ণার মূর্তি নহে, এক খণ্ড পাথরের উপর সোনার মুখ বসান মাত্র। কাশীর অনেক মন্দিরে পুরাতন সূর্য্য-মূর্তি, প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি, আধুনিক দেবতার আকার ধারণ করিয়া পূজিত হইতেছেন। অনেক স্থলে ধ্যানী বুদ্ধকে বিষ্ণু সাজাইয়া পূজা চলিতেছে। বাঙ্গালায় যেমন ঘরে ঘরে মাটির মূর্তি গড়াইয়া পূজা হয়, পূজান্তে তাহার বিসর্জন হয়, এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অল্প কোন প্রদেশে নাই, পূর্বে বাঙ্গালায় ছিল না। দশম কি একাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই পদ্ধতির ধীরে ধীরে প্রচলন হইয়াছে। মাটির মূর্তি আমরা নির্মাণ করি বটে, কিন্তু পূজা করি আত্মার—আত্মশক্তির; প্রতিমা প্রতীকের মতন সম্মুখে থাকে মাত্র। দুর্গোৎসব পদ্ধতির বা কালীপূজা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমার কথার যথার্থতা সপ্রমাণ হইবে। কূর্ম্য পুরাণে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া আছে। কূর্ম্য পুরাণ বাহিরের মূর্তি দেখিয়া ধ্যান করিতে নিষেধ করেন; উপদেশ এই যে বাহিরের মূর্তি আলম্বন মাত্র, ভিতরের ধ্যান সাধকের সামর্থ্য অনুসারে চিত্তবৃত্তিনিরোধের ফলে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে।

এইবার বৈষ্ণববাদ এবং ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের কথা তুলিতে হইবে। নারদ এবং শাণ্ডিল্য ভক্তিশাস্ত্রের সূত্রকার; স্বপ্নেশ্বরচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, বল্লাভাচার্য্য প্রভৃতি উহার ব্যাখ্যাতা। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। ইংরেজের আমলে মুদ্রাস্থের প্রচার হইলে আমাদের সমাজে বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণতন্ত্রের চর্চা কিছু হইতেছে বটে, পরন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের পর হইতে,—ভট্টকুমারীলের সময় হইতে অদ্বৈতাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত, এই হাজার বৎসরকাল যে আচার্য্য-পরম্পরা ভারতবাসীর ধর্ম্মের ভাবকে আকারিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বিশেষ রকমের আলোচনা ইংরেজীশিক্ষিত বিদ্বজ্জনসমাজে তেমন হয় না। অথচ শঙ্করাচার্য্যের আমল হইতে মোগল পাঠানের আমল পর্য্যন্ত এবং ইংরেজের প্রথম

আমাদের ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে এই আচার্য্য-পরম্পরার মতামতের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিতেই হইবে। ষাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আমি এই সন্দর্ভ-পরম্পরা লিখিতেছি, তাঁহারা আচার্য্যগণের মতবাদের সহিত সুপরিচিত থাকিলে, আমাকে অনেক কথা বার-বার বলিতে হইত না ; ব্যর্থ প্রতিবাদের পিপীলিকা-দংশনও আমাকে সহিতে হইত না। যাক সে কথা,—স্বপ্নেশ্বর শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্যের গোড়াতেই বলিতেছেন—“প্রজাদিগের মহারাজার ন্যায়, ঐহিক এবং পারত্রিক বিবিধ ফলদাতা, বন্ধন এবং মোক্ষাদি কার্য্যে প্রভু, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা একজন ঈশ্বর আছেন এবং পিতা যেমন সাধারণতঃ সকল পুত্রের উপর স্নেহশীল হইলেও ভক্তিমান পুত্রদিগের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তিনিও সেইরূপ সকল জীবের প্রতি স্নেহশীল হইলেও ভক্তদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন।” স্বপ্নেশ্বর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদ না হইলে উপাসনা হয় না। যেখানে উপাসনার কথা, শাস্ত্র সেইখানেই দ্বৈতবাদী ; বেদই বল, উপনিষদই বল, যখন উপাসনার কথা উঠিয়াছে তখনই তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পিতামাতা আমি পুত্র ইত্যাদি ভাবের উন্মেষ ঘটাইয়া তোমায় আমায়, ঈশ্বরে এবং জীবে বিষম পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষকে উপাসনা করিতেই হইবে ; উপাসনা জীবের প্রকৃতসিদ্ধ ব্যাপার। নিজের অপেক্ষা প্রবলতর শক্তি দেখিলেই মানুষ সেই প্রবল শক্তির উপাসনা করিয়াই থাকে। অতএব রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন যে, মানুষো যখন উপাসনার প্রবৃত্তি প্রকৃতিগত, স্মৃতরাং সনাতন, তখন উপাস্ত ও জীব হইতে নিত্য স্বতন্ত্র এবং সনাতন। কাজেই বলিতে হয় যে, জীবে ও ঈশ্বরে, উপাস্ত এবং উপাসকে কখনই সম্মিলন সম্ভবপর নহে ; উভয়েই স্বতন্ত্র এবং পৃথক, উভয়ই নিত্য। ইহা মায়াবাদের স্পষ্ট প্রতিবাদ। স্বপ্নেশ্বর বলেন যে, বেদান্তে ও উপনিষদে যাহা থাকে, বা যাহা আছে তাহা থাকুক ; উহার সহিত মনুষ্যসমাজের কোন সম্পর্ক নাই ; উহা আরণ্যক

শাস্ত্র । "সাধারণ মানুষ ঘর-গৃহস্থলী চালাইবে, ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, পূজা-পাঠ করিবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে অদ্বৈতবাদ অবোধ্য । লোকসমাজে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলে, জীব-শিব এক বলিয়া কীর্তন করিলে নাস্তিকতার পুষ্টি হইয়া থাকে, ঘুরিয়া-ফিরিয়া মানুষ বুদ্ধের শূন্যবাদের গর্তে আসিয়া পতিত হয় । অতএব লোকসমাজের হিতের জন্য দ্বৈতবাদ, পূজ্য-পূজক ভেদবাদ প্রচার করা সর্বথা কর্তব্য । ইহার পরে শাক্ত মত এবং বৈষ্ণব মতের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া মাধ্বাচার্য্য, বল্লাভাচার্য্য, নিম্বাদিত্য প্রভৃতি কত প্রতিভাশালী আচার্য্য যে কত মতের এবং কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার হিসাব করিয়া বলা যায় না । অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতা-দ্বৈতবাদ—এমন কত বাদই আছে । সকল বাদের সকল রকমের সিদ্ধান্ত নানা আকারে পুরাণে স্থান পাইয়াছে । দ্বৈতবাদমূলক বৈষ্ণবী ভক্তিব্যঞ্জক গোটাকয়েক শ্লোক বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব :—

“যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
হামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥
যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা ।
মনোমে রমতাং তদ্বৎ পরমাত্মনি কেশবে ॥
নাথ ষোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষুচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাহস্ত সদা স্থয়ি ॥”

অর্থাৎ “অবিবেকীদিগের ভোগ্য বস্তুতে যাদৃশ স্থির প্রীতি উৎপন্ন হয়, তোমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ আমার হৃদয়েও সেইরূপ প্রীতি জন্মিয়াছে ; উহা যেন আমার হৃদয় হইতে আর অপস্থত না হয় । যুবতীদিগের যুবা পুরুষের উপর এবং যুবা পুরুষের যুবতীদিগের উপর চিত্ত যেরূপ আসক্ত হয়, আমার চিত্ত যেন সর্বদা সেই পরমাত্মা কেশবের প্রতি সেইরূপ আসক্ত থাকে । হে নাথ,

হে অচ্যুত, আমি যে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, সেই-
সকল জন্মেতেই তোমার প্রতি আমার যেন স্থির ভক্তি থাকে।”
এই ভাবের কত শ্লোক যে পুরাণে আছে তাহার আর হিসাব করিয়া
বলা যায় না। বাল্মীকি রামায়ণ হইতে একটা শ্লোক তুলিয়া দিব।
হনুমান্ বলিতেছেন (সুন্দরাকাণ্ড)—

“যাবজ্জামকথা লোকে তাবৎ প্রাণান্ বিভর্ম্যহম্।
তাবৎ শ্বাস্তামি মেদিষ্ঠাং তবাক্তামমুপালয়ন্ ॥”

গীতায় ভক্তিযোগ বর্ণনকালে দৈতবাদের এই সিদ্ধান্তটা শ্রীভগ-
বান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

“সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ভ্রতাঃ।
নমস্যন্তুশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥”

পুরাণ সকল বাদের সমাহার ; যে বাদের অনুকূল বচন চাহিবে,
উহাতে তাহাই পাইবে। পুরাণকে বাছিয়া গোছাইয়া পড়ার নিয়ম
নাই বলিয়া, পুরাণ লইয়া অনেক সময়ে অনেক গোল ঠেকে। তাই
পূর্বের নিয়ম ছিল, পুঁথি লইয়া পুরাণ পাঠ করিবে না, পুরাণ ব্যাখ্যা-
তার মুখে বা ব্যাসের মুখেই শুনিতে হয়। অথবা পুঁথি পাঠ
করিতে হইলে, গুরুমুখ করিয়া পড়িতে হইবে। অর্থাৎ গুরুকে
সম্মুখে রাখিয়া পুরাণ পাঠ করিতে হইবে, যেখানে সন্দেহ হইবে,
সংশয় জন্মিবে সেইখানে প্রশ্ন করিবে, গুরু সন্দেহ নিরসন করি-
বেন, সংশয়ের সমাধান করিবেন। শিষ্যের কর্তব্য গুরুকে পুরাণ
পড়িয়া শুনান ; গুরুর কর্তব্য শিষ্যকে পুরাণের গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া
দেওয়া।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, পুরাণ বেদব্যাঙ্গুর রচিত। অথচ বচন

আছে—“বাসাদি মুনিভিঃ রচিতং”—কোন ব্যাস যে তাঁহারও নির্দেশ নাই। কাশীর পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাতেই কাস্তাবাণীর রচনা করিতে পারেন। বঙ্গ-বাসীর শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগে দেখিয়াছি ৩ বীর নৃসিংহ শাস্ত্রী পুথির বচন পড়িতে না পারিলেই স্বয়ং সেই স্থানে দুইটা বা দশটা অনু-ষ্টুপছন্দের শ্লোক রচিয়া দিতেন। আগে বটতলার প্রকাশকগণের অধীনে অনেক কবি ও পণ্ডিত থাকিতেন, যাঁহারা আদেশমত পুরাণ রচিয়া দিতে পারিতেন। কাশীতে ডাক্তার ব্যালেন্টাইনকে এক-খানা গোটা ভবিষ্যপুরাণ নূতন করিয়া রচিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাশ্মীরেও এইভাবে দুই একখানা উপপুরাণ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। ইহা দোষের নহে; আসল খাটি হিন্দু ইহাতে চটেন না। তাঁহারা দেখেন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসকল যথারীতি সরল প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না। সিদ্ধান্ত বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা থাকিলেই, পুরাণের লক্ষণযুক্ত হইলেই যে কেহই লিখুক না কেন, হিন্দু সমাজ তেমন পুরাণ শুনিতে বা তাহাকে পুরাণ বলিয়া মান্য করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন না।

বৎসর খানেক পূর্বে ইতালীর মহাকবি দান্তের (Dante) কাব্যালোচনা করিতে যাইয়া আমি বলিয়াছিলাম দান্তের মহাকাব্য কতকটা আমাদের পুরাণের ধরণে লেখা। দান্তের মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষাস্থরিত হইলে ঠিক একখানি উচ্চাঙ্গের ঋষিপুরাণ হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপের আর কোন দেশের মহাকবির মহাকাব্য সংস্কৃত পুরাণের আদর্শের এতটা অনুকূল নহে। পুরাণের ভাষা আবার স্বতন্ত্র। উহার শব্দযোজনা-পদ্ধতি, উহার শব্দের দ্যোতনা সাধারণ সংস্কৃত মহাকাব্য অপেক্ষা পৃথক। দান্তের, সেক্সপীয়রের, মিল্টনের যেমন lexicon আছে, তেমনি প্রত্যেক পুরাণের ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতি ত্যাগ করিলে পুরাণ ঠিকমত বুঝা যায় না। ধরনী কথকের সময় পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কথকগণ রামায়ণ,

মহাভারত, ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি জামিতেন। মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ভাগবত ব্যাখ্যা যে শুনিয়াছে, সেই জানে তাহার ব্যাখ্যা-পদ্ধতি সত্য ছিল। এসকল পদ্ধতি গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলিতেন যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা কল্পলতিকা, যাহার যেমন অভিলাষ তেমনই অর্থ উহা হইতে সে বাহির করিতে পারে। তবে গুরু-মুখ-শ্রুত অর্থই গ্রাহ্য, কারণ সে অর্থ সিদ্ধ সাধকের মস্তিষ্ক-প্রতিভাত। আমি জানি মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় যখন ভাগবতের কোন শ্লোকের অর্থ মনোমত করিতে পারিতেন না, তখন তিনি উপবাস করিয়া, ধর্না দেওয়ার মত, নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া থাকিতেন। কখনও কখনও দুই তিন দিন একভাবে কাটিয়া যাইত, তাহার পর প্রত্যাদিষ্টের মতন উঠিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেন এবং সমস্বয় সাধন করিতেন। এই ভাবে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া শাস্ত্রার্থ বাহির করিবার পদ্ধতি রামানুজাচার্য্যের সময় হইতে এদেশে প্রচলিত আছে।

পুরাণের আখ্যায়িকা-উপাখ্যান সকলের কতটুকু গ্রাহ্য এবং কতটুকু অবহেলার যোগ্য তাহার বিধিও নির্দিষ্ট ছিল। লীলা আখ্যান যাহা, তাহার রস গ্রহণ করিতে হয়, ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে নাই। কোন লীলায় কোন রসের উন্মেষ ঘটিতেছে, কেবল তাহারই বিচার করিতে হয়, ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে নাই। যাহা ইতিহাসের উপাখ্যান তাহার ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়; যেমন হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, নলোপাখ্যান ইত্যাদি। কারণ ঐতিহাসিক উপাখ্যানে ঘটনার দ্বারা চরিত্রের উন্মেষ সাধিত হয়; স্মৃতরাং সেক্ষেত্রে ঘটনাই মুখ্য। যাহা অথবাদের আখ্যায়িকা তাহা কিসের রোচক, কোন ভাবের প্রকাশক, তাহা বুঝিতে পারিলেই হইল। পুরাণ সত্যমিথ্যা লইয়া চিস্তিত নহেন; পুরাণের কেবল দৃষ্টি সিদ্ধান্তের দিকে, রসোন্মেষের দিকে, তথ্যনির্ণ-

যের দিকে। হিন্দুর সত্য পুরাণের সত্য নহে। বুদ্ধের জাতক সকল বৌদ্ধের পুরাণ। কোন কোন ইংরেজ ও জর্ম্মণ পণ্ডিত বলেন যে, বুদ্ধের জাতকের অনুকরণেই পুরাণের সৃষ্টি। রামায়ণ মহাভারতের ইতিহাস-কথার যে কত পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাত্রেই জানেন। ভাসের নাটকগুলি পাঠ করিলেও মনে হয় না যে, আধুনিক মহাভারত ভাসের সময়ে প্রচলিত ছিল। কালিদাসের সময় হইতে বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে কবিগুরু বাল্মীকির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। জাতকে যে রাম-সীতার কথা আছে তাহাও অদ্ভুত ও উৎকট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পুরাণগুলিকে বেজায় আধুনিক বলিয়া মনে করেন। কোন কোন পুরাণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত বলিয়া বহু পণ্ডিতের অনুমান। সে যাহা হউক, পুরাণ হিন্দুসমাজের আলেখ্য। পুরাণ বুঝিতে পারিলে ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির আদর্শের কথা কতকটা জানা যায়। কি উপায়ে আমরা আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাও পুরাণপাঠ করিলে বুঝা যায়। পুরাণ যেন পদে পদে জাতির বিশিষ্টতায় তালি দিয়াছে, যেন উহার উন্মেষ সাধনে নানা উদাহরণের সাহায্যে ব্যস্ত হইয়াছে। পুরাণ পড়িলেই মনে হয় নাস্তিকতার অপসারণ জন্য পুরাণকার প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—বে কোন সম্প্রদায়ের পুরাণ খুলিয়া পাঠ করুন না, দেখিবেন পুরাণকার নানা প্রকারের গল্পগাছা করিয়া, নানা দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ব্যাপ্ত্ব, নৃত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছেন। যেন মনে হয়, একটা বিশাল নাস্তিকতার ঢেউ সমাজের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার ফলে সমাজ-অঙ্গনে কল্যাসের ও অবিশ্বাসের পলিমাটি জমিয়া গিয়াছে; পুরাণ তাহাই পরিষ্কার করিবার জন্য সদা ব্যস্ত। -

পুরাণ লোকশিক্ষার গ্রন্থ, সমাজ-শাসনেরও গ্রন্থ। পুরাণে প্রধা-

নতঃ এই কয়টি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে ;—(১) ঈশ্বরে বিশ্বাস, সে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বাস্তুরাত্মা হইলেও আমা ছাড়া—সাধক ছাড়া স্বতন্ত্র পদার্থ, সাধ্য ও সাধকের বিভেদ বিচার সকল পুরাণেই স্পষ্ট করিয়া করা হইয়াছে। (২) একনিষ্ঠা,—যখন যে ভাবে যে দেবতার উপাসনা করিব, তখন তিনিই আমার সর্বস্ব, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বশক্তিমান, সর্ব দুঃখ ও পাপ-হর, সাধকের দৃষ্টিতে তখন তাঁহার অপেক্ষা বড় কেহ নাই। একনিষ্ঠা হইল উপাসনার মহাপ্রাণ ; যে উপাসক সেই একনিষ্ঠ সাধক। (৩) ঈশ্বরে মনুষ্যত্বের আরোপ ; তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সাধক যখন মানুষ, সাধকের ঈশ্বরও তখন মানুষ ; সাধকের একাদশ আসক্তি ও ষড়রিপু লইয়া তাহার ইষ্টদেবতার সৃষ্টি। সাধকের সাধ মিটাইবার জন্য ইষ্টদেবতার উন্মেষ ; স্মরণ সাধক যেমন, সাধকের ঈশ্বরও তেমনই হইবেন। এই মানবতাবাদ পুরাণে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত। (৪) ঈশ্বরে—ইষ্টদেবতায় সাধকের সর্বস্ব নিবেদন ;—প্রবৃত্তির মুখে সর্বস্ব নিবেদন, নিবৃত্তির মুখেও সর্বস্ব নিবেদন। প্রবৃত্তির মুখে সর্বস্ব নিবেদনের তত্ত্বটা ত্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার ঘর-সংসার, ধন-দৌলত, পুত্র-পরিবার সকলই আমার ইষ্টদেবতার, আমি কেবল তাঁহার প্রসাদভোজী মাত্র। আমি যাহা করিব, সে সকলের ফলাফল ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া করিব। ইহ সংসারে আমি যেন তাঁহার নায়েব, তাঁহার গোমস্তা, তাঁহার ইসারায়, তাঁহার ইঙ্গিতে আমি অর্থোপার্জন করিতেছি, ঘরবাড়ী করিতেছি। নিবৃত্তির মুখে সর্বসমর্পণের তত্ত্ব গীতায় পরিষ্কার করিয়া বুঝান আছে। প্রবৃত্তির ধর্ম্য সকাম, কিন্তু সে কামনা ঈশ্বর সেবায় বিনিযুক্ত ; নিবৃত্তির ধর্ম্য নিকাম, কেননা আমার কর্মের ফলাফল আমি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছি। এই দুইটি তত্ত্ব পুরাণ নানাবিধ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। (৫) সমাজ-ধর্ম্য বা সমাজ-শরীরের ধর্ম্য কেমন হওয়া

উচিত, তাহার ব্যাখ্যা। ব্যাপ্তি বা ব্যক্তিকে কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিলে, কেমন রাজা, কেমন প্রজা হইলে, কেমন পিতা কেমন পুত্র, কেমন পতি কেমন পত্নী হইলে সমাজের ঔজ্জ্বল্য সাধন হয় তাহার ব্যাখ্যা। এই সম্বন্ধে কথা কহিতে যাইয়া পুরাণ নানা যুগের সমাজের নানা অবস্থার কথা তুলিয়াছেন। সমাজের কোন পর্যায়ের কোন কথা, তাহা বুঝিতে পারিলে, পুরাণের ভিতরের কথা অনেকটা বুঝা যায়। (৬) ফলশ্রুতি,—কোন কর্মের কেমন ফল, কি অবস্থায় কোন কার্যের ফল কিরূপ আকার ধারণ করে তাহার বিশ্লেষণ। এই বিষয়েই পুরাণের বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া পুরাণের তিনটা স্তর আছে—ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাধনার স্তর। ঐতিহাসিক স্তরটা দৃষ্টান্তের হিসাবে প্রযুক্ত; সামাজিক স্তর বিশ্লেষণপ্রধান; সাধনার স্তর ফলশ্রুতিপ্রধান। কোন সাধনার কি ফল, তাহা এক একটা আখ্যায়িকার সাহায্যে দেখান হইয়াছে।

পুরাণ বুঝিতে হইলে কি ভাবে পুরাণ পড়িতে হইবে, মোটামুটি তাহারই গোটাকয়েক কথা আহরণ করিয়া পাঠকগণকে দিলাম। আমার সকলিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা সপ্রমাণ করিতে হইলে এক-একটি পুরাণ ধরিয়া আলোচনা করিতে হয়। আপাততঃ তাহার প্রয়োজনাভাব। কারণ, পুরাণপাঠের নিষ্ঠা সমাজে প্রকাশ না হইলে, সে পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। কাজেই এ বিষয়ের এই খানেই পরিসমাপ্তি করিলাম। পুরাণ যে এলোমেলো ব্যাপার নহে, তাহা বোধ হয় এই তিনটা প্রবন্ধে স্পষ্ট করিতে পারিয়াছি। পুরাণ পাঠের জন্যও বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃন্দাবন

বৃন্দাবনের কথা লিখিবার ক্ষণ পুনরায় আমার উপর আদেশ হইয়াছে। ইহাতে আমি বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছি, কিন্তু ইহাতে ‘নারায়ণের’ গৌরব বৃদ্ধি হইবে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু সে কথা বলিয়া অব্যাহতি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমাকে লিখিতেই হইতেছে। অতএব, ‘নারায়ণের’ পাঠকপাঠিকাগণের মনোযোগ ভিক্ষা করিয়া আমি কথা আরম্ভ করিলাম। এবার আর গৌরচন্দ্রিকা করিয়াই অর্ধেক সময় অতিবাহিত করিব না। ইহা শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, আমি আগাগোড়া জ্ঞাতব্য কথারই অবতারণা করিব, তাহা হইলে তিনি যে ভুল বুঝিয়াছেন, সে কথা বুদ্ধিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইবে না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন হয় ত বৃন্দাবনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, অনেক পুরাতন জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদের স্থানে হয় ত অনেক নূতন দৃশ্য মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমি বৃন্দাবনের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই; অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলি, আমি আজকালকার হিসাবে ভ্রমণ-বৃত্তান্তও লিখিতেছি না। আমি আমারই কথা লিখিতেছি,—আমি যাহা দেখি-
য়াছিলাম, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমি নোটবুক হাতে করিয়া বৃন্দাবনে যাই নাই; বৃন্দাবনের কোন্ মন্দিরটা কত উচ্চ, কোন্ মন্দিরের বয়স কত, কোন্ মন্দিরের কারুকার্য কোন্ শ্রেণীর, এসকল তথ্য সংগ্রহ করি-
বার ক্ষমতা আমি সেখানে যাই নাই। পূর্বকালের ইতিহাস বা প্রত্ন-
তত্ত্ব সংগ্রহ করিবারও গৌরবময় উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি গিয়াছিলাম বৃন্দাবন দেখিতে,—তোমাদের ভূগোলে লিখিত বৃন্দাবন

দেখিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না ; আমি মন্দির বা মন্দির স্থাপিত
বিগ্রহ দেখিবার জন্মও যাই নাই। আমি যাহা দেখিতে গিয়াছিলাম,
যাহা শুনিতে গিয়াছিলাম, তাহার কথা কি বলিয়া বুঝাইব ? আমি
গিয়াছিলাম শুনিতে—

“রাধানামে সাধা বাঁশী

তেমনই ক’রে বাজে কি না ?

(জয় রাধে শ্রীরাধে ব’লে)”

আমি গিয়াছিলাম বৃন্দাবনে দেখিতে—

“যমুনা-কুণ্ডতটে বাঁশীবটে সে মাধুরী।

তারে চিন্তে নারি, নর কি নারী, সুন্দর কি সুন্দরী।”

আমি গিয়াছিলাম দেখিতে

“রাই নাচে বাঁশীর সনে, কৃষ্ণ নাচে রাধার সনে,

পবন হিল্লোলে দোলে পীতাম্বর নীলাম্বরী।”

আমি গিয়াছিলাম শুনিবার জন্ম—

“এই, হিয়া দগ্‌দগি, পরাণ পুড়নি

কি দিলে হইবে ভাল।”

বৃন্দাবনে যাইয়া আমার এ সাধ, এ আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছিল কি ? আমি
যাহা দেখিবার জন্ম গিয়াছিলাম, যাহা শুনিবার জন্ম গিয়াছিলাম,
তাহা কি দেখিয়াছি ? তাহা কি শুনিয়াছি ? সে শুভাদৃষ্ট হইলে
আজ এমন করিয়া শুষ্ক হৃদয়ে বেড়াইতে হইত না, এমন করিয়া
পথে পথে ঘুরিতে হইত না, এমন করিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে
হইত না।—সে কথা থাকুক, যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

পাঠকপাঠিকাগণের হয় ত মনে আছে যে, আমি বৃন্দাবনে যাইয়া
এক দিনের আধ ঘণ্টার পরিচিত পথিককে বহুদিনের পরিচিত বন্ধু-
রূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অজ্ঞাতসারে সেই বন্ধুর আশ্রমেই
অতিথি হইয়াই বৃক্ষিয়াছিলাম, বনে জঙ্গলে, দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে

যে মঙ্গলময় বিধাতা আমার আশ্রয় মিলাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনিই আজ আমার হস্তধারণ পূর্বক এই বাবাজির আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। তবুও অন্ধ আমরা বলি “কৈ তুমি, কোথায় তুমি নারায়ণ!” তবুও সন্দেহ, তবুও তাঁহার মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস!

বাবাজি আমাকে পাইয়া যে কি করিবেন, কোথায় বসাইবেন, তাহাই ভাবিয়া পাইলেন না; তাঁহার আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। আধ ঘণ্টার সামান্য পরিচিত পথিককে পাইয়া এত আনন্দ প্রকাশ করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি একে ডাকিতেছেন, ওকে বলিতেছেন;—আমি ত অবাক। এদিক ওদিক যান, আবার দৌড়িয়া আসিয়া একই কথা বলেন, “শ্রামসুন্দর আজ কৃপা করিয়া এমন অতিথি মিলাইয়া দিয়াছেন।” আমি বলিলাম, “আমাকে পাইয়া আপনি যে শ্রামসুন্দরের সেবা ভুলিতে চলিলেন!” তিনি বালকের মত ‘হাঃ হাঃ’ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আজ যে আমার ঘরে বাহিরে শ্রামসুন্দর।” বাবাজির ব্যবহারে, তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতায় আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম; বুঝিলাম, ইহারই নাম ‘তৃণাদপি সূনীচেন’, ইহারই নাম ‘অমানীনা মান দেন’। একজন প্রকৃত বৈষ্ণব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম; এমন সাধুসঙ্গলাভে পবিত্র হইলাম।

যথাসময়ে স্নান করিয়া শ্রামসুন্দরের প্রসাদ পাইলাম। যমুনা স্নান করিতে যাইতে চাহিয়াছিলাম, বাবাজি যাইতে দিলেন না; বলিলেন, “এত রোদ্রে বাহির হইয়া কাজ নাই।”

রাত্রিতে কৈশনে ও রেলগাড়ীতে নিদ্রা হয় নাই বলিলেই হয়। তাই আহারান্তেই শয়ন করিলাম; তাহার পর নিদ্রা। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অপরাহ্ন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখি বাবাজি ভাগবত পাঠ করিতেছেন, আর আট দশজন স্ত্রীপুরুষ তাঁহার আশে পাশে সম্মুখে বসিয়া একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই আশ্রমেরই অপর এক বাবাজি

আমার উপবেশনের জন্ত একখানি আসন আনিয়া দিলেন। আমি আসনখানি সরাইয়া রাখিয়া মৃত্তিকাসনেই বসিয়া পড়িলাম। বাবাজি অতি সরল ভাষায় ভাগবতের শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দেখিলাম বাবাজি শুধু ভক্তই নহেন, তিনি মহাপণ্ডিত; গভীর শাস্ত্র-জ্ঞানের সহিত অচলা ভক্তি সম্মিলিত হইয়া বৈষ্ণবপ্রবরকে বড়ই মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

প্রায় আধ ঘণ্টার উপর তাঁহার ভাগবতপাঠ শুনিলাম। তাহার পরই তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া বলিলেন, “আজ এই স্থানেই শেষ করি। গৃহে অতিথি আছেন; তাঁহাকে দর্শন করাইতে লইয়া যাইতে হইবে।” এই কথা শুনিয়া আমি অতি বিনীত ভাবে বলিলাম, “আমার জন্ত পাঠ বন্ধ করিবেন কেন? শ্রীধাম ত পলাইবার বস্তু নহে; আজই দেখিবার এত তাড়াতাড়ি কি? আর যাহা দেখিবার, যাহা শুনিবার, তাহা ত এখানেই দেখিতে শুনিতে পাইতেছি। আপনি পাঠ করুন।” তিনি সে কথা শুনিলেন না, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। আমি বলিলাম, “আমার জন্ত আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? যাইতে হয় ত আমি একেলাই যাইব। আপনি এসব ফেলিয়া আমাকে লইয়াই ব্যস্ত হইবেন না। ইহাতে যে আমার অপরাধ হইতেছে।” বাবাজি হাসিয়া বলিলেন, “নরসেবাই নারায়ণের সেবা। বাহিরের স্তম্ভেরদের সেবা করিলেই শ্যামস্তম্ভেরদের সেবা হয়। ভুলিবেন না নরই নারায়ণ! হরি দাসের সেবা না করিলে হরিসেবা হয় না।” হায় বাবাজি! যদি শ্রীহরির দাসই হইতে পারিতাম, তাহা হইলে এমন করিয়া পথে পথে বেড়াইতাম না—তাহা হইলে এমন করিয়া বাঁধনের উপর বাঁধন আঁটিতাম না। কিন্তু তখন আর সে কথা বলিবার অবকাশ পাইলাম না;—দ্বারের বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শুনিয়াই বাবাজি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই আমার সেই মথুরার সঙ্গী যুবকটিকে সঙ্গে লইয়া বাবাজি আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্রবদনে বলি-

লেন, “এই দেখুন, আপনার ভক্ত বন্ধু ব্রজনন্দন প্রসাদ আসিয়াছেন কথাটা বলিতে লজ্জা নাই যে, যিনি এত যত্ন করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত সমস্ত রাত্রি বেলে কাটা-ইয়া আসিয়াছি, ইংরাজি আদবকায়দার খাতিরে তাঁহার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। এই রকম শিষ্টাচারই আমরা শিখিয়াছি! বাবাজির কথায় জানিতে পারিলাম যে, আমার যুবক বন্ধুটির নাম ব্রজনন্দন প্রসাদ! আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলাম, “আপনি এত তাড়াতাড়িই যে এলেন? আপনার মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?” যুবক বলিলেন, “তিনি ভালই আছেন। আপনার ত আসিতে কোন অসুবিধা হয় নাই? এখানে ত কোন কষ্ট হইতেছে না?” আমি বলিলাম, “আপনি যাঁহার কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি যে আমার পূর্বপরিচিত বন্ধু।” বাবাজি তখন হাসিয়া বলিলেন, “প্রসাদ, তোমারই জন্ম আমার এই বন্ধুদর্শন হইল।” প্রসাদ বলিলেন, “বাবু-জিকে তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়াছি বলিয়া বাবা মা আমাকে কত অশুযোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্ম তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।”

বাবাজি বলিলেন, “প্রসাদ, তাহা হইতেছে না; আমি ইঁহাকে শীঘ্র ছাড়িতে পারিব না।”

তখন দুইজনে অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক রহস্যলাপ হইয়া স্থির হইল যে, সেদিন আমি বাবাজির আশ্রমেই থাকিব, পরদিন অপরাহ্নকালে মথুরায় যাইব।

আমি আর এতক্ষণ কিছু বলি নাই; যখন তাঁহাদের ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল, তখন বলিলাম, “তাহা হইলে হে যুবক অক্লুর, আপনি কা’ল রথ লইয়া আসিবেন, আমি বৃন্দাবন অঁধার করিয়া মথুরায় চলিয়া যাইব।” আমার এই কথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন।

বাবাজি তখন বলিলেন, “প্রসাদ, তুমি তাহা হইলে ইহাকে এক-বার দেখাইয়া শুনাইয়া আন।”

প্রসাদ বলিলেন, “আপনিই বলিয়া দিন, কোথায় কোথায় ইহাকে লইয়া যাইব।” বাবাজি উত্তর করিবার পূর্বেই আমি বলিলাম, “আগে ত যমুনা দর্শন করি; তাহার পর অন্য কথা।”

বাবাজি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “তাহা হইলে প্রথমে যমুনাই দেখাও; তাহার পর গোবিন্দজির মন্দিরে লইয়া যাইও।”

যুবক তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরে গেলেন। লালাবাবুর মন্দিরের সম্মুখ দিয়া আমরা যমুনাতীরে গমন করিলাম। কিন্তু কৈ, সে যমুনা কৈ?

“যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি”

সে যমুনা কৈ? এ যে একটা মরা নদী। এ নদীর অপর পারে যে দিগন্তবিস্তৃত বালুকারাশি, এ নদীর সামান্য জলরাশি যে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে! আমি যে যমুনা দেখিতে আসিয়াছি, এ ত সে যমুনা নহে; এ যমুনার তীরে ত কিশোর কিশোরীর মধুর প্রেমাভিনয় হয় নাই; এ যমুনা ত শ্যামের বাঁশী শুনিয়া উদ্ভান বহিতে পারে না, এ যমুনা ত প্রেমের হিল্লোলে নাচে না। আমি প্রসাদকে বলিলাম, “আমি এ যমুনা দেখিতে চাহি না।” প্রসাদ বলিল, “এই ত যমুনা, দোসরা আর যমুনা নাই।” আমি বলিলাম, “এই যদি যমুনা হয়, তাহা হইলে আমার দেখা শেষ হইয়াছে; এখন চলুন বাবাজির আশ্রমে যাই।”

প্রসাদ বলিলেন, “গোবিন্দজির মন্দির, আর আর মন্দির দেখিবেন না? এখনও ত কিছুই দেখা হয় নাই।”

আমি বলিলাম, “কিছুই দেখা হয় নাই; কিছু যে দেখা হইবে, তাহাও ত মনে হয় না। যেমন করিয়া দেখিতে হয়, যে সাধন-ফলে বৃন্দাবন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমার নাই। আমি বৃথা

এখানে আসিয়াছি। তবে যখন আসিয়াছি, তখন সহরটাই দেখিয়া লই; বৃন্দাবনদর্শন আমার অদৃষ্টে নাই।”

প্রসাদ বলিলেন, “তাহা হইলে এখন কোথায় যাইবেন?”

আমি বলিলাম, “সহর দেখিগে চলুন।” এই বলিয়া প্রসাদের সঙ্গে অগ্রসর হইলাম।

এখন তাহা হইলে সহরের কথাই বলি, কারণ সেদিন আমি সহরই দেখিয়াছিলাম। সহরে দেখিয়াছিলাম অসংখ্য মন্দির আর অগণিত বানর। আমি সেদিনের বৃত্তান্ত বলিতে হইলে, তাহাই বলিব। তাহার পর আর কিছু বলিতে পারিব না—বৃন্দাবনের কথা বলিতে পারিব না। যাঁহারা বৃন্দাবন প্রকৃতপক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই শুনিবেন—আমার কথা নহে; যাঁহারা বৃন্দাবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা পাঠ করুন—ভক্তের বৃন্দাবন মানসচক্ষে দেখিতে পাইবেন। আমি দেখিয়াছিলাম বড় ছোট মন্দির, আমি সেদিন দেখিয়াছিলাম অসংখ্য ভালমন্দির নরনারী, আর আমি দেখিয়াছিলাম বানর। ইহার অধিক আমি দেখিও নাই, বলিতেও পারিব না। আমার কাছে মন্দিরের বৃত্তান্ত শুনুন—বানরের কথা শুনুন।

শ্রীগোবিন্দজির মন্দির—শুনলাম এই মন্দির নাকি বৃন্দাবনের অণু সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল; এত উচ্চ ছিল যে সুদূর দিল্লী হইতেও এই মন্দিরের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। আর মন্দিরের কারুকার্যও অতি সুন্দর ছিল। সাধক যেখানে যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা মহার্ঘ পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ইষ্টদেবতার মন্দিরে লাগাইয়াছিলেন। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়াছে। মুসলমান বাদশাহ আওরঙ্গজেব নিজের মস্তক অপেক্ষা আর কাহারও মস্তক উন্নত দেখিতে পারিতেন না; বিশেষতঃ যেখানে সেখানেই যে হিন্দুর দেবমন্দির সকল মস্তক উন্নত করিয়া সগর্ব্ব দণ্ডায়মান থাকিয়া

হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণা করিবে, স্বধর্ম একনিষ্ঠ মোগল বাদসাহ তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি কাশী প্রভৃতি অনেক স্থানের দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; শ্রীগোবিন্দজির মন্দিরের সেই অভভেদী চূড়াও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই—তিনি এই মন্দিরের চূড়াও ধূলায় লুপ্তিত করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে শ্রীগোবিন্দজি পুরাতন মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটা গলির মধ্যে আর একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এখনও সেখানেই বিরাজ করিতেছেন। এই গোবিন্দজি বহুকাল পূর্বের বনের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। গাভীসকল বনে বিচরণ করিবার সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দজিকে দুগ্ধ পান করাইয়া আসিত। পরে ভক্ত-প্রবর রূপ ও সনাতন যখন বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক “কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে পাগলের মত ছুটিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দজিকে বনের মধ্য হইতে তুলিয়া আনিয়া বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শেঠের মন্দির—এখন যদি মন্দির দেখিতে হয়, তবে সে শেঠের মন্দির। দেখিবার মত মন্দির বটে! অর্থে যদি দেবতার কৃপা লাভ করা যায়, লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া নানা কারুকার্য-শোভিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি মোক্ষলাভ করা যায়, তাহা হইলে ধন-কুবের লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ মহাশয় তাহা লাভ করিয়াছেন। ১২৬৩ সালে এই সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়া শ্রীরঙ্গজিদেবের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং যেখানে যা সাজে, অর্থব্যয় করিয়া মন্দিরকে যতদূর সৌন্দর্য্যবিভূষিত করা যাইতে পারে তাহার ক্রটি হয় নাই—শেঠজির ধনাগার তাহার জন্ত উন্মুক্ত হইয়াছিল। প্রকাণ্ড মন্দির, প্রকাণ্ড চত্বর, প্রকাণ্ড প্রাচীর, বিস্তৃত সরোবর, দীর্ঘকায় সোনার তালগাছ, অসংখ্য দাসদাসী, অগণ্য সেবাইত, প্রশস্ত অতিথিশালা—আর প্রচুর ভোগের আয়োজন! ভোগী কিন্তু নির্লিপ্ত! দেবতা নানা বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া নীরব, নিম্পন্দ, নিশ্চল! ঐশ্বর্যের

মধ্যে দেবতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। আমার মত অভাজন মন্দির দেখিয়া বলিল, “হাঁ, মন্দির বটে !” দেবতা ! দেবতা ! কোথায় তুমি ?

এই দুইটি মন্দির দেখিয়াই সেদিনের মত বাবাজির আশ্রমে—ফিরিয়া আসিলাম ; ব্রজেনন্দন প্রসাদ মথুরায় চলিয়া গেলেন।

বিশ্রামের পর বাবাজির শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বারান্দায় বাবাজির নিকট উপবেশন করিলাম। তিনি বলিলেন, “আজ কি কি দেখিলেন ?” আমি বলিলাম, “মন্দির আর বানর।” বাবাজি আমার কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, “মন্দির এখানে অনেক আছে, বানরও অনেক, কোন নরের সাক্ষাৎ কি পাইলেন না ?” আমি বলিলাম, “বাহিরে ত এখনও পাইলাম না—এই আশ্রমে অবশ্য পাইয়াছি। বাহিরে সবাই আমারই গোষ্ঠী।” বাবাজি হাসিয়া বলিলেন, “যমুনা দর্শন হইয়াছে কি ?” আমি বলিলাম, “যমুনা দর্শন হয় নাই, তবে একটা নদী দেখিয়াছি।”

এইবার বাবাজির মুখ গম্ভীর হইল। তিনি অতি ধীর স্বরে বলিলেন, “ভাই, বৃন্দাবন দেখিবার জন্ম, যমুনা দেখিবার জন্ম সব ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া আছি ; কিন্তু আমারও কিছুই দর্শন হইল না। শ্যামসুন্দরের কাছে প্রতিদিন ঐ প্রার্থনাই ত করিয়া থাকি ; ঐ কথাই ত জপ করিয়া থাকি। কিছুতেই কিছু হয় না ভাই ! কিছুই হয় না ! এ জীবন এমনই করিয়া কাটিয়া যাইবে। এখনও যে অহঙ্কার আছে—এখনও যে বাসনা আছে।” এই বলিয়াই বাবাজি তাঁহার মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

“ওরে, জটীলা কুটীলা আমার বাসনা।

আমি, ভজন পূজন কি করিব, নাম সাধনই হোলো না।

আমি মনেতে করি, গৃহ সাধন-বৈরী,

বনে যাব, নাম করিব দিবাসবরী ;

ওরে, বাসনা থাকিলে মনে বনে গেলেও যন্ত্রণা।”

বাবাজি প্রাণের আবেগে উন্টাইয়া পান্টাইয়া বারবার এই গানটি তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। আর আমি—আমি চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার এই ভাবোন্মত্ততা দেখিতে লাগিলাম। আর তখন মনে হইতে লাগিল ;—এই বিদ্বান পণ্ডিত সদংশজাত ভদ্রলোক সংসার ছাড়িয়া, সব ত্যাগ করিয়া যে বৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্ত এখানে আসিয়া পড়িয়া আছেন, দিনরাত তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্যামসুন্দরের কাছে বৃন্দাবন-দর্শন ভিক্ষা করিতেছেন ; তিনিই যখন কাতর, তাঁহার আশাই যখন এখন পর্য্যন্তও মিটিল না ; তখন আমি কামনার দাস, বাসনার গোলাম, ধনমান যশঃ পিপাসু,—আমি কোথাকার কে ? সাধন নাই, ভজন নাই—মুক্তি লাভের প্রয়াসী ; ঢাল নাই তলোয়ার নাই—নিধিরাম সর্দার !

গান শেষ হইয়া গেলে বাবাজি বলিলেন, “ভায়া, তোমাকে আর ‘আপনি’ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেছি না—তুমি বলিলে সখ্য ভাবের আভাস পাই। এখন জলযোগ কর, তাহার পর চল দুই-জনে একটু বেড়াইয়া আসি। বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কি বল ?” আমি বলিলাম, “আমার কোন আপত্তি নাই, এখনই চলুন না।” তিনি বলিলেন, “চল এখনই যাই, ফিরিয়া আসিয়া শ্যামসুন্দর যাহা মিলাইয়া দেন, তাহাই জলযোগ করা যাইবে।”

তখন পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে ; আকাশের চাঁদ দুই হাতে তৃষিত তাপিত নরনারীর মস্তকে অনৃত ঢালিয়া দিতেছেন। চারিদিকে প্রকৃতি নিস্তব্ধ ! সমস্ত সহর যেন পবিত্র জ্যোৎস্নার ধারায় অভিষিক্ত হইতেছে। এমনই সময়ে বাবাজির সহিত আমি ব্রজের পথে বাহির হইলাম। বাবাজির গমনের ধরণ দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি কোন বিশেষ স্থানের কথা মনে করিয়া বাহির হন নাই। আমাকে যে কি দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গেই চলিতে লাগিলাম।

কিছু দূর যাইয়াই একটি পরিত্যক্ত মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সেখানে লোক-সমাগম নাই। বাবাজি সেই ভগ্ন পরিত্যক্ত মন্দিরের সোপানে উপবেশন করিলেন এবং ইঙ্গিতে আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম; একটি কথাও বলিলাম না।

তিনি তখন আপন মনে, আপনার ভাবে মত্ত হইয়া প্রথমে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বর স্পষ্ট হইল। এতদিন পরেও বাবাজির সে গানটি আমার মনে আছে; সেই রাত্রির দৃষ্ট এখনও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাউতেছি। বাবাজি সুকর্ণ; তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গাহিতে লাগিলেন—

জা লাগি চাঁদন বিখ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগি রে।
জা লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক
মদন বৈরী জা লাগি রে।
সে কাহু কতে দিনে পাহন
হসি ন নিহারসি তাহি রে।
হৃদয়ক হার হাঠে টারহ জমু
পেম সুধা অবগাহি রে।
রোয়ইতে মোরে আতুর ভেল লোচন
রয়নি জাম জুগে গেলি রে।
ফুজল চিকুর চীর নহি চেতএ
হার ভার তমু ভেল রে।
তপ তোর তরুণ করুণে কাহু আএল
কাঁই বঢ়া বসি মান রে।
জেও ন অছল মন সেও ভেল সংপন
কবি বিজ্ঞাপতি তনে রে।

গানের সকল কথা মূৰ্খ আমি বুঝিতে পারিলাম না ; তঁবুও বুঝি-
লাম, বাবাজি গাহিতেছেন—যার জন্ত চন্দন বিষ হইল, যার জন্ত চন্দ্র
অগ্নি হইল, যার জন্ত মলয় পবন শর হইল, যার জন্ত মদন শত্রু
হইল, সেই কানাই কত দিন পরে তোর ঘরে আসিয়াছে, সহস্রমুখে
তাহাকে দেখিস্ না ? তোর তপফলে কানাই আসিল । বিজ্ঞাপতি
বলিতেছে, যাহা মনেও ছিল না, তাহাও সম্পন্ন হইল । গানটা আমি
এই রকমই বুঝিয়াছিলাম । কিন্তু বুঝিলাম না, বাবাজির কি হইল ?
সত্য সত্যই কি এতদিন পরে তিনি তাঁহার প্রাণ-কানাইয়ের দর্শন
লাভ করিলেন । বাবাজি এই গান গাহিতে লাগিলেন, আর তাঁহার
নয়নদয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে
লাগিল । পাষণ-হৃদয় আমি, অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগি-
লাম, আর অতৃপ্ত হৃদয়ে এই গান শুনিতে লাগিলাম । বাবাজি তাঁহার
শ্যামসুন্দরকে হৃদয়-আসনে বসাইয়া প্রেমানন্দে তন্ময় হইয়া গেলেন,
আর আমি শূন্য-হৃদয়ে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রছিলাম । মাথার উপর
চাঁদ হাসিতে লাগিল ; আমার মনে হইল, আমাকে যেন বলিতেছে—
এই সম্বল লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছ ?

শ্রীজলধর সেন ।

জীবন পথে

(কথা-নাট্য)

প্রথম দৃশ্য ।

[হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশ, ঘন শালবন, দূরে দূরে ভূর্জবৃক্ষ, মাঝে মাঝে বন্য ধুতুরার গাছ, কোথাও বা শ্বেতমল্লিকার সারি । গাছে গাছে লতায় পাতায় ঘন নিবিষ্ট, তাহার মধ্যে কুটীর । মাঝে মাঝে মেঘেরা কুটীরটিকে ঢাকিয়া দিতেছে । কুটীর-দ্বারে বসিয়া বাঁশুলিয়া বাঁশী বাজাইতেছে । বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে দূরস্থিত বাঁশ-ঝাড়ের পাতার শব্দ ও বুলবুলের ডাক শোনা যাইতেছে । বাঁশুলিয়ার সর্বদিকে ছাইমাখা, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, মাথার চুলগুলি রুম্ম, কপালের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে—হাওয়ায় মাঝে মাঝে সরিয়া পড়িতেছে । বাঁশুলিয়ার দীর্ঘ উন্নত সবল দেহ, চক্ষু সুন্দর পদ্ম-পলাশের মত ঢল ঢল বিস্তৃত । বাঁশুলিয়া একমনে বাঁশী বাজাইতেছে । বেলা অপরাহ্ন—শুক শালপাতা মাড়াইয়া রাজকুমারী মণি-কার সখি কাঞ্চনার প্রবেশ । কাঞ্চনার কৃষক রমণীর বেশ ।]

কা । বাঁশুলিয়া ! আমি এসেছি !

বাঁ । (অশ্রুমনস্কভাবে বাঁশীতে তান তুলিতেছিল)—

কা । মর্ মিন্‌সে, নিশ্চয় পাগল ! রাজকুমারীর যে কি বুদ্ধি তা জানিনে । বাঁশুলিয়া ! অ বাঁশুলিয়া ! এমন পাগলের তানে মানুষে মজে ?

[একটা হরিণ ছুটিয়া আসিয়া কুটীর-দ্বারে নয়ন তুলিয়া বাঁশীর সুর উদ্‌গ্রীব উৎকর্ষ হইয়া শুনিতে লাগিল । বাঁশুলিয়াও তাহার বাঁশী পূর্ববৎ ফুঁ দিয়া বাজাইতে লাগিল ।]

কা। বাঁশুলিয়া! অ বাঁশুলিয়া!—মরণ দশা আর কি? মিন্সে কালো নাকি,—শুন্তে পাওনা? অ বাঁশুলিয়া!

বাঁ। অঁ! অঁ! (বাঁশুলিয়ার মুখ লাল হইয়া গেল)—কে? কাঞ্চনা!

কা। আমি রাজকুমারীর কাছ থেকে এসেছি, রাজকুমারী মাথার দিবা দিয়েছে, তোমাকে একবার দেখা করতে হবে।

বাঁ। কে? কাঞ্চনা? রাজকুমারী, কে? আমি ত বুঝতে পাচ্ছি না।

কট্টু (স্বগতঃ) মিন্সে যেন ন্যাকা! (প্রকাশ্যে) রাজা শঙ্করজিতের কন্যা কুমারী মণিকা।

বাঁ। কাঞ্চনা! আমার অপরাধ ক্ষমা করতে ব'ল। আমি গরীব, চাষ করে খাই, রাজকুমারী জানলে আমি তাঁকে আমার কুটীরে বাঁশীর গান শোনাতাম্ না। রাজকুমারী জানলে আমি তাঁকে হৃদয়ের সে বুকভরা পুরোণো রাগিনী শোনাতাম্ না। আমার মর্ষ ভেঙ্গে গেছে কাঞ্চনা, আমার মর্ষ ভেঙ্গে গেছে। যাও, রাজকন্যা, রাজার সখী তাঁরা আমার কুঁড়েতে কেন? আমি কোন রাজকুমারীকে চিনি, আমি শুধু একজনকে মণিকা বলে জানতাম্। সে ত ওই পাহাড়ের কেল্লার ধারে কি গ্রাম আছে, সেইখানে থাকে, এই জানি,—রাজকন্যাকে জানি না। মণিকা! মণিকা! সে ত সেই গাঁয়ের মণিকা!

কা। বাঁশুলিয়া, রাজকুমারীর বিবাহ! বুঝলে?

বাঁ। তা আমি চাষ করি, বাঁশী বাজাই, আমার কি—আমার কি—তাঁর বিয়েতে কি আমাকে বাঁশী বাজাবার জন্ত ডেকেছেন? রাজকন্যার বিয়েতে আমি কেন? আমি কেন? বিয়েতে বাজাবার বাঁশী ত আমার নেই।

কা। শোন বাঁশুলিয়া, রাজকুমারী মণিকা তোমায় একটা কথা স্মরণ করে দিতে বলেছেন,—শ্রাবণ সন্ধ্যায় অরণ্যপথে দুর্জয়

লিঙ্গের মন্দির হ'তে ফিরবার সময় ভল্লুকের মুখ হ'তে যাকে রক্ষা করেছিলে, যার প্রাণ আজ তোমারই দান, যাকে বুকে ধরে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ঝড়ের ধারায় ভিজতে ভিজতে দুর্গ-তলে পৌঁছে দিচ্লে, তিনি তোমার কাছে আজ তাঁর ধর্মরক্ষা করতে বলেছেন। আর বলেছেন, একদিন প্রাণরক্ষা করেছেন, আজ ধর্মরক্ষা করুন। তিনি নারী, তিনি আর কি করতে পারেন? সবই পরবশে, আত্মবশে কেবল প্রাণ, তাও তাঁর চরণে ফেলে দিয়েছেন। শুধু তাই দিতে পারেন তাঁকে।— বাঁশুলিয়া, নারী-ধর্ম রক্ষা কর।

বাঁ। কাঞ্চনা! আমায় ক্ষমা কর। আমি জানতাম না যে, তিনি রাজা শঙ্করজিতের কন্যা, আমি জানতাম না যে রাজকন্যা এই দরিদ্রের জন্ম কেন সে কথা এখনও মনে করে রেখেছেন, তাঁকে আমার কথা ভুলে যেতে বল; বনপথে, পথ হারিয়েছিলেন, আমি বুন কাঠুরিয়া, আমি তাই—তা সে কথা আবার মনে রাখারার্থি কেন?

কা। বাঁশুলিয়া! মনের ধর্ম মনই জানে। নারী ভালবাসে, কেন ভালবাসে তা সে জানে না! বাঁশুলিয়া! এই যে হরিণী তোমার বাঁশীর স্বর শুনে উভরায় ধেয়ে এল, কেন বাঁশুলিয়া?—এই যে বুলবুল গাইছে, এই যে তোমার কুঁড়ের দ্বারের কাছে গোলাপ ছলে ছলে ফুটে উঠছে, কেন বল ত? বাঁশুলিয়া! ওরা কি জানে কেন? ফুল কেন ফোটে বলতে পার, বাঁশুলিয়া?

বাঁ। আমি ত ফুল নই, ফুলের ভাষা—কথা বলব কি ক'রে বল। আমি মানুষ, মানুষের কথা দুটো কইতে পারি। ফুল ফোটে কেন, তা আমি কি জানি। কাঞ্চনা, আগে জানলে আমি তাঁকে গান শোনাতাম না; আগে জানলে আমি তাঁকে—

কা। চুপ করলে কেন বাঁশুলিয়া, তাঁকে কি? বল—বল—

বাঁ। কিছু নয়, কাঞ্চনা, যাও, যাও, রাজকন্যার দূতী হ'রে আমার কাছে কেন ? আমি—যাও, যাও, কিছু জানি না, আমি ওসব কিছু জানি না—দেখ আমি জানি ছেঁড়া কাপড়ে সারাদিন পরের ক্ষেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেট ভরাতে হয়। কেউ ডেকে কাজ দেয় ত কাজ করি, আজ কেউ ডাকে নি, আজ আর কাজ করতে যাই নি, আজ সারাদিনটা বাঁশীই বাজাচ্ছি। আমার কাছে এসব কথা কেন কাঞ্চনা—যাও, যাও, আমায় কেন তাঁর কথা শোনাতে এসেছ। রাজার বিয়ে বাজাবার বাঁশী আমার নেই ! আমি অনাথ, রাস্তায় পড়ে থাকতুম, গাছের পাতা ঘাস খেয়ে মানুষ হ'য়েছি। আজ একটা পাখী কি ফল মুখে করে এনে ফেলেছিল, তাই খেয়ে দিন কেটেছে। আমার কথায় রাজকুমারীর কি কাজ ? কাঞ্চনা, যাও যাও, শীগ্গির যাও, আমি রাজকুমারীকে চিনি নি ; যাও, যাও, ওসব কথা এখানে বল না। ওই শোন বনদেবী জেগে উঠেছে—গোল কর না, যাও যাও—ওই দেখ এলা লতার যুকুট দুলে উঠছে, সরে যাও, যাও !

কা। বাঁশুলিয়া ! বাঁশুলিয়া ! কি বলছ বাঁশুলিয়া ? তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না যে, তোমার জন্মই শুধু রাজকুমারী মণিকা পরাণ ধরে রেখেছে,—পিতার ভৎসনা, মাতার স্নেহের অভিমান, মথীদের টিটকারী, এ সকল সহ্য করে শুধু তোমার মুখ চেয়ে আছে,—শুধু তোমার একটা কথায় আজ তাঁর বাঁচা মরা নির্ভর করছে,—নইলে হিমালয়ের মেয়ে মরতে ভয় পায় না। তুমি মানুষ না পাষণ্ডপ বাঁশুলিয়া, পাষণ্ড বোধ করি ফেটে যায়, তুমি বেশ নিশ্চিন্ত উত্তর দিলে। না না, তুমি নিতান্ত কাপুরুষ, ধিক্ ধিক্ ! না হলে এই মুহূর্তে এই অন্ধকারে দুর্ভেদ্য শালবন ভেদ করে তোমার প্রিয়তমাকে উদ্ধার করে আনতে। বাঁশুলিয়া ! তোমায় শেষ কথা বলে যাই,

তুমি ধর্মরক্ষা করলে না, কিন্তু নারী হিমালয়ের কন্যা, সে
ধর্ম রক্ষা করতে জানে । তুমি প্রাণ ভয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে
রইলে, নারী প্রাণের মায়া করে না, জেন, সে নিজেকে সে
ধর্ম রক্ষা করবে । বাঁশুলিয়া ! রাজকুমারীর কাল বিবাহ !
(বাঁশুলিয়ার হাত হইতে বাঁশী পড়িয়া গেল) হায় ! বাঁশু-
লিয়া, যদি বুঝতে নারীর প্রাণ ! (স্বগতঃ) পুরুষের আঁখির
পাতে কি আছে, যায় এমন হয়—উন্মাদ ! তোমার সে বোধ-
শক্তি লোপ হয়ে গেছে ।

[কাঞ্চনা রাগভরে বে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া
প্রস্থান করিল । দূরে নেপথ্যে গান গাহিয়া উঠিল ।—

বাঁশীর তানে বনে এনে এখন কেন নিদ্রা হও,
এমন নিষ্ঠুর তুমি চরণতলে দলে যাও ।—

একথানা মেঘ আসিয়া কুটারকে ছাইয়া ফেলিল । বাঁশুলিয়া
দূরে অচল মেরুর পানে চাহিয়া রহিল ।]

বাঁ । (অশ্রুমনস্ক হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া)—বাঁশী—না আমি, বাঁশীই
নিষ্ঠুর, সেই আমার মর্ম্ম ভেদেছে । বাঁশী ? না আমি !

[হরিণটা তখন বাঁশুলিয়ার কাছে আসিয়া তাহার গায়ের কাছে
মাথাটা ঘসিতে লাগিল । চারিদিকে কিংকিৎ স্বাক্ষর করিতেছে—
বাঁশুলিয়া বাঁশী লইয়া আবার বাজাইতে লাগিল—]

বাঁ । (হঠাৎ বাঁশী ফেলিয়া) না না কাঞ্চনা, তুমি ঠিক বলেছ,
ঠিক বলেছ, আমি কাপুরুষ—না না মণিকা, বাঁশুলিয়াও
ধর্ম রক্ষা করতে জানে—মণিকা ! মণিকা ! (বাঁশুলিয়া
চঞ্চল চরণে এদিক ওদিক করিতে লাগিল) “তুমি ধর্মরক্ষা
করলে না, কিন্তু নারী ধর্মরক্ষা করতে জানে ।” (হাসিতে
হাসিতে) হা-হা-হা ! নারী সকলই জানে, পুরুষ জানে না,
সে অত মনের ধর্ম ত বোঝে না—ঠিক—কাঞ্চনা ? ঠিক বলে
গেছে । আচ্ছা বাঁশুলিয়া ! সে তোমার কে ? তোমার ত এই

ছেঁড়া টেনা পরা, ঝরঝরে এই পাতার কুঁড়ে, তায় তুম্বার পড়ছে
ঝরে—মেঘের রাজ্যে বাস, আর ঘাস কেটে খাস—সম্মল ত এই
নিষ্ঠুর বাঁশী, যে কেবলই কাঁদে—চাঁদের আলোয় দেখা রাজ-
কুমারীর হাসিতে চাহনিতে তোর এত কথা কেন ? ফুল ফোটে,
পাখী গায়, মেঘ আসে চলে যায়, চাঁদ উঠে জ্যাছনা ঝরে.
বাঁশ ঝাড়ে পাতা সর্ সর্ করে, তুই এই বাঁশী নিয়ে আছিস বাঁশী
নিয়েই থাক, যে যাবার সে থাক, তোর এত কথা কেন ? উঁহু না,
এ বৃকের ভেতর আবার যেন কেউ কথা কইছে, কি বলছে, ধর্ম-
রক্ষা ! ধর্মরক্ষা ! মণিকা ! মণিকা ! রাজকুমারী মণিকা. না—
না শুধু মণিকা, বৃকের ভেতরে কে যেন জাগিয়ে বুঝিয়ে
বলছে আমার মণিকা, ধর্মরক্ষা ! ধর্মরক্ষা ! বাঁশী ! এতদিন কি
সুরে কাঁদছিলে, আজ আবার অন্ধকারে কার রূপ মনে পড়ে
জেগে উঠলে বাঁশী—আজ যেন কি বেসুর ঠেকছে, সুরের দিশে
ঠিক করেত পাচ্ছিনি—কোথায় ! কোথায় ! রূপ ! রূপ !
জীবন ! জীবন ! না না ধর্মরক্ষা ! একি সুরে বিশ্ব ভরে গেল,
ধর্মরক্ষা ! হিমালয়ের কন্ঠার ধর্মরক্ষা, নারীর ধর্মরক্ষা—পুরুষের
ধর্মরক্ষা !

[বাঁশুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, হরিণটা সেই কুঁড়ের
দ্বারের সম্মুখে শুইয়া পড়িল । পার্শ্বের সেই গোলাপ গাছ হইতে
ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

[হিমালয়ের বনদুর্গ—দুর্গাধিপ শঙ্করজিতের একমাত্র কন্ঠা মণিকা,
দুর্গ-প্রাকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি হাত অলিন্দের উপর, আর
একটি হাত গালে দিয়া, দূরে সূর্যাস্তের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন—
সম্মুখে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিরাট পাষাণ ও ধবলাগিরির অভভেদী শীর্ষ
তুম্বারে মণ্ডিত, স্নর্গভা-অঙ্কিত । একদিকে বনদুর্গ—শাল, তমান,

পিয়াল ও ভূজ্জ্বলের ছায়ায় ঢাকা, দূরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসি-
তেছে। অশ্রুদিকে জ্যোতির্ময় অগ্নিকণা পর্বত শিখরে ঠিক্রিতেছে
—সন্ধ্যাসূর্য রক্তময়। মণিকার অঞ্চল বাতাসে উড়িতেছে, পার্শ্বে
একটি গোলাপ গাছে গোলাপফুল বাতাসে ছুলিয়া ছুলিয়া, মণিকার
কণ্ঠালের কাছে আসিয়া পড়িতেছে; মণিকা সম্পূর্ণ অশ্রুমনস্ক, হুঁস
নাই। দুর্গ-প্রাকারের নিম্নদেশ দিয়া পার্বত্যপথে কৃষক রমণী-
গণ গ্রাম্য গান গাহিতে গাহিতে পৃষ্ঠে সন্তান ও শিরে বোঝা লইয়া
চলিয়াছে—]

ঘরে ঘরে আছে আমার সেই মুখ,
আমার বড় দুখে সুখ,
খাটি সারাবেলা হেসে পড়ি ঢলে
হাসি বড় করে মুখ,—
আমার বড় দুখে সুখ।

মেঘের অঁচল দিয়ে ঘেরা
আমার কুঁড়ে ঘর,
সেখা পাগলা কোরা পাগল পারা
পড়ছে বরষা বরষা।
সেই শালের ছায়ায় জড়িয়ে লতা
বাঁধা সুখের ঘর—
আমার মনের মত দুখ,
আমার বড় দুখে সুখ।

ম। সন্ধ্যা নেমে এল, বুকের ভিতর যেন অঁধার গুম্বরে উঠছে—
একি মেঘের ঘটা, এত মেঘ পাহাড়ে আসে কৈ এত কাল'
মেঘ ত কখন দেখিনি, সে বিদ্যুৎ ও বজ্রপতনের দিনেও ত
নয়! কোথা তুমি প্রাণাধিক! এ অস্তুরে যে দীপধানি ছেলেছ,
কৈ, বুঝি এ ঝঞ্ঝায় তা নিভে যায়, কোথা তুমি অস্তুরতমী!
ইচ্ছা হচ্ছে ঐ ফিঙের মতন গাইতে গাইতে উড়ে যাই—

ঐ-কেমন ঘুঘু দুটি পাতার আড়ালে মুখোমুখী করে ব'সে আছে, এ মেঘের অন্ধকারে তাদের কোন ভয়ই নেই—ঐ যে ওরা কেমন গাইতে গাইতে চলেছে—প্রাণাধিক! প্রাণাধিক! এ প্রাণ যে তোমারই শরণ নিয়েছে, কেমন করে, কেমন করে ধর্ম্মরক্ষা হবে বল—

[কৃষক রমণীরা তখন গাইতে লাগিল,—

“আমার মনের মত দুখ

আমার বড় দুখে সুখ”—]

আহা! ওরা সব কেমন গাইছে, আমার বড় দুখে সুখ—কৈ তুমি, আমার প্রাণের সুন্দর! কি বাঁশীই বাজিয়েছিলে, বাঁশুলিয়া! তুমিই আমার বড় দুখে সুখ। (একটা নিশাচর টিট্টিভ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল—মণিকা চম্কাইয়া উঠিল)—কাঞ্চনা এখনও এল না কেন, ওদের ভেতর কাঞ্চনাকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে কি সে যেতে পারলে না, কেন আমি ত তাকে ওদের মত কাপড় প'রে দুর্গ হ'তে বার হ'তে দেখেছি—কি জানি, যদি দেখা না হয়, তিনি হয় ত কি মনে করছেন, যদি কথা না কয়ে ফিরিয়ে দেন—তিনি হয় ত কি ভাবছেন, আমিই বুঝি ভুল করছি—

কা। (গান গাহিতে গাহিতে নেপথ্যে—)

বাঁশীর তানে বনে এনে এখন কেন নিদয় হও,

এমন নিষ্ঠুর তুমি চরণ তলে দলে ষাও।

বাঁশী তব কি গুণ জানে

আমি উতলা, সকল হেলা—

ধাই তোমা পানে,

তবু বল ফিরে যেতে, কেবা জানে কিবা চাও।

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনারই গলা—“কেবা জানে কিবা চাও”—

সত্যিই কে জানে কি যে চাই—

• (কাঞ্চনার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ—)

ম। কাঞ্চনা ! কাঞ্চনা ! গান রাখ, কি উপায় হ'ল, এই এলি ?
তাকে বলেছিলি, বলেছিলি ? আমি নারী কি করতে পারি,
পারি শুধু এই প্রাণ দিতে, বলেছিলি ; চুপ করে রইলি
কেন, দেখা হয় নি ? বল, বল তোর পায়ে পড়ি কাঞ্চনা, অন্ধ-
কার গুহার মত অন্ধ হয়ে আছি, বুকের ভেতর অঁধার
জমাট বেঁধে আসছে, বুঝি শ্বাস আর পড়ে না। দেখা
হ'য়েছিল, কাঞ্চনা ! কাঞ্চনা !

কা। দাঁড়াও বাপু, হ্যাঁ, আমার পায়ে কাঁটায় ক্ষত বিন্ধত হ'য়ে
গেল, আমি এখন মরছি আপনার জ্বালায়—

মণি। তা হোক, দেখা হয়েছিল কি'না বল, বল তোর পায়ে ধরি
বল—

কা। রস' বাপু, উহ, উঃ—বাবা !—হয়েছিল দেখা ! রস'—হ্যাঁ !

মণি। হয়েছিল তবে, তারপর, তারপর তবে, তারপর বলেছিলি ?

কা। সখি ! সে কথা শোন্বার তোমার প্রয়োজন ? সে কথা না
শোনাই ভাল। উহঃ মাগো পা'টা জ্বলে গেল, সে কি
হেথায় গা !

মণি। কাঞ্চনা ! তুই রাঙ্গসী। বল বল—তুই কি বুকেও বুঝি নি !

কা। সখি ! বুঝি, বুঝি সে কথা না কওয়াই ভাল, বুঝি ভুলতে
পারলেই সুখ, বুঝি না পাঠালে আরো ভাল হ'ত, কেন
পাঠিয়েছিলে সখি ! সে ত পাগল—

মণি। না কাঞ্চনা, তা ভোলবার যে নয়। কাঞ্চনা, সে আমার পাগল
তার উপরে রাগ করিস্ নি : কাঞ্চনা, সবই আমার অদৃষ্ট,
কাঞ্চনা ! আমি কেন অমনি ভিখারীর ঘরে জন্মানাম না,
আমি কেন অমনি ঘাস কি পাতা খেয়ে মানুষ হলাম না !
না কাঞ্চনা ! সে আমার জন্ম পাগল ! তিনি কি বল-
লেন কাঞ্চনা, তুই সকল কথা তাঁকে জানিয়েছিলি ?

কা। সখি ! বিধি ভুল করে ফেলেছে সখি, তাই তোমায় এই রাজ্যের ঘরে পাঠিয়েছে। তোমার পাগল কি বলে জান ? বলে, আমি কাকেও চিনি নি, রাজকুমারী আবার কে ? আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। বলে, চাষার আবার রাজকুমারীর সঙ্গে কি-কাজ ?

ম। কাঞ্চনা ! সে অভিমান করেছে, সে অভিমান করেছে কাঞ্চনা ! আমি প্রাণ ধরে তার ভাব বুকে করে বেড়াচ্ছি, কাঞ্চনা সে অভিমান করেছে, সে অভিমান করেছে, সে যে আমা-বই আর কাকেও জানে না কাঞ্চনা, তাই সে অভিমান করেছে।

কা। না গো না, সে রাজকুমারী মণিকাকে চেনে না। সে জানে ঐ পাহাড়ের তলায় গাঁয়ের একটা মেয়ে, তাকেই সে গান শুনিয়েছিল, রাজকুমারী জানলে তাকে কখন বাঁশী শোনাত না। সে গরীব, পাতার কুঁড়েয় বাস করে। তায় দিবারাত্র তুষার পড়ে। বলে, রাজকুমারীতে আমার কি কাজ ?

ম। কাঞ্চনা ! আমি বুঝেছি কাঞ্চনা ! রাজকুমারী একটা, মণিকা আর একটা কাঞ্চনা ! সে ত আসবে না কাঞ্চনা—তবে কি উপায় হবে কাঞ্চনা ? অন্ধকার ঘনিয়ে গাঢ় হয়ে এল, কাঞ্চনা ! এত অন্ধকার কখন দেখেছিস্ ? ওদিকে তুষার পড়ছে। কাঞ্চনা, আমি একলা যাব, না কাঞ্চনা আমিই যাব। সে অভিমান করেছে কাঞ্চনা, আমিই যাব। রাজকুমারী বলে সে অভিমান করেছে, আমিই যাব। আর ত আমি রাজকুমারী নই কাঞ্চনা ! বড় অন্ধকার, সেই শাল-বনের ভিতর দিয়ে কেমন করে—চারিদিকে দুর্গে যে সতর্ক পাহারা, না আমিই যাব,—আমিও ঐ কৃষক রমণীর বেশে যাব, আর ত আমি রাজকুমারী নই সখি ! যাব আমিই যাব—শুন্তে পাচ্ছিস্ নি, ঐ যে বাঁশী ডাকছে—আমিই যাব।

[দুর্গ-প্রাকারের একধারে রাজা শঙ্করজিৎ কোষবন্ধ তরবারিতে

হস্ত • দিয়া দাঁড়াইয়া—পার্শ্বে রাণী হৈমবতী দুই হাত বন্ধে চাপিয়া—উভয়ের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, ক্রোধে তাঁহার ক্ষুরিত অধর দংশন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া মণিকার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—]

শ। রাজকুমারী মণিকা ! এ দুর্ভেদ্য পার্বত্য অন্ধকারে তুমার-
নিসিক্ত প্রস্তরকঙ্করময় বনপথে কার অভিসারে—কোথায়
যেতে হবে ? রাজকুমারী মণিকা ! কৃষক রমণী হবার এতই
সাধ, সে ছিন্নবস্ত্র মলিন রুদ্ধকেশ বন্য বর্বর ভিখারী পথের
কুকুর পরাম উচ্ছিষ্টভোজী আশ্রয়হীনের আশ্রয় কি এতই
প্রার্থনীয় ও মধুর ?

ম। পিতা ! এ বিস্তৃত আকাশতলে হিমালয় কাকেও আশ্রয়-
হীন করেন না !

শ। চুপ্ ! কে তোর পিতা ? পাপিয়সি ! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি
দিলি, নারীধর্ম্মে ভস্ম লেপিলি, গৌরীশঙ্কর সম আমার এ বিজয়
গরিমার তুঙ্গ শৃঙ্গ ধূলায় লুটালি ? সেই স্থগিত লজ্জাহীনটা
তোর আশ্রয়স্থল হ'ল ? আরে, আরে—

ম। পিতা ! স্বামী নিন্দা নারীর শূন্যে নিষেধ !

শ। কি—কি—স্বামী ? চুপ, নিজমুখে ও পাপ কথা উচ্চারণ
করলি ? তোর জিহ্বা শতধা হ'ল না ? রাণী ! এই তোমার
গর্ভজাত কন্যা—যে আত্মমর্য্যাদা জানে না ?

হৈম। মহারাজ ! আমার কন্যা আমারই উপযুক্ত ! মহারাজ ! স্বামী-
নিন্দা শূন্যে নারীর নিষেধ—একথা ত সত্যই মহারাজ !
মহারাজ ! এই হিমালয়ই সে সত্যের অক্ষুণ্ণ ধারা গঙ্গা, নন্দা,
সরযু, গোমতী, তিস্তা যুগ যুগ ধরে নিয়ে চলেছে । মহারাজ !
ঐ বিরাট গৌরীশঙ্করও তাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সে কথা ত
মিথ্যা নয় মহারাজ ! আমার গর্ভজাত কন্যা আত্মমর্য্যাদা
ভুলে নি রাজন্ !

শ। বটে, বটে, ভুল হয়ে গেছে রাণী! বুঝতে ভুল হয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলাম, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার ত সব কাহিনীই স্মৃতিতে লেখা থাকে দেখছি! তুমি কি বলতে চাও যে দীনহীন কপর্দকশূন্য নিঃস্ব অন্নমুষ্টির ভিখারী, পথে পথে ঘাস পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে, সেই হত-ভাগ্য ঘৃণিত কুকুরেরও অধম—(মণিকা দুই হাত কর্ণে চাপা দিল)—তার করে আমি শঙ্করজিৎ দক্ষ প্রজাপতির বংশধর, আমার ঔরসজাত কন্যাকে—রাণী! রাণী! আমার মস্তিষ্কে বজ্রের দাহন জ্বালা—অজিৎ! অজিৎ! প্রহরী, ডাক অজিৎকে—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমারই কন্যা আজ আমারই ভাগ্যের নিয়ন্তা হোল, ধিক্!

[রাজা শঙ্করজিৎ সেইখানে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। এক-বার কোষবন্ধ তরবারির উপর হাত দিয়া, মণিকার মুখের দিকে চাহিলেন, আবার উদ্ধে আকাশপানে চাহিয়া চঞ্চলভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে কহিলেন, “নারায়ণ!”—মণিকা ও কাঞ্চনা মুখ নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। রাণী হৈমবতী অঞ্চলে নয়নজল মুছিতে লাগিলেন।]

শ। নারায়ণ! নারায়ণ! হিমালয়! তুমি জান আমার বংশের গরিমা। হিমালয়! আজ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উপড়ে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে—হো! হো! কি তাপ!

[অজিৎ প্রবেশ করিলেন—শ্বেতচম্পকবর্ণাভা ফুটিয়া উঠিতেছে—বিশাল বক্ষ বর্ণে আচ্ছাদিত, শিরে উষ্ণীষ—কটীতে তরবারি।]

শ। অজিৎ! অজিৎ! শোন, এই মণিকা ও সখী কাঞ্চনাকে কারাগারে—

হৈম। মহারাজ! বালিকা, মার্জন্য করুন—

শ। চুপ্—বাধা দিও না—উদ্ধিত বজ্রের নীচে আপনাকে এন' না, যাও, সর—এই মণিকা ও সখী কাঞ্চনাকে কারাগারে

লয়ে যাও। আর মন্ত্রীকে আমার আদেশ জানাও যে, রাজ-
কুমারী মণিকার কাল বিবাহ! তুমিও প্রস্তুত হও, ভবিষ্যৎ
সিংহাসন তোমারই—একথা যেন তোমার স্মরণ থাকে, কাল
প্রাতে তোমার অভিষেক—তোমাকে আজীবন পুত্রবৎ স্নেহে
পালন করেছি, আশা করি রাজ্যদেশ পালন করবে।

অ। মহারাজ! জিজ্ঞাসা করতে পারি—অপরাধ?

শ। আমার ইচ্ছা,—যাও, যাও আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও—
জিজ্ঞাসা ক'র না—মনে হয় এ বিশ্ব কেন গুঁড়া হয়ে যাক
না? যাও নিয়ে যাও—

অ। আশুন রাজকুমারী! সখী কাঞ্চনা সঙ্গে এস—

ম। মা গো—

[মণিকা ও কাঞ্চনা অজিতের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।]

হৈ। মহারাজ! আমার বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা—

শ। রাণী হৈমবতী! তোমার ত সকল কাহিনীই মনে থাকে, আমার
বংশের কাহিনীও তোমার মনে রাখা উচিত ছিল। আমিও
এই হিমালয়ে দক্ষপ্রজাপতির বংশধর, সে কথাটাও তোমার
মনে রাখা উচিত ছিল।

হৈ। মহারাজ! কন্যা আমার নিতান্ত বালিকা মাত্র, মহারাজেরও
স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, দক্ষের যজ্ঞও এই একই কারণে
ধ্বংস হয়েছিল—মহারাজ! আমার কন্যাকে মার্জ্জনা করুন!
(শঙ্করজিতের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন) কন্যা
আমার বালিকা মাত্র!

শ। (পা দিয়া ঠেলিয়া) রাজ্ঞী! আশ্রুতা হও! (হাসিয়া) এ
সমস্ত হিমালয়ে এমন কেউ নাই যে আমার এ যজ্ঞ ধ্বংস
করে। আমার বংশের সম্মান, আমার বংশের সম্মান, আমার
যথেষ্ট জ্ঞান আছে। যাও, যাও, সর—এই বৃদ্ধ বয়সে ভেবে-
ছিলাম মণিকার উপযুক্ত পাত্র অজিতের করে তাকে সমর্পণ

করে গভীর অরণ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করব। রাণী! আমার মস্তিষ্কে বজ্রের জ্বালা জ্বলছে। যাও, যাও, জানি আমি রমণীর অশ্রুজলই বল। হিমালয়! তুমি জান এ মরমের কথা।
রাণী হৈমবতী! দ্বাদশ বর্ষ তপস্বর্য্য করে এই মণিকা কণ্ঠা লাভ করেছিলে রাণী! শঙ্কর আমার বক্ষে বড় শক্ত হৃদ-পিণ্ড দিয়েছেন, না হ'লে এতক্ষণ বিধা হয়ে যেত।

[রাজা শঙ্করজিৎ উদ্ধে অন্ধকার পানে তাকাইতে তাকাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন—রাণী! হৈমবতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন মেঘ ঘনাইয়া আসিল, মুঘলধারে বৃষ্টি, বজ্রপতনের শব্দ ও করকাবর্ষণ হইতে লাগিল।]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রাত্রি অন্ধকার—পার্বত্য দুর্গের অভ্যন্তর; অন্ধকার অন্তঃপুর-কারাগার, একপার্শ্বে জানালা—জানালার ধারে মণিকা দাঁড়াইয়া—পর্বতের অপর পার্শ্ব হইতে চাঁদ উঠিল—চন্দ্রালোক তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে—সিক্ত নয়নপল্লব জলে ভরা—চাঁদের পানে চাহিয়া—জানালার পার্শ্বে দেয়ালের ধার দিয়া অজিৎ আসিতেছিলেন—মণিকার কথা শুনিয়া দাঁড়াইলেন।]

ম। হে চন্দ্রমা! তুমি ত সব জান; তুমি, সেই অন্ধকার বন-পথে এমনি অকস্মাৎ পর্বতের কাঁক হতে উঁকি মারলে—সেই চন্দ্রালোকে দুজনের দেখা, সেই ভীষণ ভল্লুকের হাতে—সেই ভয়াল বন্যপশুকে রিক্ত হস্তে কেমন ক'রে নিহত ক'রে—সেই কপাটবন্ধ দৃঢ় উন্নতশীর্ষ পুরুষ,—তারপর তুমি কোথায় লুকালে, শ্রাবণ মেঘে ঝঝর ধারা বর্ষণ আরম্ভ হ'ল।
আহা প্রাণাধিক! আমায় বক্ষে ধরে দুর্গমধ্যে রেখে গেল—চন্দ্রমা! তুমিও মেঘের আড়ালে থেকে সবই দেখেছিলে—তুমি দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ দেখেছিলে, তুমি এই

হিমালয়ে আবার কি তাই দেখতে চাও, চন্দ্রমা ? তুমি ত
কত যুগের কত হাসি, কত কান্না—

[অজিৎ ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে সম্মুখে আসিয়া]

অ । রাজকুমারী !

ম । (নিরুত্তরে নিশ্বাস ফেলিলেন)—(স্বগতঃ) আঃ—সর্প কেন
দংশিল না শিরে—

অ । রাজকুমারী ! আপনাকে দুটো কথা শুধু বলতে এসেছি—
রাজকুমারী ! আমি আপনার প্রণয়-পাত্রকে মিলন করাইয়া
দিব, রাজকুমারী ! বোধ হয় জানেন অজিৎসিংহ কখন মিথ্যা
কথা বলে না ; বালককাল হ'তে এক সঙ্গে খেলা, একসাথে
মৃগয়া, একসাথে পর্বতে পর্বতে নন্দা তিস্তার উৎপত্তি-
স্থান খুঁজিতে যাওয়া, একসাথে অনেকদিন কেটেছে—রাজ-
কুমারী আমাকে তাঁর সহোদর ভায়ের মত মনে করবেন
বোধ হয় ।

ম । অজিৎ ভাই ! (রাজকুমারী মণিকা কাঁদিয়া ফেলিলেন)—
আমি আর রাজকুমারী নই !

অ । রাজকুমারী ! আপনি আশ্বস্ত হ'ন,—কল্য বিবাহরাত্রে আমি
প্রাণ দিয়েও আপনার প্রণয়-পাত্রকে মিলন করাইয়া দিব—
শুধু এই কথা বলতে, শুধু এইটুকু জানাতে এয়েছি ;—
আর—না থাক—

[অজিৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন ।]

ম । ভাই ! ভাই ! বুঝেছি বুঝেছি—প্রেম সর্বত্যাগী, অজিৎসিংহ
বুঝেছি—হায় ! কেন এই নারীজন্ম !—আহা ! আমার সে
পাগল এখন কোথায়, এখন সে কি করছে ?—বাঁশুলিয়া !
বাঁশুলিয়া ! কৈ সে তোমার বংশীধ্বনি—পাগল ! পাগল !
তুমি আমার হৃদয়ে কি বাঁশী বাজালে বল, কি রকমে আমার
এ হৃদয়ে আঘাত করলে, যায় সমস্ত তুমার গলে গেল,

পাগল ! বাঁশুলিয়া ! বাঁশুলিয়া ! তুমি কি জান যে তোমার শালিবনের বুন পাখী আজ কোন লোহার খাঁচায় আবদ্ধ হয়েছে ?

চতুর্থ দৃশ্য ।

[বিবাহরাত্রি—অচলমেরুর চারিদিকে আলোকমালা পর্বতে পর্বতে বাদ্য ও শব্দের রোল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—বিবাহ-মণ্ডপে সালঙ্কারা রাজকুমারী মণিকা, পার্শ্বে সখী কাঞ্চনা, সম্মুখে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন—সম্মুখে হোমাগ্নি। একপার্শ্বে বসিয়া রাজা শঙ্করজিৎ—দূরে রাণী হৈমবতী যোড়হস্তে উর্দ্ধপানে চাহিয়া—চারিদিকে গ্রহরীবর্গ,—নিমন্ত্রিত আত্মীয়বর্গ সকলে উপবিষ্ট, কেহ হাসিতেছেন, কেহ কথা কহিতেছেন। পুরোহিতের পার্শ্বে শ্রুতিপাঠ হইতেছে।]

শ। রাণি ! শুভকার্যে অশ্রুজল ফেল না,—রাণী হৈমবতী !
তুমি কি আমার বংশ-গরিমার ভাতি ভুলে গেছ ? কেন,
তোমার ত সকল কাহিনীই মনে থাকে ।

পু। (হোমাগ্নিতে হব্যদান করিলে অগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল) মহারাজ ! আহুতি গ্রহণ করুন—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—

[নেপথ্যে বাঁশুলিয়ার বংশী বাজিয়া উঠিল—]

ম। কাঞ্চনা ! কাঞ্চনা ! (উন্মত্তার ম্যায় দাঁড়াইয়া ঐ বাঁশী বেজেছে,
তিনি আসছেন, তিনি আসছেন, কাঞ্চনা ! কাঞ্চনা !

কা। বস বস—(মণিকা আবার বসিয়া পড়িলেন)

শ। ওকি ! ওকি ! হ্যাঁ, এই যে—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—

পু। কৈ বর কোথায়—বরকে আনয়ন করুন,

শ। অজিৎ ! অজিৎ ! কৈ মন্ত্রী ! অজিৎকে শীঘ্র আনয়ন করুন,
লগ্ন অতিবাহিত হয়ে যায় ! ওকি ! কৈ অজিৎ কোথায় ?

[মন্ত্রী ছুটিয়া অজিৎকে ডাকিতে গেলেন—নেপথ্যে হর হর

শব্দ ও অশ্বের পদধ্বনিতে পার্বত্য দুর্গ কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল ।]

শ। কি ! কি ! কিসের গোলমাল ! আরে ! আরে ! ভীক্
সব—

[বাঁশুলিয়া ও বারজন পাহাড়িয়া অশ্বোপরি সশস্ত্রে প্রবেশ করিল—মুখে মার্—মার্—মার্—হর হর রব)—বাঁশুলিয়া বামহস্তে মণিকাকে ঘোড়ার উপর তুলিয়া লইল ।]

ম। কাঞ্চনা ! কাঞ্চনা ! একি স্বপ্ন না বিভ্রম !

বাঁ। শোন, সকলে শোন, এই রাজকুমারী মণিকা আমার ধর্ম-
পত্নী, আমি বাঁশুলিয়া তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি—
চন্দ্র সূর্য্য হিমালয় ও আমার আত্মা সাক্ষী । আমি এই সকলের
মধ্যে থেকে তাঁকে গ্রহণ করলাম, যদি কাহারও সাধ্য থাকে
সে যেন বাধা দেয় । দ্বিতীয় দক্ষপ্রজাপতি ! আমিই তোমার
ষষ্ঠ ধ্বংস করলাম—

[ইতিমধ্যে পাহাড়িয়াগণের সহিত রাজা শঙ্করজিতের প্রহরীবর্গ ও
অন্যান্য পুরবাসীগণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল ।]

শ। আরে রে বর্বর ! হতভাগ্য হীন ক্রীতদাস, ভিক্ষারে দিন কাটে
যার, বধি তোরে পশুর মতন ! প্রহরি ! প্রহরি ! রুদ্ধ
কর সকল দুয়ার, যেন মক্ষিকা না পলায় চকিতে । আরে,
আরে ! ঘৃণিত তস্কর, বধি তোরে ছাগ পশু সম ।

[বাঁশুলিয়া মণিকাকে লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান,—
রাজা শঙ্করজিৎ তার অনুধাবন করিলেন—]

হৈ । নারায়ণ ! নারায়ণ ! (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)—

[পাহাড়িয়ারাও যুদ্ধ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল—]

কা। সব ত বেশ হোল ! এখন কাঞ্চনা তোকে ত কেউ চায় না ?
তুই তবে দাঁড়িয়ে কেন বল,—তোর ত কাজ ফুরল—এ

হোমাগ্নি কেন তবে আর শুধু জ্বলে—বাঁশুলিয়া ! তুমি বেশ
বাঁশী বাজিয়েছিলে—বাঃ !

[হোমাগ্নিতে স্বল্প প্রদান ।]

প্রথম দৃশ্য ।

[চারিদিকে অন্ধকার—তিস্তা নদীর তীরের নিকট দুই পর্বতের
মধ্যদিয়া পথ ; দ্রুতবেগে বাঁশুলিয়া সর্বদা রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত
দেহে, মণিকাকে বন্ধে লইয়া ঘোড়ার উপর ছুটিয়া আসিতেছেন—]

বাঁ। মণিকা ! মণিকা ! ধর্মরক্ষা হয়েছে, মণিকা ! ধর্মরক্ষা !
ধর্মরক্ষা !

ম। প্রিয়তম ! প্রিয়তম !

বাঁ। বারটা পাহাড়িয়া মরে গেছে—তাদের সমস্ত বুকের রক্ত ঢেলে
দিয়েছে—বারটা প্রাণের মূল্যে তোমায় আজ লাভ করেছি
মণিকা !

[পশ্চাতে রাজা শঙ্করজিৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছেন—]

শ। নিস্তার নেই ! নিস্তার নেই ! এখন নিস্তার নেই ! সারা বিশ্বে
তোমার স্থান হবে না, নিস্তার নেই ! আরে ! আরে ! কৃতঘ্ন
পিশাচ, মৃত্যু শিরে তোমার—

[বাঁশুলিয়ার ঘোড়া তুষারের উপর পা মচ্কাইয়া পড়িয়া গেল,
বাঁশুলিয়াও মণিকাকে লইয়া তিস্তার তীরে ছিটকাইয়া পড়িলেন—
ঠিক সেই সময়ে শঙ্করজিৎ—“এইবার ! এইবার ! না না পতিত
যে”— এই বলিয়া একবার থম্কাইয়া দাঁড়াইলেন—পরমুহূর্তেই
মণিকা চকিতের মধ্যে বাঁশুলিয়ার তরবারি লইয়া শঙ্করজিতের গলে
আঘাত করিলেন—তাঁহার মস্তক বিধগু হইয়া মণিকার কোলের
কাছে ছিটকাইয়া পড়িল । ওদিকে তখন প্রভাত ; পর্বতের পৃষ্ঠ-
দেশ হইতে অকস্মাৎ সূর্য্যোদয় হইল—মণিকা দেখিল—পিতা !]

ম। পিতা ! পিতা !—সূর্য্য তুমি ত সব দেখলে ।

[মণিকা মৃত বাঁশুলিয়াকে বক্ষে তুলিয়া তিস্তার জলে নামিতে লাগিল।—ছুটিতে ছুটিতে অজিতের প্রবেশ—]

অ। পিতা! পিতা! মহারাজ! রাজকুমারী!

ম। (জলে নামিতে নামিতে) অজিত ভাই! ক্ষমা কর, আমি জীবন পণে প্রেম ক্রয় করেছি; ঐ দেখ তিস্তা আমাদের হাত বাড়িয়ে ডাকছে, বলছে বেশ করেছিস্।

অ। বেশ করেছ রাজকুমারী! আমিও জীবন দিয়ে সে প্রেম বিক্রয় করলাম, তাও তবে দেখে যাও—(অজিত নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন ও পড়িয়া গেলেন।)

ম। হিমালয়! হিমালয়! তোমার কন্যা! হিমালয় তুমি রইলে, যুগ যুগান্ত রইলে; এই কাজের সাক্ষী রইলে।

[মণিকা বাঁশুলিয়াকে বুকে লইয়া ডুবিয়া গেল—তিস্তার উপরে যে তুষার ভাসিতেছিল তাহা আবার সমান হইয়া গেল—চারিদিকে পাখীরা কলরব করিয়া উঠিল—] দূরে কৃষক রমণীরা গান্ধ গাইতে গাইতে মাঠের দিকে চলিয়াছে—

ভোরের বেলা পাখী গায়

সোনার আলো লুটায় পায়

ভুট্টা ক্ষেতে হাওয়া চলে

চল্লো কাজে চল্।

মনের মানুষ মনে আছে

ভাবনা কিসের বল্।

(যবনিকা পতন।)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

অন্তর্যামী

(১)

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !
অপূর্ব আলোকভরা, অন্ধকারে ঢাকা ;
শত লক্ষ চূড়া তার, আনন্দ গস্তীর,
উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্ন-পটে অঁকা !
নাহি বৃক্ষ, তবু আছে বৃক্ষের মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া ;
শত লক্ষ পুষ্পলতা অপূর্ব বরণ,
পাকে পাকে উঠিতেছে ঘিরিয়া ঘিরিয়া !
উজ্জ্বল স্বপনভরা, আনন্দ গস্তীর,
ওই ছায়ালোকে ভাসে অপূর্ব মন্দির !

(২)

নাহি মেঘ তবু যেন ছুটাছুটি করে,
অপূর্ব আলোক ছায়া, মেঘের মতন !
নাহি চন্দ্র, নাহি সূর্য ! কি যে স্বপ্নভরে
উজ্জলি রেখেছে তারে, সে কোন গগন !
নাহি শব্দ, তবু যেন নীরব গস্তীর
উঠিতেছে নিরন্তর কার গীত ধার ?
প্রশান্ত আনন্দভরা ধীর, অতি ধীর,
কে যেন বন্দনা করে কোন দেবতার !
বর্ণাভীত বর্ণে ঢাকা, আনন্দ গস্তীর,
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !

(৩)

ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার ?
কোন পথে যেতে হবে,
কে বল আমারে কবে,
যেন হেরি মনে মনে বন্ধ চারিধার ?
ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার ?

কঠিন পাষাণে যেন রুদ্ধ চারিধার !
প্রবেশের পথ নাই,
যতই যাইতে চাই,
তবু আশা নাহি ছাড়ে অন্তর আমার !
ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার !

(৪)

যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে মোর !
আমার অন্তর-আত্মা বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে,
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে !
কেন হাসিতেছ তুমি, নিশ্চয় নিষ্ঠুর !
অজানিত পথ কিগো, এতই বন্ধুর ?
যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে মোর,
যেমন করেই হোক যেতে হবে মোর !
পথ খানি যেথা থাক, পাব আমি পাব,—
যেমন করেই হোক যাব, আমি যাব !

(৫)

পথ খানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায় ;
 পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায় !
 কোথা পথ, কোথা পথ, কোথা পথ খানি !
 সে পথ বিহনে যে গো, সব মিছা মানি !
 এদিকে ওদিকে চাই, চকিত পরাণে,
 পাগলের মত ধাই, পথের সন্ধানে !
 এই পথ দেখি ভাবি, পেয়েছি পেয়েছি !
 এ পথ সে পথ নয়, এ পথে এসেছি !
 নিশ্বাস ফেলিয়া চলি, কত দূর জানি,
 এই গ্রাম-প্রান্ত হ'তে সেই পথ খানি !

৫। বৌদ্ধ-ধর্ম

২। কোথা হইতে আসিল ?

পূর্বের “নারায়ণে” বৌদ্ধ-ধর্ম কোথা হইতে আসিল তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। বঙ্গবগধচের জাতির আচার ব্যবহার ও

ঐতরেয় আরণ্যকে
বঙ্গ বগধ ও চের জাতি।

ধর্ম লইয়া বৌদ্ধ-ধর্মের উৎপত্তি ঠিক হউক
আর নাই হউক, বৌদ্ধ-ধর্মের মতামত আচার-
ব্যবহার অনেকটা পূর্বদিক হইতেই আসি-

যাছে। কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বঙ্গবগধচের জাতির কথা অল্প লোকেই জানে। অতি অল্পদিন হইল ঐতরেয় আরণ্যকের একটি ভাষ্যে উহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে। এখনও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন ওখানটার অর্থবোধই হয় না। সায়ন বঙ্গবগধচের শব্দের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তবে ওকথার উপর জোর দেওয়া যায় কি? সায়নের কথা ধরি না; সায়ন বেদরচনার দুই তিন হাজার বৎসর পরে উহার অর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। দু’চারটা মানুষের নাম ও দেশের নামের তিনি যে অন্য অর্থ করিয়া দিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এস্থলে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা নিজেও ইহার অর্থ কি স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে বেশ দেখিতে পাইতেছি যে বঙ্গশব্দের মানেতে কোনও গোল নাই। সায়নের অর্থ বনংগতা; এ অর্থ আমরা লইতে পারি না। বগধ যে মগধ তাহাতেও আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। তামিল জাতির একটা শাখাকে যে চের বলিত তাহারও সন্দেহ নাই। এখনও দক্ষিণ দেশে তামিল বা দ্রাবিড়ীয় জাতির মধ্যে কেরল নামে একটি প্রবল জাতি আছে। কেরলদিগের প্রাচীন নাম চের। চেরো বলিয়া একটি জাতিকে ছোটনাগপুরের সমস্ত

জাতিই, আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। কপিলবাস্তুর নিকটে এখনও যে খাড়ুজাতি আছে তাহারাও চেরো বা চেরজাতির একটা ধারা।

এই সকলের সঙ্গে যদি আর একটা কথা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরও একটু সুবিধা হয়। সকলেই জানেন যে আরণ্যক-

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে
ভরতের রাজত্ব

গুলি ব্রাহ্মণগুলিরই শেষ অংশ। ব্রাহ্মণ যে প্রকারের বই, আরণ্যকও সেই প্রকারেরই বই। ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, আরণ্যকে

তাহাই বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ অংশে ইন্দ্র-দেবতার মন্ডে অভিষেক হওয়ায় যেসকল রাজা বড় হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যে ঋষি অভিষেকের পুরোহিত ছিলেন তাহার প্রশংসা আছে, আর যে রাজা অভিষেক লইয়াছিলেন তিনি কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। এই তালিকার শেষ ভাগে লেখা আছে যে ভরতরাজা ইন্দ্র অভিষেক লইয়া ১৩৩টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭৮টা যমুনার পশ্চিমে মরুদেশে, আর ৫৫টা গঙ্গার পূর্বে জলবৃষ্টির দেশে। যমুনার পশ্চিমে যতদূর যাইবে মরুদেশ আর উষ্ণ দেশ। কতদূর ভারতের অধিকার ছিল বলা যায় না। ৭৮ অশ্বমেধের জন্ত কতখানি দেশ লওয়া আবশ্যিক আমরা জানি না। তবে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বেলুচিস্তান উহার মধ্যে ছিল না। থাকিলে ভারতের নাম অনুসারে উহাও ভারতবর্ষ বলিয়া গণ্য হইত; তবেই যমুনার পশ্চিম হইতে সিন্ধুদেশের পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া তিনি ৭৮টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। তাই যদি হইল তবে ৫৫টা অশ্বমেধের জন্ত গঙ্গার পূর্বে কতটা জমী তাহাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল? ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অস্তর্বেদীর নাম একেবারেই করে না, বলে যমুনার পশ্চিমে ও গঙ্গার পূর্বে। এখন ৫৫ অশ্বমেধের জন্ত কতটা দেশের দরকার। আমার বোধ হয়

এলাহাবাদ হইতে ঠিক উত্তরমুখে রেখা টানিলে ঐ রেখা ও গঙ্গার পূর্বপারের মধ্যে যে দেশ পড়ে তাহাই ৫৫টা অশ্বমেধের পক্ষে যথেষ্ট ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভারতবর্ষ অথবা আর্যভূমির অথবা আর্যজাতির বসতি বিস্তারের এই সীমা নির্ধারণ করিয়া দিলে, তাহার পরই

বঙ্গবগধ ও চেরগণ
পার্থী ।

ঐতরেয় আরণ্যক বলিলেন যে বঙ্গ বগধ চের-
জাতি পক্ষিবিশেষ ; উহাদের ধর্ম নাই, উহারা
নরকগামী হইবে । ইহার মোটামোটি অর্থ এই

হইল যে আর্যগণ এলাহাবাদ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার ওদিকেই
বঙ্গবগধচেরজাতি । ইহারা আর্যগণের শত্রু । আর্যগণের বসতি-
বিস্তারে বাধা দিতেন তাই আর্যগণ ইহাদিগকে দেখিতে পারিতেন
না । যাহাদিগকে তাহারা দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে মানুষ
না বলিয়া পশু পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল । তামিল-
গণ তাহাদের কাছে বানর । কর্ণাটগণ হয়ত ভালুক, -লঙ্কার লোক
রাক্ষস । সেইরূপ বাঙ্গালার লোক পার্থী ।

বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পার্থীর দেশেই জন্মান । তাঁহারও পূর্বে
কনকমুনি কপিলবাস্তুরই নিকটে জন্মাইয়া বোধি লাভ করেন । এই

অঞ্চলেই জৈনধর্ম-প্রচারক মহাবীর জন্মগ্রহণ
বুদ্ধ পূর্বাঞ্চলের
লোক । করেন । তাঁহার জন্মস্থান বৈশালী, পাটনার

উত্তর-পশ্চিম গঙ্গার উত্তরপারে । ইনি আবার

জৈনযতি হইয়া বার বৎসর কাল পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসেন ।
বৈশালীর লোক মনে করিল, মহাবীর নিক্রদেশ হইয়াছেন । বার
বৎসর পরে তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া কেবলী হইয়া ফিরিলেন ।
তাঁহারও পূর্বে পার্শ্বনাথ কাশাতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পরি-
ত্যাগের পর পূর্বে অঞ্চলে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া সমেতগিরি অর্থাৎ
পারেশনাথ পাহাড়ে বাস করিয়া তথায়ই দেহরক্ষা করেন । আর
আর তীর্থঙ্করদের অনেকেই পূর্বে অঞ্চলের লোক । ২৪জন বুদ্ধ

ও ২৪জন তীর্থঙ্করের বৃত্তান্ত পড়িলে একথা আরও প্রমাণ বলিয়া বোধ হইবে।

পশ্চিমাঞ্চলে যখন আর্যগণ যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল করিতে ব্যস্ত, শ্রোতসূত্র রচনায় ব্যস্ত, শূদ্রগণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখার বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত, পূর্ব ও পশ্চিমে তখন পূর্বাঞ্চলে বঙ্গবগধচেরগণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত, ভেদ।

কিসে জন্মজরামরণের হাত এড়ান যায় তাহাই লইয়া ব্যস্ত। পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ঋষির পর ঋষি শ্রোতসূত্র রচনা করিতে-ছিলেন; পূর্ব অঞ্চলে তেমনি তীর্থঙ্করের পর তীর্থঙ্কর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে সুখে থাকা যায় তাহারই উপায় দেখিতেছিলেন।

শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ, মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর, দুজনেই এক সময়ের লোক। দুজনেই খৃষ্টের পূর্বের ছয় শতের লোক। সূতরাং দীপ-

২৪জন বুদ্ধ ও ২৪জন তীর্থঙ্কর।
কর প্রভৃতি ২৪জন বুদ্ধ আর ঋষভদেবাদি ২৪জন তীর্থঙ্কর তাহাদের অনেক পূর্বের আবি-

র্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে শাক্যসিংহের পূর্বের যে ২৩জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ নন—বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্ম্মটা পুরাণ, তাই দেখাইবার জন্যই ২৪টা নাম করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহের পূর্ববর্তী কনকমুনির খাম্বা পাওয়া গিয়াছে, যেখানে তাহার নির্বাণ লাভ হয় তাহা স্থির হইয়াছে; তাঁহাকে মানুষ নয় বলা এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার নেপালী বৌদ্ধেরা বলে চারিযুগে আটজন মানুষ বুদ্ধ। বিপশী ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও বিশ্বভূ ত্রেতাযুগে, ক্রবুচ্ছন্দ ও কনকমুনি দ্বাপরে, এবং শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয় কলিযুগে। অপর ১৭জনকে তাঁহারা মানুষ বলুন আর নাই বলুন, শাক্যমুনি ও তাঁহার পূর্বেরকার ছয়জনকে তাহারা মানুষ বলেন। -তীর্থঙ্করদের মধ্যেও, অনেকে মনে করেন যে শেষ দুইজন মাত্র সত্যসত্য মানুষ, বাকীগুলি মনগড়া মাত্র। তাহা হইলেও আমরাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধ ও

মহাবীরের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে পরকাল লইয়া অনেক-দিন হইতে নাড়াচাড়া হইতেছিল।

বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথা আজীবক—ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম, নিগ্রহ—ইহা মহাবীরের ধর্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্মপ্রবর্তক, অজিতকেবশ কাম্বল একজন, সঙ্গয় একজন ও পোকুদ কভ্যায়ণ একজন।

এগুলিও ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেই-খানেই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বাংশে লোক যে

পূর্বাঞ্চলেই বহু ধর্মের প্রসার। কেবল ধর্ম লইয়াই থাকিত, এরূপ নহে; এখানে অশ্রুশ্রু বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

ডাক্তার হার্নলি বলেন যে অস্ত্রচিকিৎসা পূর্বাঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। হস্তিশাস্ত্র এই দেশেই রচনা হয়। শ্যায়-শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও পূর্বভারতে; সুতরাং পূর্বভারত যে এককালে একটি সুসভ্য দেশ ছিল, ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর্য্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে আর্য্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্বসমাজ, পূর্ব-আচার ও পূর্বব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম হইল, শেষ সব ধর্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধ-ধর্মই পূর্বভারতে থাকিয়া পূর্বভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল।

বৌদ্ধদিগের অনেক আচারব্যবহার আর্য্যগণের মধ্যে নাই। বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়—কোথাও এক গাছি কেশ রাখে না। কিন্তু

বৌদ্ধ ও আর্য্য আচার-ব্যবহার ভেদ। হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। একথা যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, যে সকল মুসলমানেরা

প্রথম বেহুর দখল করেন তাহাদেরও আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।
 তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম আছে জানিতেন না। একটা
 বৌদ্ধ-বিহার জয় করিয়া তাহারা দেখিলেন
 মাথা কামান। সেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ রহিয়াছে তাহাদের
 সব মাথা কামান। সব মাথা কামান হিন্দুর হইতেই পারে না।
 তবে ইদানিং কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিখাত্যাগ করিয়া-
 ছেন। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের শ্রায় অবমাননা আর নাই। সেই-
 জন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিলে
 তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহার সম্পত্তি তাহার
 সঙ্গে দিবে, কেবল তাহার শিখাটি ছেদন করিয়া লইবে। কিন্তু
 বৌদ্ধ-ধর্ম্মে সকলেরই শিখাচ্ছেদ করিতেই হইত।

আহার বৌদ্ধেরা বারটার আগে করিবে। বারটার এক মিনিট
 পরে আহার করিতে পারিবেন না। আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য
 নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশে মারা
 আহারের নিষম। না হয়, অন্য কারণে কোনও জন্তু মারা হয়,
 তাহারা সে জন্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে। রাত্রে তাহারা
 রস খাইতে পারে, জল খাইতে পারে, কিন্তু শক্ত জিনিস খাইতে
 পারে না। তাহারা পেয় খাইতে পারে কিন্তু চর্ব্ব চোষ্য লেহ
 খাইতে পারে না। এই ত তাহাদের নিয়ম। এটি কিন্তু আর্য্য নিয়-
 মের বিরোধী। আর্য্যগণ এক সূর্য্যে দুইবার খাইতেন না। সূতরাং
 দিনে একবার ও রাত্রে একবার। তাঁহাদের কল্যবর্ত্ত বা প্রাতরাশের
 কথা আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। একবার খাইয়া আর্য্যগণ চব্বিশ
 ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সোনা রূপা ছুইতে পারিতেন না। পূর্ব্বভারতে উহাদের
 ছোঁয়ার দরকার ছিল না। কারণ সোনা রূপার টাকা এদেশে অতি কমই
 ব্যবহার হইত। এদেশে কড়ির ব্যবহার অধিক
 স্বর্ণ রৌপ্য ত্যাগ। ছিল, সোনা রূপা ব্যবহার না করিলেও চলিত।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ করিতেন। হিন্দুস্থানে পঞ্জাবে এমন কি ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটিয়ার উপর শোয়। মাটিতে শুইতে তাহাদের বড়ই কষ্ট হয়, পারত-উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ। পক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। কিন্তু বান্দালায় তাহার বিপরীত। অধিকাংশ লোকই ভূমিতে শয়া পাতিয়া শোয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইলে খাট চৌকি তত্ত্বাপোষ ব্যবহার করে।

বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। গৃহস্থ যাহারা পঞ্চশীল মাত্র গ্রহণ করিবে তাহারাও মদ খাইতে পারিবে না, একথা আর্য্য-গণের পক্ষে খাটে না। তাহারা সোম পান মদ্য ত্যাগ। করিতেন। সৌত্রামণিধাগে তাহারা সুরাপান করিতেন। পুরাণে বলে পূর্বের সকলেই সুরাপান করিতেন, কিন্তু শুক্রাচার্য্য শাপ দেওয়ায়, মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল সময়েই চলিত, যথা পশুধাগে সোম, সৌত্রামণিতে সুরা।

এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধ-ধর্ম ও আর্য্য-ধর্মের অনেক কাজের কথায়ই প্রভেদ। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম কোথা হইতে আসিল বলিতে গেলে, আর্য্য-ধর্ম হইতে আসিল একথা বলা যায় না, আর কোনও দিক হইতে আসিয়াছে। এত প্রাচীনকালে আর কোন দিক হইতে আসিবে সূত্রাং পূর্বদিক হইতেই আসিয়াছে। আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব কি নূতন কথা বাহির করিয়াছেন? তাহার ধর্মের স্কুল কথাগুলি, বিষয়গুলি যদি প্রাচীন ধর্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাহার নূতনত্ব কি? বুদ্ধদেবের পূর্বেও লোকে সংসার ত্যাগ করিত, ভিক্ষু হইত; যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল। সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া থাকিতে গেলেই অহিংসা, অস্ত্রের প্রভৃতি শীল গ্রহণ করিতে হয়, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন ভিক্ষুরাও তাহাই করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও

সম্ভারামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের। ভিক্ষু-দিগের শাসনের জন্ত যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের। এক জায়গায় অনেক ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। এইরূপ অনেকগুলি ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ গোলযোগ বাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তিনি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, সেগুলি প্রাচীন ভারতে চলিত থাকিলেও, যে আকারে তাহা-দিগকে এখন দেখিতে পাওয়া যায় সে আকারটি তাঁহার দেওয়া। তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবিশুদ্ধ তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশজনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালান, তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসমাজের পরম উন্নতির জন্ত, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সমস্ত যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্তও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাহাতে বুদ্ধের ধর্ম্য এত বড়, বাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, বাহার জন্ত বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, বাহার জন্ত সকল ধর্ম্য অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্য এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ ‘মাকামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।’ তিনি নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বৎসর তপস্বী করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, বাহা পাইয়া তিনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্রহ্ম আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, বাহা পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে এই মধ্যমা প্রতিপৎ। মাকামাঝি চল। অহিংসা ধর্ম্য পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চল যেন কোন কীট মুখে না ঢুকিতে পারে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কীট পতঙ্গ পড়ে। মলত্যাগ করিয়া তাহা কাঠি দিয়া নাড়িয়া

দ্রিও যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে শুকাইয়া না যায় । রাস্তায় চলিবার সময় এক গাছ কাটা হাতে করিয়া ঘাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে কোন পোকা মাকড় মারা না যায় । এসকল বাড়া-বাড়ি নয় কি ? বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না । তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কোন জীবহত্যা করিও না । তাহা হইলেই অহিংসা ধর্ম পালন হইবে । তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভাল নয় ; কেবল ভাল খাব, ভাল পরব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভাল নয়, আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভাল নয় । তিনি নিজের যথেষ্ট কঠোর ব্রত করিয়াছিলেন, যথেষ্ট উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে কোনও লাভ নাই, শরীরের কষ্টই সার ; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে এগুলি করা ভাল নয় । ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কি ? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন,—আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় নদৃশুয়ে । এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ এইটিই বৌদ্ধ-ধর্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ । বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন । দুটা বিরোধী জিনিস উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিক্কহস্ত ছিলেন ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।

আরও কিছু আমার কথা

আনন্দে আনন্দময় ! আনন্দকে পেয়ে আমার শোণিত-প্রবাহ, আজ উল্লাসে নৃত্য করছে, স্রংপিণ্ড আমায় দোলা দিচ্ছে, পুলক আমার দেহ-তন্ত্রীকে বহুত করছে । আমার হিয়ার ধগ্ধগিতে, আমি সে প্রাণবস্তুর পরিচয় পাচ্ছি । তারি ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে আমার স্ফীতবন্ধের রক্তবিন্দুসকলের রঙ বদলে গেল । আমি শুভ্রতাকে পেয়ে আজ আমার “পয়োধরা” নাম সার্থক জানলাম । আর মুখ নেত্রে চেয়ে দেখলাম, এই আনন্দধরিত্রীদের সঙ্গে, সেই শিল্পী কুশলীর এই ত শ্রেয়সী বিরচনা ! আজ আমার মুখশ্রীতে এক অলৌকিক স্নিগ্ধ আভা দেখে, কে যেন অনিমেষ নয়নে আমায় নিরীক্ষণ করছেন, আর আমি হ্রীবিজিতা মুষ্কার মত ব্রীড়ানত হয়ে এক অপূর্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি । আমি তাই আজ রূপের উপষাটিকা, পরশের পরিচারিকা, রসের নবনায়িকা । আজ ষৌবন আমার হৃদবিহারী, গন্ধ আমার মনোহারী, শব্দ আমার ভাণ্ডারী, আর “আমি” হয়ে আছে আমার দুয়ারের ভিখারী, দূরে দাঁড়িয়ে অভিমান “মরিছে গুমরি !” আমি যে আনন্দে বিভোর হলাম । একি ! অকস্মাৎ কেন আমি বধির হয়ে গেলাম, আর কানে কথা বায় না, কে আমায় অবশ করে দিলে, আর ছোঁওয়া গায়ে লাগছে না, আমার যে চক্ষু গেল আর দেখতে পাচ্ছি না । রস আশ্বাদন আমার মিটে গেল । একি হোল ! এ যে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ, অরস । এই কি মৃত্যু ! হে মরণশীল ! তুমি ত আজ ভয়ঙ্কর নও, আমি ত তোমায় দেখে ভীত হচ্ছি না । এতো তোমার সংহার বৃষ্টি নয় ! আজ বিনাশ করতে আসনি ! আজ আমায় আলিঙ্গন দিয়ে, আমার আনন্দকে বাঁচাতে এসেছ ? তাকে চিরজীবী করবে বলে ? তুমিই অমৃতের সোপান ! আজ স্পর্শ করে বলতে পারব, মৃত্যুই আনন্দ,

আনন্দই মৃত্যু ! দুইএর একই অমৃতস্বরূপ ! “আনন্দরূপমমৃতম্, অমৃতরূপমানন্দম্ ।” আজ তুমি মৃত্যুরূপে মৃত্যুঞ্জয়ী নাম ধরেছ ? আজ কেন এ কৃপা ? ঐশ্ব্যকার কৃপা ? এয়ে কৃপাহি কেবলম্ !

পেলাম ত, ঘরে রাখতে পারব কি ? এ ঘরে যে সাতভূতের কীর্তন, কেউ এসে টিকে থাকতে চায় না । আমার শৈশব এসেছিল, চলে গেছে । বালাকে আমি পেয়েছিলাম, ধরে রাখা গেলনা । কৈশোর, কৈ কিছুতেই ত রইল না । এখন যৌবন, সেও বাই বাই করছে । এ ঘরে আমার কোনই একতিয়ার নাই ;—যদিও এ আমারি পৈত্রিক ভিটায়, আমারি গায়ের মালমসলায় তৈয়ারী, শ্রায্যমতে আমিই এর উত্তরাধিকারী । কিন্তু কে একে অর্মন বেওয়ারিসি মান করে দিলে ? যার যখন ইচ্ছা আসে যায় ; একে ভাসে গড়ে, গাঁথে, জোড়ে, সাজায় গোজায় ; ফের দেখ্ না দেখ্ চলে যায় । না করে এরা আমায় আসতে জিজ্ঞাসা । না জানিয়ে যায় বাবার বেলা ! আছি যেন একটা সান্দী গোপাল পড়ে । আমার ছিল একখানা খুদে ঘর, ছিলাম আমি তাতে গরীবী হালেতে । না তা হোলনা ; কর, কর, একে বড় কর ; কর, কর, একে মনোহর কর ; সাজাও দিয়ে সৌখিন সাজ, দাও তাক লাগিয়ে সবায় আজ । তোমরা ত তাক লাগিয়ে দিয়ে থালাস্ ! তারপর, তাল সামলায় কে বল দেখি ? দেখ, বাড়ী ঘর যতই বাড়ানো হবে, বাহার তার যতই খুলবে, ততই তাতে বাসের সুখও বিস্তর পাবে, বিড়ম্বনা ভোগও বহুতর জানবে । দেখ্ছ না কি যে এই ঐশ্ব্য্যের বিকারে এ ঘরের সকলের মাথা কেমন বিগড়ে গেছে । আমার পঞ্চ প্রভু ত থেকে থেকে, কেবলি বেকাস বৃদ্ধে, বেহুদা হাস্ছে, বেয়াড়া তাকাচ্ছে, বেহুঁস চলেছে, বেয়াদবি কর্ছে । আমি কাকে খুয়ে কাকে সামলাই ! কেমনেইবা সামলাই বল ? আমার আপনার মাথায়ই কত কি যে খেয়াল চাপ্ছে ! তা যদি বলি ! আমার কখনও ইচ্ছা কর্ছে নিদ্রার মত লোচনদ্রাহিণী হয়ে, মুচ্ছার মত মনোহারিণী রূপে সকল সংযমীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই । আবার কখনও

এক ভুজঙ্গিনী হয়ে, তাকে বেড়িয়ে বেড়িয়ে, তার সর্ব্বাঙ্গে বিষের স্বালা ঢেলে দিয়ে, পরক্ষণে শত চুম্বনে তা তুলে নিয়ে, আপনি তা পান করে, প্রেমময়কে প্রেমে পাগল হ'তে শেখাই। আমার সাধ যায়, অপ্সরার ঢঙে, আকাশ থেকে নেমে, সমুদ্রের ঘরে আগুন ছুঁইয়ে হরিতে পালাই। আবার এও মনে লয়, যাদুকরীর বেশে এসে, পথের পাশগুকে ধরে, হেসে আপন পাশে যাদু করে রাখি। থেয়ালের কথা বল কেন? কিন্তু তা বলে আসলে কি কিছু মিলে নাই? কার দৌলতে আমার “আমি”কে তাড়াবে, অভিমানকে এড়াবে, আমার দুর্লভ দেখা দিল? আমার দূরত্ব ঘুচে গেল, আমাতে আনন্দ সম্ভব হ'ল? আমি অসহায় না ত?

আমি অসহায়, একে অঁকড়ে ধরেই ত প্রাণে বেঁচে আছি। তাই সদা ভয়, এই আসা যাওয়ায় আমার কিছু আসবে যাবে না ত? যৌবন! তুমি যে বড় টিপি টিপি হাসছ? তোমার মিয়াদী পাট্টা ফুরিয়ে এসেছে? তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে? এবারে তল্লিতল্লা তুলবে? দোকান পাট ওঠাবে? তা হবে না, সেটি হতে দিচ্ছি না। জোর জুলুমে না পারি, সাধ্য সাধনা করব, তাতে না কুলায় ত প্রসাধনা আরম্ভ করব। তুমি যাবে? হ'তেই পারে না। তুমি যে যৌবন! আমারি তমুর তনিমা, বন্ধের গরিমা, নয়নের নীলিমা! তুমি যাবে? হে রহস্যময়! আমি যে তোমারি চাতুর্য্যে মোহিনী রমণী, তোমারি ঐশ্বর্য্যে গরবণী গৃহিণী, তোমারি প্রসাদে সংবর্দ্ধিনী জননী। তুমি যাবে? তুমি যে আমার প্রিয়ের প্রথম অনুচর, আমার প্রিয়ের লীলা-সহচর, আমার নিত্য-মনোহর! তুমি যাবে? তুমি যে, হে সুন্দর! আমার স্পৃহণীয়, আমার স্মরণীয়, আমার ভজনীয়, তুমি যে “হয়ে জীবনের প্রভু, হাসাও কাঁদাও কভু।” আমার যে “ও রাজ চরণে তবু পরাণ লোটায়”। তুমি যাবে? তা যাবে বৈ কি? কে আমি বলবার? কে আমি রাখবার? তা আমাদের কাছে থাকবে কেন? তখন তাদের বয়েস হয়ে আসে, তাতে তারা জাতে পুরুষ, সহজেই সাহস বেশী।

তারা জেনে শুনেই যৌবনে এসে পা দেয়, যৌবন সে পদস্পর্শে হেসে জেগে উঠে তাদের সেবায় লেগে যায়। আর যৌবনের যাবার নামটি নাই। আমাদের তখন যদিচ থাকে উচকা বসেস, কিন্তু আমরা মায়ের জাত কিনা, মান রেখে চলাই আমাদের ধারার ধাত। আমরা সহজে গিয়ে কারো গায়ে পা ছোঁয়াতে পারিনা, আমাদের স্বভাবে তা দেয় না। যৌবন যেচেই আমাদের ঘরে আসে,—দেখে, আমরা তারে লাভ ক'রে সাদরে হৃদাসনে বসাই। তবুও এসেই তার যাই যাই যাই। ছুনিয়ার দস্তুরই এই? “শক্তুর ভক্ত নরমের যম”। তা যে যাই বল? যাই যাই করলে আর তাকে ধরে রাখা যায় না। সে কেমন উসখুস করে, মনটা তার উড়ুউড়ু হয়ে যায়। কথা মিছে নয়, “ধরে বেঁধে প্রেম চলে না”। খোসামুদি ছাড়লাম, ডাকলাম এস এস আগার “আমি”, এস এস আমার অভিমান তুমি! আর তোমাদের কোণঠেসা করে রাখা কেন? তা বৈকি? এ বিলাস বিভব কে নেবে! আমার বিশ্বাসের সুখা অফুরন্তই রবে। আমার বাহুপাশের অমৃতক্ষরণ নিঃশেষেই চলবে। যাক না যৌবন যেতে চায় ত! ভয় কি? ভাবনা কিসের? শোণিতপ্রবাহ! তোমরা বেঁচে যাবে, আর দিবারাত্রি হৃদিত বেগে কারো হুকুমে ছুটাছুটি করতে হবে না। হৃদপিণ্ড! আর ত্রস্ত দোলা দিয়ে কেউ তোমায় হয়রাণ করে দিবে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,—এ বেলা তোমাদের মস্তিষ্কের বিকারের উপশম হবে। জানি তোমরা, ফের সম্ভ্রমে কথা কইবে, বুঝে কাছে বসবে, দেখে দৃষ্টি দেবে, ভেবে বশ করবে। যাকনা যৌবন যেতে চায় ত। কার ভয়? কিসের ভাবনা? মন! তুমি তবে আমার আনন্দকে এর হাত থেকে নিয়ে নেও, তবেই আমি আনন্দমনে বসে বসে এদের আসা যাওয়া দেখতে পারব। মুখের কথায় মন মানছে ত?

যৌবন স্থান দোটানায় পড়ে “নয়রো, নতস্কা” তখন একটু ক্ষেম দিলাশা পেলাম। মনকে চোখ ঠার দিয়ে প্রসাধনায় লাগিয়ে দিলাম।

অপাঙ্গে অঙ্কন চাই ? কেন ? “অঁখিতে অঙ্কন নইলে কি অঁখি-
রঙ্কন মিলে ?” আমার দিব্য দৃষ্টি রোখবে না ত ? “ক্লেপা ! পক্ষম
সকল প্রহরী আছে কি করতে, পলকেই সব সামলে নিবে যে।”
ভালো সিন্দূর বিন্দু চাই ? ওসব ছিটা ফোঁটায় কি কারো মন তোষা
যায় ? প্রিয়তম হাসবেন যে, ছি ! তখন লজ্জায় মুখ দেখাব কেমন
করে ? ইন্দুমুখি ! লজ্জাজড় মুখটি দেখাবার এই ত ফন্দি ।
কপোলে পত্রলেখা ? নয় ত চিত্রলেখা ! বিগতপ্রায় রক্তিম
আভা ফোটাতে কিসে ? বক্ষে চন্দন ? “বলভের সেই ত চিত্র-
বিনোদন।” চরণে অলঙ্ক রেখা ? “বিলাস প্রিয়ের এই ত মনো-
লোভা।” তাই ত অঙ্গে আমার আভরণের আভা ঝলসিছে । বুঝি বা
আমার দিন ফিরিল । আমি আপন মনে বসে বসে আপনা রূপ
দেখছি । এ মোহিনী মুরতি বটে, মনোমোহিনী ত নয় ? এ বিচিত্র
চিত্র নিশ্চয়, চৈতন্যস্বরূপ ত নয় । এ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই,
আমার কি স্তাবক মিলবে না ?

শব্দ ! তুমি কারো বার্তা শোনাতে না ? পরশ দেখছি গা
আল্গা দিয়ে বসল ! রূপের যেন চোখ বুজে আসছে, বলি রস !
আর বশ করায় তোমার মতি নাউ ? গন্ধ ! কেন আমোদ করা
ছেড়েছিলে ? কার কথা কে কর ? সব চুপ ! আমি ত বুঝি না এ
নীরব পরিহাস কেন ? আমি কি তবে দিনের লাগাল পেয়ে দিনের
মাথা খেলাম । আমি লজ্জা পেয়ে, সজ্জা ছাড়লাম, “এখন মরি যে
লাঞ্জে !” চেয়ে দেখি চারিদিকে মৃতের আকার । তাই ত ! আমি প্রাণী ?
অমৃতের সন্তান ? মৃতের কেহ নই ? তাই কি ? আহা ! তাই যেন হয় !

যৌবন এবারে যাবার যোগাড় দেখল । জ্ঞানান দিয়ে এর
যাওয়া কেন ? আর সকলের মত ফস্ করে এর যাওয়া নয়
কেন ? বুঝিবা এই রয়ে সয়ে যাওয়ার কোন রহস্য থাকবে ?
না ! পারলাম না আর আমি, এই মাথাপাগলা কটাকে নিয়ে ?
এরা আমায় প্রাণান্ত না করে ছাড়বে না দেখছি ।

শাকের চোটে, কে তার স্বরের মধুটুকু চুরি করেছে ; পরশের কথা, কে তার মোহ-পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছে ; রূপের নালিশ, কে তার সুখদর্শনে বাদ সেধেছে । রসে এসে নাকি মেলা ভেজাল গেশাল পাড়েছে । গন্ধের নাকি খাতির খতম হ'তে চলল । নালিশে আর সুপারিশে আমি একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়লাম । ঘরে কি যেন এক লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন ব্যাপার উপস্থিত । থাক সে শোনা কথা । নিজের চখে কি দেখছি ? আমার অমন চাকু চিকণ চেহারার সে চটকু কৈ ? আমার নিখুঁত কপালে এ লেখা ছিল ? কৈ আগে ত তা দেখিনি ! এখন আর এ লেখার রেখা পৌছা যাবে না ! আমার সেই ঢল ঢল কপোলে ওসব কিসের ছাপ ? আর এ ছাপ ঢাকা পড়বে না ! দেখ দেখ, আমার কাল' মিশমিশে চুলের দশা দেখ । দেখে হেসে আর বাঁচনা । সারাটা দেহ ছেয়েই এই সাদায় কালোয় অদল বদল চলেছে ? মন্দ না ! এ যে দেখছি কলাবিদ্যা-সম্বিত চৌর্য্য-বৃত্তি ! তুলি ধরে ধরে রঙে বেরঙে মিশিয়ে, স্থানে বেস্থানে আঁচর কেটে দিয়ে কারিগরি ফলালে হয়েছে । মতলব, মিষ্ট বস্তুটিকে মাটি করে দেওয়া । এ নষ্টামি, বুদ্ধি কার ? কেন “আমি”র মুখটি এবারে চূণ কেন ? অভিমানের দোষ দিলে কি হবে ? সে মানী লোক, আপনা মান আপনার কাছে, সে ত তোমার মত সরফরাঙ্গি জানে না, করতে চায়ও না ; সে কিছু বেশ-কম দেখলে অন্তরে বলে পুড়ে মরলেও, কয়ে তা সে জানাবে না । ঐ পাঁচটাকে দেখাচ্ছ কি ? ওরা ত আগে থাকতেই চটে আগুন হয়েই ছিল ! রাগের মাথায় রাশদ না করাই মঙ্গল । কে জানে ! কি বলতে কি বলে ফেলবে, শেষ-কালে জবাবদিহি কে হবে, বাপু ?

সব সমান ! এতদিনে বুঝলাম, এদের উমেদারী করা কি বৃক্ষ-মারী । অথচ এদের ছেড়েও আমাদের বাঁচোয়া নেই । একজনকে আমরা জন্মের দাবী পাওনা পেয়ে থাকি, আর এক জনকে জন্মের সঙ্গে ফাও দিয়ে দেয়, বাকী ক'জন জন্মশোধ সাথী হয়ে আসে ।

এসব কাণ্ড পাণ্ডনার ফেরে পড়ে, মাঝে থেকে আমরা কাঁপর হয়ে মরি যে। এদের ত দেখি দস্তই সার, কাজের বেলায় হয়ে যায় হতভম্ব। বসে বসে “কি গেল বল্লেই কি গেল ? একি অরাজকের রাজ্য পড়েছে নাকি” বলে চোঁচামেটী করলে আর চোখ রাজ্যালেই ত আর চোর ধরা পড়ে না, চুরি বন্ধ হয় না ? খোঁজ নাও, খবর-দারী কর, তবে ত তোমাদের প্রভুগিরি মানব ? মন তুমি মুসড়ে গেলে যে ? আমাতে ভয় এল, আমাকে ভাবনায় ধরল। ঘোঁবন ধীরে স্তব্ধ তার সঙ্গের সরঞ্জাম সব সম্বরণে শুরু করল। আমার তাক লাগলো, ভবনে ভাঙ্গনি লাগল। কে, ও, আমার হাবেলীর সীমানা দিয়ে, হালুকা পায়ে চলা-ফিরা করছে ? যেন চিনি চিনি চিনি, জানি জানি জানিনা ! কে তুমি ? কার অত আসুকারা ?

এবার কি তোমার প্রবেশের পালা ? আরো কি ভাঙ্গবে ? আরো কি গড়বে ? কে তুমি ? দাঁড়াও, মুখ দেখতে চাই। মুখ দেখে, চন্কে গেলাম ! চোখ দেখে মনে হোল একে ভূতে পেয়েছে। আমারি ঘরের মানুষ, জন্মইন্তক আমারি সঙ্গে মানুষ হয়ে, আজ তার এ বেইমানি বুদ্ধি ? বিশ্বাস হ'ল না ? কেও তলব করেছে নিশ্চয় ! নয় ত, আমি ভোলা মন দেখে, আপনার খাতা খুলে সব আমার খবরাখবর টুকে রেখে দিয়েছিল, দরকার মত আমার স্মরণ করিয়ে দিবে বলে। কত খাতির, কত স্নেহ ! যেন সোদরের মত। তার আজ এ দুর্ঘটি ! আমারি খেয়ে পরে, আমারি ঘরে সিঁদ কাটবে ? কেমনে প্রত্যয় যাই বল ? বল বল তুমি বল, কার হুকুমে একাজে লাগলে ? কি ! তুমি মরণের কিঙ্কর ? এঘরে আসবার বেলা, দাসখণ্ড লিখে দিয়ে, কবুল করে এসেছিলে, চুরির মাল তাকে দিবে বলে ? কৈফিয়ৎ দিতে হলে এই লেখা দেখাবে ? তাই নিকাশের খাতাপত্রের সঙ্গেই এনেছিলে, আর লিখে লিখে রাখতে ? কার মনে কি থাকে বুঝে ওঠা ভার ! হে কি হুব ! তোমার মনে এই ছিল ! হে বরশ্চোর ! এবারে কিছু

নিয়ে নিয়েছ। যা, না নিতে পেরেছ, নাশ করে গেছ; বাকী সব ছতরছান করে আমার ভিটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে সটকাবে? তখন মরণ এসে আমায় ভস্ম করে আমায় মরণ দেখাবে?

ওহে ক্রীতদাস! তুমি চাকরীর চক্রান্তে পড়ে, চোখের মাধা খেয়ে, প্রভুর বিভূতি মূর্তি দেখ বলে, আমারে দেখাচ্ছ মৃত্যুর ভয়? হে তস্কর! কি বুঝবে তুমি, মৃত্যু আমার কে? আমার চিতা পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে গেলে, তাতে গঙ্গাজল ঢাললে, আমি মরা, সে জল-স্পর্শে, মরণেরি মহামন্ত্র-বলে, ভস্মস্বরূপে ঢেলে অমর হয়ে উঠে দাঁড়াব। তুমি অজ্ঞান, তুমি কিস্কর! কি জানিবে তুমি মৃত্যুর মহিমা? আমি যে তাই বিনাশেরি পথে গিয়ে বহুকাল ধরে মরণেরি শরণ লয়েছি। হে বড় চোর! কর কর তুমি চুরি কর, যত পার, আমি আজ হতে আর তোমায় কিছু বলব না।

মুখে বল্লাম বটে! কিন্তু চোখে দেখছি ঐ ঘরের ভাঙ্গনি, চোখে দেখছি ঐ চোর! চোখে দেখছি ঐ চিতার আগুন! ঐ ভস্ম হয়ে ছাই হয়ে যাওয়া। আতঙ্ক! আতঙ্ক! আনন্দ আমার গোলায় গেল। এ দৈব দুর্দিনে, দুঃখের দিনে, প্রিয়তম পরশ আমার এক ভ্রম। কিন্তু হে আমার পরশমণি! আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে জ্ঞানহারী করে দিওনা, আমি যে তা হোলে, তোমার ডাক শুনতে পাব না। ও মধুমাখা ডাক না শুনলে আমি চক্রে অন্ধকার দেখি। হে সুন্দর! হে আমার অতি সুন্দর! তা হলে এ চোখ নিয়ে আর কি করব? আমি যে চাই, সব দেখা চুকিয়ে দিয়ে, জন্মভরে এক দেখা দেখব! আর মুখভরে বলব “জন্ম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরোপিত ভেল”। আমি যে চাই সব ছোঁওয়ার বালাই নিয়ে, এক ছোঁওয়ায় মিশিয়ে দিয়ে, বলতে, “নাথ নাথ যুগ হিয়া পর রাখনু তবু হিয়া পুড়ন না গেল।” তাই বলছিলাম হে আমার সর্বস্বহর! আমার জ্ঞান কেড়ে নিওনা। তবেই আমার সব যাবে, আমার সর্বনাশ হবে। তবু শুনছ না?

পলে পলে আমায় অবশ করে, অসার করে, আমায় কাল করে,
আমায় কাণা করে দিচ্ছ ? গাঢ় গাঢ়তর আলিঙ্গন ? আমার যে
শ্বাস বন্ধ হয়ে এল ? নিবিড় নিপীড়ন ? ভয় খেয়ে গেছলাম ?
কৈ কালাত বোধ করছি না, আমার সবই ত রইল, সর্বনাশ ত হল না ?
তুমি কি গায়ে মধু ঢেলে এসেছ ? তুমি অমৃতের অধিকারী ? এ
মধুরসে মধুপরশে আমি যে ক্রমে মধু হয়ে যাচ্ছি । আন্তে আন্তে
আমার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল ! আর আমায় খুঁজে পাচ্ছি না ।
আমি শুধু আমার ছিলাম, এখন মধুর হলাম ; সঙ্গে আমার আর সবও
মধুর হয়ে গেল ! এখন আমার শব্দ মধুর হয়ে গেল, আমার পরশ
মধুর হয়ে গেল, আমার রূপ মধুর, আমার রস মধুর, আমার গন্ধ
মধুর । হে মধুকর ! এই জগৎ মধুর করে দিলে ? মধু, মধু, মধু !
মধুময় হেরি এ ত্রিভুবন । আজ অঙ্গ দেখাচ্ছে সব মধুর চাক ঐ
অঙ্গীকে ; অঙ্গী দেখাচ্ছে সব মধুর চাক ঐ অঙ্গকে ; আর আমি
অঙ্গাঙ্গী, এই দুই মধুর চাক হ'তে, জনম জনম মধু “পিও, পিও
জিওন রহব ।”

শ্রীজগদম্বা দেবী ।

সেকালের স্মৃতি ।—বাজে-কথা

৩। বঙ্কিমচন্দ্র ।

১২৫৮ সালের কথা বলিতেছি। মুন্সী আমাকে অক্সফোর্ড হইতে লিখিলেন, আমরা বঙ্কিমবাবুর বহিগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ছাপিতে চাই। তুমি অনুমতি লইবার চেষ্টা কর।

তখন অক্সফোর্ডে একটি সাহিত্য-সভা ছিল। মুন্সী প্রভৃতি সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। ইংরেজ ছাত্রেরা তাঁহাদের দেশের ও ইউরোপের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদের রচনা পড়িয়া শুনাইতেন। বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাঁহাদের দেশের কবি ও ঔপন্যাসিকদিগের রচনার অনুবাদ করিয়া বিদেশী সভ্যদিগকে তৃপ্ত করিতেন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের অনুবাদ শুনিয়া বিদেশী ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সতীর্থদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের দেশের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের রচনা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাও না কেন? আমাদের ভাষায় সকল দেশের বড় বড় কবি ও লেখকদের রচনার অনুবাদ হয়। কিন্তু তোমাদের দেশের সাহিত্যের পরিচয় নাই। এই সভা হইতে, অন্ততঃ সভ্যদের ব্যবহারের জন্ত, কিছু কিছু ছাপাইবার ব্যবস্থা কর।

তাই মুন্সী আমাকে বঙ্কিমবাবুর অনুমতিলাভের চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া, পর দিন প্রভাতে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের ঘরে বসিয়াছিলেন। এই ঘরটিই তাঁহার study ছিল। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। সেদিন

তাঁহাকে বেশ প্রসন্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে মুন্সীর চিঠির কথা বলিলাম।

অক্সফোর্ডের—মোক্ষমূলরের উদ্ভূতোরণের মনীষী ও সাহিত্যরসিক ছাত্রসম্প্রদায় অনুবাদে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের আশ্বাদ পাইয়া ছাপাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা একটু গর্ব অনুভব করিয়াছিলাম। জাতির গৌরব মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, শুনিয়া বঙ্কিমবাবুও আনন্দিত হইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোনও ভাবান্তর দেখিলাম না। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, সম্মতিও দিলেন না! আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া বলিলাম, “কেন?”

বঙ্কিমবাবু গড়িয়ার কাঠের নলটি মুখ হইতে নামাইয়া স্থিতমুখে বলিলেন, “না।”

আমি বলিলাম, “মুন্সীর আশা করিয়া লিখিয়াছে। তাহারা দুঃখিত হইবে;—হয় ত বিদেশী সহপাঠীদিগের কাছে অপ্রস্তুত হইবে। ইহাতে আপনার ক্ষতি কি?”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। একবার মনে করিয়াছিলাম, আমার বহিগুলির ইংরাজী করিয়া ছাপাইব। পরে স্থির করিয়াছি, না ছাপাই ভাল।”

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “কেন?”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “রমেশ তখন বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিলাতের Publisherদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লিখিয়াছিলাম। উত্তরে রমেশ লিখিলেন, বিলাতের Publisherরা নিজের খরচে বাঙ্গালা উপন্যাসের অনুবাদ ছাপিতে চায় না। বিলাতে এখন problem লইয়া উপন্যাস লিখিবার হুজুক চলিতেছে। লোকে তাই পড়ে ও তাই কেনে। এ সময়ে অল্প উপন্যাস ছাপিলে লাভ হইবে না। রমেশের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার চিঠিপত্র চলিয়াছিল।”

রমেশ—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা

ছিল। রমেশবাবুকে অনেকবার বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছি।
উভয়ে মশগুল হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

আমি বলিলাম,—“মুন্সীরা নিজের খরচে ছাপিবে। আপনি যে
রকম বন্দোবস্ত করিতে বলিবেন, আমি সেই রকম করিতে লিখিব।”

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া—স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, “তোমার যে
বড় আগ্রহ! তুমিও দুঃখিত হইতেছ। কিন্তু আগে সব শোন।
শুধু লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিজেই
ছাপিব। তোমাকে বলি,—আমার দুই একখানা উপন্যাসের ইংরাজী
অনুবাদ হইয়াছে। তাহা আমার পছন্দ হয় নাই। আমি নিজে
অনুবাদ করিব, ঠিক করিয়াছিলাম। আমার শেষের উপন্যাস কয়-
খানা যে উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই উহাদের
অনুবাদ করিব—ভাবিয়াছিলাম। এই দেখ,—”

বঙ্কিমবাবু চেয়ার হইতে উঠিলেন; ঘরের পশ্চিম দিকে একটি
আলমারীর দিকে অগ্রসর হইলেন; আলমারী খুলিয়া সকলকার
উপরের তাক হইতে একখানি বড় বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া
আমাকে দিলেন।

আমি দেখিলাম, দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “দেখ, কত খাটিয়াছি। অনুবাদ করিয়াছি।
কাটিয়া কুটিয়া আবার ‘কেয়ার’ করিয়াছি। তাহার পর বাঁধাইয়া
তুলিয়া রাখিয়াছি।—”

আমি সাগ্রহে বলিলাম, “তবে এইখানিই দিন।”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “না; আমি বিলাতী Publisher-দের কাছ
থেকে estimate পর্যন্ত আনাইয়াছিলাম। শেষে ভাবিয়া দেখিলাম,
ছাপাইয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজরা আমার উপন্যাস বুঝিতে
পারিবে না।”

আমি বলিলাম, “সে কি? অক্সফোর্ডের শিক্ষিত ছাত্রদের ভাল
লাগিল, ইংরেজ পাঠকের ভাল লাগিবে না?”

বন্ধিমবাবু মূহু মূহু হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িতে লাগিলেন, আমার হাত হইতে দেবী চৌধুরাণীর পাণ্ডুলিপির খাতাখানি লইয়া প্রান্তা উন্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বন্ধিমবাবু একবার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমি অমনই স্বেযোগ পাইয়া, মিনতি করিয়া, আক্ষর করিয়া বলিলাম, “একবার পরখ করিয়া দেখিলে হয় না—ভাল লাগে কি না?—তাহারা কি বলে?”

বন্ধিমবাবু বলিলেন, “শুধু তাহাদের ভাল লাগিবে না—নয়; তাহারা গালাগালি দিবে।”

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “গালাগালি দিবে?”

বন্ধিমবাবু বলিলেন, “হাঁ। এই দেবীর কথাই ধর। আমি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি। এই ব্রজেশ্বরের বিয়ের কথা কি উহার বুদ্ধিতে পারিবে? polygamy বলিয়া চীৎকার করিবে। আমি কেন ব্রজেশ্বরের তিনটি বিবাহ দিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা বিলাতের লোক বুঝিবে না। তোমাদের দেশেও ত ‘বহুবিবাহ’ দেখিয়াই কেহ কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছে।”

আমি তবু নিরস্ত হইলাম না; সাহস করিয়া বলিলাম, “তাহা ত পুস্তকের ভূমিকায় বুঝাইয়া দিলে হয়।”

বন্ধিমবাবু বলিলেন, “তোমাদের আক্ষর রাখিতে পারিলে আমি খুসী হইতাম। কিন্তু আমি এখন ইংরেজীতে আমার বই বাহির করিব না। তোমাদের অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না—কিছু মনে করিও না।”

আমি নিরাশ হইয়া ফিরিলাম, এবং মুল্লীকে বন্ধিমবাবুর প্রত্যাখ্যানের কথা লিখিয়া দিলাম। Private circulationএর জন্ত ছাপিবারও বন্ধিমবাবু অনুমতি দিলেন না।

দুঃখের বিষয় এই যে, বন্ধিমবাবুর কৃত “দেবী চৌধুরাণী”র অনুবাদ হারাইয়া গিয়াছে। আমি বন্ধিমবাবুর দ্বিতীয় দৌহিত্র, স্নেহভাজন

শ্রীমান পূরেন্দ্রসুন্দরকে দেবীর অনুবাদ ছাপিতে বলি। তিনি পাণ্ডু-
লিপি খুঁজিয়া পান নাই।

গ্রন্থকারের নিজের অনুবাদটি নষ্ট না হইলে, তাহা ভবিষ্যৎ অনু-
বাদকদিগকে পথনির্দেশ করিতে পারিত।

সাহিত্যের প্রাণ স্বদেশী। তাহাতে সার্বভৌমিক ভাবও থাকে।
তবু এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের আদর্শ হইতে পারে না।
বঙ্কিমবাবু আমার মত নাবালকের নিকটে তাঁহার আপত্তির সমস্ত
কারণ নির্দেশ করেন নাই। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে
নিরস্ত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর কাহারও সহিত তাঁহার কথা
হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, “এখন
ইংরেজীতে আমার বই বাহির করিব না।” তিনি কি অনুকূল সময়ের
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন? তাঁহার সমস্ত উপন্যাস ত উদ্দেশ্যমূলক নয়।
সেগুলির অনুবাদ করিবার অনুমতি দিলেন না কেন?

এখন একটা কথা মনে হইতেছে। বঙ্কিমবাবু খাটী ‘স্বদেশী’
ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে ‘স্বদেশ’ দেখাইয়া ও চিনাইয়া
দিয়াছিলেন। স্বদেশের জন্মই লিখিতেন। শেষ জীবনে নিকাম ধর্মের
ও নিকাম কর্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যসেবাও
নিকাম ও উদ্দেশ্যমূলক ছিল। সে উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দেশমধ্যেই
আবদ্ধ ছিল। যাহা দেশের বস্তু, দেশে সার্থক হইবার হয়—হউক,
ইহাই হয় ত তাঁহার কামনা ছিল।

* * * * *

ইহার অনেক দিন পরে বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,
“আপনি কি আর উপন্যাস লিখিবেন না? আমরা কি পড়িব?”

বঙ্কিমবাবু যেন আমাদের পড়িবার জন্মই উপন্যাস লিখিতেন!
বঙ্কিমবাবু এ ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমা করিয়া বলিয়াছিলেন, “তা ঠিক বলিতে
পারি না। তবে অনেক দিন থেকে একটা জিনিস লিখিবার ইচ্ছা

আছে। হইয়া উঠিতেছে না। বৈদিক যুগের ছবি দিয়া একথানা উপন্যাস লিখিব। তবে—হইয়া উঠিবে কি না, বলিতে পারি না।”

বঙ্কিমবাবু অনেক দিন বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন ; বেদের দেবতা, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। সেই সময়েই বোধ হয় এই সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ‘হইয়া উঠিবার’ পূর্বেই বঙ্কিমবাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি আরম্ভ করিয়াছেন ?”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “না ; আরম্ভ করিতে পারিলে শেষ হইয়া যায়।—যদি লিখিয়া উঠিতে পারি, এবং তোমাদের ভাল লাগে, তা হ’লে, ইংরেজী করে’ ছাপান যাবে। কি বল ?”

আমার সেই আগ্রহের কথা তখনও বঙ্কিমবাবুর মনে ছিল ! আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

* * * * *

১২৯৯ সালে বাঙ্গালা দেশে সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলন আরম্ভ হইল। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। উভয় পক্ষের আগ্রহ ক্রমে বিরোধের সন্নিহিত হইল। বিচার ক্রমে বিতণ্ডায় পরিণত হইল। বিতর্ক ক্রমে চরমে উঠিল। সংবাদপত্রে বাদরামী দেখা দিল।

স্বর্গীয় শ্যামলাল মিত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ; সমুদ্র-যাত্রার সমর্থন করিতেন। এই সময়ে “জন্মভূমি”তে সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্যামলাল বাবু সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসের “সাহিত্যে” ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাহার পর, “সাহিত্যে”র এক জন পৃষ্ঠপোষক, আমার অগ্রজতুল্য,

প্রতিষ্ঠাশালী শুলেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন ; এবং “সাহিত্যে” ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দেন ।

প্রবন্ধটি পাইয়া, আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পড়িয়া গোলে পড়িলাম । আমাদের “সাহিত্য” তখন প্রায় গণতন্ত্র ছিল । এখন গণও নাই, তন্ত্রও নাই ; জনও ত খুঁজিয়া পাই না ।—যাক, এখন গণের কথাই বলি । এই রচনার লেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে ‘বানর’ বলিয়া গালি দিয়াছিলেন । আমি বলিলাম, “প্রবন্ধটি ছাপিয়া কাজ নাই ।”

গণের কেহ কেহ আমার সমর্থন করিলেন ; কিন্তু অনেকেই ছাপিতে বলিলেন । যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার লেখাই তখন “সাহিত্যে”র প্রধান অবলম্বন ছিল । তাঁহার লেখা না ছাপা শ্রবুদ্ধির কাজ নয়, তাহাও শুনিলাম । কিন্তু সকলেই স্বীকার করিলেন, প্রবন্ধটির শ্লেষ বিক্রপ খুব smart হয় নাই । কিন্তু এক জন—হায় ! তিনি আর ইহলোকে নাই—স্বর্গীয় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বলিলেন, “রচনা বেশ হইয়াছে । তুমি appreciate করিতে পারিতেছ না ।” নলিনীর মতে আমার শ্রদ্ধা ছিল ।—অমন স্নেহময়, প্রেমময় বন্ধু আর পাইব না । অমন সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই । সাহিত্যই তাহার জীবনের সম্বল ছিল । কাব্য ও কবিতা ও কলাসৌন্দর্য্যে নলিনী মগ্ন হইয়া থাকিত । সংসারের দারিদ্র্য, দুঃখ, আবির্ভাব, কঠোরতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না । নলিনীকে আমরা ‘কবি’ বলিয়া উপহাস করিতাম । নলিনী টুর্গেনেফ্, টলষ্টয়, হায়েন প্রভৃতির নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিল । চৈতন্য-লাইব্রেরীতে সে যখন এই সকল গ্রন্থকারের কেতাবের আমদানী করে, তখন অনেকের পক্ষে সে সকল প্রহেলিকা ছিল । শান্ত, নম্র, ধীর, সারস্বত,—সংসারের কুটিল চক্রে অনভিজ্ঞ নলিনী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কৈশোরের সরলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল ।

“দারিদ্র্যের মৃদু গর্বে চরিত্র সুন্দর !” নলিনীর পক্ষে অস্বর্থ বলিয়া মনে হইত । নলিনীর জীবন বলিত—

“যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবন-স্থলে !”

দরিদ্র নলিনীও সারদাকে বলিতে পারিতেন,—বোধ হয় মনে মনে
বলিতেন,—

“তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্গে এ বসুমতী, যার খুসী তার !”

নলিনী “সাহিত্যে” অনেকগুলি সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন। আজ-
কাল মোপাঁসা ভাজা, মোপাঁসা চচ্চড়ি, মোপাঁসার ছেঁচকী, মোপাঁ-
সার ছ্যাচ্ড়ার ছড়াছড়ি হইয়াছে। কিন্তু নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালীকে
মোপাঁসার গল্পের আস্বাদ দিয়াছিলেন।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া বঙ্কিমবাবুর
বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। ইহার পূর্বে দুই চারিবার বঙ্কিমবাবুর
পরামর্শ পাইয়া উপকৃত ও চরিতার্থ হইয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—“আজ রাখিয়া যাও। কাল কি পরশু
আসিও।”

দুই দিন পরে অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।
দক্ষিণের বৈঠকখানায় জানালায় দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু কাহার সহিত
কথা কহিতেছিলেন। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম; বঙ্কিমবাবু ফিরিয়া
দেখিলেন, বলিলেন, “বসো।” তাহার পর আবার দক্ষিণমুখে
হইয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, পার্শ্ববর্তী
বাড়ীর ঢাকা বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে—যেন
শিশিরস্নাত ক্ষুদ্র যুঁই। মেয়েটি হাসিতেছে, বঙ্কিমবাবু হাসিতে-
ছেন। ক্ষুদ্র শিশুর সহিত শিশু হইয়া বঙ্কিমবাবু খেলা করিতে-
ছেন! মেয়েটি ঘাইবার সময় বলিল, “সাধের তরনী আমার কে

দিল তরঙ্গে!” বন্ধিমবাবু প্রফুল্লচিত্তে স্মিতবিকশিতমুখে এক-
থানি সোফায় বসিলেন,—আমাকে বলিলেন, “মেয়েটি আমার
সই!”

পাশের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিতেছিল। আমি অশ্রুমনস্ক হইয়া
শুনিতেছিলাম। বন্ধিমবাবুর কথা শুনিয়া তটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে
চাহিলাম। বন্ধিমবাবু বলিলেন, “আমার বড় নাতি হারমোনিয়ম
বাজাইতেছে। আমি নাতিদের সঙ্গে খেলাধুলা করি। হারমোনিয়ম
কিনিয়া দিয়াছি। বাড়ীতেই বাজায়, গায়, আনন্দ করে। আমি
উহাদের বাহিরে যাইতে দিই না। তুমি বাজাইতে পার?”

আমি বলিলাম, “না।”

“গান বাজনা তোমার ভাল লাগে না?”

“আমি খুব ভালবাসি।”

“তবে শেখ না কেন?”

অনেক জিনিস ভালবাসিতাম, কিছুই ত শিখিতে পারি নাই!
কি উত্তর দিব?

দাদামহাশয়েরা অনেক চেষ্টা করেন, হারমোনিয়মও কিনিয়া
দেন; পণ্ডিত, মাষ্টার, উপদেশ—চেষ্টা—যত্ন, কিছুই ত্রুটি হয় না।
কিন্তু তাঁহারা বিধিলিপি মুছিয়া দিতে পারেন না। কল্পনায় ভবি-
ষ্যৎ গড়িয়া দেন, কিন্তু প্রাক্তন বর্তমানও গড়ে, ভবিষ্যৎও গড়ে।
আজ দিব্যেন্দুর ‘দাদা’ আর আমার দাদামহাশয়ের কথা এক সঙ্গে মনে
হইতেছে। তাঁহাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা ভ্রমে স্মৃতাঙ্কতি হই-
য়াছে। তাঁহাদের কত আশা বিফল করিয়াছি। কিন্তু বিনিময়ে কি
পাইয়াছি? সে সম্ভাবনা কি আর ফিরিবে? তাহার বিনিময়ে আজ
বে সর্বস্ব—জীবন দিতে পারি!

বন্ধিমবাবু বলিলেন, “তোমার সেই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।”

“আপনার কি মত?”

“তুমি সম্পাদক,—তোমার মত কি আগে শুনি?”

“আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমার মতের মূল্য কি ? আপনার মত কি, বলুন ?”

বঙ্কিমবাবু আমার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—
“আগে তোমার মত কি বল।”

আমি বলিলাম, “আমার ছাপিবার ইচ্ছা নাই।”

“কেন ? তুমি কি সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ ? আষাঢ় মাসের ‘সাহিত্যে’ ত ‘সমুদ্র-যাত্রা’র পোষক প্রবন্ধ ছাপিয়াছ ?”

“প্রবন্ধ স্থলিখিত ও যুক্তিযুক্ত কি না, আমরা তাহাই দেখি। আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও আমরা ছাপি।”

“তবে এটা ছাপিবে না কেন ?”

“যাহারা সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ, তাহারা সমুদ্র-যাত্রার পক্ষদিগকে গালি দিতেছে। এ পক্ষ হইতে সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষদিগকে গালি দিয়া সেই দলে ঢুকিয়া কোনও লাভ নাই।”

“গালি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কি সব সময়ে মন্দ ?—অনেক সময়ে বিদ্রূপে অনেক কাজ হয় ; জান ?”

আমি বলিলাম, “এ লেখাটি কি আপনার ভাল লাগিয়াছে ?—ইহার ব্যঙ্গ—”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “তোমার কি মনে হয় ?”

আমি বলিলাম, “আমার খুব smart মনে হয় নাই।”

“সবই কি খুব smart হয় ?”

আমি বলিলাম, “প্রতিপক্ষকে বাঁদর বলিলে কি বুদ্ধিমত্তা হয় ? পুরাণো কাম্বুদী ঘাটিয়া লাভ কি ?”

“পুরাণো কাম্বুদী ?”

“আপনার সেই ব্যাখ্যাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের চর্বিবতচর্বিবণ। ইহাতে মৌলিকতা নাই। সাহিত্যের হিসাবেও রচনাটি আমার এমন সার্থক মনে হয় নাই—যে জন্ত, গোঁড়াদের যে ব্যবহারের নিন্দা করি, সেই কুকার্য্য নিজেরা করিতে পারি।—তবে আপনি যদি ভাল মনে করেন—”

“না ; আমি তোমার সব কথা না শুনিয়া কিছু বলিব না ।
—বাবু যদি চটেন ? তোমার কাগজে তিনি খুব লেখেন, এবং বেশ
লেখেন ।”

“আমি বুঝাইয়া, মিনতি করিয়া চিঠি লিখিব ।—তাতেও যদি
চটেন, আমি কি করিব ।”

আমি বুঝিলাম, বঙ্কিমবাবু আমার কথা শুনিয়া খুসী হইলেন ।
পকেট হইতে সেই রস-রচনাটি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া
বলিলেন,—“আমি সম্পাদক হইলে, ইহা ছাপিতাম না । আর
ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এ সব রচনা খুব original—smart,—to the
point না হইলে effective হয় না । এটা শুধু গালাগালিই বটে ।”

আমি বাড়ীতে আসিয়া প্রবন্ধটি ফেরত দিলাম । মহিলা-সম্পা-
দিত একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকে পরে তাহা ছাপা হইয়াছিল ।

১২৯৯ সালে আমার বিচারশক্তি ঠিক বঙ্কিমবাবুর মত ছিল,
এবং আমি খুব বাহাদুর ছিলাম, আশা করি, আমার গুণগ্রাহী জনার্দন-
দিগকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি, এবং তাঁহাদিগকে নাক তুলিয়া
আমার শ্রদ্ধা করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছি ! আমি কিন্তু কলমটি
রাখিবার সময় সেই স্নেহময় মনীষীকে স্মরণ করিয়া ভাবিতেছি,—
তাঁহার এত অনুগ্রহ ছিল, এমন আদর্শ মিলিয়াছিল, বিধাতা সব
বিফল করিলেন কেন ? অথবা, “প্রভবতি শুচির্বিশ্বোদগ্ৰাহে মণি ন
মৃদাং চয়ঃ”—ভবভূতির এই বাণী বিফল হইবার নহে ।

শ্রীশূরেশ সমাজপতি ।

বাঁশী-ধ্বনি

নিস্তবধ মধ্যাহ্নের নীরবতা করি দূর,
অহেতু আনন্দ-রসে ব্রজ-হিয়া করি' পূর
বাজিল মুরলী ;

অনন্ত অসীম নভ সে সুরে উঠিছে ভরি',
ক্ষুদ্র তৃণ, ধূলিকণা সে সুর হৃদয়ে ধরি'
পড়িতেছে ঢলি' ।

সে সুরে পুলক-ভরে কদম্ব শিহরি' উঠে,
চম্পক অশোক নাগ কানন ভরিয়া ফুটে,
অশথ নিশ্চল ;

উল্লসিত গিরি-দরী, নিব্বরি হরষে ধরে,
বাড়ায় তরঙ্গ-বাহু যমুনা প্রণয়-ভরে
আকুল বিহ্বল ।

জড়ের ভিতরে বুঝি সে সুরে চেতনা জাগে.
নবীন জীবন পেয়ে হের সবে অনুরাগে
হ'য়ে তৃষাতুর

বাঁশরীর সুর-সুধা আকণ্ঠ করিছে পান,
আস্বাদ করিছে যেন সে সুরে কাহারি' প্রাণ
অজ্ঞাত মধুর !

মুরলীর মোহময় মধুময় শুনি' রব
নৃত্য করে রঙ্গ-ভরে ময়ূর ময়ূরী সব
সুখে পুচ্ছ তুলি' ;

শুক সারি পিক আদি যতক সুকণ্ঠ পাখী
ডালে বসি' শুনে বাঁশী আনন্দে মুদিয়া অঁখি
নিজ গান তুলি' ।

চকিত বিলোল নেত্র উৰ্দ্ধপানে প্রসারিয়া
আনন্দে কুরঙ্গযুথ সে সুর-অমিয়া পিয়া
ধমকি' দাঁড়ায় ;

মধুর বেগুর গানে আকুল ধেমুর প্রাণ,
বৎসগুলি ভুলি গিয়া জননীর স্তনপান
দিশাহারা ধায় ।

স্বাবর জঙ্গম যেন লভিতে সঙ্গম কার
অবিদিত ভাব-ভরে খুলিয়া হৃদয়-দ্বার
রহে প্রতীক্ষায় ;

কে যেন আড়ালে বসি' করিতেছে আবাহন,
তার যেন সাদা পেয়ে অচেতন সচেতন
অভিসারে ধায় !

যমুনা মণ্ডিত করি' মরি সে মুরলী-সুর
মোহিত করিল গিয়া গোপ-গোপী-হৃদি-পুর
সুদূর গোকুলে ;

যেমনি শুনিল বাঁশী, উদাসী হইল হিয়া,
অদৃশ্য কুহক যেন সবারে টানিয়া নিয়া
আনে নদী-কূলে ।

কাস্ত-পদ-সেবা-রতা চরণ ছাড়িয়া ধায়,
অনাদর ভুলি' তার পতি বন-পথে ধায়
সুর অনুসরি' ;

শিশু ফেলি' ধায় নারী, পয়োধরে ক্ষীর ঝরে,
বনিতার বাহু-পাশ বাঁধিতে না পারে নরে,
চলে ছরা করি' ।

কে যেন কোথায় বসি' ডাকে নিজ গণে তার,
গেহ দেহ ভুলি' তাই নরনারী অনিবার
চলে তার পানে ;

কুল মান ভুলে গোপী, বিহ্বল গোপের প্রাণ,
নাচে সবে নদী-তীরে আনন্দ করিয়া পান
পাগল পরাণে ।

বাঁশীর সুরের নেশা সবারে পাগল করে,
যুবক যুবতী কিবা বাল বৃদ্ধ সমস্তরে
করে সংকীৰ্ত্তন ;

কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ “কৃষ্ণ কোথা” ডাকে,
কেহ বা যমুনা-বারি প্রেমানন্দে অঙ্গে মাখে
স্মৃতি-নিমগন ।

কেহ পিতা কেহ মাতা, কেহ সখা সখী কেহ,
কিঙ্কর কিঙ্করী ভাবে কেহ বা লুটায় দেহ
হ’য়ে আত্ম-হারা ;—

কেবল বিরলে এক কিশোরী আছিল ধ্যানে,
বঁধুর বাঁশরী-সুর পশেনি তাহার প্রাণে
ভেদি’ দেহ-কারা ।

নিগূঢ় মরমে তার যে প্রেম-যমুনা বয়,
না উঠে তরঙ্গ তাহে ; শাস্ত স্তম্ভ সে হৃদয়
অতল, অটল ;

বাহ্য উন্মাদনা ওই বাঁশী তথা নাহি বাজে,
বাঁশীধর নিজের তার দেহাতীত চিত্তমাঝে
মগ্ন অবিরল !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ।

বান্দালার আদি নাটক

ভদ্রার্জুন ।

বান্দালা ভাষার আদি নাটক “ভদ্রার্জুন” মহাভারতের “শুভদ্রা-হরণে”র কাহিনী লইয়া রচিত । শুভদ্রা-হরণের আখ্যানটি বান্দালী কবিগণের বড়ই প্রিয় । তেজস্বিনী শুভদ্রার রথ-সঞ্চালন-কাহিনী তাঁহাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে । মাইকেল “শুভদ্রা-হরণ” নামক একখানি কাব্য-রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ।* কিন্তু উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই । তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

“তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিহু, শুভদ্রা-সুন্দরি !
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে ! আশার লহরী
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে ।

* * *

কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কর, পূজি বৈশ্যানে
(ঋষিকুলবৃত্ত বিজ্ঞ) গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুমি বিজ্ঞ-জনে,
লভিবে সুশ্রবঃ, সাজি এ সঙ্গীত-ব্রতে ।”

মাইকেলের এই অসমাপ্ত ব্রত পরে নবীনচন্দ্র “রৈবতক” কাব্য-প্রণয়ন করিয়া উদ্ঘাপন করেন । মাইকেল ‘শুভদ্রা-হরণ’ লিখিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন—

* মাইকেলের অসম্পূর্ণ ‘শুভদ্রা হরণ’ কাব্যের প্রারম্ভ এইরূপ :—

“কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসীজনে।”

এই বাণী তাঁহার পক্ষে ঘটিল না বটে, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীরূপে সফল হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার পর নবীনচন্দ্রই সুভদ্রা-হরণ কাহিনী অবলম্বনে “রৈবতক” রচনা করিয়াছিলেন। এই সুভদ্রা-হরণ কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বিষয়ক্ষে দেখি—

“এক চিত্রে অঙ্কন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবীসেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদের পতাকাশ্রেণী এবং রজোজ্বলিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘসকল চূর্ণ করিতেছে। সুভদ্রা আপন সারথ্য-নৈপুণ্যে প্রীত হইয়া মুখ ফিরাইয়া অঙ্কনের দিকে বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, কুম্ভ দস্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন, রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলকসকল উড়িতেছে, দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।”

[চতুস্তহারিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার বঙ্কিম কল্পনার তুলিকায় এই সুভদ্রা-হরণের কৌতুকজনক আধুনিক সংস্করণও অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন,—

“একদিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ী হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ষা জুড়িয়া অস্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্য জন্ত আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বঙ্গা

“কেমনে ফাস্তনো শূর স্বগুণে লভিল।

(পরাভবি যজ্ঞবন্দে) চারু চন্দ্রাননা

ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী

কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসীজনে,

বাগ্গেবি ! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।”

ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল দেখিয়া, সূর্য্যমুখী স্তম্ভদ্বার মত নগেজের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একেবারে গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় স্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাহার দুর্দশা দেখিয়া নগেজ নিঃসহস্র বর্নগা ধারণ করিয়া গাড়ী অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী স্তম্ভদ্বার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, “তুই সর্ব্বনাশী ত যত আপদের গোড়া।”

[চতুঃসংসারিংশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু অপ্রসিক্ত কাব্য ও নাটককার স্তম্ভদ্বা-হরণ চিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন। “ভদ্রা-জ্জুন” নামক বাঙ্গালা ভাষার আদি নাটকও এই স্তম্ভদ্বা-হরণ বৃত্তান্ত লইয়া রচিত।

“ভদ্রাজ্জুন” নাটকখানি রচনাগুণে যে সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিবে তাহার সম্ভাবনা না থাকিলেও, আদি নাটক বলিয়া ইহার অপেক্ষাকৃত বিশদ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। গ্রন্থখানি দুঃপ্রাপ্য এবং ইহার পুনর্মুদ্রাক্ষণেরও কোন সম্ভাবনা নাই। স্তম্ভদ্বা বাঙ্গালা ভাষার আদি নাটকখানি কিরূপ তাহার বিশদ ধারণা যাহাতে পাঠক-মাত্রেরই করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার বহুস্থল উদ্ধৃত করা-ইয়া দেখাইতেছি।

নাটকখানির দৃশ্যে দৃশ্যে ক্রিয়া (Action) কিছুই নাই। কালীরামদাসের মহাভারত যেরূপ পয়ারাদি ছন্দে রচিত, নাটকের পাত্রপাত্রীও তেমনি পয়ারাদি ছন্দেই কথোপকথন করিতেছে। অতি অল্প স্থলেই গদ্যে কথোপকথন আছে। একখানি কাব্যের পংক্তি-গুলি কথোপকথনচ্ছলে লিখিলে যেরূপ হয়, নাটকখানির অধিকাংশ স্থলেই সেইরূপ। নাটকোচিত ক্রিয়া বা জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি “ভদ্রা-জ্জুনে” নাই। চরিত্রের মধ্যে বলদেবের অভিমান, ভীমের ক্রোধ

ও নারদের কলহপরায়ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রোপদীচরিত্র আদৌ ফুটে নাই। সত্যভামা ও রুক্মিণী—কৃষ্ণের এই দুই পত্নীর চরিত্র নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয় চরিত্রের মধ্যে স্বাভাব্য লক্ষিত হয় না। কেবল রমণীগণের কথোপকথন ও ক্রিয়াকলাপ অঁকিতে গিয়া নাট্যকার যেখানে তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গমহিলা-চিত্র অঁকিয়া ফেলিয়াছেন, সেই স্থলগুলি এই হিসাবে দুষ্কট হইলেও বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।

‘ভদ্রার্জুনে’র প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা। যুধিষ্ঠির রাজসভায় বসিয়া আছেন, “নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।” এই গীতেই নাটকের আরম্ভ। গীতটির প্রথমাংশ এইরূপ,—

[রাগিণী যুলতানী। তাল কাওয়ালী।]

জয় যদুকুল-ভিলক দৈত্য-অরে।

হের মতিহীন পামরে মর্ত্য-পরে। ॥

দুঃখভঞ্জনরূপ তব ভক্তিভরে।

যেবা চিন্তয়ে নভে সেই মুক্তি পরে ॥

নহি সখ্যতা-ভাবে পার ব্যগ্র নরে।

করে শক্রতা যেই সেই শীঘ্র তরে।

ইত্যাদি।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করিয়া দিলেন, দ্রোপদীর জন্ম যেন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, এবং নিয়ম করিয়া দিলেন, “তোমরা একএকজন দ্রোপদীসহিত কালক্ষেপণ করিবে এবং একের সময়ে অশ্ব যিনি দ্রোপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্যটন করিতে হইবেক।” (১০ পৃষ্ঠা) একজন ব্রাহ্মণের গোধন দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম অর্জুনকে, দ্রোপদী ও যুধিষ্ঠির যেখানে বিরাজমান ছিলেন, সেই অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে হইল। কাজেই পূর্বোক্ত নিয়মভঙ্গের প্রায়-শ্চিত্তস্বরূপ তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে দেখি, শ্ৰুভদ্রা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, দেবকী ও রোহিণী বশুদেবকে পাত্র সন্ধান করিতে বলাতে, বশুদেব বলরামের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। বলরাম দুর্যোধনকে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। দেবকী ও রোহিণী এই কথা শুনিয়া প্রতিবেশিনীর সহিত এই প্রকার যুক্তি করিতেছেন,—

রোহিণী। বরটি নাকি বড় ভাল।

দেবকী। কে বল দেখি?

রো। রাজা দুর্যোধন।

দে। আমি শুনিয়াছি তাহার নাকি বড় দুষ্ট চরিত্র।

রো। বিলম্ব, সে কি কথা? এমন হবে না।**

দে। আবার তার বাপ কাণা।

রো। তার বাপ অঙ্ক তাতে ক্ষতি কি? সে ত কাণা নয়?

দে। ওমা, সেকি? একটা কাণা বেয়াই হইবে? একে দুর্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা, কাণা রাজার বেটা বলে, আবার শ্ৰুভদ্রাকে কি কাণার বৌ, কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে? ওমা, সেটা বড় লজ্জার কথা।**

সহচরী। কেমন গো। প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা। অনেক দেখিয়াছ ওনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে তুমিই বিবেচনা কর দেখি? ছেলের বাপের যদি কোনও অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্র ত সে দোষে দোষী হয় না?

প্রতিবাসিনী। হাঁ গো বোন, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী, রোহিণী উহারা ত সেদিনকার মেয়ে, আমি উহাদের বাপের পর্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

[২য় অঙ্ক, ৩য় সংযোগস্থল।]

এই কথোপকথনটি বান্দালী গার্হস্থ্য-চিত্রে বেশ খাপ খাইতে পারে, কিন্তু রাজা দুর্যোধনের পত্নীকে ‘কাণার বৌ’ বলিবে এইরূপ আশঙ্কা ও প্রতিবেশিনীর সহিত পূর্বোক্ত পরামর্শ প্রাচীন যুগের চিত্র নয়। বান্দালার প্রাচীন লেখকগণ যেমন শিবদুর্গাকেও খাঁটি বান্দালী দম্পতি সাজাইয়া তাঁহাদের কোন্দল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ‘ভদ্রা-

অর্জুন'-রচয়িতা তারাচরণ শিকদারও নাটকখানির সর্বত্রই প্রাচীন-কালের রমণীচরিত্র অঙ্কনে প্রয়াস না করিয়া বাঙ্গালীর মেয়েরই চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ভদ্রাঅর্জুনের রমণীগণের চরিত্র, রীতিনীতি, কথোপকথন সবই বাঙ্গালী ধরণের। সেইজন্যই নাট্যকার তবু কতকটা স্বাভাবিকতা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। নাটকের অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথন অধিকাংশই কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে, অর্জুন প্রায়শ্চিত্তহেতু তীর্থযাত্রাক্রমে প্রভাসতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছেন। অভ্যর্থনার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে “রৈবত” (রৈবতক ?) পর্বতে লইয়া চলিলেন। অট্টালিকার উপর হইতে সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জুনের আগমন দেখিতেছিলেন। অর্জুনকে দর্শনমাত্রই সুভদ্রা তাঁহার প্রতি অমুরক্তা হইলেন। পরে সত্যভামা তাঁহার এই অবস্থা জ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শের পর নিশীথে সুভদ্রাকে লইয়া অর্জুনের শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ববিবাহ সঙ্ঘটন করিয়া দিলেন। এদিকে বলদেব পূর্বেই দুর্যোধনকে সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এখন নারদ গিয়া বলদেবকে এই গান্ধর্ববিবাহ সংবাদ দিলে বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনকে হারায় আসিবার জন্ম নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে নিজ উদ্দেশ্যও স্পষ্টাঙ্গরে লিখিয়া দিলেন যে সুভদ্রার সহিত তিনি দুর্যোধনের বিবাহ দিবেন। তৃতীয় অঙ্ক এইখানে শেষ হইল।

চতুর্থ অঙ্কে দুর্যোধন নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া বরসাজে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন ও যুদ্ধিষ্ঠিরের উপদেশে ভীমও সৈন্যসহ বরষাত্রী হইলেন, এই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথমে দুর্যোধন আসিতেছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সুভদ্রাহরণে পরামর্শ দিতেছেন। অস্তঃপুরমধ্যে তখন দুর্যোধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইবে এই বিশ্বাসে রমণীগণের মঙ্গল আচার আরম্ভ হইয়াছে। কৃত্তিবাস ষেরূপ সীতার বিবাহোৎসব বর্ণ-

নায়ে বাঙ্গালীর বিবাহ-আচার বর্ণনা করিয়াছেন, এখানে নাট্যকারও সেইরূপ খাঁটি বাঙ্গালীর সংসারের বিবাহ-চিত্রই আঁকিয়াছেন,—

“কুশিণী । * * চল সকলে ভদ্রাকে হরিদ্রাদি লেপন করাইয়া। আনর্থ
নইয়া যাই । কোথা গো মহচরিত্র, তোমরা শব্দাদি মঙ্গলধ্বনি কর ও হরিদ্রাদি
আন ।

সহচরী । ঠাকুরাণি, সকল প্রস্তুত করিয়াছি, ইহা কি ভুলিবার কথা ?
প্রতিবাসিনি, তুমি এযোগণের মধ্যে প্রাচীনা । অগ্রে তুমিই স্নতজার গাজে
হরিজ্ঞা দেও ।

প্রতিবাসিনী। আমি হরিদ্র। মাখাইতেছি, তোমরা কেহ শঙ্খরব কর,
 কেহ বা উলু উলু ধ্বনি দেও। [শঙ্খাদি মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল।]
 সত্যভামে, আমাদিগকেই অল্প নিশায় বাসর জাগিতে হইবেক : দেখা
 যাইবে দুর্ঘোষন কেমন চতুর ও কত টাকাই বা শয্যা-উঠানি দেয়।

কল্পিনী । ওগো রজনীর কণ্ঠ রজনীতে হইবে ; একপকার মঙ্গলকণ্ঠ বাহা
তাহা শীঘ্র সমাধা কর, এখনও নান্দীমুখাদি অনেক কণ্ঠ অবশিষ্ট আছে ।
সকলে । হাঁ, এখন অন্য কথা রাখ, চল ভদ্রাকে আগে আন করাইয়া আনি ।

[সকলে নানাবিধ বাস্তাদি লইয়া উনুধ্বনি করিতে করিতে সরোবরতীরে গমন করিলেন ।]”

[୧ମ ଅଂକ, ୬ ମହୋଦୟାଗନ୍ଧର୍ବ ।]

সরোবরতীরে অৰ্জুন স্তম্ভদ্রাকৈ হরণ করিলেন । যাদবগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । যাদবগণ পরাজিত হইলেন । দুৰ্য্যোধন বরসাজে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রশ্ন করিলেন । বলরাম নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—

"কৃଷে সহোদর ভিন্ন,
আমি নাহি জানি অন্য
কৃষের ভৈমন মন নব ।

চক্কী এক নাম তাঁর, **তার চক্র বুঝা তার**
চক্র করি নিজ কার্যায় লয় ।...

- দিয়া আপনার রথ অর্জুনে দেখায় পথ
হরিবারে যম সহোদরা ।

কৃষ্ণের সাহস পায় অর্জুন হরিল তায়
সতত কৃষ্ণের এই ধারা ॥
গৃহমধ্যে শত্রু যার, জীবন তাহার ছার
তার সাক্ষী দেখে দশাননে ।
নিজ সহোদর হয়ে রামের শরণ লয়ে
বিভীষণ বধে রক্ষোগণে ॥
তোমাদের প্রিয় হরি আমি সকলের অরি
এই হেতু ডুবালে আমায় ।
ভাল ভাল বুঝা গেছে যা হবার হইয়াছে
এবে আর কি আছে উপায় ?.....
এখন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর ।
ছাড়ি সবে মম আশ স্মৃখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার ॥”

বলরামের এই খেদোক্তির পরই “ভদ্রার্জুন” নাটকের যবনিকা পড়িয়াছে ।

বাঙ্গালায় বৈষ্ণবযুগে রচিত সংস্কৃত নাটকগুলির পক্ষে অনুবাদ হইয়াছিল । এমন কি অনভিজ্ঞ লেখক এই সকল পক্ষে অনুবাদিত নাটক দেখিয়া কাব্য * লিখিয়া তাহার নাটক নাম দিয়াছিলেন । পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “প্রেম নাটক” ও “রমণী নাটক” ইহার দৃষ্টান্ত । “ভদ্রার্জুন”-প্রণেতা পাশ্চাত্য নাটক পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার মনে নাটক ও কাব্যের প্রভেদ জ্ঞান বিশেষরূপেই জাগ্রত ছিল । কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার নাটকখানির অনেক স্থলে কাব্যো-

* “কাব্য” এখানে আধুনিক প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হইল । সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্য দুই প্রকার, দৃশ্য ও শ্রব্য । দৃশ্য কাব্যই নাটক । এখন বাঙ্গালায় কাব্য বলিতে সাধারণতঃ শ্রব্য গীতিকাব্যই বুঝাইয়া থাকে । এই অর্থেই এখানে আমরা “কাব্য” শব্দ প্রয়োগ করিলাম ।

চিত্ত ভাষার অবতারণা হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। কাব্যে বিস্তৃত উপমা উৎপ্রেক্ষাবহুল অতিশয়োক্তিপূর্ণ অনুপ্রাস বা যমকযুক্ত রচনা শোভা পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু নাটকে এরূপ রচনা আদৌ প্রয়োগাই নহে। কিন্তু কাব্যরস বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জার সহিত এরূপ বিজড়িত যে বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে তাহা স্থানে অস্থানে প্রযুক্ত হইতে থাকে। কেবল ‘ভদ্রার্জুন’-প্রণেতা কেন, মাইকেল, দীনবন্ধু, রামনারায়ণ ভট্টরত্ন, মনোমোহন বসু প্রভৃতি সকল নাট্যকারই অল্লাধিক পরিমাণে এ বিষয়ে দোষী। গেটের ফাউন্ট, বাইরণের ম্যানক্রেড বা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যাংশে সুমোহন হইলেও এগুলি অভিনয়োচিত নাটকের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল দাবী করিতে চাহে না। ‘ভদ্রার্জুনে’ ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির অনুকরণে যেখানে যেখানে নাট্যকার কাব্যরস-সিঞ্চনে নাটকের সৌষ্ঠব বিধান করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, সেইখানটিই কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। সুভদ্রা লিঙ্গলিখিতরূপে অর্জুনের রূপ বর্ণনা করিতেছে,—

“বদনমণ্ডল মাঝে অক্ষিরূপ ভূণ ।
লুকাইয়া পুষ্পশর রেখেছে অর্জুন ॥
ধনুকের গুণ খুলি রেখেছে মনেতে ।
ধনুঃ মাত্র খুইয়াছে কপাল নিম্নেতে ॥
প্রণয়কাননে পার্শ্ব থাকে লুকাইয়া ।
যুগ্ম অন্বেষণ করে অমিয়া অমিয়া ॥
কুরঙ্গিনী কামিনীর পাইলে সন্ধান ।
কটাক্ষে টানিয়া ধনুঃ করয়ে সন্ধান ॥

* * * *

মনের অনলে সখি, প্রাণ মোর দহে ।
ভস্মসাৎ হই বুঝি আর নাহি সহে ॥
জলিছে প্রবলভর বাণের আগুন ।
জলধররূপ হেরি সম্মুখে অর্জুন ॥

হতাশা পবন ভায় হয়ে সহকারী ।
ঘন হতে নাহি বধাইতে দেয় বারি ।
অনলে অনিলে প্রেম অতি ঘোরতর ।
উভয়ের সংযোগে উভয়ে বীরবর ।
এখনো অর্জুন যদি বরিয়ে সলিল ।
তবে ধামাইতে পারে অনল অনিল ॥”

[৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ সংযোগস্থল ।]

আবার আর একস্থানে সুভদ্রা পাঁচালীর ছড়ার শ্রায় শ্লেষালকার-
যুক্ত বিলাপ করিতেছে—

“কালকূট দেও সখি করি আমি পান ।
নিশাকর সহিত প্রাণ হউক অবসান ।
কাল সম কাল রাত্রি মম পক্ষে কাল ।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল ।
জ্ঞানে নাহি পাপ ক্রিয়া করি কোনও কাল ।
দাদা বলদেব কেন হইলেন কাল ।”

এইরূপ কৃত্রিমতাপূর্ণ রচনার পরাকাষ্ঠা অস্ত্যযমকবহুল নিম্নোক্ত
অর্জুনের রূপবর্ণনায় সুপ্রকট,—

“অর্জুনের সুখ-সুধাকর সুধাকর ।
যেই সুধাপানে হইল অমর অমর ॥
সেই সুধা মম প্রাণী যদি পান পান ।
তা নহিলে কভু নাহি পাবে প্রাণ প্রাণ ॥
তাহার হৃদয় জলাশয় জলাশয় ।
এ হৃদি-মরাল-পক্ষে সেই পয় পয় ॥
মম হৃদে লয় তার যদি পাই পাই ।
এ নরন উন্মীলনে তবে চাই চাই ॥
নহিলে না থাকে নিশ্বাস জলন জলন ।
কৈশনে করিবে গৃহে চরণ চরণ ॥”

[৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ সংযোগস্থল ।]

আবার ইহার উপর অপ্রচলিত দুক্লিহ উৎকট শব্দ-বিজ্ঞাসে নাট্যকার নাটকখানির শোভাসম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, যথা—

“মন-কুঞ্জর মম নাহি দৈব্য ধরে ।
পাপ-খঞ্জরাঘাত কত সহ্য করে ॥
ভূতে নিস্তার করণাশে পঞ্চকূপে ।
ভূতা জজ্ঞান ক্ষিত্তিতে বহুৰূপে ॥”

[১ম অঙ্ক. ১ম সংযোগস্থল ।]

আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে কাব্যরস অবতারণার চেষ্টা করাতে ‘ভদ্রার্জুন’ কিরূপ নীরস, বিরক্তিজনক ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকাবলীর মধ্যে কাব্যরস-যুক্ত দীর্ঘ কবিতাগুলিও অভিনয়ের সময় বিশেষ বিরক্তিজনক মনে হইয়া থাকে। কাব্যরচয়িতা যে পথে চলেন, নাট্যকারের সে পথ নহে। ভারতচন্দ্র অনুপ্রাস যমক প্রয়োগ করিয়া উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি দিয়া শত পংক্তিতে বিচার রূপবর্ণনা করিতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার পাত্রপাত্রীর মুখে এতাদৃশ বর্ণনা দিলে নিঃসন্দেহ হাস্যসম্পদ হইবেন। সংস্কৃত নাটকাদিতে কেবল কাব্যাংশবহুল এক একটি সমগ্র অঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি অভিনয়কাল অপেক্ষা পাঠকালেই সমধিক প্রীতিদায়ক। রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নিজ নাটকাবলীর স্থানে স্থানে এ দোষ সংক্রামিত করিয়াছেন। তাঁহার পথে পরে দীনবন্ধুও অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের আলোচ্য ‘ভদ্রার্জুন’ নাটকখানিতেও পূর্ববর্তী বাঙ্গলা কাব্যের কৃত্রিমতাপূর্ণ রচনার প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

“ভদ্রার্জুনে”র প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পদ্যে রচিত। পয়ার ও

ত্রিপদী ছন্দই নাটকখানিতে সমধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। কথোপকথন পদ্যেই চলিতেছে। যথা—

অৰ্জুন । কে তুমি এখানে কর আশ্রয় প্রকাশ ?

ব্রাহ্মণ । দেখ হে অৰ্জুন মম হয় সর্বনাশ ।**

অ । বিশেষ করিয়া তার কহ বিবরণ ।

ব্রা । ধর্মরাজ্যে অরাজক হয় কি কারণ ॥

অ । কেন প্রভো কি ঘটনা হইয়াছে কও ।

ব্রা । আমার গোধনগণ আনাইয়া দাও ।

[১ম অঙ্ক, ২য় সংযোগস্থল ।]

হাস্তরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার একটি মৌলিক দৃষ্ট সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার হাস্তরসের নমুনা এইরূপ,—

“[এক বাতুল, এক মস্তপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল। মস্তপায়ী গান করিতেছে।—

বা । বেটা তুই কি গান করিতেছিস্ ?

ম । ওরে শালা, মার নাম পাইতেছি ।

বা । তুই শালা, মদ খাইয়াছিস্ ? উ, শালায় মুখে গন্ধ দেখ ।**

ম । (গীত) ঐ আসতেছে অৰ্জুন ।

আমি মদের জন্য হব খুন ।

যখন অৰ্জুন আসবে কাছে তার কাছে ভিক্ষা চাব ।

সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে তাই দিয়ে মদ কিনে খাব ।**

ম । ও ভাইসকল, ঐ দেখ কুঞ্চের রথ আসিতেছে । আমাদের এক কুঞ্চ ছিলেন, আবার দুইটা হইয়াছেন । একি ! তবে অৰ্জুন কোথায় ? ** হয় ত অৰ্জুন পলাইয়াছে ।

বা । হাঁ, তোর ভয়ে ।**

তৃতীয় পথিক । ওহে, অৰ্জুন ত কেহই নয়, একজন কুঞ্চ ও অন্যজন উদ্ধব ।**

চতুর্থ পথিক। কেন উদ্ধব উদ্ধব করিতেছ, উদ্ধবকে কোথায় পাইলে ?
উদ্ধব, উদ্ধব, একটা কি কথা পাইয়াছ, উদ্ধব কাহাকে দেখিলে ?

অন্তান্ত পথিক। অর্জুনই বটে। হাঁ, তিনিই বটে। কোথা উদ্ধব, যে বলে সে গর্দভ।”

[৩য় অঙ্ক, ৫ম সংযোগস্থল ।]

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে নাট্যকারের হাস্যরস-সৃষ্টি-প্রয়াস বিশেষ সফল হয় নাই। তবে প্রথম যে সকল বাঙ্গলা নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহার রচয়িতাগণ প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থকারের ন্যায় অশ্লীলতার অবতারণা করিয়া নাটকে হাস্যরস আনিতেন। ‘ভদ্রার্জুন’-প্রণেতা যে তাহা করেন নাই, এইমাত্র প্রশংসা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

“ভদ্রার্জুনে” এক বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটি দৃশ্যের শেষে কতকগুলি পংক্তিতে অনেক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। যথা, প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের পর লেখা আছে—

“এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক ধর্ম্মরাজ নইয়া তঙ্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জুনকে আশীর্বাণি প্রদানকরত স্বগৃহে গমন করিলেন।”

[১৫ পৃষ্ঠা]

মুদ্রিত নাটক পাঠের সময় না হয় আমরা ব্যাপারটা বুঝিলাম, কিন্তু অভিনয়ের সময় দর্শক ইহা বুঝিবে কিরূপে ? হয় ইহা উহা থাকিবে, না হয় নাট্যকারকে কোনও স্বগতোক্তি বা অশ্রু পাত্রের উক্তি দ্বারা ইহা বুঝাইতে হইবে।

“ভদ্রার্জুন” বাঙ্গালার আদি নাটক হইলেও ইহার কোথাও অভিনয় হয় নাই। সেইজন্য সাধারণের নিকট ইহা তত প্রতিপত্তি বা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ইহার একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, ইহা ইংরাজী নাটকের গঠন-রীতির আদর্শে রচিত, সংস্কৃত নাটক-রচনা-পদ্ধতির আদৌ অনুসরণ করে নাই। বাঙ্গলা নাটকের বাহ্য-গঠনে

ইংরাজী আদর্শই এখন স্থায়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু ‘ভদ্রার্জুনে’র প্রভাবে তাহী হয় নাই। মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটকাবলীর প্রভাবেই তাহা হইয়াছে। তবে ইংরাজী নাটকের গঠন-রীতির অনুকরণ-প্রয়াস ‘ভদ্রার্জুনে’ই প্রথম হইয়াছিল। কেবল ইহার অভিনয় না হওয়ায় এ নাটকখানি জনসাধারণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

“ভদ্রার্জুনে”র সমসাময়িক দুইখানি নাটকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহাদের একখানিকে ‘ভদ্রার্জুনে’রও পূর্ববর্তী বলিতে চাহেন।* বর্তদিন না উল্লেখ্য কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে ততদিন নিশ্চয় করিয়া ইহা স্বীকার করা যায় না। তবে অশ্রান্তস্থল হইতে এইমাত্র জানা যায় যে হরচন্দ্র ঘোষ এই নাটক দু’খানির প্রণেতা। ইনি হুগলীনিবাসী ছিলেন। ইংরাজী হইতে বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি অনুবাদে ইহার পটুতা ছিল। হুগলীকলেজে পাঠ্যাবস্থায় ইনি Baconএর Essay on Truthএর বাঙ্গালানুবাদ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাটক দু’খানিও অনুবাদ মাত্র। প্রথম “ভানুমতী-চিন্তাবিলাস” Merchant of Veniceএর অনুবাদ ও দ্বিতীয় “চাক্ৰমুখ-চিন্তাহরা” Romeo Julietএর অনুবাদ। এই বাঙ্গলা নাটক দু’খানির ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই সেক্ষ-পীয়রের শ্রায়। পাত্রপাত্রীর নামগুলি কেবল বাঙ্গলা। সুতরাং বাঙ্গলা মৌলিক নাটক বলিতে গেলে “ভদ্রার্জুনে”ই আদি নাটক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বাঙ্গলা ভাষার প্রথম নাটককার কে ?” এই প্রশ্নের আলোচনা হয়। কে, বি, দত্ত, শ্রীকৃষ্ণ কিরণচন্দ্র দত্ত, One who knows প্রভৃতি মহোদয়গণ পত্রদ্বারা এই প্রশ্ন সীমাংসার চেষ্টা পান। শেষোক্ত অজ্ঞাতনামা পত্রপত্রেরক হরচন্দ্র ঘোষের “ভানুমতী-চিন্তাবিলাস”কে “ভদ্রার্জুনে”র পূর্ববর্তী বলেন। আমরা এই নাটকখানির অনুসন্ধান করিতে সকলকে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[৪]

তত্ত্ব ও কল্পনা

পৌরাণিক কল্পনার শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্ববস্তু যে কৃষ্ণবস্তু তাহা হইতে পৃথক্ করিতে গেলে, লোকের গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে, ইহা জানি। এই দুই যে ফলতঃ একই বস্তু, ইহাদেৱে যে একান্তভাবে পৃথক্ করিতে পারা যায় না, ইহাও মানি। কিন্তু লোকে তত্ত্বের খোঁজ রাখে না বলিয়াই যে পৌরাণিক কল্পনার নিগূঢ় মর্ম্মও বুঝে না, এই কথাই বা অস্বীকার করিতে পারি কি? শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণলোকে একজন দেবতা মাত্র মনে করিয়া থাকে। আর দেবতাতে ব্রহ্মজ্ঞান এদেশে নূতন নহে। প্রাচীনকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবোপাসকেরা আপন আপন সাম্প্রদায়িক উপাস্তবস্তুকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাও এইরূপে ব্রহ্মপর্যায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। “একং সদিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি”—ঋগ্বেদের এই সর্ব্বজনবিদিত শ্রুতি ইহার প্রমাণ। পৌরাণিক ধর্ম্মেও বিষ্ণু এবং মহেশ্বর উভয়ই ব্রহ্মরূপে উপাসিত হইয়াছেন। তত্ত্বের কালী দুর্গা প্রভৃতি সকলেই সাধারণ তান্ত্রিকদিগের দ্বারা “ব্রহ্মময়ী”রূপে আরাধিত হইয়া আসিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধকেরা কালী এবং কৃষ্ণকে পর্য্যস্ত মিলাইয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ স্বয়ং ইহার সাক্ষী। “গোপনে, গোকুলে এসে, শ্যাম সেজেছ, শ্যামা!” “একবার নাচ গো শ্যামা, যশোদা নাচাত তোমায়, বলে নীলমণি, সে বেশ লুকালে কোথায়, করালবদনী”;—এইসকল সংগীত ইহার প্রমাণ। এইসকল ক্ষেত্রে আন্তরিক অনুভূতি যতই গভীর এবং ভাবোচ্ছ্বাস যতই আকুল হউক না কেন, তত্ত্বের উপলব্ধি যে ততটা পরিষ্কার নহে, একথা অস্বীকার করা

অসম্ভব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বলিয়াছেন। ইনি ঋষিকেশ। ইনি নারায়ণ। ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, বৃন্দাবনচন্দ্র। দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া বৃন্দাবনে লীলা, মথুরায় অশুরনাশ, দ্বারকায় রাজত্ব, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন; পুরাণের সকল কথাই বৈষ্ণবেরা সমভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু অতি অল্প লোকেই পূর্বাপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া, তত্ত্বের সঙ্গে পুরাণের সম্যক সমন্বয় সাধন করিয়া, এই বিরাট ও জটিল কৃষ্ণকথার নিগূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যথাসাধ্য বিচারপূর্বক এসকলের একটা অর্থবোধের চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বৈষ্ণবেরা কোনও বিচারই করেন না। “বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর”—এই সত্য উপদেশের একটা কল্পিত কদর্থ করিয়া, “পছ” তুহিঁসে কেবলে”র-স্থানে “বপু ভূতিসে কেবল” পড়িয়া, চক্ষুজলে বন্ধ ভাসাইয়া, তৃপ্তিলাভ করেন। কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান ইহারা রাখেন না। কৃষ্ণজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত ইহাদের জাগে নাই। আর তদ্বাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন না বলিয়া, বহুতর নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কৃষ্ণোপাসনাও কেবল কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপে এবং বস্তুতন্ত্রতাবিহীন ভাবের উচ্ছ্বাসেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহারা নাম শুনিয়াছেন, বস্তু চিনেন নাই, চিনিবার আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়াছে কি না, সন্দেহ। ইহারা অনুবাদকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, যার অনুবাদ তার খবর জানেন না ও রাখেন না। কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু সত্য দেখেন নাই। আর কৃষ্ণ-বস্তু যে সত্যবস্তু ও তত্ত্ববস্তু, এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্তই, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া একটা নূতন কথার সৃষ্টি করিয়া, এই শ্রীকৃষ্ণকে পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ হইতে এতটা জোর করিয়া টানিয়া পৃথক করিতে হয়। নতুবা, প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণতত্ত্বকে কৃষ্ণকথা হইতে পৃথক করা যায় না। শুরু বা কৃষ্ণ বস্তু হইতে যেমন শুরু বা কৃষ্ণ ধর্মকে, চিন্তায় পৃথক করিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে পৃথক করা যায় না; সেইরূপই কৃষ্ণতত্ত্বকে কৃষ্ণকথা হইতে পৃথক করা সাধ্যায়ত্ত্ব নহে।

শুদ্ধবস্তু ও শুদ্ধত্ব, কৃষ্ণবস্তু ও কৃষ্ণত্ব, তিত্তবস্তু ও তিত্তত্ব, সাধু ব্যক্তি ও সাধুতা, ধার্মিক ও ধর্ম, ভক্ত ও ভক্তি, এ সকল যেমন অভিন্ন ; কৃষ্ণকাহিনী এবং কৃষ্ণতত্ত্বও সেইরূপই অভিন্ন। ধর্ম ভিন্ন ধার্মিক অসৎ। ভক্তি ভিন্ন ভক্ত অলীক কল্পনা মাত্র। আবার ধার্মিক এবং ভক্ত ভিন্ন ধর্ম এবং ভক্তিও নিরাকার ভাব মাত্র, সত্য বস্তু নহে। ধর্মের ও ভক্তির বাস্তবতা ধার্মিকে ও ভক্তে। ধার্মিকের ও ভক্তের সত্তা ও প্রতিষ্ঠা ধর্মেতে ও ভক্তিতে। সেইরূপ তত্ত্ব ভিন্ন পুরাণ অবস্তু, মিথ্যা। পুরাণ ভিন্ন তত্ত্ব অব্যক্ত, অজ্ঞাত। কৃষ্ণতত্ত্বের আশ্রয়েই পুরাণের অপূর্ব কৃষ্ণকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার এই কাহিনীর মধ্যেই ঐ তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুরাণ-কথাকে অবলম্বন করিয়াই, যুগযুগান্ত ধরিয়া, আমাদের দেশের মুকুতি-সম্পন্ন সাধকেরা, নিজদের অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই কৃষ্ণ-বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ভাব ও ভাষার পরস্পরের সঙ্গে যে নিগূঢ়, অঙ্গাদী সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-তত্ত্বের সঙ্গেও পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীর সেই সম্বন্ধ। কৃষ্ণতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য, ভাব-স্বরূপ। সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুই পুরাণের কৃষ্ণকথার মধ্য দিয়া, সর্ববুদ্ধিয়াকর্ষক অপূর্ব রসমূর্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাব অগ্রজ, ভাষা তার অনুজ। কোনও কোনও পণ্ডিত-গণ বলেন যে ভাব ও ভাষা একে অন্যের অগ্রজ বা অনুজ নহে, দু'ই যমজ ; যুগপৎ উভয়ের উদ্ভব হয়। মানুষের চিন্তার প্রণালী-তেই কেবল ভাবকে ভাষার অগ্রজ বলা হয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে ভাষাকে মুখে করিয়াই ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু আদিতে ভাব যদিও বা ভাষার পূর্বজ হয় ; তথাপি এই ভাষার দ্বারাই পরে ঐ ভাবের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। ভাষা যত ফোটে, ভাব তত বাড়ে। ভাব যত ফোটে, ভাষাও তত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু ভাষা যতই পরিস্ফুট হউক না কেন, ভাব সর্বদাই তাহাকে ছাড়াইয়া থাকে ; কিন্তু কখনও ছাড়িয়া যায় না।

ভাব নিরাকার, ভাষা তাহাকে আকারিত করে। ভাব মুক, ভাষা তাহাকে মুখর করে। ভাব ধোঁয়া, ভাষার সুনিপুণ ফুৎকারেই তাহা জ্বলিতজ্বলনরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। ভাব বিশ্ববীজ স্ফোট-স্বরূপ। ভাষা সেই স্ফোটেরই পরিণতি, এই প্রত্যক্ষ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় সৃষ্টি। ভাব ও ভাষার মধ্যে এই যে নিগূঢ়, নিত্য, ব্যক্তাব্যক্ত, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখিতে পাই, তব্দের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণেরও সেই সম্বন্ধ। পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ কল্পিত বটেন, কিন্তু অসত্য নহেন।

ফলতঃ কল্পনা সর্বথাই যে মিথ্যা হয়, এই কথাই বা কে বলিল? অলীক কল্পনা আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কল্পনা যে নাই, ইহাই বা বলি কেমনে? আমাদের ভাষাতে অলীক কল্পনার একটা বিশিষ্ট নাম নাই। কেহ কেহ ইহাকে কাল্পনিকতা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অলীকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতার ভাবই বেশী প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই এই কথারও তেমন ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু ইংরাজিতে ইহার একটা বিশিষ্ট নাম আছে। ইংরাজিতে অলীক কল্পনাকে ফ্যান্সি কহে। সত্য-কল্পনারও একটা নাম সে ভাষায় আছে, তাহাকে ইমেজিনেশন বলে। ফ্যান্সি এবং ইমেজিনেশন দু'ই আমরা কল্পনা বলিয়া থাকি; কিন্তু ইংরাজি ফ্যান্সি আর ইমেজিনেশন এক বস্তু নহে। আর কল্পনার আশ্রয়ে যে কেবল কাব্যসৃষ্টিই হয়, তাহাও ত নয়। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, তত্ত্ববিদ্যা, মানবজীবনের কোনও শ্রেষ্ঠ সাধনা বা সম্ভোগই কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষবাদীগণ যতই বাস্তবতার বড়াই করুন না কেন, তাঁহাদের এই তথাকথিত প্রত্যক্ষবাদ পর্য্যন্ত কল্পনার সাহায্য ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না। জড়বিজ্ঞান যে বিশ্বব্যাপী বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, বিশ্বেশ্বরকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে চাহে, সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা তথ্যও কল্পনারই উপরে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের উপরে নহে। আধুনিক কেমিতি যে পরমাণুবাদের বা অ্যাটমিক থিওরীর উপরে সমগ্র রসায়ন

তব্ধটাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পরমাণু কেহ কি কখনও দেখি-
য়াছে, না মাপিয়াছে, না কোনও উপায়ে তার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ
করিতে পারিয়াছে ? এই পরমাণুবাদও ত কল্পিত, প্রত্যক্ষ নহে । যে
মাধ্যাকর্ষণী শক্তির দ্বারা অসংখ্য সৌরজগৎ আপনাপন সূর্য্য ও গ্রহ-
নক্ষত্রাদি লইয়া এই মহাশূন্যে ঝুলিতেছে ও নিজ নিজ নির্দিষ্টপথে
চলিতেছে, তাহা কি প্রত্যক্ষ, না কল্পিত ? বস্তুচ্যুত ফল মাটিতে
পড়িয়া যায়, আকাশে ঝুলিয়া থাকে না ; এটা একটা অদ্বুত বা
অদৃষ্টপূর্ণ ঘটনা নহে । কিন্তু এই ঘটনা দেখিয়া নিউটন যে বিশ্ব-
ব্যাপী মাধ্যাকর্ষণী শক্তির প্রচার করিলেন, তাহা কোনও দিন কেউ
চক্ষে দেখে নাই, হাতে ধরে নাই, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ
করে নাই । এই যে মাধ্যাকর্ষণের বিধান আবিষ্কৃত হইল, ইহা
কি প্রত্যক্ষের, না কল্পনার ফল ? বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ করেন বিশিষ্ট
ঘটনা বা কার্য্য, কিন্তু কল্পনা করেন তাহার অন্তরালে বিশাল, বিশ্ব-
জনীন কারণের বা নিয়মের বা শক্তির খেলা । বিজ্ঞান যত কেন
প্রত্যক্ষের দোহাই দিক না, কল্পনাকে ছাড়িয়া সে এক চুলও আপ-
নার সাধনপথে চলিতে পারে না । গণিতবিদ্যাকে ত সকলেই
নিতান্ত প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন । কিন্তু গণিত
পর্য্যন্ত এই সত্য কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া আছে । দেশ এবং
কালের উপরেই গণিতের প্রতিষ্ঠা । অনন্ত বিস্তৃত দেশ, যে দেশ
আবার অনন্তভাগে বিভক্ত হইতে পারে ; অনন্ত প্রবাহিত কাল, যে
কাল আবার অনন্তভাগে বিভক্ত হইতে পারে ;—এই দুইটি বস্তুকে লই-
য়াই ত গণিতের যত কারচুপি । কিন্তু এই অনন্ত-বিস্তার ও অনন্ত-
প্রবাহ, অথচ অনন্ত বিভাগক্ষম দেশ ও কাল কে কোথায়, কিরূপে,
কোন দিন, প্রত্যক্ষ করিয়াছে ? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশখণ্ডই আমরা জানি ।
ছোট ছোট কাল-কলাই আমরা বুঝি । এদের সীমা দিতে পারি না ।
সীমা দিতে যাইয়াই দেখি, পূর্বে ও পরে আরও দেশ এবং আরও
কাল থাকিয়া যায় । এই পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ গোচর হয় । কিন্তু যার

লাগাইল পাই নাই, তাহাই যে অনন্ত, কোনও দিন তার অন্ত পাইব না, এ কথা বলি কার জোরে? এ ত কল্পনা। যাহা প্রত্যক্ষ করি, তারই ইঙ্গিত লইয়া এই সকল কল্পনার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়, এই কথা সত্য। ইহা কল্পনা বটে, কিন্তু এই কল্পনা বস্তু-তত্ত্ব, প্রত্যক্ষের উপরে, প্রত্যক্ষকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়াই, গড়িয়া উঠিয়াছে, এই কথা বলিতে পার। আর তারই জগৎ বিজ্ঞানের এ সকল কল্পনা সত্য, এই দাবি করাও সম্ভব। এই কল্পনাকে অলৌক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আস্তিক নাস্তিক সকল প্রমাণশাস্ত্রেই অনুমান ও উপমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আর অনুমানের রাজ্যে যাইতে হইলেই, কল্পনার রথে চড়িতে হয়। এই কল্পনাকে ছাড়িয়া কেবল যে কাব্যসৃষ্টিই অসম্ভব হয়, তাহা নহে। ইহাকে ছাড়িয়া মানুষের মন কিছুই মনন করিতে পারে না; মানুষের জ্ঞান কিছুই জানিতে পারে না; মানুষের চেষ্টা পশু হইয়া পড়িয়া রহে; মানুষ এই সকল সুখসাধক স্রিয়গ্রাম লইয়া, এই আনন্দময় বিশ্বে, কণা-মাত্র আনন্দভোগ করিতে পারে না। কল্পনা মাত্রকেই যদি অসত্য বলিয়া পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে কেবল কৃষ্ণগাথা নহে, কিন্তু—

‘সীমার মধ্যে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর’

এসকল নিরাকার সংগীতকেও কল্পিত বলিয়া বর্জন করিতে হইবে। নানকের যে অমন গুরুগম্ভীর ভজন,

“গগনমে থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে”,

তাহাকেও মিথ্যা বলিয়া ছাড়িতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর, পরলোক, ধর্মের সকল বাঁধন, ভক্তির সকল সাধন, জীবনের সকল প্রতিষ্ঠাই উড়িয়া যায়। অথচ এই সকলকে উড়াইয়া দিয়াও, কল্পনাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পুরাতন লোকায়ত ও আধুনিক জড়বাদী নাস্তিকেরা এসকলের কিছুই ত একরূপ মানেন নাই, অথচ এই প্রত্যক্ষ সংসার-ভোগের জগৎই ইহাদিগকেও পদে পদে কল্পনার পদসেবা

করিতে হয়। ফলতঃ কল্পিত আর মিথ্যা একই কথা নহে। মিথ্যা কল্পনা বিস্তর আছে। কিন্তু সত্য কল্পনাও আছে। মানুষের প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য অভিজ্ঞতাকে ধরিয়া, সেই অভিজ্ঞতার মর্ম উদ্ঘাটন বা অর্থ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, যে কল্পনা ফুটিয়া উঠে, তাহাই সত্য কল্পনা। ইহাকেই ইংরাজিতে ইমেজিনেশন কহে। এই কল্পনা সত্য বলিয়াই, বিজ্ঞানের রাজ্যে ইহাকে সায়েন্টিফিক ইমেজিনেশন—scientific imagination—বা বৈজ্ঞানিক কল্পনা; ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে, হিস্টরিক ইমেজিনেশন—historic imagination—বা ঐতিহাসিক কল্পনা; ধর্মজীবনে রিলিজিয়াস ইমেজিনেশন—religious imagination—বা ধর্ম-কল্পনা; এবং কাব্য-সৃষ্টিতে পোয়েটিক ইমেজিনেশন—poetic imagination—বা কবিকল্পনা বলিয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে ফ্যান্সি—fancy—শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কারণ এইসকল কল্পনা হইলেও মিথ্যা নহে। এ কল্পনা প্রত্যক্ষেরই মতন, এমন কি এক হিসাবে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা বেশী সত্য। প্রত্যক্ষ বাহার ইন্দ্রিত মাত্র করে, আপনার সত্য প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠারূপে যে বস্তুর সঙ্কেত মাত্র প্রত্যক্ষ বহন করিয়া আনে, কিন্তু যাহাকে প্রত্যক্ষের দ্বারা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, এই কল্পনা, সেই সঙ্কেত ধরিয়া, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেরই ভিতরে যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সত্য বা তত্ত্ব লুকাইয়া আছে, তাহাকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। এই জন্য এই কল্পনা যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহা অতীন্দ্রিয় মাত্র, অসত্য নহে। অতএব পৌরাণিকী কৃষ্ণকাহিনী কল্পিত বলিয়া যে সর্বৈব মিথ্যা, এমন বলা যায় না। সত্য কল্পনাতেও সত্যভাস মিশিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক কল্পনা—সায়েন্টিফিক ইমেজিনেশন—এবং ঐতিহাসিক কল্পনা বা হিস্টরিক ইমেজিনেশনেও থাকে; সর্বাপেক্ষা নিগূঢ়তম যে ধর্মরাজ্য, সে রাজ্যের সত্য-কল্পনায় অর্থাৎ রিলিজিয়াস ইমেজিনেশনেতে যে বহুতর সত্যভাস থাকিবে, ইহা কিছুই বিচিহ্ন নহে। পৌরাণিকী কল্পনার কৃষ্ণকাহিনীতে যে সত্যভাস নাই, এমন কথা কে বলিবে? আর এই কল্পনার কতটাই

বা সত্যোপেত ও বস্তুতত্ত্ব, আর কতটাই বা অলৌক ও বস্তুতত্ত্বতা-
বিহীন এবং সত্যভাস মাত্র, কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনার দ্বারাই কেবল তাহা
ধরিতে পারা যাইবে। ইহার আর কোনও কষ্টিপাথর নাই। আর
এই কারণেই, তত্ত্ববস্তুকে দৃঢ় করিয়া ধরিবার জন্মই, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণকে
এই বিচারের সূচনায়, ব্যতিরেকী পন্থার অনুসরণ করিয়া, পুরাণ-
কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিতে হয়। পরিণামে অবশ্যমুখে,
পৌরাণিকী কথার যতটা তত্ত্বের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে ও তত্ত্বকে
প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আপনি নিজের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়া সত্য-
বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

756.3
016

সচিত্র বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ ।

(প্রথম বর্ষ) ১ম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা ।

{ বৈশাখ , ১৩২২ সাল ।

{ ১৩৫৪

756 3
016

1442

বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ আট আনা, প্যাকিং ও ডাক মাওল
৮০ আনা ।

নারায়ণ-কার্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকতা ।

২০নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া প্রেসে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

P 29868

বৈশাখ ১৩২২

সূচী পত্র ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়	ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫১৩
২। অর্জুনা পুষ্করিণী	" পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫২৮
৩। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম	" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩৭
৪। সেকালের স্মৃতি—বঙ্কিমচন্দ্র	" সুরেশ সমাজপতি	৫৪৫
৫। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা	" পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৫২
৬। স্বামী বঙ্কিমচন্দ্র	" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৫৬৩
৭। বঙ্কিম (সমালোচনা)	" জ্ঞানানন্দ পাল	৫৭২
৮। বঙ্কিমবাবু	" ললিতচন্দ্র মিত্র	৫৮৮
৯। ঐতিহাসিক প্ৰবেষণঃ বঙ্কিমচন্দ্র	" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯৭
১০। বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্কিমদর্শন (কবিতা)	" বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	৬০৬
১১। বঙ্কিমবাবু ও উত্তর-চরিত	" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৬০৯
১২। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—"গীতার" কথা	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৬২১
১৩। বঙ্কিম-স্মৃতি	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬২৮
১৪। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান "পাঠক" জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	" জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৩২
১৫। চরিত চিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র	" বিপিনচন্দ্র পাল	৬৪৮
১৬। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	" ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৬৬৩
১৭। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি		পরিশিষ্ট

বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা]

[বৈশাখ, ১৩২২ মাল

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

বঙ্কিমবাবুর বাড়ী আমার বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়। নৈহাটি স্টেশন হ'তে তাঁর বাড়ী ষতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ী প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁদের বাড়ীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি মুড়াগাছা পরগণায় রাধাবল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হ'তে তাঁহার সেবা চলে। দুইঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, একঘর ফুলে, আর একঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উহাদের মধ্যে ষাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়ীতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসে ভের পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘবে মেজে চক্চকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খেলা জাম্ম-গায় বেশ একটি মেলা হয়; প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনা-

রস বিক্রী হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট দশ থানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটরভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়ে-ভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়ার ও খাজা থাকিত; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারী দোকান অনেক-গুলি থাকে। তাহাতে নানারকম বাঁশী, কাগজের পুঁতুল, কাঠির উপর লাক্ দেওয়া হনুমান, কটকটে ব্যাঙ্ক কিনিতে পাওয়া যায়। এসব ত গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড় দরকারী জিনিস এই মেলায় বিক্রী হয়—নানা রকম গাছের চারা ও কলম। আমাদের দেশে বাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রগণ সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, নেন্বুর কলম, সুপারির চারা, লক্রেট ফলের গাছ, গোলাপজামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফন্সার গাছ এবং গোলাপ ঘুঁই জাঁতি বেল নব-মালিকা কামিনী গন্ধরাজ মুচুকুন্দ বক্ কুর্চি কাঞ্চন টগর সিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আটদিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালীরা, যে কোনও গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচা-লার মধ্যে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন, এসব ত ছিলই; তার উপর একটা মোক্-দমার সঙ্ঘ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল, জজসাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ্ঘ ছিল—আহ্লাদে পুঁতুল। তার এক গাল হাসি লাগি-য়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে। রাধাবল্লভের বাটার

গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ী, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জ-বাড়ী বলিলে অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ী যাইতেন; সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল; কুঞ্জ ছিল; কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ী হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল গুণ্ডিচা, অর্থ কুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ী লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙ্গালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ী লইয়া যায়। বন্ধিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আটদিন থাকেন; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে, সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বোঁ, বী, গিল্লীবান্নী, আধাবয়সী ও বুড়ীরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারী যাই। বড় বড় যুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানারকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট, ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া, দেশশুদ্ধ লোক চমৎকার হইয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। বাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটানা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক খোলা, গুটিকতক চৌকা ঘামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আটদিনই খুব জম্জমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে বন্ধিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিম দিকে একটি ঘর, তাহাকে বন্ধিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত; হুঁকা, কলিকা, বৈঠক, ফর্সি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আঁগুন

দেশালাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্ত, তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণ দিকে শিব-মন্দির-সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার পূর্বদিকে দুটি দরজা একে-বারে খোলা জমীতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিম দিকে দুটি জানালা, ঘরটি খুব পশ্চিমে লম্বা। এই ঘরের দক্ষিণে দুটি ঘর। দালানটি ষতখানি লম্বা, ঘর দুটিও ততখানি লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে এক-খানি খাট থাকিত, পূর্বের ঘরটিতে একটি ফরাস থাকিত। পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন, পূর্বের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে ঘাইবার অধিকার ছিল। কখন কখন সে ঘরটিতে দুই একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানযোড়া একটি ফরাস পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত, হারমোনিয়ম থাকিত, সময়ে সময়ে অশ্রুশ্রু অনেক রকমের বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে-কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি, তাহার কোন নিদর্শনই এখনও দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণ দিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দুকাঠাও পূরা হইবে না। ঘর দুটি একত্রে ষতখানি লম্বা, বাগানটিও তত-খানি লম্বা, আড়েও প্রায় ঐরূপ, তিনদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নীচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁধান, হাতখানেক উঁচা, তাহারও আবার মাঝখানে একটি ছোট চৌকা হাত-খানেক উঁচা, তাহারও মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাতখানেক উঁচা। চারিদিকেই যেন গ্যালারি মত। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারি-

দিকেই টব সাজান থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমী ছিল, তাহাতে শুরকীর কঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমীতে যুঁই জাতি কুঁদ মল্লিকা ও নবমালিকার, গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈষ্ণব-খানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বন্ধিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভাল বাসিতেন, যতদিন তিনি বাড়ী থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন ও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

আমরা বালককালে প্রতিবৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম। রেল-ওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্য্যন্ত দুইধারে অনেকগুলি কামিনী-ফুলের গাছ ছিল। আমরা প্রায়ই ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ না কেহ আসিয়া আমাদেরকে ভয় দেখাইত “তোমাদিগকে ধরিয়া” সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব।” সঞ্জীববাবু আমাদেরকে কি শাস্তি দিতেন জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর মহাশয়ের পুত্রেরা বড় দুই লোক, ছেলে-পিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায়বাহাদুরের বাড়ী বড় একটা যাইতাম না। একবার ধরনীকথকের কথা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স বছর এগার, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দু’চার দিন ধরনীকথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায়বাহাদুরের বাহির বাড়ীর পাঁচফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্ত যেমন সব জায়গায় ইটের বেদী হয়, এ বাড়ীতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একটা বড় তাকিয়া বেদীর কাজ করিত। ঐ বেদীর উপর একখানি ভাল গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠান-ময় গালিচা ও সতরঞ্চ পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচারে বসিতেন,

শূদ্রেণ। সতরঞ্জে বসিত। ধরনীকথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গভীর ও উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি? কিন্তু এখনও সে সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি বাড়ী হইতে কিছুদূর, পূর্বদিকে, সঞ্জীববাবুর ফুলবাগানে ধরনীকথকের বাসা ছিল। সে ফুলবাগান দেখিবার আমাদের খুবই সখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনদিন সে দিকে যাই নাই। চারি পাঁচদিন ধরনীকথকের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর একদিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্কার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর কোনদিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই, তাঁহার ত আর ঠিক ছিল না, কোনদিন আসিবেন, কোনদিন আসিবেন না।

আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে ষাউইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র “On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers” একটি ‘এসে’ লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। ত্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র শ্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, ‘তুমিও চেষ্টা কর।’ কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই ‘এসে’ দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র শ্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিহারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশী লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি, এ পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পাইলেন।

প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গলার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর সার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেইদিন শুনলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন এবং গবর্নর সাহেব যাহার জন্য আমার এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেননা একজন গ্রন্থকার হই ? তাহার পর ভাবিলাম এম. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত ত একরকম স্কলারশিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ কটি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্তবাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম. এ., মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ. আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র ‘আর্য্যদর্শনে’ আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীরভাবে, বেশ মুকুবি-আনা চালে বলিলেন, “তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল ‘ভিউ’ দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।” আমি বলিলাম, “আমার ত মহাশয় নিজের কোন ‘ভিউ’ নাই। পুরাণ পুথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।” যাহাহোক তিনি উহা ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন টাপাতলার ছোট গোলদীঘীর ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্তবাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি বৎসরকাল তাঁহাদের বাড়ী যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সে ক্ষণ আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সহর তাঁহাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, “তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।” আমি বলিলাম, “আর্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না”। তিনি বলিলেন, “সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি ষ্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে সেখানে পৌঁছিব।” যথা-সময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে তাঁরা চারি ভাই স্টামাচরণবাবুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙ্গাইলেই স্টামাচরণ বাবুর বাড়ীর দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ী ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোন্টি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এটি কে?” তিনি বলিলেন, “এটির বাড়ী নৈহাটি, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি. এ. পাস করিয়াছে।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

নারায়ণ



বক্সিমবাবুর পৈত্রিক বাড়ির সম্মুখভাগ।

BIDDYA PRESS

“ব্রাহ্মণ”? রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, “হাঁ”। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “নৈহাটি বাড়ী, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি. এ. পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আস না কেন?” আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, “সঞ্জীববাবুর ভয়ে”। তাঁহারা সকলেই ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, “আমার ভয়? কেন?” “শুনিয়াছি কামিনীগাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।” হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “নৈহাটি? তোমার বাবার নাম কি?” আমি বলিলাম, “৬/রামকমল শ্রায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়”। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “তুমি রামকমল শ্রায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকটে আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল! তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তারমত তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না”—বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, “হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।” অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন “কি কাজ?” রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, “ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে”। বঙ্কিমবাবু মুকুটবিন্দুনা চালে বলিলেন, “বঙ্গলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই ‘নদনদী পর্বত কন্দর’ লিখিয়া বসিবে।” আমি বলিলাম, “আমার রচনার প্রথম পাতেই ‘নদনদী পর্বত কন্দর’ আছে,” বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, “প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিরাই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্তরূপ”। তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “নন্দর ভাই বঙ্গলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাঁই

হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।” আমি তিনটি পরিচ্ছেদমাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ী গেলাম, রাজকৃষ্ণ-বাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।

এই সময়ে কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ছিল। লোকে তাঁহার কথাবার্তায় ও আচারব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিল “রামফকড়”। নৈহাটি ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়ীতেই তাঁর অব্যাহতদ্বার ছিল। তিনি সব বাড়ীতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফকুড়ি করিতেন ও ফকুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল। বন্ধিমবাবুর নিকট অনেক আদর যত্ন পাইয়াও আমি মাসাবধি তাঁহার বাড়ী যাই নাই, যাইবার ভরসাও করি নাই। এক দিন রামফকড় আমায় আসিয়া বলিল, “তুমি বন্ধিমকে কি দিয়া আসিয়াছ?” আমি বলিলাম, “একটা লেখা”। সে বলিল, “তাই বটে! বন্ধিম একটা প্রফ দেখিতেছিল, আর বলিতেছিল ‘নন্দর ভাইটি বেশ বাঙ্গলা লিখিতে শিখিয়াছে’, তুমি সেখানে যাওনা কেন? বোধ হয় গেলে সে খুসী হ’বে”। রামবাড়ুঘ্যের কথায় ভরসা পাইয়া আমি আর একদিন বন্ধিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, “তুমি এসেছ, বেশ হ’য়েছে! তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?” আমি বলিলাম, “আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা।” তিনি বলিলেন “ওঃ! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গলা বাহির হইবে না।” সেইমুহূর্ত্ত হইতে বুঝিলাম যে বন্ধিমবাবু মুরুবিব-আনা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মত গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?” তিনি বলিলেন “নিশ্চয়ই”। আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকী অধ্যায়

কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকীগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি দ্বীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মনদিয়া পাতা উন্টাইয়া উন্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এগুলি চলিবে কি?” তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, “যাহা ছাপাইয়াছি সে.রূপা, এসব কাঁচা সোণা”। বলিতে কি, সেদিন আমি ভারি খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর যখন নৈশাটি হইতে কলিকাতা-যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনিরবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।

কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরামশিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভাল শাস্ত্রিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুক্তবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহারপর তিনি আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়া কাব্যংশেই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলঙ্কার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই এক জন পড়িতেন, তাঁহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িতেন ও ন্যায়শাস্ত্রের কচুকটি লইয়াই থাকিতেন। সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজী কাব্য পড়িত সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি ‘বঙ্গদর্শনে’র তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি

হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতে-ছেন, ইহাও দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের শ্রায় গুনগুন করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনও শুনি নাই। তিনি বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্রেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। “রিনাইসেন্স” (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গলারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতাস্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ‘বাঙ্গালীর উৎপত্তি’ বলিয়া বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জ্ঞানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য প্রাচীন পুঁথি ঘাটিয়া তাঁহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম। এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গলার ইতিহাস অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালী দখল করিবার পূর্বে বাঙ্গালায় যে অনেক বড় বড় রাজত্ব ছিল, এখন তাহার অনেক আভাস পাওয়া গিয়াছে, তখন সব অন্ধকার ছিল। তথাপি বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য্য ও অনার্য্য-গণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনও কেহ বেশী কিছুই লিখিতে পারেন নাই।

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও রজনী ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কমলাকান্তের দপ্তর তখনও শেষ হয় নাই। বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার ভারতমহিলা লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের

সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোন খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয়; কেন না, বঙ্গদর্শনের গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল, গ্রাহকেরাও বঙ্গদর্শনের টাকা দিতে নারাজ ছিল না। তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি বঙ্কট ভাল-বাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিকলোক ছিলেন, একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরিটি যায়।*

* সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে ‘ভিক্টোরি টাউন্স এন্ড’ পাস হইল। ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অস্তান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন; সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে; সকল হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজ সাহেব বলিলেন, “আরও ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গলা নামগুলো কে বুঝবে? ওগুলো ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া দিতে হইবে। বোমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না, Daughter-in-law’s Lane বলিতে হইবে।” জজসাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছেন না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, “৭৫ টাকা হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরও ৩০০ টাকা দেওয়া দরকার।” জজসাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, কেন?” সঞ্জীববাবু বলিলেন, “আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝবে? উহাকে Black-footed Friend বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে।” সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজ সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপী লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে

তখন দিনকতক তিনি সব্‌রেজিষ্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুরবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্ত লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেইজন্য এখন সেইসকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লঙ্কো যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিষ্কা বাঁধান একখানি কৃষ্ণকাস্তুর উইল আমাকে দিলেন, বলিলেন “রেলগাড়ীতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।” আমি অনেক বৎসর ধরিয়া সেখানি বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই আমার বাড়ীতে নাই। বৌঠাকুরাণীরা

না। বাড়ী গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।” সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জঙ্গসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল জঙ্গসাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাহার নাম ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জঙ্গসাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।

অনেকগুলি সখীদের দিয়াছেন, এখন পুত্রেরা বড় হইয়া কতকগুলি আপন আপন বন্ধুদের দিয়াছেন। আমার এত যত্নের জিনিস এক-খানিও বাড়ীতে নাই!

লক্ষ্মী হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বন্ধিমবাবু সেখানে নাই। শুনলাম তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। শিবের মন্দিরের পাশে সে ঘরগুলিতে চাবীবন্ধ। বাগানটি গতপ্রায়। সেই দিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম, দেখিলাম চুঁচুড়ার ঘোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, একটিতে তাঁহার অন্তরমহল, আর একটিতে তিনি নিজের বসেন। যেটিতে তিনি বসেন, সেটি এক-তাল। বাড়ীটির একটি গেট আছে। যে ঘরটিতে তিনি বসেন, তাহা একটি বড় হল, গঙ্গার দিকে চারিটি জানালা। সে ঘরের পূর্বের দেওয়ানটি গুটিকতক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নীচেও জল আসে। বন্ধিমবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেদিন তার নীচে খুব জল ছিল। এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু ‘কৃষ্ণকান্তী’ আছে?” তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “লক্ষ্মী হইতে আমি বঙ্গদর্শনের জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?” তিনি বলিলেন, “তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোন জার্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।” আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম “বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি”—অর্থাৎ তিনজন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই তিনজন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের ‘চরিত্র গঠন করে’—সেই তিনজন কবি বাইরন, কালিদাস ও বন্ধিমচন্দ্র।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অৰ্জুনা পুষ্করিণী

অনেকে এই পুষ্করিণীকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের বারুণী পুষ্করিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। ‘বারুণী’ পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। এই পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রদিগের পৈতৃক। গ্রামোপাস্থে অতি নির্জজন স্থানে উহার খনন হইয়াছিল, কিন্তু কোন্ সময়ে উহা খাত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। অৰ্জুনা পূৰ্বে স্বৰূহৎ জলাশয় ছিল, জল দেখা বাইত না, পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত, আর উহার উপর অসংখ্য পদ্মফুল বায়ুতাড়িত হইয়া ভুলিত। চারিদিকের পাড় আশ্রয়কাননে সুশোভিত। এই আশ্রবনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত। প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় সকল সময়েই তাহাদের কলরবে এই নির্জজন সরোবরের চিরনিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইত।

এই পুষ্করিণী এক্ষণে মজিয়া গিয়া সঙ্কীর্ণ আয়তন হইয়াছে এবং পাড়ে পাড়ে প্রজা বসিয়াছে। ইহার সে রম্যতা আর নাই।

‘অৰ্জুনা’র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রদিগের ফুলবাগান ছিল, উহাতে একটি ক্ষুদ্র বাগানবাটীও ছিল, এক ব্যক্তি উহাতে কিছুদিন বাস করিতে পারিত, কোন কষ্ট হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাশ্রম ঐ বাগানের স্রষ্টা সাধন করেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্র উহা একটি উৎকৃষ্ট ফুলবাগান করিয়াছিলেন। তেরচৌদ্দবর্ষ বয়ঃক্রমে জলপানি পাইয়া ঐ ঢাকা হইতে এবং পিতৃদেবের সাহায্য হইতে হুগলি কলেজের মালীর দ্বারা নানাপ্রকার ফুলের চারা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য ইষ্টক-নিৰ্ম্মিত বসিবার স্থান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ বাগানের পূৰ্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বড় বড় মনসা-কাটার বেড়া ছিল, আর দক্ষিণ দিকে ইষ্টক-নিৰ্ম্মিত ভিতের উপর

ନାରାୟଣ



ଅଞ୍ଜନା ପୁନଃରିଖି ।
(ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା
୧୨୮ ପୃଷ୍ଠା ।

BIJOYA PRESS

রেলিং ছিল ও একটি ফটক ছিল। এই রেলিংএর পরই অর্থাৎ বাগানের দক্ষিণেই 'অর্জুনা'। মাঠাল গ্রামে যাইবার জন্ত কেবল মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলবাগানে ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভাল বাসিতেন এবং যতদিন না তাঁহাদের বসতবাটীর সম্মুখে একটি বৈঠকখানাবাটী নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ততদিন এই ফুলবাগানে সৰ্ব্বদা থাকিতেন। ঐ ফুলবাগানের এক্ষণে আর কোন চিহ্ন নাই, ঐ জমিতে এখন প্রজা বসিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী

আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম ।

বঙ্কিমচন্দ্র গোড়ায় যেমন ভাবে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে শেষের তিনখানি উপন্যাস লেখেন নাই । গোড়ায় তিনি কাব্যসৃষ্টি, ভাবসৃষ্টি এবং রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষে একটা উদ্দেশ্য লইয়া তিনি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন । তিনি ধর্ম্যতবে, গুরুশিষ্যের কথোপকথনে, স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, অমূল্যলন-তত্ত্ব একটা কল করিয়া বুঝাইয়া দিব । সে কল উপন্যাস ; সে কল তাঁহার শেষের তিনখানি উপন্যাস । এই তিনখানি উপন্যাসের বিশ্বাস বুঝিতে পারিলে, বুঝা যাইবে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-তত্ত্ব কি ভাবে এবং কোন্ দিক্ দিয়া বুঝিতেন ।

গোড়ায় বলিয়া রাখি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি হিসাবে পেট্রিয়ট ছিলেন । তিনি সমাজের মঙ্গলকামী কবি ছিলেন । তিনি সমাজকে ইউরোপের আদর্শে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গড়িতে কখনই চেষ্টা করেন নাই । তিনি Iconoclast পুরাদস্তুর ছিলেন না ; Eclecticism-এরও তিনি ঘোল আনা সমর্থন করিতেন না । বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়া-ছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সম্বন্ধে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে আচার-ব্যবহারগত পরিবর্তন অবশ্যস্বাবী । সেই পরিবর্তনকে দেশের ও জাতির প্রকৃতির অনুকূল করিয়া পরিচালিত করা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীরই কর্তব্য । কমটির পলিটিভিক্স তাঁহার মনোবার উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, প্রতিক্ষ প্রভাব আমরা এড়াইতে পারিব না ; আমাদের অতীতের ইতিহাস এবং তৎকালীন প্রাধাবুদ্ভি আমরা পরিহার করিতে পারিব না, আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে । সুতরাং যে উপায়ে জাতিকে ধরিতে পারি, জাতির নিম্ন

স্বরগুলিকে টানিয়া, সঙ্গে করিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি সেই উপায়ই আমাদের অবলম্বনযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় প্রাদেশিকতার ভাবটা সর্বপ্রথমে ফুটাইয়া তোলেন। তিনি অনেকবার বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বাঙ্গালী প্রথমে নিজেকে চিনিতে শিখুক, নিজের জাতির দোষগুণ বিশ্লেষণ করিতে পারুক, তবে সে গোটা ভারতবর্ষের চিন্তা করিতে পারিবে ও জানিবে। কবি রঙ্গলাল হইতে হেমচন্দ্রের প্রথম দশা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক কবিগণ গোটা ভারতবর্ষ লইয়া দেশহিতৈষণা বা দেশাত্মবোধের চর্চা করিতেন। তখন বাঙ্গালার কবি রাজস্থান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, পুরাণ-তিহাস লইয়া দেশগীতি গান করিতেন। তখন বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয় নাই, তখন বাঙ্গালী ইংরেজের দেওয়া কাপুরুষতার দুরপন্যে কলঙ্কলেপে কলঙ্কিত ছিলেন। এ কলঙ্ক ভঞ্নের চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথমে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম লিখিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।) “বন্দে মাতরম্” বাঙ্গালার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে; এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিত মাত্র নাই। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার পরিচায়ক, বাঙ্গালিদের পরিচায়ক, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বাঙ্গালী, দেবীচৌধুরাণী বাঙ্গালী কুলঙ্গনা, সীতারাম বাঙ্গালী ভৌমিক, চন্দ্রচূড় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে। “বন্দে মাতরম্” গানই বাঙ্গালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গভঙ্গের সময়ে, যখন ইংরেজশিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি খাস বাঙ্গালার উপর নিপতিত

হইল, তখনই “বন্দে মাতরম্” গান বাঙ্গালীর কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মালমসলা বন্ধিমচন্দ্র তৈয়ার করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্গভঙ্গে সে সময় ও সুযোগ দেখা দিল, আর আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম নূতনভাবে বাঙ্গালার লোক-লোচনের গোচর হইল। এই তিনখানি উপন্যাস বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের ত্রিপদ বেদী।

এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বন্ধিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে তাহার পর্যায় দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত, জাতিগত, এবং সংস্কারগত দোষে বা চ্যুতির ফলে কেমন করিয়া আদর্শ সৃষ্ট হইল না, তাহাও তিনি অপূর্ব চরিত্রোন্মেষ সাহায্যে দেখাইতে ক্রটি করেন নাই। তদ্ব্যাস্ত সিদ্ধান্তকে মান্য করিতে হইলে বন্ধিমচন্দ্রের পর্য্যয়ে একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তন্ত্র বলেন যে, সর্ব্বাণ্ড্রে ব্যষ্টি বা সাধককে তৈয়ার করিয়া তুলিতে হইবে, পরে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির প্রভাবে সমাজকে আদর্শের অনুকূল করিতে হইবে, শেষে সমন্বয় সাধন করিয়া মাতৃ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বন্ধিমচন্দ্র কমটির ফিলজফির প্রেরণায় সর্ব্বাণ্ড্রে Environment বা প্রতিবেশ প্রভাব ঠিক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বন্ধিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী-জাতির সহিত কাজ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। মায়ের খাস তালুকের প্রজা হইতে হইলে গৈরিক বসন ধারণ করিতে হইবে। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্মপ্রচার বা জাতির উদ্বোধন বাঙ্গালায় সর্ব্বভ্যাগী সাধক সন্ন্যাসী ছাড়া কেহ করে নাই, কেহ পারে নাই। তাই সন্ন্যাসীর গৈরিক লেখা তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে যেন উজ্জ্বল হইয়া

ফুটিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। আনন্দমঠে মহেন্দ্র সিংহ সম্ভান বটে, কিন্তু তিনি সন্ন্যাস পান নাই। দেবীচৌধুরাণী ব্রাহ্মণ কন্যা; সীতারাম কায়স্থ ভৌমিক ও সেনাপতি। আনন্দমঠে তিনি ঠিক সাম্প্রদায়িক ভাবে সমাজের সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে শক্তিকে সর্বসিদ্ধির আধারভূতা করিয়া বঙ্গীয় মান-বতার উন্মেষ সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন; সীতারাম উপন্যাসে শক্তিবিক্রপা হইলে, পুরুষ মোহাক্ক হইলে, কেমন বাড়া ভাতে ছাই পড়ে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালিদের শ্লাঘা ও অপহুব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।

মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আদিরসের মহাকবি। তাঁহার সকল উপন্যাসেই আদিরসের নানা অবস্থাগত বিশ্লেষণ আছে। তিনি বাঙ্গালার ইংরেজি-নবীণ বা উদ্ধত নায়কনায়িকাই ভাল করিয়া অঙ্কিয়াছেন, মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সখা অথ কোন প্রকারের কথাই ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বিলাতের যে আদিরসের Romanticism বায়রণ হইতে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। শেষের তিনখানা উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াও তিনি আদিরসের হাত এড়াইতে পারেন নাই। আদিরসের মৈনাকের উপর তাঁহার অনেক ভাবের নোকা কাঁসিয়া গিয়াছে। যেন তিনি বাঙ্গালীকে বার বার বলিয়াছেন যে, এই আদিরসের গুপ্ত পর্বতের সংঘাতে তোমার তন্ত্র ধর্ম, তোমার 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'—তোমার সকল ধর্ম, সকল সম্প্রদায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যদি ইউরোপের আদর্শে দেশাত্মবোধের অর্গব্যান বাঙ্গালার ভাবের লহরের উপর ভাসাইতে হয়, তাহা হইলে

সাবধান আদিসের চোরা বালির উপর, ডোবা পাহাড়ের উপর দিয়া নৌকা চালাইও না ; পূর্বেরকার অনেক সাধের সামগ্রীর মতন উহাও ফাসিয়া ঘাইতে পারে। ভবানন্দের কল্যাণীর রূপে মোহ, দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের প্রতি মোহ ও ঘর-গৃহস্থালীর প্রতি অনুরাগ, সীতারামের শ্রীর জন্ম উদ্ভূততা, শ্রীর ভ্রাতার—গঙ্গারামের রমার রূপে মোহ,—এ সকলই উদ্ভট হইলেও, এ এক কথাই বুঝাইতেছে,—এ রিরংসার হলাহল বিস্তারের পথ ও প্রণালী দেখাইয়া দিতেছে। মনে হয় বঙ্কিম-চন্দ্র স্বেচ্ছায় dramaকে নষ্ট করিয়া, উৎকটের আশ্রয় লইয়া উপদেশের সার্থকতা সাধনে অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি যে situation সৃষ্টি করিতে ঘাইয়া এতটা প্রমাদ করিবেন, ইহা ত বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক ইতিহাস কথা ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতটা প্রচারিত হয় নাই। তিনিই বরং বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ইতিহাস জানিতে ও বুঝিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; তাহার চেষ্ঠায় বাঙ্গালার অনেক বিস্মৃত কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার নারী চিরদিন এমন বিহ্বলা ও অবলা ছিল না। তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার অধ্যাপক-গৃহিণী স্বামীর অনুপস্থিতিকালে ছাত্রদের ন্যায় ও অলঙ্কারে পাঠ দিতেন। তিনি ত বাঙ্গালার ভৈরবী দেখেন নাই, এমন কি বাঙ্গালার শেষ ভৈরবী বিন্দুবাসিনীকেও দেখেন নাই। তিনি জানিতেন না যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরের মেয়েরা এখনকার মতন কাপড় পরিত না ; তাহাদের অনেকের হিন্দুস্থানী বা দাক্ষিণাত্যের ঢঙের কাপড় পরা ছিল। এখনকার কাপড়পরা ইংরেজের আমলের কিছু পূর্ব হইতে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে যে সত্যই লড়াই করিতে পারিত, পাঠানদের সহিত লড়াই করিয়াছিল, রঘুডাকাতকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে সব খবর তিনি ঠিকমত জানিতেন না। অর্থাৎ এ সকল সমাচারকে তিনি

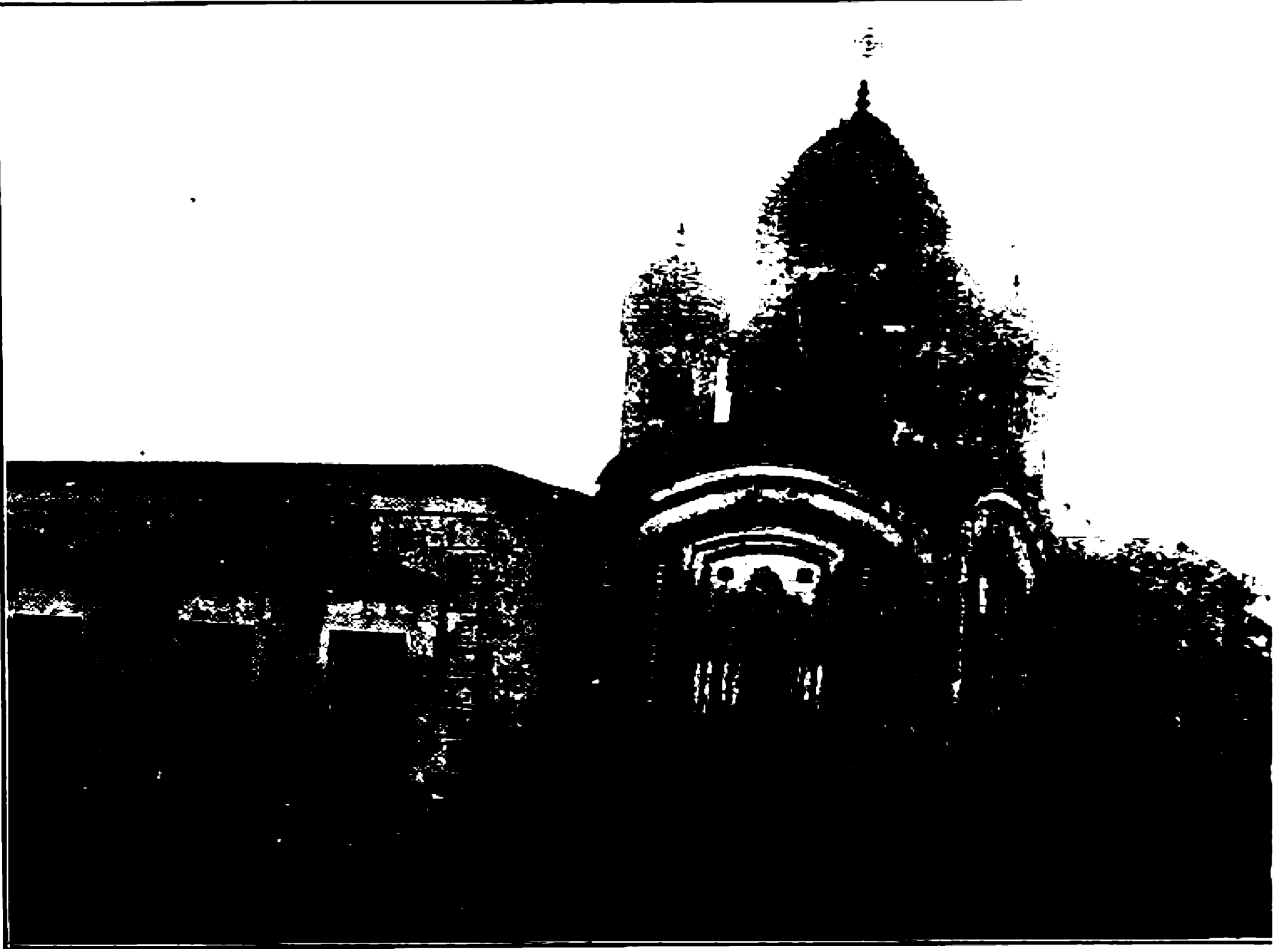
historical truth বলিয়া গ্রহণ করিবার অবসর পান নাই । ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট চাকরি করিতে করিতে বাঙ্গালার অনেক জেলায় তাঁহাকে ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেকের মুখে অনেক গালগল্প, অনেক কিস্কদন্তী তিনি শুনিয়াছিলেন । তাহারই উপর স্বীয় অপূর্ব কল্পনা চড়াইয়া তিনি শাস্তি, শ্রী, নন্দা, প্রফুল্ল প্রভৃতির চিত্র অঁকিয়াছেন । ঐ সকল চিত্র ঠিক বাঙ্গালার নহে ; অথচ উহাদের উপরে বাঙ্গালিদের মোটা গালার রঙ, বেশ জোর করিয়া বসান আছে । শ্রীকে বা শাস্তিকে দেখিলে মনে হয়, যেন উহারা বাঙ্গালার ভৈরবী, বাঙ্গালার কুলাঙ্গনা ; অথচ একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় বাঙ্গালায় এমন চরিত্র ফুটিবার নহে ; তথাপি কিন্তু উহাদের উপর এমন একটা বাঙ্গালীমানা মাখান আছে, যাহার মোহ এড়ান যায় না । এইভাবে কতকটা কাল্পনিক, কতকটা আধুনিক উপাদান লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষের তিনখানা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন ।

এই তিনখানা উপন্যাসের situation বা ঘটনাসম্প্রতি ফুটাইতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সাহায্য লইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ঐতিহাসিকতা বজায় রাখেন নাই । আলেখ্যের ground work বা ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যত্যয় ঘটান যায় বটে । উপন্যাস ইতিহাস নহে, একথাও ঠিক বটে ; কিন্তু তিনি এই তিনখানা উপন্যাসের কোন খানাতেই ground বা ক্ষেত্র তৎকালোপযোগী করিতে পারেন নাই । Detail বা খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে তাঁহার আলেখ্যের ক্ষেত্র আধুনিকতা-দোষে দুর্ঘট হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র যে এদোষ পরিহার করিতে পারিতেন না তাহা নহে ; তিনি উপন্যাসের purpose বা উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছিলেন । ক্ষেত্রের প্রতি, ঘটনার ঘটপ্রতিঘাতের প্রতি, আলেখ্যের আলো ও ছায়ার প্রতি তিনি তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন নাই । রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপাল-কুণ্ডলা যিনি লিখিয়াছেন, তিনি যে কারিকর মন্দ ছিলেন, এমন কথা বলা অসাধ্য । কিন্তু এই তিনখানা উপন্যাস লিখিবার সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত

লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, চিত্রকলার প্রতি তেমন নজর রাখিতে পারেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই রাখেন নাই। এই তিনখানা উপন্যাসে যে সকল চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহাদের *mentality* বা মানস-উন্মেষ আধুনিকতা দোষে একটু দূষিত হইয়াছে। এদোষ কতকটা অপরিহার্য। কারণ, তাহাদের উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই তিনখানি উপন্যাস লিখিতে হইয়াছিল তাহারা যে আধুনিক স্ত্রী-পুরুষ। তাহাদের সংশয় ভঙ্গনের জন্য, সন্দেহ নিরসনের জন্যই তিনি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার অঙ্কিত নরনারীর চিত্রে আধুনিকতার (*modernism*) দোষ অপরিহার্য হইয়াছে। উদ্দেশ্যসম্বন্ধিত উপন্যাস লিখিতে যাইলেই এ দোষ ঘটিবেই। বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্ত দোষী করা যায় না। কিন্তু এক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী নির্দোষ; তিনি সম্যাসীর চিত্র অনেকটা নির্খুঁত করিতে পারিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি ভাল সম্যাসীর সংশ্রবে আসিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শ ভাল ছিল। ফলে চিত্রও তাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সম্যাসীর চিত্র তিনি তাঁহার প্রায় সকল উপন্যাসেই লিখিয়াছেন, এবং সেসকল চিত্রে সম্যাসীর বৈশিষ্ট্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কয়টা মোটা কথা গোড়ায় বলিয়া রাখিয়া, এই তিনখানি উপন্যাসের এক একখানি গরিয়া আমার বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

নানাভাবে অনুশীলন তত্ত্বটা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ অনুশীলন তত্ত্বটা কিন্তু খাঁটি ইউরোপের সামগ্রী। জার্মান পণ্ডিত ফিক্টের (Fichte) *Individual and Communal Culture* ব্যাপ্তি এবং সংহতির অনুশীলনটাই, তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া, বাঙ্গালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যত সম্যাসী সম্প্রদায় আছে, আনন্দমঠের সম্যাসী সম্প্রদায় তাহার কোন আদর্শের অনুকূল নহে। উহা যেন বিলাতের Lake Poets দিগের Susquehanna প্রদেশে Utopia স্থষ্টির জন্য আদর্শ,—প্রটেক্ট্যান্ট Monkদিগের অনেকটা অনুরূপ।

নারায়ণ



বক্সিমবাবুর বৈঠকখানা ও তাঁহার পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ।

গেরুয়াও থাকিবে এবং ঘরে পত্নীও থাকিবে, ত্রুত উদ্‌যাপনের পরে সে পত্নীকে লইয়া ঘর করিবার আশা, তুষানলের মতন হৃদয়ে সদা ঝলিতে থাকিবে, এমন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ছিল না—হয় নাই। তাত্ত্বিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাহারা শক্তি রাখিত বা শৈব বিবাহ করিত তাহারা গেরুয়াবসন পরিত না, রক্তাশ্রয় ধারণ করিত। গোড়ীয় ভেকধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে গৈরিকের প্রচলন নাই; উহারা গেরুয়া বা রক্তবস্ত্র পরিধান করিত না। এই সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর দল গড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটু গোলে পড়িয়াছিলেন। সে গোল শাস্তির জ্বরদস্তি, ভবানন্দের কল্যাণী-মোহ আদি উদ্ভট ব্যাপারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য মনোবা বুঝিয়াছিল যে, তেলে-জলে মিশ খায় না; পত্নীও থাকিবে, অথচ স্বামী ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজিবে; আর পত্নী আগান দেওয়া আমটির মতন পাতায় ঢাকা হইয়া চিরজীবন কাটাইবে—অন্ততঃ যৌবনটা কাটাইয়া দিবে—এমন অঘটন ঘটাইতে হইলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী উভয়ের পতন—ত্রুতভঙ্গ অবশ্যস্তাবী। গৃহানুরাগ বা domesticity বজায় রাখিয়া, বাঙ্গালিহ অন্ধুর রাখিয়া এমন চিত্র পূর্ণাঙ্গ করা যায় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের চরিত্র চিত্রণে গোটাকয়েক কলকলেখা স্পষ্ট রাখিয়াছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, সমষ্টির কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। যখন আনন্দমঠ রচিত হয়, তাহার পূর্বের অর্ঘ্য জাতির সমন্বয় বা জলভরীণ হইতে National Cohesiveness বা জাতি-সংহতি লইয়া ইউরোপে এবং আমেরিকায় খুব আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের ফলে একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কার্ডিগ্যাল নিউম্যান এপক্ষে অনেক কথা সে সময়ে কহিয়াছিলেন। আমার অনুমান হয় যে, আনন্দমঠের গড়নে নিউম্যানের ভাবের মসলা অনেকটা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখিয়া বাঙ্গালীকে এই কথাটা যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইউরোপের ভোগপ্রচুর

শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে জাতির মঙ্গলকামী কর্মী হইতে হইলে দেশীয়ভাবে ত্যাগী হইতে হইবে। তেমন কর্মীকে সর্বত্র এমন পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, বাহা দেখিলে বাঙ্গালার আপামর সাধারণে চিনিতে পারে, এবং চিনিয়া স্বেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিতে পারে। এইটুকু ইসারা করিয়া গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের জন্মণ জাতির প্রচারিত সমাজতত্ত্ব ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইতেছে বলিয়া আনন্দমঠের সন্ন্যাসী না পূরা তাত্ত্বিক, না পূরা বৈষ্ণব। উহারা মানুষও মারিতেছে, আবার “ধীর সমীরে ষমুনাতীরে” গান করিতেছে। উহাদের তাত্ত্বিকী সাধনা নাই, বৈষ্ণবের জপমন্ত্র এবং কীর্ত্তন আনন্দও নাই। উহারা পরোপকার করিতেছে — কোম্পানীর মাল লুটিয়া, কোম্পানীর নিরীহ সিপাহীকে খুন করিয়া উহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকে ক্ষুধার অন্ন দিতেছে। পরোপকারের এমন উৎকট আদর্শ আমাদের শাস্ত্রে নাই, ধর্ম্মে নাই; বিশেষতঃ কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস ধর্ম্মে নাই। কারণ আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর আদর্শের তলায় বিলাতী পেট্রিয়টিজম আছে, ইউরোপের outlawryর মোহন অংশটুকু অঙ্কিত আছে। এই অপূর্ব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কাঠামর (frame-work) উপর বঙ্কিমচন্দ্র এক অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন। এ কাব্যে বৈষ্ণবের মাধুরী আছে, তাত্ত্বিক শাস্ত্রের তেজস্বিতা আছে এবং আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের Idealismএর মোহ আছে। এই তিনের সমবায়ে মঠের গল্পটা খুব জাঁকাল হইয়াছে বটে; কিন্তু সিদ্ধান্ত বাক্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। হয় ত বা অন্য নানা কারণে তিনি ইচ্ছা করিয়া তাহা ফুটান নাই। তাই আনন্দমঠের অনেক কথা ঢাকা আছে; সেই কারণে উহার নাট্যাংশ ও উপদেশাংশ উভয়ে উভয়ের অনুবাদী (complementary) হয় নাই। আনন্দমঠে জীবানন্দ ও শান্তিই কেন্দ্রচরিত্র। এই দুই চরিত্র যে ভাবে ফুটান হইয়াছে, সে ভাবে চরিত্রোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত কথাগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে

সত্যানন্দকে আনিয়া সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে ; অনেক কথা মহাপুরুষের উপর বরাত দিয়া রাখা হইয়াছে । আনন্দমঠের মহিমা চরিত্রোন্মেষে নহে, চিত্রাঙ্কনে নহে, উহার মহিমা “বন্দে মাতরম্” গানে এবং মাতৃ-মূর্তি প্রদর্শনে । শক্তি-প্রতিমাকে কেমন ভাবে দেশাঙ্গবোধের প্রতীকে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে আনন্দমঠে বুঝাইয়া দিয়াছেন । ইহাই আনন্দমঠের বিশিষ্টতা ।

দেবচৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার culture বা অনুশীলন ভবের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন । এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ পরিস্ফুট । দেবচৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে । দেবীচৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তি-মূর্তি—কমনা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে ; অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব বৈষ্ণবঠাকুরাণী । যখন শক্তি-মূর্তি তখন পুরুষ সম্মুখ ; ব্রজেশ্বর পিতৃশাসনে সম্মুখ, প্রকুল্লর রূপে সম্মুখ । এই পুরুষের তৃপ্তি-তৃষ্টি সাগর বোঁ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান বোঁ এবং ঐশ্বর্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রকুল্ল বা দেবচৌধুরাণী । প্রকুল্লকে সর্বৈশ্বর্য-শালিনী করিতে ষাইয়া কবি গোলে পড়িয়াছেন । প্রকুল্লকে একরাত্রির জন্ম স্বামিসঙ্গে সুখী করিয়া কবি সর্বৈশ্বর্যের পথে একটা কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন । তাহার পরিণাম দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের গৃহে আসিয়া বাসন মাজা—ঘর-সংসার দেখা । যেমন কম্বী তেজস্বী ব্রাহ্মণ ডাকাতের হাত দিয়া কবি দেবীরাণীকে গড়িয়া তুলিলেন, সে গড়নের ফলে পুরুষ ব্রজেশ্বর সোনা হইয়া ষাইবার কথা । কিন্তু কবি প্রকুল্লের সংস্পর্শে ব্রজেশ্বরের মানবতার উন্মেষ-ভঙ্গী দেখান নাই । যেন প্রকুল্ল আসাতেই নয়ান বোঁয়ের ঝগড়া খামিল, সাগর বোঁয়ের অভিমান দূর হইল, আর ব্রজেশ্বর যেন “নিত্য সর্বগত স্থানুরচলোয়ং সনাতনঃ” পুরুষের হিসাবে, প্রকুল্লের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, সব, রজঃ ও তমঃ—প্রকুল্ল,

সাগর ও নয়ান বো—এই তিন গুণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই তিনের সমাধান করিলেন প্রকুল, সংসারে একটা negative স্রুথের বা স্বস্তির লহর তুলিলেন প্রকুল, ফলভাগী হইল ব্রজেশ্বর। এই টুকুর অশ্রু প্রকুলকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান সবই শিথিতে হইল, কুস্তী করিতে হইল, লাঠি খেলিতে হইল, নানা ভঙ্গীতে ত্যাগের মন্ত্র করিতে হইল, দেবোরাণীর দোকানদারী বসাইতে হইল, ডাকাতে দলের সন্দার হইতে হইল! ভবানী পাঠকের গুরুগিরির পর্য্যাবসান হইল সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর-গৃহস্থলীর কার্য্যে—বাসনমাজায় ও মপল্লী বনৌকরণ। আদিরসের কবি আদিরসটুকু ভুলিতে পারেন নাই, domesticityর লোভটুকু সামলাইতে পারেন নাই। এতটা শিকার পরেও প্রকুল বৈষ্ণবী হইতে পারিলেন না, তাত্ত্বিক মতে শাস্ত্র তৈরবী হইতেও পারেন নাই। ঝান্সীর রাণীর বা রাণী দুর্গা-বতীর বা বাঙ্গালার সোনা বিবীর এত শিক্ষা হয় নাই, তথাপি তাঁহারা শক্তিরূপিনী ছিলেন, অঘটন ঘটাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বহুগ্রামে অপূর্ব শক্তিশালিনী ও সংঘমপরায়ণা বহু তৈরবী ও বৈষ্ণবী পূর্বের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের আদর্শও প্রকুলের পরিণতি অপেক্ষা অতি উচ্চ স্তরের। গীতার হিসাবে সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাইয়া, নিকাম ধর্ম্মের ছবি অঁকিলে ব্রজেশ্বরেও প্রকুলের স্বামি-বোধ থাকিবে না; ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিশালতায় মিশিয়া যাইবে। তাই প্রকুল-চরিত্র একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়; উহাকে শাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে কিংবা ইউরোপীয় দর্শনের মাপ-কাঠিতে মাপিলেও পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ব্রজেশ্বরে শিবত্বের আরোপ করিয়া প্রকুলকে শক্তিরূপে খাড়া করিতেন, তাহা হইলে ব্রজেশ্বরের চিত্র অশ্রু প্রকারের হইত, প্রকুলও আরও একটু ফুটিত। অথবা যদি প্রকুলকে বৈষ্ণবী মাজাইতেন তাহা হইলে উহাতে হয় স্রুতজ্ঞার নহেত রুদ্রীণীর ছায়া পড়িত। দুইয়ের কোনটাই প্রকুলে পরিষ্কৃত হয় নাই। এত করিয়াও যখন প্রকুলের স্বামীর ঘর করিবার আকাঙ্ক্ষা ঘুচে

নাই, যখন সাগর বোকে বজরায় ডাকিয়া রঙ্গভঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই, তখন প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্মের, গীতাতত্ত্বের ক্ষুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ গীতার সিদ্ধান্তসকলের ছড়াছড়ি দেবীচৌধুরাণীতে করা হইয়াছে। সাধক ভবানীপাঠকের আলেখ্যে কোন বিষম দোষ দেখি না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের ব্রজেশ্বরের মতন পিতৃ-ভক্ত বাঙ্গালী যুবক অনেক ছিল, ব্রজেশ্বরের জনকের মতন বিষয়ী বাঙ্গালী কৃষ্ঠাব্যক্তি অনেক দেখিয়াছি, সাগর বো, নয়ান বো যে দুই একটা দেখি নাই তাহা নহে; কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্র অপূর্ব; উহা বাঙ্গালার নহে, অথচ বেশ বাঙ্গালীয়ানা মাখান। উহা বাঙ্গালীর ঘরে কখনও ছিল না, বাঙ্গালীর ঘরে কখনও হইবে না। যে উদ্ভটতা শাস্তিতে আছে, সে উদ্ভটতা প্রফুল্লের ফুটিয়াছে। কোনটা বাঙ্গালার নহে, ভারতবর্ষের নহে, অথচ কোনটাকেই বাঙ্গালিদের গণ্ডী হইতে বাহিরে রাখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এই টুকুই কারিগরী—এই টুকুই শিল্প-নৈপুণ্য।

সীতারাম উপন্যাসে যেন দেবীচৌধুরাণীর *obverse proposition solve* বা কতকটা বিরোধী ভাবের ব্যঙ্গনা দেখান হইয়াছে। এখানে পুরুষ প্রকট; সীতারাম রায় কস্মী ও তেজস্বী পুরুষ। তাঁহার তিন স্ত্রী—স্রী, নন্দা এবং রমা। স্রী যেন ঐশ্বর্য্য, নন্দা যেন স্নানাদিনী, রমা যেন হ্রী বা মোদিনী। রাজার রাণী যেমন হইতে হয়, ঘরানী-গৃহিণী যেমন হইতে হয়, নন্দা তেমনই। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমতা, স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিতা, স্বামীর মর্যাদা রক্ষায় সদা নিরতা; বাঙ্গালার গৃহস্থ কুলঙ্গনার এক দিকের একটা আদর্শ নন্দা। রমা যেন মোমের পুঁতুল, সোহাগের খুঁচি, যেন আদরসের মঞ্জুষা; স্বামীর সোহাগে সদাই যেন গলিয়া পড়িতেছেন; স্বামীর মহত্ব বা গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার শক্তি নাই, স্বামীকে লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি বেশ আছে। ফলে, রমা সদা ভীতা ও সঙ্কুচিতা; সে স্বামীকে পাইলে পুঁতুল খেলা করিতে ভালবাসে, স্বামীর রাজ্য-

গিরির, দেশোন্মবোধের কোন ধারও ধারে না। এমন টানের পুতুল, মোমের খেলনা, রাজা-বাদসা ধনীর ঘরে অনেক পাওয়া যায়। ইহাতে অস্বাভাবিকতা নাই। কিন্তু শ্রী—সে কেমন নারী! প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবার আশঙ্কায় শ্রী স্বামীবর্জিতা; সে বর্জ্জনকালে, কিশোর বয়সে তাহার কেমন শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল তাহার কোন পরিচয় গ্রন্থকার দেন নাই। শ্রী ফুটিল গঙ্গারামের রক্ষা ব্যাপারে, বিদগ্ধ বটশাখায় দাঁড়াইয়া লোক সমাহরণে ও উৎসাহ দানে শ্রী ফুটিয়া উঠিল—বিদ্যা-বিনাসের মত ভ্রাতা ও স্বামীর প্রাণ সংশয় বুঝিয়া একবার শ্রী বাঙ্গালীর মেয়ের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর শ্রী একটা প্রহেলিকা; সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বটে, কিন্তু জগন্নাথের রথের দড়ীর টানের মত তাহার হৃদয়ে স্বামী-ঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে। অথচ যখন সীতারাম তাহার দ্বারস্থ, তাহার জন্ম পাগল, সে পাগলামীর ফলে রাজ্য যায়, স্বাধীনতা যায়, তখন শ্রী পাষাণী। এই পাষাণ ভাব-টাই সীতারামের পুরুষকারের তাসের ঘর শেষে ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীকে allegory বলিতে পারি না কারণ allegoryর হিসাবে শ্রীর চরিত্রোন্মেষ ঘটন হয় নাই। শ্রী একটা abstractionও নহে; কারণ এমন ভাবে abstraction ফুটিয়া উঠে না। সীতারাম হেন পুরুষ,—যে দেশের জন্ম, জাতির জন্ম পাগল, যে স্বীয় পুরুষকারের প্রভাবে অঘটন ঘটাইয়াছিল, তাহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান মামুদাবাদ ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা,—ভেমন একনিষ্ঠ সাধক এমন মোহে পড়িবে কেন? একনিষ্ঠার এমন পরি-গাম হয় না। তাহার একনিষ্ঠা আছে, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে, নিশ্চিন্ত না হইলে, তাহার মন অন্য দিকে ঘাইবে না। সীতারাম বিপদবেষ্টিত হইয়াও পতনের স্থায় শ্রীর রূপে পুড়িয়া মরিল। শ্রীইবা এমন কোন দেশের ভৈরবী যে, ধর্মরাজ্য ছাড়াইয়া বাইতেছে দেখিয়াও টলিল না, সর্বনাশ করিয়া তবে বাহির হইল! এমন allegory আমি বুঝিতে পারিলাম না। সাধনশাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে ইহা বুঝি না, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের মাপকাঠি

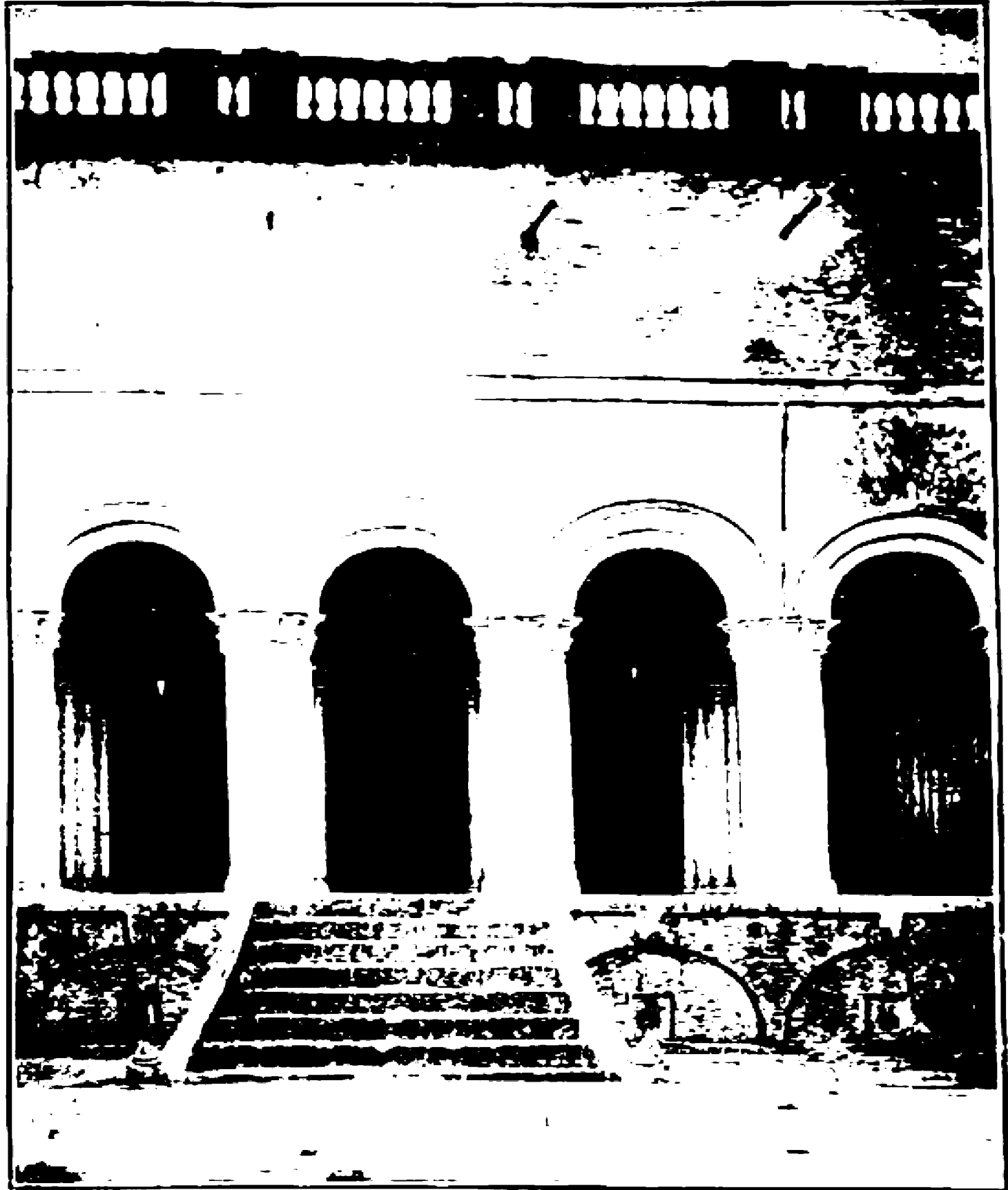
লইয়া ইহার পরিমাণ করিতে পারি না। তাহার পর গঙ্গারাম ও রমা—এক অপূর্ব ব্যাপার। গঙ্গারাম শ্রীর ভাই, সুতরাং শ্রীর সপত্নীর ভ্রাতৃস্থানীয়। গঙ্গারাম সীতারামের কৃপায় সব পাইয়াছিল; জীবন, পদ, ঐশ্বর্য্য, মান-সম্মান, তাহার ইহজীবনের সর্বস্বই সীতারাম-দত্ত। সেই গঙ্গারাম নগরপাল, অবশ্যই বীর ও যোদ্ধা। নগরপালের হিসাবে, শ্রীর ভাইয়ের হিসাবে, রমা তাহাকে ডাকিতে পারে। তাই বলিয়া গঙ্গারামকে সহসা রমার রূপে পাগল করিয়া তুলিতে কোন আদিরসের কবি পারেন না, সাহসে কুলায় না। বন্ধিমচন্দ্র তাহা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে লাভ হইল কি? সিদ্ধান্তবিকাশের পক্ষে উহা সহায়তা করিল না, আদর্শ ফুটাইবার পক্ষে উহা কাজে লাগিল না, ক্ষেত্রের মার্জ্জনা পক্ষে উহার কোন প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের প্রেম এবং শ্রীর প্রতি সীতারামের মোহ যেন allegoryর হিসাবেও ঠিক খাপ খায় না। অথচ এই উপন্যাসের এই দুইটি ঘটনাই মহাপ্রাণ; গল্পটা এই দুইটি ঘটনার উপরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পের Tragedy এই দুই ঘটনা হইতেই পরদায় পরদায় খুলিয়াছে। ফলে, এই দুইটা ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায় না, বর্জ্জন করা চলে না। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, গল্পের বনিয়াদের সহিত এই ঘটনা দুইটি ঠিক খাপ খায় না।

কিন্তু বন্ধিমচন্দ্র এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধের অনেক কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী চরিত্রের কোথায় কতটা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। Artএর হিসাবে তিনখানা উপন্যাসে দোষ থাকিলেও, উপদেশের হিসাবে উহা পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ। সে উপদেশ কথা সেই বুঝিবে, যে বন্ধিমচন্দ্রের মনীষার শেষ পরিণতি বুঝিয়াছে, যে ধর্ম্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তসকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। শুক্রাষু না হইলে তত্ত্ব কথা বুঝান যায় না। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালীর সম্মুখে বহুকাল পড়িয়া আছে; উহাদের পর্য্যাপ্তভাবে অভিনয় হইয়াছে, বহু

লোকে উহা পাঠ করিয়াছে, কিন্তু উহাদের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা ঠিকমত হয় নাই। দেশ, কাল, পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি বলিতে বাধ্য যে, উহাদের বিশ্লেষণের সময় ও শুভ অবসর এখনও দেখা দেয় নাই। যে ভাবে “বন্দে মাতরম্” মহাগীতি কুটিয়াছিল সেই ভাবে এই তিনখানা উপন্যাসের তত্ত্বকথাও কুটিয়া উঠিবে। সেটা বিধাতার কৃপা সাপেক্ষ। তাই আমি উহাদের নাম দিয়াছি —ত্রয়ী। ত্রয়ী ইষ্টের করুণা ছাড়া বুঝা যায় না। এই তিন খানিও বুঝিবার দিন কাল আছে, যোগ্য মানুষ আছে। এখন আমি বাহিরের মোটা কথা কয়টার উল্লেখ করিয়া নিরন্তর হইলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারায়ণ



চট্টোপাধ্যায়-বাটীর অভ্যন্তর—ঠাকুরদালান ।

সেকালের স্মৃতি ।—বাজে কথা

৪ । বঙ্কিমচন্দ্র ।

বঙ্কিমবাবু 'সৌখীন' ছিলেন । তাঁহার আশে পাশে সবই বেশ পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, সাজানো, গোছানো দেখিতাম । অগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না । বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি ছিল । বাড়ীতেও বঙ্কিমবাবুর পিরামের বুকের বোতামের দু'একটা খোলা দেখি নাই । শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন ; প্রত্যহ কামাইতেন । পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না । সোনার চশমাখানি ঝক্-ঝক্ চক্-চক্ করিত । খাপখানিও সেইরূপ । ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন । টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত ; কোথাও এক বিন্দু ধূলি নাই । বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন । শুড়-শুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া-মোছা ; মুরলী বড় কলিকায় 'তাওয়া' দিয়া উৎকৃষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত । বঙ্কিমবাবু বেশ মিঠাইয়া, জিরাইয়া, ধীরে ধীরে, তামাক টানিবার আয়েস ভোগ করিতেন ।—বাড়ীতে ঢুকিলে, ঘরের চারি দিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নাই ।

সাহিত্যেও বঙ্কিমবাবুর 'সৌখীনতা'র পরিচয় পাওয়া যায় । বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন । তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য্য, রচনায় সৌন্দর্য্য, বাক্য-বিন্যাসে সৌন্দর্য্য, শব্দ-চয়নে সৌন্দর্য্য । তাঁহার উপন্যাসের অনেক পাত্রপাত্রীও সৌখীন, 'সৌন্দর্য্যপ্রিয়' । • তাঁহার

আদর্শও সৌন্দর্য্য। তাঁহার অনেক ক্ষুদ্র শৃঙ্গির ‘রচনা-রীতি’ খুব সৌখীন।

সেকালে “সাহিত্য”র একটা জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব পুরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০/- দশ টাকা। ইহা ‘রাজসংস্করণ’। রাজসংস্করণ রাজাদের পাতে দিবার যোগ্য সংস্করণ, অথবা সংস্করণের রাজা, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা মনে আছে, কোনও রাজা ইহার গ্রাহক হন নাই। কোনও প্রজাও হন নাই। এক শত ছাপা হইত। এক জন ‘গ্রাহক’ হইয়াছিলেন। তিনি রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী ;—জমীদার, টাঙ্গাইলের কবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। পুরাতন হিসাবে ভূস্বামী রাজা। ইনি এখন ‘রাজা’র ভাই-দাদা বটে।

যাক্। অবশিষ্ট নিরনব্বইখানি আমরা বাছিয়া বিলি করিতাম। একদিন সেই রাজসংস্করণের “সাহিত্য” লইয়া বন্ধিমবাবুকে দিতে যাই। বন্ধিমবাবু ভাল ছাপা পছন্দ করিতেন। “সাহিত্য”খানি হাতে করিয়া লইলেন; বলিলেন, “বাঃ, চমৎকার!” উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এত খরচ করিয়া সামলাইতে পারিবে কি?”

আমি বলিলাম, “এক শত এইরকম ছাপা হয়, সব নয়।”

“তাতেও ত অনেক খরচ পড়িবে। কে লইবে?”

“কেহ নয়। আমরা সখ করিয়া ছাপি। এক জন গ্রাহক হইয়াছেন!” প্রমথবাবুর নাম বলিলাম।

বন্ধিমবাবু বলিলেন, “আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাপা ভালবাসি। আমার বহিগুলি এখন ভাল করিয়া ছাপাইতেছি। বাঁধাইয়া দিতেছি। কাজেই দামও বাড়াইতে হইয়াছে।”

আমি বলিলাম, “আমাদের দেশের লোক বেশী দাম দিয়া কিনিতে পারিবে কি? বোধ হয়, বিক্রী কমিয়া যাইবে।”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “তা হ’তে পারে। কিন্তু আমার সমস্ত বই ঐ রকম করিয়া ছাপিব।”

আমি বলিলাম, “দাম সস্তা হইলে সকলে পড়িতে পারিত। বড় বড় ইংরেজ লেখকদের বই কত সস্তায় পাওয়া যায়।”

“তা বটে। আমি তাও ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, এ দেশে এখনও cheap literature-এর সময় হয় নাই। আমার মনে হয়, উপস্থাসের মূল্য অধিক হইলে ক্ষতি নাই।”

আমি প্রকারান্তরে প্রতিবাদ করিবার জন্ত বলিলাম, “সকলের সুবিধার জন্ত আমরা ‘সাহিত্য’র বার্ষিক মূল্য দুই টাকাই রাখিয়াছি।”

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, “তোমাকে আর একদিন বলিয়াছিলাম—‘সাহিত্য’র দাম তিন টাকা করিয়া দাও। যাহারা দুই টাকা দিতে পারে, তাহারা তিন টাকাও দিতে পারে। যাহারা তিন টাকা, দুই টাকা, কিছুই দিতে পারে না, তাহারা কিছুই কেনে না। “বঙ্গদর্শনে’র সময়েও দেখিয়াছি, ‘প্রচারে’ও দেখিয়াছি ;—যে শ্রেণীর লোক গ্রাহক হয়, দুই এক টাকায় তাহাদের আসে যায় না।”

“যাহারা খুব গরীব ? তাহারা কি পড়িতে পাইবে না ?”

“খুব গরীব, অথচ পড়িতে জানে, পড়িতে চায়, এমন লোকের সংখ্যা এখনও এ দেশে অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই ; তাই শিক্ষিতের সংখ্যা বড় অল্প। cheap literature-এর এখনও সময় হয় নাই। ইহার অন্য কারণও আছে। সকল জিনিস সকলের হাতে দেওয়া উচিত নয়। সকল বই সাধারণে না পড়িলেও কোনও ক্ষতি নাই। কতকটা পড়া শুনা থাকিলে যে সব জিনিস পড়া চলে, খুব অল্পশিক্ষিতের পক্ষে সে সব বই পড়িলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। দেশের অবস্থার সঙ্গে cheap literature-এর সম্বন্ধ আছে।”

তার পর সাহিত্যখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “দিব্য ‘get-up’ হইয়াছে।”

আমি বলিলাম, “আমরা ত আর কিছু করিতে পারিব না। কাগজে, মলাটে, বাহারে যা হয়।—”

“কেন ? তোমাদের কাগজ ত বেশ হইতেছে।”

আমি বলিলাম, “আপনি যদি ‘বঙ্গদর্শন’ ঘুড়ীর কাগজে বটভলার ছাপাখানায় ছাপিয়া দিতেন, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। অমন কাগজ আর হইবে না। আমরা অমন লেখা কোথায় পাইব ?”

মনে করিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু ইহাতে সায় দিবেন ; বলিবেন, “তা বটে।” কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “তোমরা না পারিবে কেন ? এখন যে সব কাগজ বাহির হইতেছে, ‘বঙ্গদর্শনে’র যে সুবিধা ছিল, তাহাদের সে সুবিধা নাই। তখন বাঙ্গালায় অনেক জিনিস লেখা হয় নাই। প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোকে কিছু জানে না, সে বিষয়ে যৎ-সামান্য লিখিলেও চলিত, লোকে তাহাই পড়িত, সেইটুকুই শিখিত। এখন আর তাহা চলে না। এই তোমার ‘সাহিত্যে’র কথাই ধর। উমেশ বটব্যালের মত original research করিয়া ‘বঙ্গদর্শনে’ কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই। বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তর ‘মৃত্যুর পরে’—উঁচু দরের লেখা। ‘বঙ্গদর্শনে’ এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।—তোমরা পারিবে না কেন ? ‘বঙ্গদর্শনে’র কাজ বঙ্গদর্শন করিয়াছে ; তোমাদের কাজ তোমরা কর।”

বঙ্কিমবাবু শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের “মৃত্যুর পরে”র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিন চারিবার আমার নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর style-এরও তিনি প্রশংসা করিতেন। “মৃত্যুর পরে” গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। পূজ্যপাদ বটব্যাল মহাশয়ের “বৈদিক প্রবন্ধাবলী”ও “বেদপ্রবেশিকা” নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয়, দুই-ই ইঁদুরে কাটিতেছে।

আমি বলিলাম, “আপনার লেখা ? আপনার প্রবন্ধ, সমালোচনা,

উপস্থাপন,—সে রকম আর কে লিখিবে ? সে গৌরব ত আর কোনও মাসিকের ভাগ্যে ঘটিবে না। আপনি ত আর কোনও কাগজে লিখিবেন না।”

“আর লিখিয়া উঠিতে পারি না। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা, দেখিয়া লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু—”

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, “আমি আমার কাগজের কথা বলি নাই ; আমার সেই প্রথম দিনের হুকুম মনে আছে।”

বন্ধিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তুমি না বল,—আমি তোমার কথা ভাবি। তুমি ছেলেমানুষ, এত টাকা খরচ করিতেছ ; ‘বন্ধ করিয়া দাও’ বলিতেও ইচ্ছা হয় না। অথচ তোমার লোকসান দেখিলেও কষ্ট হয়। অন্ততঃ খরচপত্রটা চলিয়া যায়, এমন কিছু করা যায় না ?”

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, “যায়। সে উপায় আপনার কাছে। আমার বলিবার উপায় নাই।”

বন্ধিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, “আমার লেখা ? আমি লিখিলেই কি কাগজ চলিবে ?—তা চলুক না চলুক, আমি যে তোমার কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না, তার কারণ আছে। অন্ততঃ চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।”

আমি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম, “একটাই দিন না !”

বন্ধিমবাবু বলিলেন, “শুধু তোমাকে একটা দিনে ত চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন ; আমার নাতিদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি ত সব বুঝি। তাঁহার ‘ভারতী’ আছে। রবি আসেন ; জান ত, ‘প্রচারে’র সময় এক পালা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ‘সাধনা’ আছে। তুমি আছ, তোমার ‘সাহিত্য’ আছে। তার পর আর এক আছেন,—আমার বেয়াই দামোদর বাবু।”

আমি বলিলাম, “তাঁহার ‘প্রবাহ’ ত নাই। তিনি কি আবার—”

“না ; তিনি ‘নব্য-ভারতে’র জন্ত খরিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে

বলিয়াছি—আমা দ্বারা হইয়া উঠিবে না।—এখন, তিনটি লিখিতে পারিলেও হয়। তা যে কবে পারিয়া উঠিব, তা ত বলিতে পারি না।”

এমন সময়ে মুরলী আসিয়া খবর দিল,—হারাণবাবু আসিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “হারাণচন্দ্র কেন আসিয়াছেন, জান ?—‘বঙ্গবাসী’র যোগেনবাবু হারাণবাবুকে আর এক দিন পাঠাইয়াছিলেন। ‘জন্মভূমি’র জন্ম আমার উপস্থাপন। পাঁচ শত টাকা দিতে চাহিয়াছেন।”

এমন সময়ে হারাণবাবুর প্রবেশ। হারাণবাবু—স্বনামধন্য, এখন রায় সাহেব হইয়াছেন। কোনও চন্দ্রকেই প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইতে হয় না! হারাণচন্দ্রের জন্ম মশাল জ্বালিলে অভিমানী রায় সাহেব আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “বহুন হারাণবাবু।—আমি পারিয়া উঠিব না।”

হারাণবাবু একটু জিদ করিতে লাগিলেন, টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে, তাহারও আভাস দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “না।” তার পর হারাণবাবুকে বলিলেন, “সাহিত্যের get-up দেখুন।”

হারাণবাবু বলিলেন, “ক’খানিই বা ছাপা হয় ? ‘জন্মভূমি’ অনেক ছাপিতে হয় ; ‘জন্মভূমি’র ছাপাও মন্দ নয়।”

“আমি সে কথা বলিতেছি না।”

হাসিতে হাসিতে হারাণবাবু বলিলেন, “যোগেনবাবুকে কি বলিব ?”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “বলিবেন,—আমি পারিব না।” তার পর গড়গড়ায় নলটি লাগাইয়া দুই এক টান তামাক টানিয়া বলিলেন,—“ভক্তি প্রীতির জন্ম বাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার জন্ম তাহা পারিয়া উঠিব কি ?”

হারাণবাবু বলিলেন, “আমি আর এক দিন আসিব।”

বক্সিমবাবু বলিলেন, “কিন্তু আমাদেরই হইয়া উঠিবে না।”

আমি বক্সিমবাবুর সম্মুখে বসিয়া যে নূতন বক্সিমচন্দ্রকে দেখিলাম, তাঁহাকে ত আগে দেখি নাই, চিনিতে পারি নাই! আমার মানস-পটে তাঁহার অশ্রু মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কল্পনা-নয়নে সেই বক্সিমচন্দ্রের ছবি দেখিয়া মনে হইল,—

“পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!”

শ্রীশূরেশ সমাজপতি ।

বন্ধিমচন্দ্রের বাল্যকথা

সেকালের পল্লিগ্রামমাত্রেরই পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল, আমাদের বাটীর সন্নিকটে একটি ছিল। বন্ধিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে। জুগলি কালেজে ভর্তি হইবার পূর্বে তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বন্ধিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমহাশয় কায়স্থ সম্ভান, বড় রাসভারি লোক, ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের স্তায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া, “লেখ্ লেখ্ শ্যাররা” বলিয়া চোৎকার করিতেন, তখন ছাত্রেরা ধরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বন্ধিম, এক একদিন বৈকালে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেতগাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বন্ধিম বেত লইয়া কোন কোন ছাত্রের নিকট গিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বা বয়ো-কনিষ্ঠ। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই তিনজন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত ঢুলাইয়া বলিতেন, “মারি’ মারি’, আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ী আস খেলতে যাও নাই?” বন্ধিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময়ে ঐ কয়জন বালকের সহিত কোন কোনদিন তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অশান্ত খেলা—বাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেই জন্য, দুর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বালকদিগের পরীক্ষা করাতে তাহা-

নারায়ণ



বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

(বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদরদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণবাবুই জীবিত আছেন ।
ইনি “বঙ্গ-দর্শনের” কাব্যাদ্যক্ষ ছিলেন)

দের উৎসাহ হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অশ্রুশ্র বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে পারিত না। তিনি কাছাকাছি বাল বলিলে, তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত। স্কুলে, কালেজে, তাঁহার সমধায়াদিগের উপরও ঐরূপ প্রভাব ছিল, ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই মহিমা। লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন যৌবনে একজন বিখ্যাত বাঙ্গলা লেখক হইলেন, তখন অনেকগুলি সুশিক্ষিত যুবককে উৎসাহ দিয়া লেখক করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক একজন বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র না জন্মাইলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কখনও বাঙ্গলা ভাষার লেখক হইতেন না, চিরকাল ইংরাজি লেখক থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় ও অনুপ্রাণনে তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্য্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরু-মহাশয়-দত্ত বেত লইয়া, বালক বঙ্কিম, কোন একটি বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখাপড়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক, ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাস্তাডি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটিজুতা পায়ে ফট্ ফট্ শব্দে পলাইলেন। এক ব্যক্তি এক বাজরা বেগুন লইয়া নৈহাটীর বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, সে উহা আমাদের ঠাকুরবাড়ীর দরজার নিকটে ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা ঘাট নির্জন হইল। সকল বাটীর দরজা বন্ধ হইল, কেবল বালক বঙ্কিমের জন্ম আমাদের বাড়ীর দরজা খোলা রহিল, তিনি গুরুমহাশয়প্রদত্ত বেত হাতে করিয়া আমাদের বাড়ীর দরজার নিকট রাস্তার ধারে দাঁড়াইলেন, সুতরাং আমাদের যত লোকজন ছিল, তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

পিতৃদেব তখন তাঁহার কর্মস্থলে, অগ্রজদ্বয়ও তাঁহার নিকটে। গ্রামে গোরার বহর লাগিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা বিপদ ভাবিয়া পলায় বে! ! সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা কুচ করিয়া কলিকাতায় আসিত, কিন্তু পীড়িত গোরারা নৌকাযোগে আসিত। যে স্থানে সূর্যোদয় হইত, সেই স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্ত ডাঙ্গায় উঠিত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে উৎপাত করিত। দুই তিন বৎসর পূর্বে একবার গোরারা আমাদের গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। বঙ্কিমচন্দ্র গুরু-মহাশয়-দত্ত বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, এমনত সময়ে একদল গোরা আসিতেছে দেখা গেল। তাহারা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতে লাগিল, একজন বেতটি লইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে দলে দলে গোরা আসিতে লাগিল। বালক বঙ্কিম স্থিরভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অর্ধঘণ্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল, গ্রাম আবার সজীব হইল।

কথাটা অতি সামান্য বটে, কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা গোরার ভয়ে পলাইল, সকল দরজা বন্ধ হইল, বালক বঙ্কিম সেই গ্রামেই প্রতিপালিত, আকাশ হইতে পড়েন নাই। তিনি নির্ভয়ে বেত্রহস্তে গোরার সম্মুখে দাঁড়ান কেন, এই তেজটুকু বালকের পক্ষে অসামান্য বোধ হওয়াতেই এই স্থলে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। তিনি নিজের চন্দ্রশেখরের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, “বঙ্গালীর ছেলে মাত্রেরই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে জুজু দেখতে চায়।”

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দ্বারা ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না, একজন ভাল Executive Officer ছিলেন, তথাপি কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি পিতৃ-দত্ত

একটি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। তিনি পূজার ছুটিতে কন্দম্বল হইতে বাড়ী আসিয়া, উহা জানিতে পারিয়া ঘোড়াটি বিক্রয় করাইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই; কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না, আর যৌবনে গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

যখন বন্ধিমচন্দ্রের বয়স দশ কি এগার বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে, এক দল ডাকাত আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি করিবে। পিতৃদেব তখন বাড়ী ছিলেন না, জেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুকুবিগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে স্ত্রীলোকেরা ও আমরা চার ভ্রাতা কয়েক রাত্রে জন্ম প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র বালক বন্ধিম বাঁকিয়া বসিলেন, কুঞ্চিত কেশরাশি ঢুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “তাহা কখনই হইতে পারে না, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাইব না।” পিসেমহাশয় বলিলেন, “তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক।” বন্ধিম বলিলেন, “কেন কেটে যাবে? আমাদের বাড়ীতে ত অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর বাগ্দি, যাহারা এক একজন লাঠিয়াল, ও বোম্বটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য কি যে ডাকাতরা আমাদের কেটে যায়।” তাঁহার অগ্রজদ্বয়েরও ঐ মতে মত হওয়াতে, বালক বন্ধিমেরই পরামর্শ মতে কার্য্য হইল। কয় রাত্রি ধরিয়া অনেক লোক আমাদের বাড়ী পাহারা দিত। ডাকাত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ঐ দিন হইতে গুরুজনেরা বন্ধিমচন্দ্রকে “বাঁকা” বলিয়া ডাকিত।

আমাদের গ্রামের আড় পারে হুগলি কালেজ, প্রায় সাত আট বৎসর ধরিয়া বন্ধিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ঐ কালেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক এক দিন ছুটির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত, বন্ধিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “কেমন রে, নৌকা ছাড়বি?”

মাঝি নৈহাটীর পাটনী, কখন 'না' বলিত না, নৌকা খুলিয়া দিত। কোন কোন দিন ঝড় উঠিলে পূর্বে নৌকা ঘাটে গিয়া পৌঁছিত, আর কোন কোন দিন মাঝি গঙ্গায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কাল মেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল হইত। অলক্ষণ মধ্যেই প্রবল বেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গসকলের মাথাগুলি ভাসিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীর বক্ষে তুলার মাড় ভাসিত। ঘাঁহারা নদী-বক্ষে ঝড়ে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি ভয়ানক দৃশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন। যিনি ঝড়গুরু দেখিয়া ভয় পাইতেন তিনি প্রকৃতির এই সর্বসংহারিণী মূর্তি অজ্ঞান হইয়া দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কালেজ পরিত্যাগ করিবার তিন চারি বৎসর পূর্বে, আমি ঐ কালেজে ভর্তি হই, সুতরাং আমাকেও মধ্যে মধ্যে এই বিপদে পড়িতে হইত।

বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে একজন নীলকর সাহেব, হাতীর শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পুলিশ কাজ করিত। দারগাগণ ঐ সাহেবটিকে কোন মতে ধরিতে পারিল না, কেন না, তাঁহার নিকট সর্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, তাহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। সাহেবটি British-born subject, সুতরাং হাইকোর্ট সোপর্দ হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, কেন না, তিনি উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ বিচিত্র অসামঞ্জস্য মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইত।

এই সঙ্গে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িল, উহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিবস একরূপ কুয়াসা চারিদিক ব্যাপিয়াছিল যে, কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। আমার জীবনে-কখনও

ঐরূপ কুয়াসা দেখি নাই, কেন না, উহা প্রায় ১০।১১টা অবধি ছিল। আমরা সাড়ে নয়টার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িতে বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল, দিক্ ঠিক করিতে পারিব না। বন্ধিমচন্দ্র তাহা শুনিলেন না, নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাটা, নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ পনের মিনিটে কলেজ-ঘাটে পৌঁছিত, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা হইল, নৌকা চলিতেছে, কিন্তু কোথায় কলেজের ঘাট! নৌকা কেবল চলিতেছে, চলিতেছে। বন্ধিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাচ্ছিঁস্ রে?” মাঝি বলিল, “আজ্ঞে, তা’ জানি না।” “সে কি রে?” “আজ্ঞে, বোধ হয় ভাটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিঁ।” মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে, বন্ধিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা আপনা-আপনি এক স্থানে তীরলগ্ন হইল। বন্ধিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কোন জায়গা?” মাঝি বলিল, “বুঝি, মূলাঘোড়।”

কপালকুণ্ডলা গল্পটি যে কুজ্জ্বলিকায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এই দিনের ঘটনাবলম্বনে।

বন্ধিমচন্দ্র বাল্যে এবং কৈশোরে গল্প শুনিতেন ভালবাসিতেন। কিন্তু যে সে লোকের নিকট নহে, কিম্বা যা’ তা’ গল্প নহে—সে-কালের লোকের নিকট, সেকালের গল্প। বন্ধিমচন্দ্রের দুই একখানি উপন্যাস কোন কোন ঘটনা অথবা কোন কোন গল্প অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। গত চৈত্র মাসের ভারতীতে “বন্ধিমচন্দ্র-দীনবন্ধু” প্রবন্ধে*

* যখন বন্ধিমচন্দ্র নেওড়া মহকুমাতে ছিলেন, (একণে উহাকে কাঁধি মহকুমা বলে,) তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বন্ধিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙলায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড়-বন

কি ঘটনা অবলম্বনে কপালকুণ্ডলা রচিত হইয়াছিল তাহা লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধে আরও দুই একখানির কথা লিখিব। আমাদের খুলনা পিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা, তাঁহাকে আমরা মেজঠাকুরদা

জ্ঞান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সম্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন। ঐ সময়ে তিন চারি দিন বাণীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন, যথা—

“যদি শিশুকাল হইতে যোল বৎসর পর্য্যন্ত কোন জীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই জীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?” যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম। সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গাশ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, “যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে; বন জঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্য দ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে; দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।” পরে ব্যঙ্গ্য ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “কিছুকাল সম্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে, স্বামী পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে, সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সম্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।” ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না—ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টি ছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত; উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসান কালের কথা। ইনি গল্প করিতে ভালবাসিতেন ও গল্প করিতে জানিতেন। আধুনিক কোনও কোনও বিদেগী গল্প-লেখকেরা যেমন নায়ককে মিষ্টার এবং নায়িকাকে মিস্ লিখিয়া থাকেন, এই বর্ষীয়ান তাঁহার নায়ককে মির্জা ও নায়িকাকে বিবী বলিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়-মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন; যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহ বাদসাহের সময় ঘটিয়াছিল তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদসাহের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের স্থায় লোকমুখে কিস্বদস্তিরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মান্দারণের জমীদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে উড়িয়া হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমীদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন, তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল। সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে সম্ভ্রীচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঐ ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তখন বোর্ডিং হয় দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।

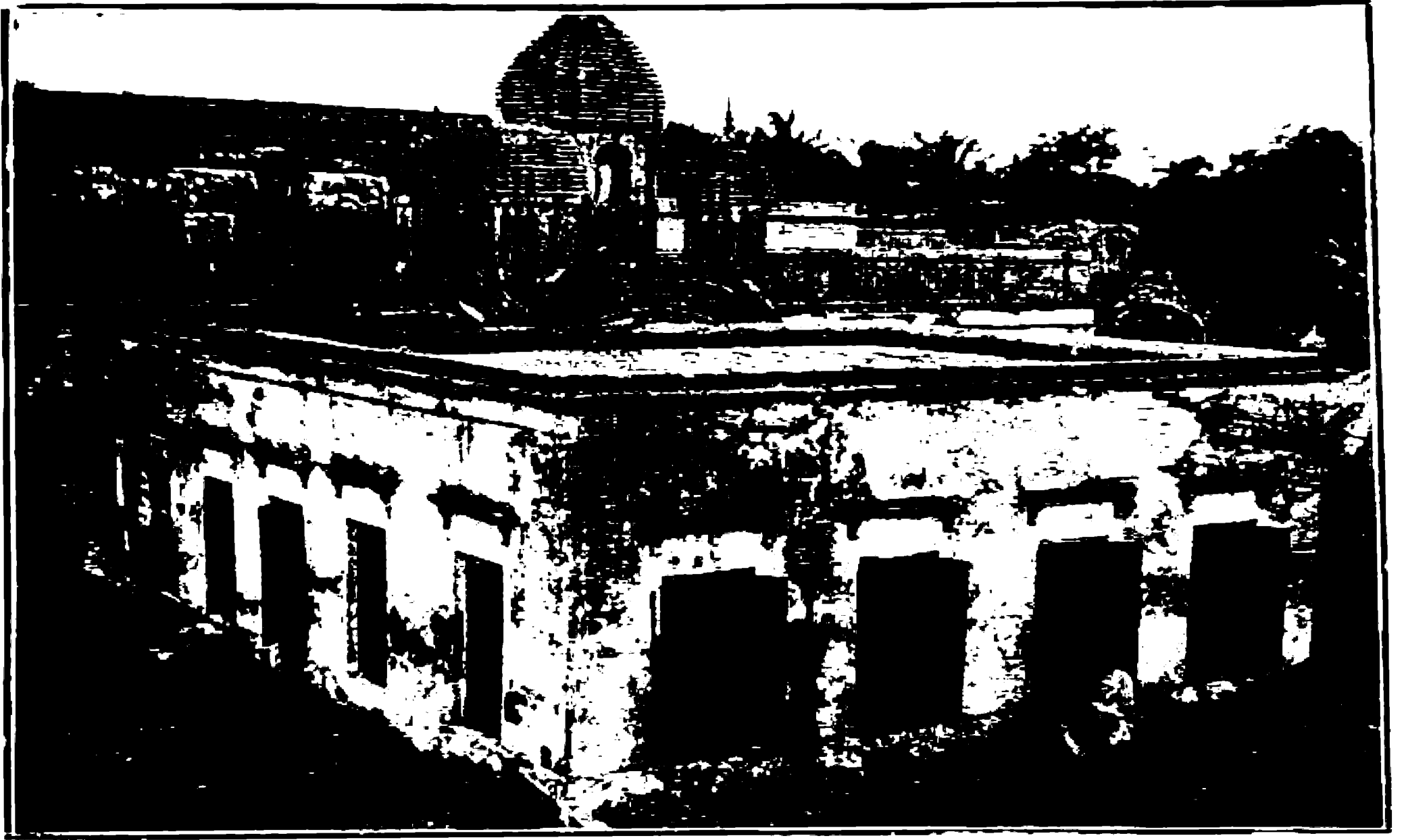
কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ‘মতিবিবী’ একটা গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। কোন দরিদ্র গৃহস্থের বধু ঘোবনারস্তে কুলত্যাগিনী হইয়া কোন ধনাঢ্য যুবরর রক্ষিতা হয়। প্রায় পঁচ ছয় বৎসর পরে হঠাৎ

একদিন তাহার স্বামীকে দেখিল, দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে কান্না আর ধামিল না। কিছুদিন পরে প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তাহার যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল তাহা লইয়া স্বামীদর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিল। এমত স্থানে বাসা লইল যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিতে পায়, প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিত আর কাঁদিত। এইরূপ দিবানিশি কাঁদিত। কুল-ত্যাগিনী হইলেও তাহার প্রতিবেশিনীগণ তাহার দুঃখ শুনিয়া তাহাকে সাহুনা করিতে আসিত। এইরূপে কিছুদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই চির-অভাগিনীর যৌবনেই জীবনাস্ত হইল।

ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবীর কোন সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

বর্ধিয়ান্ খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেভাবে ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা আমার বোধ হয় একজন লেখকেও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক ‘ফসল’, ‘অঙ্কন’, এই সকল কথা সর্বদা আন্দোলন করিতে ভাল-বাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন। পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল তাহা বিবৃত করিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব হইতে অঙ্কন হইল, আর ঐ বৎসর (১১৭৬ সালে) ফসল হইল না; এই কয়বৎসর অঙ্কনার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থের, পরে ধনবান্দেরও আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেননা টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে যে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এই-রূপ অবস্থাতে বঙ্গ নানাপ্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইল, অবশেষে

নারায়ণ



বক্শিমবাবুর বৈঠকখানা—দক্ষিণ-পশ্চিমে রেলওয়ে পুনের উপর হইতে ।

যে সিঁড়ির উপর একজন লোক বসিয়া আছে, তাহার ঠিক নিম্নেই বক্শিমবাবুর একটা ছোট ফুলবাগান ছিল। এখন ইহার চিহ্ন মাত্রও নাই। এই জমিটুকু এখন রেলওয়ে অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ঐ সিঁড়ির উপরে ডানদিকে একটি ঘর এবং বামদিকে একটি ঘর। ডানদিকের ঘরটিতে বক্শিমবাবু একা বসিয়া লেখা পড়া করিতেন, বামদিকের ঘরটিতে দিনের বেলায় শুইতেন।—৫১৬ পৃষ্ঠা।

চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোতা ছিল, তাহারাও অশ্রাব্যে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল, কেননা ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ছিয়াস্তরের মন্থস্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে “আনন্দমঠ” লিখিলেন। “বন্দে মাতরম্” গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎ-বাক্য আছে। কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র মিত্র “সাহিত্যে” উহার সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিয়াছিলেন বটে, তথাপি আমার যতটুকু স্মরণ আছে আমিও লিখিলাম। বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাত matter কম পড়িলে পণ্ডিত-মহাশয় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একটি ‘লোক-রহস্যে’ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। “বন্দে মাতরম্” গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিতমহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় একপাত matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা আজই পাবে।” একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিতমহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে “বন্দে মাতরম্” গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, “বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে,—উহা মন্দ নয় ত—ঐটা দিন না কেন।” সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের হেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, “উহা ভাল কি মন্দ এখন তুমি বুঝিতে পারবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।” এই গীতটির একটা সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। একজন

গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন, পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটি সুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সুরে ভাল লাগিলে লাগিতে পারে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ।

“বৎসরে কি কালের মাপ ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ ।” আজ “ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র” প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাই আমার মনে পড়িতেছে । বৎসরের হিসাবে সে ত সেদিনের কথা—এখনও দশ বৎসর হয় নাই—কাল-সমুদ্রের একটি তরঙ্গও উঠিয়া মিলায় নাই । কিন্তু তাহার পর যেন “লাথ লাথ যুগ” চলিয়া গিয়াছে । যেদিন বাঙ্গালার ঘাটে, বাটে, তটে, মাঠে “বন্দেমাতরম্” গীত শুনা যাইত । পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্বের রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি গীতে বাঙ্গালী, কেবল বাঙ্গালী নহে, সমগ্র ভারতের অধিবাসীরা, মা’র স্বরূপ দেখিয়াছিল । সেই, অবজ্ঞাত না হউক, অল্পপরিচিত গান পবন-সহায় দাবানলের মত দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেদিন আর আজ—ইহার মধ্যে কত যুগ বহিয়া গিয়াছে ! সেদিন জড়ত্বশাপমুক্ত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে উৎসাহ, যে উত্তম, যে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস, যে জাতীয়-জীবন-গঠন-চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেসব কি কেবল বিদ্যুতেরই মত বাঙ্গালীর অদৃষ্টাকাশে দেখা দিয়া অন্ধকার ঘনীভূত করিয়া গিয়াছে ? সে ভাব কি উচ্ছ্বলতায় পরিণতি লাভ করিয়া উৎপীড়নে নিঃশেষ হইয়াছে ? আজ আমার সেইদিনের কথাই মনে পড়িতেছে । তখন সমগ্র বঙ্গ “বন্দেমাতরম্” গানে মুখরিত । “বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ে”র উদাত্তস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবের কীর্তনের সুর পর্য্যন্ত কত সুরে কত জন এই গান গাহিতেছে ! তখন ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া স্বধর্ম্মত্যাগী কর্ম্মযোগী ব্রহ্মবাক্তব স্বজাতিকে সরল ভাবে তাঁহার জাতীয় ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন—‘সন্ধ্যা’ তাঁহার প্রচারবেদী ; আর বিদেশী শিক্ষার মুকুটময়ুখে স্বদেশী ভাবের স্বরূপ নির্ণীত করিয়া ধ্যানযোগী অরবিন্দ ইংরাজী-শিক্ষিত স্বদেশবাসীকে সে ভাব বুঝাইতেছেন—‘বন্দেমাতরম্’ তাঁহার বক্তৃতামণ্ডপ । ব্রহ্মবাক্তব

বঙ্কিম-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ‘বন্দেমাতরম’ পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার কথা হইল। স্থির হইল, একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা বিবৃত হইবে—সে প্রবন্ধ আমি লিখিব; আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন—অরবিন্দ। ইহার কিছুদিন পূর্বে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে “বন্দেমাতরম” মন্ত্রের ঋষি বলিয়াছিলেন। সে কথা আমি অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম। অরবিন্দ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার নাম—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। সংবাদপত্রে অনেক সময় সংরক্ষণযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সংবাদপত্র প্রায় কেহ রাখে না—রাখিতে পারে না। আবার ‘বন্দেমাতরম’ বাঁহারা রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেকে সকারণ বা অকারণ ভয় হেতু তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই আজ এতদিন পরে আবার সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বুঝাইতে লেখনী ধরিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি। তাঁহার ঋষিত্ব কিসে?

অনেকে এই প্রাচীন জাতির প্রনষ্ট গৌরবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, বর্তমানকালে এই অধঃপতিত জাতির মধ্যে আর অমানুষ শক্তিশালী চিন্তার ও সভ্যতার নিয়ন্তা, ঋষির আবির্ভাব সম্ভব নহে। তাঁহাদের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত—এ আক্ষেপ ভিত্তিহীন। যে দেশ সনাতন সে দেশের, যে জাতি সনাতন সে জাতির, আর যে ধর্ম সনাতন সে ধর্মের শক্তি, জ্যোতিঃ ও পূতপ্রভাব কিছুকালের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইতে পারে, কিন্তু চিরতরে অন্তর্হিত, অন্তমিত, অদৃশ্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষ বহু বীরের, বহু ঋষির ও বহু সাধু পুরুষের আবির্ভাবে পবিত্র হইয়াছে; ভারতবর্ষ তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র—লীলাভূমি। এই দেশেই তাঁহাদের আবির্ভাব স্বাভাবিক, যুগে যুগে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন। বর্তমান যুগে বাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে “বন্দেমাতরম” মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিত্ব কে সন্দেহ করিতে পারে?

ঋষিতে ও সাধুতে প্রভেদ স্বপ্রকাশ। ঋষির জীবনে অসাধারণ

পূতাচার বা চরিত্রে আদর্শ-সৌন্দর্য্য না-ও লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহার গৌরব তাঁহার জীবনে নহে; পরন্তু তিনি যে ভাব অভিব্যক্ত করেন তাহার সেই অভিব্যক্তিতে। কোন জাতিকে বা সমগ্র মানব-সমাজকে যে কথা জানাইতে হয়—ভগবান তাহা ঋষিমুখে ব্যক্ত করান। মানবকে যদি কোন অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখাইতে হয়, তবে ঈশ্বরানুগৃহীত ঋষির নয়নে সে দৃশ্য প্রতিভাত হয়। তিনি তাহা দেখিয়া জগতে সে সংবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার কথায় অবিশ্বাসী বিশ্বাস না করিয়া পারে না, সংশয়ান্দোলিত হৃদয় স্থির হয়, সন্দেহের অন্ধকার দূর হয়। তাই জগতে অঘটন সংঘটিত হয়। যে কথা ব্যক্ত করাই তাঁহার বিধিনির্দিষ্ট কার্য্য, সেই কথাই তাঁহার মন্ত্র, —তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি।

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সমগ্রদেশে সম্পূজিত কেন? তিনি আমাদের কোন মন্ত্র দিয়াছেন—কোনরূপ দেখাইয়াছেন? তিনি কবি, তিনি সাহিত্যিক, তিনি কল্পনালোকে কমনীয় মূর্ত্তির রচনায় সিদ্ধ-হস্ত। কিন্তু কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার গৌরব যত অধিকই হউক না কেন, তাহা তাঁহারই ঋষি-গৌরবের নিকট ন্যূন—“শুষ্ক বদরীর মত তুচ্ছ”। সাহিত্য-সমালোচক শিল্পের মানদণ্ডে মাপিয়া তাঁহার ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ প্রভৃতির স্থান, ‘দেবীচৌধুরাণী’, ‘আনন্দমঠ’, ‘কৃষ্ণচরিত্র’, ‘ধর্ম্মতত্ত্ব’ প্রভৃতির স্থান অপেক্ষা উচ্চে নির্দিষ্ট করিবেন। কিন্তু ‘কপালকুণ্ডলা’দির বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক ও কবি, আর ‘দেবীচৌধুরাণী’ প্রভৃতির বঙ্কিম-চন্দ্র ঋষি ও জাতিসংগঠক। কবিকীর্ত্তি দুর্লভ—ঋষিকীর্ত্তি কল্পাস্ত-স্থায়িনী।

কবি ও সাহিত্যিকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতেও জাতীয় কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছিল। সত্য বটে তাঁহার সাহিত্যিক কার্য্যের ফল মুখ্যভাবে বাঙ্গালীই সম্বোগ করিয়াছিল; কিন্তু গৌণভাবে জগতের অন্যান্য প্রদেশও তাহাতে বঞ্চিত হয় নাই।

কারণ, জাতীয় জীবন-গঠনে বাঙ্গালাই ভারতের পথপ্রদর্শক। কোন জাতি যখন তাহার স্বতন্ত্র জাতীয় স্বভাৱ অনুভব করে, তখন তাহার হৃদয় যে নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন কল্পনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সে-সকলের প্রকাশোপযোগী ভাষা না পাইলে সে জাতির উন্নতির গতি প্রহত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে সেইরূপ ভাষা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম দানের মূল্য সামান্য নহে। বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধি নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যিক-গণ তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের ভাষা রক্ষণশীল, গতিহীন বাঙ্গালার ভাবপ্রকাশেরই উপযোগী ছিল। পরিবর্তিত ও উন্নতির পথারূঢ় জাতির ভাবপ্রকাশের জন্য পরিবর্তিত উন্নততর ভাষার প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে তাহার অভাব অনুভব করিতে দেন নাট; প্রয়োজনের পূর্বে তিনি বাঙ্গালীকে সে ভাষা যোগাইয়াছেন। তিনি পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত ভাষার সহিত জনসাধারণের চলিত ভাষা মিশ্রিত করিয়াছেন বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত বিস্তারবিহীন নিয়ম-নিগড়বদ্ধ ভাষায় নূতন বাঙ্গালার বিচিত্র, সুন্দর, সরস ও সতেজ ভাব বিকশিত হইতে পারিত না। আধুনিক বাঙ্গালীর ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষার প্রয়োজন হইয়াছিল, সে ভাষার সংস্কৃতির শক্তি, গাভীর্ঘ্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সহজবোধ্য সাধারণ ভাষার তেজ ও বৈচিত্র্য মিশ্রিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই অভাব পূর্ব্বেই বুঝিয়া বাঙ্গালীকে তাহার নবভাব-প্রকাশোপযোগী ভাষা দিয়াছিলেন। আজ যে বাঙ্গলা ভাষা হর্ষে উদ্বেলিত, উৎসাহে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, ক্রোধে বিকম্পিত, ঘৃণায় সঙ্কুচিত, করুণায় বিগলিত হয়, সে বঙ্গভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সর্ব্বাঙ্গে দেশের সাহিত্যিক অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তেমনই সর্ব্বাঙ্গে দেশের রাজনীতিক অভাবও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন দেশে রাজনীতিক আন্দোলন যে প্রণালীতে

পরিচালিত হইত তাহার অনুপযোগীতা এদেশের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ‘লোকরহস্য’ ও ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ তিনি বিক্রপের কশাঘাতে লোককে ইহা বুঝাইয়াছিলেন। বিক্রপ প্রতিভাবান লোকদিগের অন্ত্র হইলে প্রতিপক্ষ পরাজয়ে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব সংহারে নহে—সৃষ্টিতে, বিসর্জনে নহে—প্রতিষ্ঠায়। সব্যসার্চী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন অযোগ্যকে নির্দয়ভাবে উন্মূলিত করিয়া যোগ্যকে সাদরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রেও তেমনই অযোগ্যকে বিক্রপে বিচ্ছিন্ন করিয়া যোগ্যকে সাহিত্যের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রেম স্বার্থসংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না; ত্যাগে তাহার প্রতিষ্ঠা—সাধনায় তাহার বিকাশ। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে ভয়-ভীত শ্রুতি ত্যাগ করিয়া গান্ধীর্ষ্য-গৌরবান্বিত সিংহবৃদ্ধি অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার মা’র হস্তে ভণ্ডের ভিক্ষাভাণ্ডও নাই, আর বিদ্রোহীর আত্মবিস্মৃত তরবারি নাই। তিনি ‘আনন্দমঠে’ ও ‘দেবীচৌধুরাণী’তে বুঝাইয়াছেন শারীরিক বলের সাধনা করিতে হইবে; কিন্তু নৈতিক বল—সংযম ব্যতীত শারীরিক বল স্থায়ীকার্য্য করিতে পারে না। ‘সীতারামে’ তিনি দেখাইয়াছেন, অনাচারের স্পর্শে শারীরিক বলের দুর্গচ্ছাড়া বজ্রাহত গিরিশিখরের মত ধূলিবিলুপ্তি হয়; উচ্ছৃঙ্খলতা সাধনার অন্তরায়, সিদ্ধির বৈরী। তিনি বুঝাইয়াছেন, নৈতিক শক্তিসাধনার প্রথম সোপান ত্যাগ, কর্ম্মে আত্মসমর্পণ। তাই তাঁহার “সন্তানগণ” সন্ন্যাসী, মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনী-দারা-সুত সর্ব-ত্যাগী। তাহারা সংসারত্যাগী ও ইন্দ্রিয়জয়ী। তাহাদের ব্রতভঙ্গের, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত—“জ্বলন্তু চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ।” যে ধনজন, দারাসুত, এসকলকে ভালবাসে, যে আপনাকে ভালবাসে, তাহার স্বদেশভক্তি অসম্পূর্ণ।

এ সাধনায় “জীবন তুচ্ছ” ; সাধককে দিতে হইবে—“ভক্তি ।” তাঁহার “সন্তানগণ” দুর্দান্ত দম্ভা নহে ; নিষ্ঠুর নরহস্তা নহে ; তাঁহারা সন্ন্যাসী ও সাধক । বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, নৈতিক শক্তিসাধনার দ্বিতীয় সোপান সংঘম ও পদ্ধতিবদ্ধতা । দেবীর কঠোর শিক্ষায়, সন্তান-গণের পরুষ প্রতিজ্ঞায় এবং ‘দেবীচৌধুরাণী’ ও ‘আনন্দমঠ’ পুস্তকদ্বয়ে বর্ণিত পদ্ধতিবদ্ধ কার্যে তিনি ইহাই বুঝাইয়াছেন । নৈতিক শক্তি-সাধনার তৃতীয় সোপান স্বদেশপ্রেমে, ধর্ম্যভাবে সমাজ-সংস্কার । বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে স্বদেশপ্রেমধর্ম্য শিক্ষা দিয়াছেন । ‘দেবী-চৌধুরাণী’তে ইহার আভাস—‘আনন্দমঠে’ ইহার বিকাশ । ‘ধর্ম্যতত্ত্বে’ কর্ম্যযোগের বিচিত্র ভাব বিবৃত । ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ মূর্ত্ত কর্ম্যযোগের চিত্র চিত্রিত । স্বদেশপ্রেমে এই কর্ম্যযোগের পূর্ণ বিকাশ । “বন্দে মাতরম্” গীতে এই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র নব্য-ভারতের রাজনীতিক গুরু । তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমধর্ম্যে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য তাঁহার স্বদেশবাসীকে “নবীন-কিরণে জ্যোতির্ময়ী” মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শন । স্বদেশপ্রেম যত দিন কেবল বুদ্ধি-গ্রাহ্য, তত দিন তাহা শক্তিহীন ; যখন হৃদয়ে তাহার স্বরূপ প্রতি-ভাত হয়, তখনই তাহা মানুষকে চালিত করে, তখনই মানুষ তাহার জগৎ জগতে আর সব তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখে । যতদিন মাতৃভূমি পর্ব্বত-কিরীটিনী, সাগর-সুশোভিতা ভূমিখণ্ড মাত্র, যতদিন দেশবাসী কেবল মনুষ্যমণ্ডলী মাত্র, ততদিন স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না । যখন যুগ্ময়ী মা চিন্ময়ীরূপে দেখা দেন, তখন সেই মাতৃ-মূর্ত্তির দর্শনপুণ্যে মানবের জাভ্য-দ্বিধা-সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থাক্ততা অরু-ণোদয়ে রজনীর অন্ধকারের মত দূর হয় । বঙ্কিম বাঙ্গালীকে ও ভারত-বাসীকে সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন । তাই যেদিন বাঙ্গালী জাগিল, সেদিন একজনের মুখে “বন্দে মাতরম্” মন্ত্র উচ্চারিত হইতে না হইতে সমগ্র ভারতবর্ষ সেই মন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিল । এই মন্ত্রে ভারতবাসীর ভাব-প্রকাশের ভাষা পাইল ।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এ জাগরণের বহু পূর্বে মাতৃমূর্তি দেখিয়াছিলেন। “কমলাকান্ত”রূপে তিনি মা’র এই মূর্তি দেখিয়াছেন। “এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা” দেখিয়া, কাঁদিয়া বাঙ্গালীকে বলিয়াছিলেন—“এস, ভাই সকল ! আমরা এই অন্ধকার কাল-স্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে এই প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি ? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল ! চল ! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সমুদ্রগ করি—এই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি ? না হয় ডুবিব ; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ?” সেই মূর্তিই “সন্তানগণে”র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। “দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী, শত্রু-বিমর্দনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী ; দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী ; বামে বাণী বিজ্ঞানবিজ্ঞানদায়িনী ; সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয় ; কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।”

এই মূর্তি দেখিয়াই তিনি যুক্ত করে উর্দ্ধমুখে ডাকিয়াছিলেন—

“সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোস্তুতে ॥”

আর এই মূর্তি দেখিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে ভারতবাসী গাহিয়াছে—

“বন্দে মাতরম্।”

এই নবজাগরণ কিরূপে আসিবে তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। “সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক

দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যিক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই, শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোক-শিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু। ইংরাজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তম্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তম্বে বুদ্ধিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম-প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা-আপনি পুনরুদ্ধার হইবে।”

বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে। প্রতীচ্য শিক্ষার বহির্বিষয়ক জ্ঞানের তড়িৎসঞ্চারে প্রাচীর জড়ত্ব দূর হইয়াছে। ভগীরথানীত গঙ্গার স্পর্শে যেমন সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল, ইংরাজের আনীত বহির্বিষয়ক জ্ঞানে তেমনই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। দেশ নবজীবনে জাগ্রত হইয়াছিল—নবায়ু-কিরণে চক্ষু মেলিয়াছিল। লর্ড মিণ্টোর মত যাহারা ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন, সমগ্র প্রাচী নবভাবচূড় জাগরণ-তরঙ্গে প্লাবিত হইতেছে; তাহাতে প্রাচীর প্রাচীন সংস্কার বিধৌত হইয়া যাইতেছে। জাপানে, চীনে, ভারতে, —সমগ্র প্রাচীতে এই জাগরণের লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে। এ জাগরণ প্রতীচীর সভ্যতার সহিত পরিচয়-প্রসূত, প্রতীচ্য শিক্ষার ফল, বহির্বিষয়ক জ্ঞানলাভের অবশ্যস্বাভাবী পরিণাম।

দেশে এই নবভাবের আবির্ভাব যে অবশ্যস্বাভাবী, ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। মা যে মূর্তিতে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন, একদিন যে মা'র সেই মূর্তি তাঁহার সদেশবাসী সকলেই প্রত্যক্ষ করিবে তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। সমগ্র দেশের জাগরণের পূর্বেও কেহ কেহ ভিমিরাবৃত প্রাচীর ভোরণে অরুণকিরণ-

বিকাশ-সূচনা লক্ষ্য করিতেন। কাহারও কাহারও শ্রবণে বিহঙ্গের প্রভাতী সঙ্গীতে দিবসের আহ্বান শ্রুত হইত। মনে আছে, কলিকাতায় ক্রীযুত ওয়াচার সভাপতিত্বে বিডন উচ্চানে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গীত এই “বন্দে মাতরম্” গান শুনিয়া একজন মদ্রদেশাগত প্রতিনিধির নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্ত্ররচনাকালেই দেশের জাগরণের অবশ্য-স্তাবিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই গান উপস্থাস্থানির পূর্বের রচিত হয়। তিনি যখন এই গান রচনা করিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করিতেছিলেন তখন ‘বঙ্গদর্শনে’র কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে গান রচনা না করিয়া উপস্থাস্থ রচনা করিতে বলেন,—গানে ‘বঙ্গদর্শনে’র ক্ষুধা মিটিবে না। শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—যদি পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া থাক তবে তখন এ গানের মর্ম্ম বুঝিবে। পঞ্চবিংশ বর্ষের ব্যবধানে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় ভারতের নব-জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, সেই “বন্দে মাতরম্” মন্ত্রে ভারতবর্ষ মুখরিত। সুদূর মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধি-তোরণে বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মন্ত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে—

“বন্দে মাতরম্।”

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রজনী ।

[সমালোচনা ।]

আমি বহুমুখশ্রেণীর “রজনী” সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব । রজনী উপন্যাসে রজনীর চরিত্রের কতটা উন্মেষ হইয়াছে, কেবল তাহারই আলোচনা করিব । পূর্ণ উপন্যাস গ্রন্থখানা আমার আলোচ্য বিষয় নহে । রজনীর চরিত্র কিরূপে ফুটিয়াছে, কিরূপেই বা তাহা আমাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে, তাহারই যথাসম্ভব বিচারে প্রবৃত্ত হইব । বুঝিতে চেষ্টা করিব,—নারীর অন্ধত্ব কি, অন্ধার পুষ্পসংসর্গ কি, নয়নহীনা পুষ্পনারীর প্রেমসঞ্চার কেমন, রূপোন্মাদ কাহাকে বলে, বিরহীর বিরহ-বেদনা কিরূপ, বিরহ-বিধুরার নিমগ্নজন, উদ্ধার, মিলন কেমনে হয় ! সামর্থ্যানুসারে কেবলই এ সকল দেখিব, বুঝিব নহে, কবি তাঁহার কাব্যে যে অপূর্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রসের সাগরে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিয়া রসা-স্বাদনে মগ্ন হইবার চেষ্টা করিব ।

রজনীর বিষয় আলোচনা করিতে যাইলে সর্বপ্রথমেই দু’একটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে । বলা বাহুল্য, রজনীই ‘রজনী’ গ্রন্থের নায়িকা, রজনীর চরিত্রাঙ্কনই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য, অন্যান্য চিত্র ইহার চরিত্র ফুটাইবার জন্তই চিত্রিত করা হইয়াছে এবং উহার চরিত্রের সমধিক উৎকর্ষের নিমিত্তই অন্যান্য চরিত্র পরিস্ফুটনের প্রয়াস । কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যে সকল নায়িকা-চিত্র দেখিতে পাই, তাহার সহিত রজনীর অঙ্গগত পার্থক্য আছে । সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রায়ই অন্ধ নায়িকা দেখা যায় না ; আদিরসের গ্রন্থে যে রসসৃষ্টির জন্ত নায়িকা-চরিত্রের অবতারণা করা হয় তাহা অন্ধা দ্বারা ভালরূপ ফুটিতে পারে না ; সেই জন্তই কবিরা তাঁহাদের নায়িকাদিগকে প্রায় অন্ধ করিয়া

সৃষ্টি করেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা জন্মাক্ষা। আলো কি, সে জানে না, অন্ধকার কি, সে বোঝে না; যে সংসারে সে বাস করে, তাহা সে কখনই দেখে নাই, ইহজীবনে দেখিবে না; যে সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাহার জীবন অতিবাহিত হয়, সে সকল সম্বন্ধের পরিচয় দৃষ্টির সাহায্যে তাহার লাভ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় বলিয়াছেন, “Last Days of Pompeii”র নিডিয়া স্বরণে রজনী রচিত হয়। নিডিয়া অন্ধা স্মৃতরাং রজনীও অন্ধা। ইহার কারণও তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন। “যে সকল মানসিক এবং নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ নায়িকা দ্বারাই বিশদরূপে ফুটিতে পারিবে বলিয়া রজনীকে ঐরূপ করা হইয়াছে।” ঐ সকল তত্ত্ব ভাল ফুটিয়াছে কি না, আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। কিন্তু নিডিয়ার ম্যায় রজনীও ফুলওয়ালী কেন? নিডিয়ার ম্যায় তাহাকেও পুষ্পনারী করিয়া সৃষ্টি করা হইল কেন? বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। স্মৃতরাং ইহা আমা-দিগকেই বুঝিতে হইবে। কিঞ্চিৎ মনোযোগ-সহকারে ঘাঁহারা প্রতিভার গতি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রতিভা কাহারো অন্ধ অনুকরণ করে না। সে ঘাহা বুঝে, তাহাই সকলকে বুঝায়, ঘাহা বুঝে না বা জানে না, অশ্বের মুখে তাহা শুনিয়া কখনো অপরকে তাহা বুঝাইতে চায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিচার বহুপূর্বেই হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে সম্বন্ধে কিছু বলা ধ্বংস। স্মৃতরাং লিটন নিডিয়াকে ফুলওয়ালী করিয়াছেন বলিয়াই যে বঙ্কিমচন্দ্র রজনীকে ফুলওয়ালী করিলেন, এমন মোটা অনুকরণ বঙ্কিমচন্দ্র কখনই সম্ভবে না।

বিশেষতঃ নিডিয়ার ধরণের ফুলওয়ালী বলিয়া কোনো জীব আমাদের দেশে নাই। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দেবতার অর্চনাতেই পুষ্প ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ফুল দিয়া দেবতার পূজা করে, এবং পূজাস্থে তাহা দেবতার আশীর্ব্বাদরূপে মস্তকে ধারণ করে। বস্তুতঃ এদেশে পুষ্প

প্রধানতঃ আত্ম-প্রসাদার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আত্মভোগার্থ নহে। রাজার গৃহে কিম্বা ধনীর আবাসে পুষ্প বিলাসের উপানান হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও দেশের জনসাধারণ ফুলের উপভোগ সদাসর্বদা করে না। রোমে পুষ্প-সজ্জা সাধারণ ভাবেই ছিল। সেইজন্ম সেখানে ফুলওয়ালীও ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্কা দরিদ্রা, নিঃসহায়া বালিকারা সে দেশের পথে পথে ফুলের বুড়ি মাথায় বহিয়া নাগরিকগণের নিকট ফুল বিক্রয় করিত। নিডিয়াও কখন বা প্রাসাদ-দ্বারে ঘাইয়া, কদা-চিৎ বা প্রমোদকানানের উপকণ্ঠে উপবেশন করিয়া, স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাজি সাজাইয়া বিক্রয় করিত। কিন্তু এদেশে কিশোরী বা যুবতী ফুলবালা ছিল না; বর্ষীয়সী প্রোঢ়াই মালিনীর কাজ করিত। সে মালিনী প্রধানতঃ পূজার ফুলই যোগাইত। বিবাহে বা উৎসবে লোকে পুষ্পসজ্জা করিত বটে, সে কাজ মালাকারে সাধন করিত। বন্ধিমের মনীষা এই বৈষম্যটুকু ধরিয়াছিল। সেই জন্মই তিনি রজ-নৌকে নিডিয়ার স্থায় ফুলওয়ালী করেন নাই। ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ম তিনি রজনীর দরিদ্র পিতাকে মালী সাজাইয়াছেন। রজনী গৃহে বসিয়াই ফুল দিয়া মালা গাঁথিত, রাজকৃষ্ণ তাহা পথে পথে বিক্রয় করিত।

ইহা না করিলে বন্ধিমচন্দ্র রজনীকে বাঙ্গালার হিসাবে স্বাভাবিক করিয়া, তাহাকে ফুলের সংসর্গে আনিতে পারেন না। কিন্তু তিনি ইহা করিলেন কেন? রজনীকে ফুলওয়ালী না করিলেই বা কি ক্ষতি হইত? আমরা ইহার একমাত্র সম্ভব উত্তর খুঁজিয়া পাই। লিটনও তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং বন্ধিমচন্দ্রও তাহা জানিয়াছিলেন।

আমাদিগের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে; শাস্ত্রে ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। এই সকল ইন্দ্রিয়ই বাহিরের বস্তু চিনে বা জানে। বাহিরের সকল পদার্থের পরিচয় এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই সংগ্রহ করিয়া থাকে। চক্ষু রূপ দেখে, কর্ণ শব্দ শোনে, নাসিকা গন্ধের আণ গ্রহণ করে, জিহ্বা নানা রসাস্বাদনে নিমুক্ত থাকে এবং ত্বক কোমল ও কঠোর

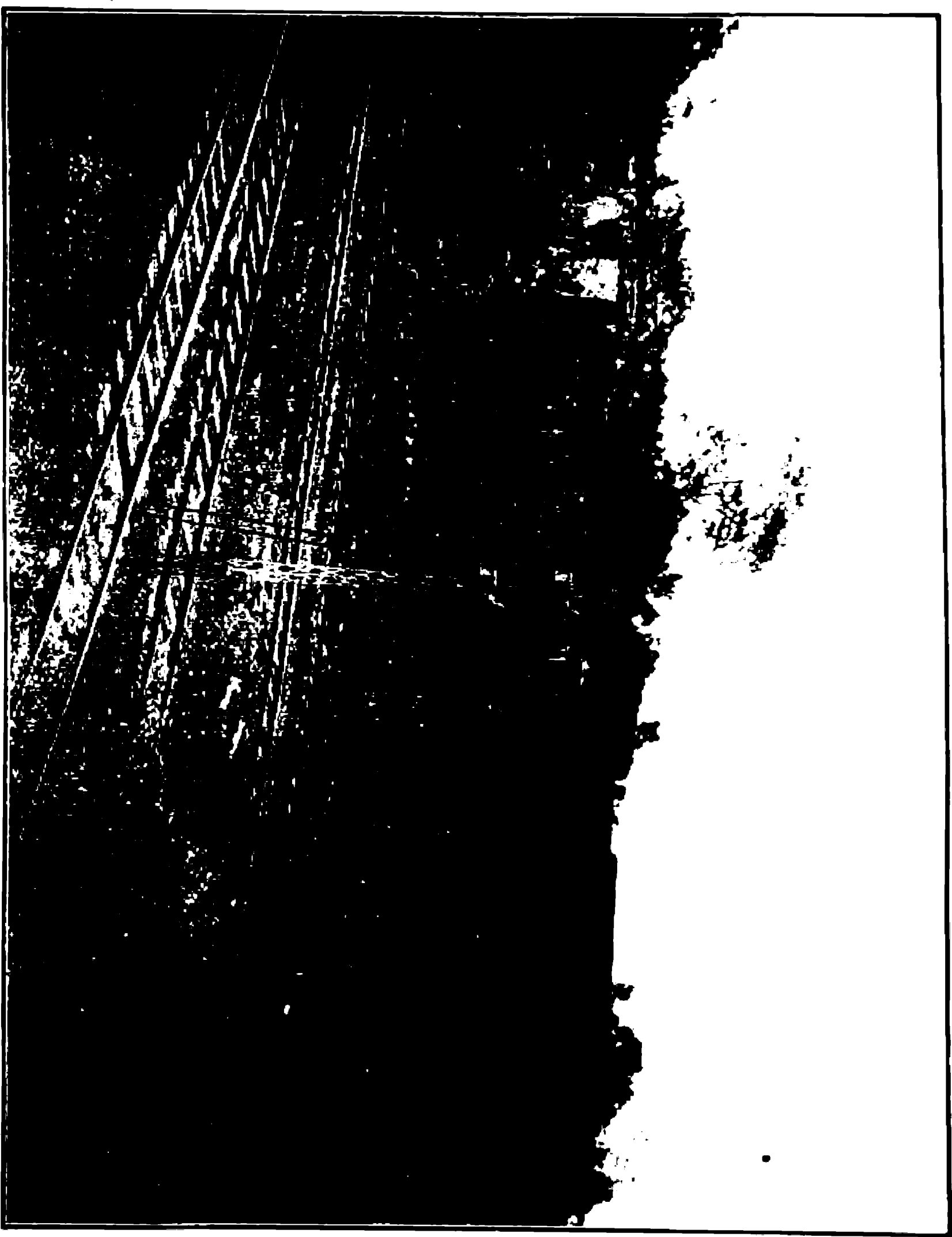
স্পর্শ অনুভব করে। বাহ্য পদার্থের সহিত এই সকল ইন্দ্রিয়ের যখন সম্পর্ক ঘটে, তখনই ইহার ক্ষুধা পায়। এই শারীরিক ক্ষুধার জন্ম অন্তঃকরণে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই দুঃখ বা সুখ। অনুভূতির এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই শ্রেষ্ঠ। কারণ চোখ যত জিনিস দেখিতে পায়, হাত তত জিনিস স্পর্শ করিতে বা নাসিকা তত গন্ধ আশ্রয় করিতে বা কণ্ঠ তত শব্দ শুনিতে বা জিহ্বা তত বস্তু আস্বাদন করিতে পায় না। এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তরে যে পরিমাণ সুখসংস্কার সম্ভব, অন্য কোনো ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা সম্ভবপর নয়। ইহার অভাব লোককে যত কষ্ট দেয়, অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের অভাব তত দেয় না। এই জন্মই অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষা করিবার সময় কাতর ভাবে বলে,—“যার চোখ নাই, তার কিছু নাই।” রজনীর এই চোখ ছিল না। তাহার সুখাগমের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ কি জানি কি অভিশাপে চিরদিনের জন্ম রুদ্ধ ছিল। সাধারণ নারী বা পুরুষ যে পরিমাণ সুখবোধ করিতে পারে এবং করে, রজনীর পক্ষে তাহা সাধ্য ছিল না। আর এই সুখবোধই আমাদের অন্তরের বৃত্তিসমূহকে বিকশিত করিয়া তুলে। রজনী অন্ধা; তাহার সুখও সেইজন্ম সাধারণের সুখ অপেক্ষা অনেক কম হইবার কথা। এই সুখবোধ যদি সত্যসত্যই সাধারণ নরনারী অপেক্ষা অনেক কমই হয়, তাহা হইলে সাধারণ নারীর ন্যায় তাহার সকল মনোবৃত্তিরও বিকাশ ঘটিতে পারে না। সুতরাং চক্ষুহীনতার জন্ম যে পরিমাণ সুখবোধ কম হয়, তাহার কতক পূরণ করিলে অন্য রমণীর ন্যায় অন্ধার অন্তরের বৃত্তিসমূহ ফুটিয়া উঠিতে পারে। এই পূরণ কেবল পুষ্প দ্বারাই সম্ভব। কেহ যদি বলেন, রজনীর একটি ইন্দ্রিয় নাই—তাহার অবশিষ্ট চারি ইন্দ্রিয়েরই চরিতার্থতা সাধন কি ফুলের দ্বারা সম্ভব? আমরা বলিব, না। কণ্ঠ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক,—এই চারিটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পুষ্পের দ্বারা কেবল চক্ষু নাসিকা এবং স্পর্শ,—এই তিন ইন্দ্রিয়েরই চরিতার্থতা সাধন করা যাইতে পারে। জিহ্বার তৃপ্তিসাধন

পক্ষে জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক ; কিন্তু কৰ্ণ আছে । কৰ্ণ মিষ্ট স্বর শুনতে ভালবাসে । সুতরাং তাহাকে বীণাবাদিনী করা যাইতে পারিত । কারণ বীণার স্বরের শ্রায় মিষ্ট স্বর আর নাই । কিন্তু কোনো দরিদ্র গৃহস্থ কণ্ঠা বীণা বাজাইয়া সময় কাটাইতে পারে না । যাহারা দিন আনে, দিন খায়, লবঙ্গের অর্থসাহায্য ব্যতিরেকে জীবিকানির্ব্বাহ যাহাদিগের ভার হইয়া উঠে, এমন বাড়ীর ভদ্র বাঙ্গালীর মেয়ে কখনো বাণাবাদিনী হইতে পারে না । রজনীর পিতা পুষ্পব্যবসায়ী ; আর পুষ্পব্যবসায়ীর কণ্ঠা যে পুষ্প-সংসর্গে আসিবে, ইহা কিছু বেশী বা বিস্ময়কর কথা নহে ।

দৃষ্টির যে একটা মোদিনী শক্তি আছে, তাহা হইতে কেহ বঞ্চিত হইলে, স্পর্শের দ্বারা সে আহলাদের পূরণ করিতে হয় । যাহারা জন্মান্ত তাহারা হাত বুলাইয়া সামগ্রীর পরিচয় গ্রহণ করে । যে অন্ধ কোমল পুষ্পরাশিই কেবল স্পর্শ করে, পুষ্পের মধুর আশ্রাণে সদা পরিতৃপ্ত হয়, সে অন্ধের মনে কোমল ভাবের সঞ্চয় অধিক হয় । লিটনের নিডিয়া যেমন কোমল স্বভাবের পরিচয় দিয়াছে, বন্ধিমের রজনীও তদধিক কোমলা,—ভাবে ও রসে শিরীষ-পেলবা । এই অপূর্ব্ব কোমলতাটুকুতে স্বাভাবিকতার ভাব মাখাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই বন্ধিমচন্দ্র রজনীকে গোড়ায় ফুলনারী করিয়া সাজাইয়াছেন । তাহার রজনী সত্যই রজনীগন্ধার তুল্য নিরাবিল স্বচ্ছ—অমল ধবল, এবং অতিশয় কোমল । তাহাতে কপটতার রূঢ়তার লেশমাত্র নাই । সে পরের দুঃখে নিজের সুখ ভুলিতে পারে, পরস্তু কদাচ সত্যের অপলাপ করে না ।

কাহারো সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, প্রথমে তাহার উক্তিই গ্রহণ করা শ্রেষ্ঠ উপায় । পরে সে উক্তির যথার্থতা ও স্বাভাবিকতার বিচার করিয়া তাহার বিষয় আলোচনা করিতে হয় । রজনী আপনার পরিচয় কিরূপ দিয়াছে, সর্ব্বপ্রথম আমরা তাহাই দেখিব । গ্রন্থারম্ভে আত্মকথা কহিতে গিয়া রজনী বলিয়াছে, “আমি বড়

নায়ায়ণ



কঁটালাপাডায় নক্ষত্রাবূর পৌত্রিক নাটি ।

(বর্তমান অবস্থা—কেন্দ্রের ধার হইতে)

দুঃখী,—আমার দুঃখের কথা কে শুনিবে ?” কিন্তু দুঃখ কি ? এই প্রশ্নেই একস্থলে আছে. অভাববিশেষই দুঃখ । রজনীর অভাব কিসের ? তাহার অর্থের অভাব, মানুষের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের অভাব । সুতরাং সে দুঃখী, সন্দেহ নাই । ইহাই মোটা কথা ; স্থূল বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায় । কিন্তু আমরা আর একটু সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব । অভাববিশেষই দুঃখ সত্য ; কিন্তু অভাব যতক্ষণ না অনুভূত হয়, ততক্ষণ দুঃখও অনুভব করা যায় না । কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, অভাব কি অনুভব না করিয়া থাকে যায় ? বরং কোনো বস্তুর সম্ভাব সকল সময় ভালরূপে অনুভূত না হইতে পারে, সুখের অবস্থা মানুষ সকল সময় ভাল করিয়া জানিতে না পারে, কিন্তু দুঃখের অবস্থা ত জানে, অভাব ত অনুভূত হয় । কারণ দুঃখ সুখ হইতে তীব্র । দুঃখে মানুষকে পাগল করে, সুখে পাগল এমন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায় । আমরা ইহা মানি, স্বীকার করি । কিন্তু দুঃখেরও ভাগবিভাগ আছে । যে দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী, সে দুঃখের তীব্রতা ক্রমে কমিয়া আসে । মানুষ সেই দুঃখের অবস্থায় ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন আর তাহা তাহার নিকট বেশী কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হয় না । অভ্যাসের ও কতকটা বিস্মৃতির শীতল প্রলেপ ক্রমে তাহার দুঃখের ক্ষতকে ভরাট করিয়া তুলে ; কিন্তু সেই ক্ষততে যখন খোঁচা লাগে, তখনই আবার তাহা দগ্ধগে হইয়া নূতন ঘায়ের মত তীব্র হয় । এস্থলে তাহার ক্ষতই তাহার দুঃখের কারণ নহে, সেই খোঁচাই তাহার কষ্টের মূল । যখন কোনো দরিদ্রা রমণী,— ছিন্ন বস্ত্র যাহার পরিধান, জীর্ণ কুটীর যাহার আশ্রয়, সামান্য শাকসবজি যাহার আহার, তুচ্ছ ভিক্ষা যাহার উপজীবিকা—এমন রমণী যখন তাহার সম্ভ্রান্তকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুপন করে, তখন কি তাহার দারিদ্র্য তাহাকে দুঃখ দিতে পারে ? কিন্তু সেই সম্ভ্রান্ত—অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুষ্পলী,—সেই সম্ভ্রান্ত যখন খাত্তের অভাবে শীর্ণ হইতে থাকে এক বস্ত্রের অভাবে মলিন মুখে মার কাছে আসিয়া উপ-

স্থিত হয়, তখনই দারিদ্র্য কি, সে তাহা বুঝিতে পারে; তখনই দারিদ্র্য-রাক্ষসী বিকট মূর্তি ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। এইখানে দারিদ্র্যই তাহার দুঃখের কারণ নহে, দারিদ্র্য জগৎ পুস্ত্রের শৌৰ্ণতা এবং মলিনতাই তাহার দুঃখের কারণ।

রজনী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। রজনী সপ্তদশ বৎসর এই অবস্থায় কাটাইয়াছে। সপ্তদশ বর্ষ সে অন্ধা এবং দারিদ্র্য; সুতরাং এতকাল পরে আপনার দুঃখ ভাবিয়া সে আকুল হইবে কেন? তাহার পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে, সে যে বিশেষ মনঃকষ্টে ছিল, এমন কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং তাহার সহসা এরূপ উত্তির অশ্রু কারণ আছে। আমরা ক্রমে তাহা দেখিব।

কেহ কেহ বলেন যে মানবজীবনের গতি নাকি বড় সূক্ষ্ম। সুতরাং কোনো মানুষের জীবনের গতি জানিতে হইলে, তাহার পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সম্যক বিচার করিতে হয়। তাহার যৌবন জানিতে হইলে, তাহার শৈশব জানিতে হয়, প্রৌঢ় জানিতে হইলে, যৌবন জানিতে হয়। এরূপ না করিলে তাহার জীবনের মূল সূত্রটি মধ্যে মধ্যে হারাইয়া যায়। মহাজনপদাশ্রয় করিয়া আমরাও রজনীর শৈশবের কিছু আলোচনা করিব।

বন্ধিমচন্দ্র রজনীর শৈশবের একটি মনোরম চিত্র আমাদের কাছে দিয়াছেন। তাহাতে অন্ধের মনোভাব সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। সে পিতার মুখে মনুমেন্টের কথা শুনিয়া তাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিল। বামাচরণের কান্না থামাইতে না পারিয়া তাহাকেও 'তুই আমার বর হবি' বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিল। এই ইন্দ্রিতেই তাহার শৈশব খুব ভাল করিয়া ফুটিয়াছে। রজনীর সতের বৎসর এইরূপেই কাটিল।

এই স্থলে একটা কথা আমাদের মনে আসে। আজকালকার হিন্দুঘরের সতের বৎসরের অনূঢ়া কন্যা—কিছু উদ্ভট বলিয়া প্রথমে বোধ হয়। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্রই ইহার কারণ একস্থলে দিয়াছেন।

রজনী দরিদ্র, অন্ধ এবং জাতিতে কায়স্থ হইলেও পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং ফুলওয়ালী। সে যদি অন্ধা না হইত, তাহা হইলে সম-অবস্থাপন্ন গৃহে তাহার বিবাহ ঘটতে পারিত; অথবা সে যদি ধনী হইত, তাহা হইলে কোনো ধনী গৃহস্থ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত; কিন্তু তাহার যদি বিশেষ কুলগৌরব থাকিত, তাহা হইলেও বা তাহার বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু ইহার কোনোটিই তাহার ছিল না; সুতরাং সে এত বড় হইয়াও অবিবাহিত।

ইহা ব্যতীত, আমাদিগের মনে হয়, বন্ধিমচন্দ্র আরও এক কারণে রজনীকে অবিবাহিতা যুবতী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে তাহার কৃতিত্বের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ধিমচন্দ্র রজনীকে ধেরূপ চিত্রিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে রজনীকে অনুঢ়া যুবতী করা ভিন্ন অন্য কিছু করা যায় না। আমাদের দেশে হিন্দুর গৃহে অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ হয়। কন্যার পিতাই জামাতাকে খুঁজেন, তিনি সকল বন্দোবস্ত করেন, এবং তিনিই কন্যাকে সম্প্রদান করেন। বিবাহের পূর্বে বরের সহিত কন্যার কোনরূপ পরিচয় হয় না। বিবাহের পরে, পতিগৃহে বাইয়াই সে পতিকে ভালবাসিতে শিখে এবং ভক্তি করিতে জানে। কিন্তু রজনী স্বয়ংই পতিকে চিনিয়াছে, বিবাহের পূর্বে নিজেই তাহাকে ভালবাসিয়াছে। এই প্রেম-সঞ্চার অল্পবয়সে সম্ভব নয়। যৌবনেই নরনারী প্রেমের মর্ম্ম বুঝে। প্রেমিকার প্রেমিকের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা যৌবনেই জাগিয়া উঠে; শৈশবে বা বাল্যে তাহার উন্মেষ হয় না। তাই রজনী অনুঢ়া যুবতী, সতের বৎসরের কন্যা।

রজনী এখন যুবতী; রাস্তায় বেড়াইয়া, মালা গাঁথিয়া, বামাচরণকে আদর করিয়া আর সে পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। তাহার হৃদয় এখন, যেন কাহাকে চায়? শৈশবের ক্রীড়ায় তাহার আর মন বসে না, সর্বদাই শূন্যবোধ হয়।

রজনীর মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন সে শচীন্দ্রের কণ্ঠ

শুনিল। ইহা তাহার না জানি কেমন লাগিল ; সে তৎ শ্রবণে মুগ্ধা হইল। ইহা ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন নহে, গীতব্যবসায়িনীর মিষ্ট রাগিণী আলাপ নহে, বীণার মোহন তান, বা বাতোর সুন্দর স্বরলহরীও নহে। তাহারা শুনিতেই ভাল লাগে, কর্ণকুহরেরই তৃপ্তিসাধন করে। কিন্তু ইহা যে কানের ভিতর দিয়া জন্মাস্কা রজনীর মরমে পশিল।

কিন্তু কেবল স্বর শুনিয়াই কি সকল যুবতী পাগল হয় ? প্রেমিকের কণ্ঠস্বর প্রেমিকার হৃদয়ে প্রেমের উদ্বেক করিতে পারে, কিন্ধা উদ্ভিক্ত প্রেমকে বাড়াইতে বা গভীর করিতে পারে ; কিন্তু দুটা একসঙ্গে পারে না। দর্শন যখন প্রেমের সঞ্চারণ করে, শ্রবণ তখন তাহাকে বর্জিত এবং গভীর করে ; আবার শ্রবণ যখন প্রণয়ের সৃষ্টি করে, দর্শনই তখন তাহাকে বাড়াইয়া তোলে এবং গভীর করে। সুতরাং রজনী যে কেবল কথা—যে কথা তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয় নাই, এমন কথা—শুনিয়া একেবারে শচীন্দ্রকে ভালবাসিয়া ফেলিল ; ইহা কিছু অস্বাভাবিক। নয়নবিহীন রজনীর পক্ষে শচীন্দ্রের দর্শন অসম্ভব ; সেই জন্ত কবি এইখানে প্রেমিকের স্পর্শ আনাইলেন। শচীন্দ্র রজনীর চিবুক স্পর্শ করিল—রজনী মজিল, তাহার দেহমধ্যে তাড়িৎ-শ্রোত প্রবাহিত হইল ; আনন্দে তাহার রোমাঞ্চ হইল। সে আনন্দে আত্মহারা হইল। অন্ধের দৃষ্টি নাই, কিন্তু শ্রবণ ও স্পর্শনে সে অন্ধের মানবজন্ম যেন সার্থক হইল। সে ভালবাসিতে শিখিল ; অনাস্বাদিত ভালবাসার আনন্দে সে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিল। ইহাই সুখ। এতদিনে রজনী সেই সুখের পরিচয় পাইল। যেমন স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয় ; তেমনি প্রেমের স্পর্শে চির-দুঃখিনী রজনী কণেকের জন্ত সুখের কনককান্তি ধারণ করিল। বালারূপের প্রথম স্পর্শে গাছের শুষ্ক পাতাও যেমন হেমাভ হয়, রজনীও তেমনি স্বর্ণময় হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সুখ কতক্ষণের জন্ত ? সুখের সে শুভ মুহূর্ত চলিয়া গেল। তখন রজনীর সম্মুখে ‘কেবল’ অতীত সুখের স্মৃতি। সেই স্মৃতির সাহায্যে সে প্রেমকে প্রগাঢ়

করিতে চেষ্টা করিল। অন্ধ জীবনের এই শুভ মুহূর্তের আনন্দ তাহার আশাকে জাগাইয়াছে, হৃদয়ে একটা অপূর্ব পিপাসার সৃষ্টি করিয়াছে। দরিদ্রা রজনী সে তৃষ্ণা মিটাইবে কেমনে? যুবতীগণ তাঁহাদের অত্যন্ত সুখের স্মৃতিমাত্র বহন করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না, ভবিষ্যতে সাধ মিটাইয়া পাইবার আশায় আকুল হন। এবং যখন সে সাধ মিটাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তখনই অভাব অনুভূত হয়, তখনই তাঁহারা নিজেকে দৈন্য এবং দুঃখ জানিতে পারেন। রজনী যখন শচীন্দ্রের কণ্ঠ শুনিল, তাহার স্পর্শলাভ করিল, তখন অন্ধ হইলেও তাহার ভিতর হইতে শচীন্দ্রের রূপের জন্ম একটা কাতর ক্রন্দন উঠিতে লাগিল। তাহার চোখই নাই, হৃদয় ত আছে। যখন শচীন্দ্রের স্বর আকাশে মিশিয়া গেল, ধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি টুকুও যখন বায়ুতে বিলীন হইল, তখন সে কি লইয়া থাকিবে? কি অবলম্বন করিয়া তাহার প্রণয়বস্ত্রী বিস্মৃতি লাভ করিবে? প্রেমিকা যখন প্রেমিককে চক্ষুচক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, তখন সে তাহার রূপ ধ্যান করিয়া, মনোমধ্যে তাহার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিরহ-জ্বালা জুড়াইতে চেষ্টা করে। কিন্তু রজনীর সে উপায় নাই। এখন সে জানিল অন্ধ হওয়া কত দুঃখের। পুটপাকের জ্বালার মতন হৃদয় পুড়িয়া যায়, তথাপি আগুন নিভাইতে পারা যায় না।

রজনীর বিরহ বড়ই মর্স্যস্পর্শী; বন্ধিমের লেখনীর উপযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। সে আপনার অবস্থা ভাবিত, নিজের অন্ধত্বের জন্ম সে যে শচীন্দ্রকে দেখিল না, ইহা ভাবিত; ভাবিয়া স্বীয় জীবনকে শত বিকার দিত, বিধাতাকে দোষ দিত; কিন্তু শচীন্দ্রকে কখনো দোষী ভাবে নাই। আবার শচীন্দ্রের কণ্ঠ সে যখনই শুনিত, তখন তাহার কিরূপ আহ্লাদ হইত! “বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন তাহার বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়। রজনীরও এইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত।” কাঁদিয়া কাঁদিয়া, বর্ষার বারিভরা মেঘের মত অশ্রুবারি বিসর্জন করিয়া করিয়া প্রাণতরে কণ্ঠপুরে শচীন্দ্রের কথা কহিতে

ইচ্ছা করিত। বিরহের এমন অপূর্ব চিত্র, আমাদের সাহিত্যে আর নাই। অন্ধ বিরহিণীর বিরহের ও প্রেমের বিশিষ্টতা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ফুটাইয়াছেন এমন কেহ পারে নাই।

রজনীর এইরূপ বিরহ-ব্যথা ; বিরহে তাহার দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল ; কাস্তি মলিন হইল ; মাতাপিতা ইহা দেখিলেন। দেখিয়া কন্যার বিবাহের জন্ত ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু রজনীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। হিন্দুর প্রথমত মাতাপিতা কন্যাকে এ বিষয় কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। রজনীর বয়স বেশী হইয়াছিল, সত্য ; কিন্তু রজনীর বয়োধিক্য ইহার ব্যতিক্রম করিবে কেন ? তাহার উপর সে অন্ধ, সুতরাং তাহার মাতাপিতা ভাবিয়াছিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কিছু প্রয়োজন নাই।

রজনীর বিবাহ স্থির ; পিতা তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন, লবঙ্গ তাহার টাকা দিতেছেন। সে কি করিবে ? সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেমন উভয় দিক হইতে গর্জ্জন করিয়া আসিয়া মধ্যস্থিত পদার্থকে ক্ষণেকের মধ্যে ডুবাওয়া, ভাসাইয়া, চূর্ণ করিয়া দেয়, তেমনই একদিকে পিতার উত্তোগ, অন্য দিকে লবঙ্গের উৎসাহ, রজনীর আশাভাণ্ডও বুঝি ঘটনার স্রোতে সেইরূপ ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া দেয়। বৈশাখী ঝড়ের সময় বায়ু যেমন সহসা ভীষণ বেগে আসিয়া তরুলতা ছিন্ন করিয়া দেয়, আজ রজনীর আশালতাও বুঝি সেইরূপ ছিন্ন হয়। সে কি করিবে ! সে লুকাইয়া কাঁদিতে পারে, কিন্তু কাঁদিলে বিবাহ বন্ধ হইবে না। এ সময় কিসে সে বুক বাঁধিবে ? কে তাহাকে সাহুনা দিবে ! কাহাকেই বা সে সকল কথা খুলিয়া বলিবে ! এ অবস্থায় সাহুনা দিতে পারে কেবল একজন। তাহাকে কিছু খুলিয়া বলিতে হইবে না, সে যে ভাবে যাহাই বলুক না, তাহাই তাহার পক্ষে মহাসাহুনাশ্বরূপ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র সেইজন্ত আর একবার রজনীকে শটীন্দ্রের সহিত মিলাইলেন। রজনী কাঁদিতেছে দেখিয়া শটীন্দ্র তাহাকে মিষ্ট কথা বলিলেন, তাহার হাত ধরিয়া উপরে আনিলেন।

রজনী তখন উন্মত্তা হইল। সে বিবাহের কথা ভুলিয়া গেল। উভয়ের মিলনের কথা ভুলিয়া গেল, বিবাহবন্ধের কথা ভুলিয়া গেল,—সকল ভুলিয়া শচীন্দ্রকে স্বামীপদে বরণ করিল।

এখন সে বিবাহবন্ধের জন্ত সব করিতে সমর্থ এবং প্রস্তুত। যাহার জন্ত ইহা সে করিতে পারে, সে যে তাহার স্বামী,—হৃদয়-দেবতা। প্রথম সাক্ষাতে রজনী শচীন্দ্রকে পতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। সে তাহাকে ভালই বাসিয়াছিল,—অন্ত কোনো সম্বন্ধের সৃষ্টি উভয়ের মধ্যে তখনো হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই বিবাহে বাধা দিবার রজনীর কোনো বিশেষ শক্তি ছিল না। তখন পর্য্যন্ত শচীন্দ্র পরপুরুষ। পরপুরুষের জন্ত সে গৃহত্যাগ করে কি করিয়া। কিন্তু এখন টাপার সহিত যাইতে তাহার কোনো দ্বিধা উপস্থিত হইল না। সে রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া চলিল। কিন্তু হীরালালের সহিত রাত্রে যাইতে তাহার আপত্তি হইল। রমণীর স্বাভাবিক সতীত্বজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। তাহার আপত্তি টিকিল না, সে গেল; কিন্তু হীরালালের লাঠীর অর্দ্ধখণ্ড নিজহস্তে লইয়া গেল। রজনী অন্ধা এবং সরলা হইলেও সে যে সংসারানভিজ্ঞা নহে, ইহা তাহার প্রমাণ।

ইহার পর হীরালাল যখন তাহাকে কিছুতেই বিবাহে সম্মত করাইতে না পারিয়া নদীসৈকতে রাখিয়া চলিয়া গেল, তখন রজনীর কি অবস্থা! ঘোর নিশা, মানুষের কণ্ঠশব্দ নাই, রজনী কোন শব্দই শুনিতেছে না। সে যে একাকিনী, নিস্তব্ধতার স্পর্শে তাহা সে বুঝিল, এবং ইহাও বুঝিল যে তাহার চারিদিকে জল, মাঝখানে অন্ধ যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে দুঃখের চরম সীমায় উপস্থিত। তাহার স্মৃতির আশা-প্রদীপও এখন নিভিল, শেষ অবলম্বনও সে হারাইল। সে অন্ধা এবং যুবতী; কে ইহাকে উদ্ধার করিবে,—কি করিয়াই বা সে শচীন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবে? সে ভাবিয়া কুল পাইল না; ভবিষ্যৎ অনুভূতি শূন্য নৈরাশ্যময়, আশার কোন বোধই তাহার নাই। প্রথমে হীরালালের উপর তাহার ক্রোধ হইল। ক্রোধে

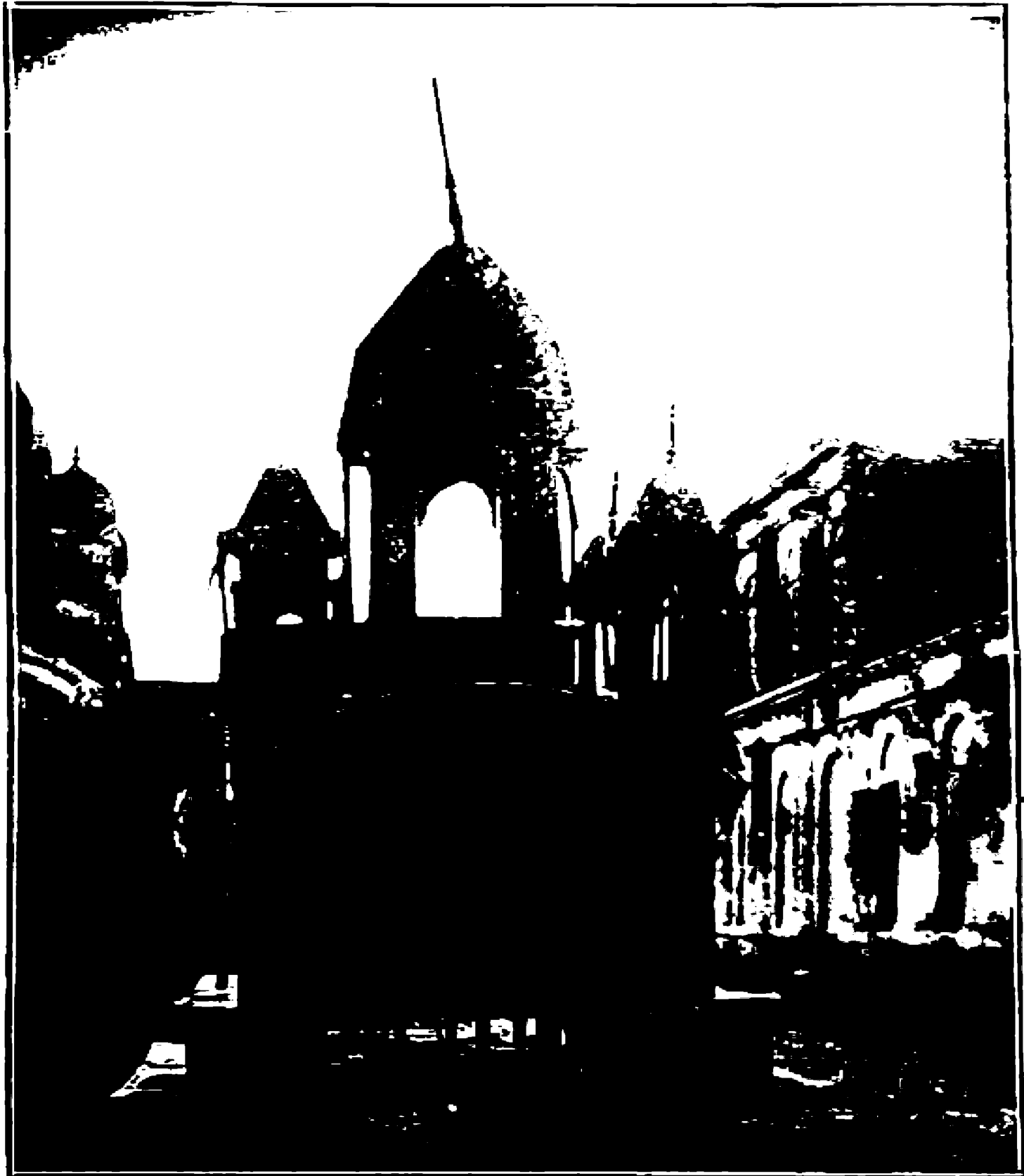
জ্ঞান হারাইয়া সে হীরালালকে মারিল। পরে দুঃখ হইল, জীবন দুঃসহ বোধ হইল। দুঃখে পাগল হইয়া সে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রজনীর জীবনাভিনয়ের প্রথম অঙ্ক এইখানেই শেষ হইল। এই খানেই যদি ইহার যবনিকা পতিত হইত, তাহা হইলে রজনীর চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; রজনী ‘রজনী’ হইত না, আমরাও ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না। ইহাতে কেহ মনে করিবেন ‘না যে শচীন্দ্রের সহিত রজনীর মিলন এখনো সংঘটিত হয় নাই বলিয়াই আমরা এ কথা বলিলাম। নিডিয়া তাহার প্রণয়ীর সহিত মিলিতে পারে নাই; সেও নদীবক্ষে আত্মদেহ বিসর্জন দিয়াছিল। কিন্তু তথাপি নিডিয়ার চিত্র অসম্পূর্ণ নহে। ইহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ। কিন্তু নিডিয়ার এবং রজনীর বিসর্জন এক নহে। উভয়ের অবস্থায় বিস্তর প্রভেদ। রজনী এতাবৎকাল যাহা করিয়াছে তাহার প্রভাবে মনুষ্য-সামান্য ধর্ম্মই তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার মধ্যে যে দেবতা আছেন, তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। সে যাহা করিয়াছে, তাহার অবস্থার এবং তাহার বয়সের প্রায় সকল রমণীই তাহা করে। ফলতঃ তাহার জীবনের বিশেষত্ব এখনো পরিস্ফুট হয় নাই।

এই বিশেষত্বটি ফুটাইয়া তোলাই কবির কবিত্ব। সকলের বিশেষত্ব এক সময়ে বা এক অবস্থায় ফুটিয়া উঠে না। বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে ইহা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই বিশেষত্ব যখন ফুটিয়া উঠে, তখনই মানুষের জীবন সার্থক হয়। হিন্দুর মতে ইহা সকলের মধ্যেই আছে, এবং সকলের মধ্যেই ফুটে। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ তাহার “পতিতায়” ‘সুপ্ত দেবতা’ বলিয়াছেন। এই দেবতাকে জাগাইয়া তোলাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। রজনীর দেবতা এখনো জাগে নাই।

কিন্তু তাহার এই বিসর্জনেই ইহা জাগিল। অগ্নিতে সোনা

নারায়ণ



রাধাবল্লভের রথ ।

(৫১৩ পৃষ্ঠা)

পোড়াইলে যেমন তাহার খাদ নষ্ট হইয়া খাঁটী সোনা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, রজনীর বিসর্জনেও তাহার হীনধাতু টুকু নষ্ট হইয়া বাহা সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলকর, তাহাই অবশিষ্ট রহিল। ইহা দ্বারা রজনীর চরিত্র যে নিন্দনীয় এমন কথা বলি না। কিন্তু তাহার বিশেষত্বও যে আগে ফুটে নাই, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আমাদের দিয়াছেন। রজনী যখন বিবাহে অসম্মত হয়, তখন সে নিজের কথাই ভাবিয়াছিল, চাঁপার কথা ভাবে নাই। চাঁপা যে মপত্ৰী-সহবাসে ক্লেশ পাইবে, সে যে ঈর্ষানলে পুড়িয়া মরিবে, একথা তাহার মনে আসে নাই। অবশ্য যদি আসিত তাহা হইলে ‘রজনী’র সৌন্দর্য্য নষ্ট হইত, স্বাভাবিকত্ব ঘুচিয়া যাইত। প্রথম প্রণয়ের তীব্র মোহ এবং গাঢ় মঙ্গলিম্পা প্রেমিক কিম্বা প্রেমিকাকে অন্তরের কথা ভাবিতে দেয় না। রজনীও সেইজন্য তখন চাঁপার কথা ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু অমরনাথের সময় সে পারিয়াছিল। কারণ মোহ তখন অনেকটা কাটিয়াছে, সামান্য আসক্তি আর তাহার হৃদয় জুড়িয়া নাই। গভীর প্রেম তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কিন্তু রজনী যে “অমরনাথের ইচ্ছায় তাহার দাসী” হইতে চাহিয়াছিল, শতীন্দ্রকে ইহলোকের জন্ত ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহার কারণ কেবল ইহাই নহে। এ পর্য্যন্ত রজনী অত্যাচারই পাইয়াছে, অবিচার এবং নিগ্রহই সহ্য করিয়াছে,—উপকার পায় নাই। লবঙ্গ তাহার উপকার করিতে চাহিয়াছিল, সত্য, কিন্তু রজনীর পক্ষে তাহা উপকার হয় নাই। সে দেখিল এমন পর জগতে আছে, পরের জন্ত বাহার হৃদয় কাঁদে, এমন মানুষ সংসারে আছে, রজনীর দুঃখ দেখিয়া বাহার হৃদয় বিগলিত হয়। তাহার উপর অমরনাথ রজনীর উদ্ধার-কর্তা। সুতরাং রজনী তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। অমরনাথের মহৎ চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া রজনীর সম্বৃত্তিসকলও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দীপ-শলাকার স্পর্শে পুঞ্জীভূত বারুদরাশি যেমন একেবারে জ্বলিয়া উঠে, অমরনাথের চরিত্র-সংস্পর্শে রজনীর হৃদয়ও সেইরূপ আলোকিত হইল

—চতুর্দিক তাহার বিমল বিভাষ উদ্ভাসিত হইল। এতদ্ব্যতীত রজনী অমরকে ভক্তি করিত। একরূপ ভক্তি বোধ হয় সে আর কাহাকেও করিত না। মানুষ যাহাকে ভক্তি করে, তাহাকে সহজে ক্লেশ দিতে পারে না। রজনী যখন শুনিল, অমরনাথ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন, তখন সে আপনার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। নানারূপ চিন্তায় তাহার অন্তর আলোড়িত হইতে লাগিল। একদিকে তাহার জীবন, জীবন কেন জীবন অপেক্ষাও প্রিয়বস্তু, অন্য দিকে অমরনাথের সুখ। শেষে তাহারই জয় হইল। শয়তান নিষ্পেষিত হইল ;—তৎপরিবর্তে তাহার সুগুণদেবতা জাগিয়া উঠিলেন। সে স্থিরভাবে ধীর ভাষায়, অবিকম্পিত কণ্ঠে লবঙ্গকে বলিল, “তাহা হইবে না ; তিনি যখন আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, আমি তাঁহারই হইব, আর কাহারো নহে।”

কিন্তু রজনী অমরের নিকট কিছুই লুকাইল না। সব বলিল, “তাহার হৃদয় যে শচীশ্বরের পদে বিক্রীত, তাহা বলিল, সে যে অমরনাথের উপযুক্ত নয়, তাহাও বলিল।” অমরনাথ সমস্ত শুনিল ; শুনিয়া রজনীকে ছাড়িল, শুধু ছাড়িল না, শচীশ্বরের সহিত মিলাইল।

বন্ধিমচন্দ্রের প্রতিভা এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জন্মাক্ষা রজনীর রূপোন্মাদ নাই। শ্রবণে ও স্পর্শনে যে রূপ, সেই রূপের আংশিক উন্মাদনায় রজনী কিছুকাল প্রেমবিধুরা হইয়াছিল। পুষ্প-সংস্পর্শে রজনী চিরকোমলা এবং চিরসরলা। সে শুনিয়াছিল উপকারকের প্রত্যাশা করিতে হয়, তাই সে অমরনাথের বিবাহ-প্রস্তাবে অসম্মত হয় নাই। সে ফুলের ভ্রাণে, ফুলের স্পর্শে মাধুর্য্যই সংগ্রহ করিয়াছে ; তাই অমরনাথের মাধুর্য্য-মণ্ডিত ব্যবহারে সে আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইল। রজনী কর্তব্যপরায়ণা, কিন্তু কুটীলা নহে। সে আত্মগোপন করিতে পারিল না, সকল কথা খুলিয়া বলিল। তাহার ত চক্ষুলাজ্ঞা নাই। তাহার হ্রী আছে,

কিন্তু বীড়া নাই, কারণ সে যে জন্মাক্ষা! এই বিশ্লেষণেই বন্ধিম-
চন্দ্রের প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ হইয়াছে।

রজনীর শেষ চিত্র মাতার চিত্র। যে রূপ নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ, শেষে
আমরা রজনীকে সেই মাতরূপে দেখিলাম। আমাদের নয়ন সার্থক
হইল।

—

—

বন্ধিমবাবু ।

আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি বন্ধিমবাবু ; পরমারাধ্য জননী দেবীর মুখে শুনি বন্ধিমবাবু, অগ্রজদিগের মুখে শুনি বন্ধিমবাবু ; তাই এই প্রবন্ধের নামকরণ করিলাম বন্ধিমবাবু । তাঁহার সম্বন্ধে আমার ষ্টেটুকু স্মৃতি তাহাই জ্ঞাপন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । তবে এ স্মৃতি আমার পিতৃদেব ৩দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতির সহিত কতক জড়িত ।

সম্প্রতি একদিন আমার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় বন্ধিমবাবুর রং কি কাল ছিল ? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কাল বলিতেছেন কেন ? তিনি বলিলেন, আমি তাহার দাড়ি গোঁফ কামান, চোগাচাপকান আবৃত চেহারা দেখিয়াছিলাম, তাহার রং কালই বোধ হইয়াছিল । একরূপ ধারণা হয় ত আরো অনেকের থাকিতে পারে, সেই জন্ত প্রথমেই তাহার বর্ণের কথা বলিব । তাঁহার গুরু ভাষায় বলা যাইতে পারে তাঁহার রং “কবিত কাকুন” শ্রায় ছিল । বিয়াল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে, তিনি একদিন আমার পিতৃদেবের সহিত গল্প করিতেছিলেন । দুইজনে দুটি তাকিয়া ঠেসান দিয়া অর্ধ শায়িত ছিলেন । বন্ধিমবাবুর গায়ে একটি পাতলা দুক্কফেনিভ লংক্লথের কোট ছিল । তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার রং ফুটিয়া বাহির হইতেছিল । তাঁহার নিজের উপমা ব্যবহার করিলে বলা যাইতে পারে যে, ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়া আলো যেমন অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তাঁহার রংও সেই কোটের আবরণে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছিল । গোঁফ ও কেশ ঘন ও মিসমিসে কাল । তাঁহার এই সময়ের ফটো আমাদের আছে । বন্ধিমবাবুপ্রণীত “দীনবন্ধু-জীবনী”র শেষ সংস্করণে ঐ ছবির হাফটোন প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে । “মানসী”তে বোধ হয় এই ছবি প্রথম প্রকাশিত হয় ।

পাঠ্যাবস্থায় যখন বন্ধিমবাবু ও আমার পিতৃদেব ঐশ্বর গুপ্তের কাব্য-

শিষ্য ছিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহাদের পত্রে আলাপ হয়। পরে তাঁহাদের ষে রূপ বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের অবিদিত নহে। বন্ধিমবাবুর কনিষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, যখন তাঁহারা কেবল দুইজনে বসিয়া থাকিতেন তখন অনেক সময় নীরবে কাটিয়া যাইত। দুইজনে দুইটি গুড়গুড়ি লইয়া ধূম পান করিতেন এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণও কাটিয়া যাইত। শুনিয়াছি কারলাইল ও এমারসন্ উভয়ের যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, দুইজনে দুইটি চুরুটের ধূম বাহির করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। বোধ হয় তাহাদের আত্মায় আত্মায় কথা হইতেছিল, বাহ্যেদ্বিজে তাহা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের এই দুই মনীষী বন্ধুরও সেইরূপ নীরব কথোপকথন হইত। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পরও বন্ধিমবাবু এই নীরবতাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন সমগ্র বঙ্গদেশ বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু বন্ধিমবাবু স্থির ছিলেন। বঙ্গদর্শনে তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অনেকেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং সেজন্যই তিনি বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণে এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন,—

“আমার আর একজন সহায় ছিলেন, সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী, তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই; কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্ম কাদিলে প্রাণ জুড়াইবে। অশ্রুর কাছে দীনবন্ধু স্নেহক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু। আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখন কিছু বলি নাই, এখনও কিছু বলিলাম না।” এরূপ অনলম্পর্শী সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত আর আছে কি!

তাঁহার আর একজন প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। ইনি “পশুতাগ্রণী কাব্যামোদী” জগদীশনাথ রায়। বন্ধিমবাবু উভয়কে সহোদরের মত ভালবাসিতেন। একদিন তাঁহার কলিকাতার বৈঠকখানায় তাঁহার পিতৃদেব ও তাঁহার নিজের তৈলচিত্র দেখাইয়া কহিলেন, ঘরে স্থান নাই, নহিলে কয় ভায়ের, দীনবন্ধু ও জগদীশের ছবি রাখিতাম। অনেকেই হয় ত জানে না যে এই জগদীশবাবুই বিশ্বকর্মের ‘হরদেব ঘোষালে’ কল্পিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের মত বন্ধিমবাবু ও জগদীশবাবুর চিঠি পত্র চলিত। এ কথা জগদীশবাবুর পুত্র ভক্তিবাজন বাবু খগেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট শুনিয়াছি।

অনেক স্থলেই দেখা যায় যে বন্ধুত্ব বন্ধুর মৃত্যুর সহিত ফুরাইয়া যায়। আমার পিতৃদেবের অনেক বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকেরই বন্ধুত্ব ঋণস্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু বন্ধিমবাবুর বন্ধুত্ব সে জাতীয় ছিল না। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি আমাদের আত্মপুঞ্জের মত দেখিয়াছিলেন। সততই আমাদের সংবাদ লইতেন। আবশ্যক হইলে সম্পরামর্শ দান করিতেন। তাঁহার দ্বারা যে উপকার সাধন হইতে পারে তাহা করিতে কখনই বিরত হয়েন নাই। তিনিই পিতৃদেবের রচনাকুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করিতে বলেন এবং নিজে পিতৃদেবের একটি ক্ষুদ্র জীবনীও লিখিয়া দেন। ইহা পিতৃদেবের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট ছিল। তিনি ইহাকে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপিবার অনুমতি দেন এবং এই জীবনী সে অবধি আমাদের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ইহার উপস্বর্গও আমরা ভোগ করিতেছি। মৃত বন্ধুর পুত্রগণের প্রতি এই স্নেহের চিহ্ন অতীব বিরল। তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। কেহ কেহ বলেন, অনেক স্থলে ঋণ স্বীকার করা ঋণ পরিশোধের কতকটা উপায়। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা সর্বসাধারণের নিকট এই ঋণ স্বীকার করিতেছি। পিতৃদেবের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইবার সময় তিনি আমাদের একখানি ইংরাজী পত্র পাঠান। তাহার

আরম্ভে লিখিয়াছিলেন—“I owe it to the memory of your father that I should give a critical estimate of his writings” এবং বিজ্ঞাপনে একথা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। “দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব” শীর্ষক সমালোচনার পূর্ববাস্তব এই পত্রে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন—“কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি-ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব এই বাসনা ছিল। তাই এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।”

বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় তিনি আমার পিতৃদেবের মৃত্যুজনিত শোক নীরবে বহন করিয়াছিলেন। কাহারও নিকটে যে কাঁদিয়াছিলেন তাহাও শুনি নাই। শোক তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কিন্তু যেদিন আমাদের বাটীতে প্রথম পদার্পণ করেন, তাহার ক্ষত হৃদয়ের শোকরাশি সেতুবন্ধনে জলসংঘাতের ম্যায় উছলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আমাদের কাছে দেখিয়া, আমাদের বালিকা সহোদরাকে ক্রোড়ে করিয়া শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। সে ঘটনা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল কিন্তু এখন আমার হৃদয়ে কল্যাকার ঘটনার ন্যায় জাগিয়া আছে। সে দৃশ্য জীবনে কখন ভুলিব না।

তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের চিহ্ন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। আমার পিতৃদেব তাঁহাকে নবীন তপস্বিনী নাটক উৎসর্গ করেন। বন্ধিমবাবুও তাঁহাকে মৃণালিনী উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব যে বন্ধুর জীবনের সহিত শেষ হয় নাই তাহা দেখাইবার জন্য আনন্দমঠের অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, “স্বর্গে মর্তে

সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।” ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন তাহার বন্ধু হালামকে ভুলিতে পারেন নাই। কাব্যে ইহার অমর নিদর্শন আছে। যদি বীজের সহিত বৃক্ষের তুলনা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলা ঘাইতে পারে আনন্দ-মঠের উৎসর্গ বাঙ্গলা সাহিত্যের In Memoriam. সম্প্রতি শ্রদ্ধা-স্পদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার “বন্ধিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ বৎসর বিচ্ছেদের পর আবার সেই দুই বন্ধু পুনরায় মিলিত হইয়াছেন। সে মিলন অনন্ত কালের জন্ত, তাহাতে বিচ্ছেদ নাই। মৃত বন্ধুকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি যে আপনাকে “স্বদধীন জীবিত” বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতই সত্য। বন্ধিমবাবুর কনিষ্ঠ পূর্ণবাবু একদিন আমাকে বলেন,—তোমার বাবার মৃত্যুর পর বন্ধিমবাবুর জীবনের পূর্বকার অবস্থা আর দেখি নাই। যেন তাঁর জীবনের গতির পরিবর্তন হইয়াছিল।

এবার বর্ধমানে সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে মহারাজ বাহাদুরের প্রণীত “চন্দ্রজিৎ” নামক নাটকের অভিনয় দর্শনকালে একটি কথা বড় মনে লাগিয়াছিল। রাজা ‘চন্দ্রজিৎ’ বলিতেছেন—“রাজর্ষির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সব মনে রাখা। স্মৃতির প্রত্যেকটিই সজাগ রাখিলে স্মৃতি বিলোপনের উপায় সুসাধ্য, নচেৎ কর্মক্ষয়কালীন কোন না কোন লুপ্ত স্মৃতি সজাগ হইয়া বিস্ময় ঘটাইতে পারে।” বন্ধিমবাবু সাহিত্য-জগতের রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহারও ঐরূপ স্মৃতিশক্তি ছিল। আমার পরলোকগত বন্ধু শরৎকুমার লাহিড়ী বন্ধিমবাবুর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির পরিচায়ক একটি গল্প করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি : একবার বন্ধিমবাবু “সারল্যের পুস্তলিকা, পরহিতে রত, সকলে বিদিত” রামভট্ট লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিবার জন্ত কৃষ্ণনগরে গমন করেন। শরৎবাবু তখন ভরণ বয়স্ক। বয়সের চাপল্যানিবন্ধন তিনি বন্ধিমবাবুর নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার একখানি ফটো চাহেন। বন্ধিমবাবু তাঁহাকে বলেন যে, এক্ষণে তাঁহার আর ফটো নাই ; যদি

নারায়ণ



গুজবাড়ী ।
৫১৫ পৃষ্ঠা ।

ভবিষ্যতে কখন আবার ফটো তোলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একখানি দিবেন। ইহার বহু বৎসর পরে যখন কলিকাতায় অবস্থানকালে পুনরায় ফটো তোলেন, সেই সময়ে তাঁহার কর্মচারী উমাচরণকে বলেন যে, রামতনুবাবুর পুত্র শরৎকে একবার আসিতে বলিও। শরৎবাবু তাঁহার পিতৃশ্রুত সরলতার সহিত স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার পুস্তকের দোকান তখন বেশ চলিতেছে। তিনি S. K. Lahiri নামেই অভিহিত। তিনি ভাবিলেন তাঁহাকে প্রকাশক করিবার জন্যই বুদ্ধি বঙ্কিমবাবু ডাকিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমবাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরিচয় দিলেন যে তিনি S. K. Lahiri. বঙ্কিমবাবু শুনিয়া তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “উমাচরণ উমাচরণ, তুমি কাকে ডাকিয়াছ, আমি যে রামতনুবাবুর ছেলে শরৎকে ডাকিতে বলিয়াছি।” শরৎবাবু অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, “আমিই শরৎ”; তখন তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃষ্ণনগরে যখন তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম, আমার কাছে ফটো চাহিয়াছিলে মনে পড়ে?” শরৎবাবুর সে কথা আদৌ স্মরণ ছিল না, তাঁহার বলায় পর মনে পড়িল। বঙ্কিমবাবু আবার বলিলেন, “আমি আবার ফটো তুলিয়াছি, প্রথম উপহার তোমার জন্য রাখিয়াছি।” বঙ্কিমবাবু যে এই সামান্য কথাও বিস্মৃত হন নাই তাহা দেখিয়া শরৎবাবু চমৎকৃত হইলেন। এইরূপ সামান্য কথা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতার পরিচয় আমিও একবার পাইয়াছিলাম। University Instituteএ বেদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবার বন্দোবস্ত হয়। বঙ্কিমবাবুর প্রথম বক্তৃতা আমি শুনিতে গিয়াছিলাম। বসিবার স্থান পাই নাই দাঁড়াইয়াছিলাম। বহু জনতার জন্ত কিছুই শুনিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে চলিয়া আসিলাম। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বক্তৃতাটি ছাপা হইবে কি না? তিনি বলিলেন, University Magazineএ ছাপা হইবে। পরে অন্য কথা হইয়াছিল। বক্তৃতাটি পড়িবার জন্য

আমার অব্যক্ত আগ্রহ তিনি বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর আমার তৃতীয় অগ্রজ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে যান। আসিবার সময় বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বলিলেন, “এই Magazine তুমি ললিতকে দিও, তাহার আমার বক্তৃতাটি পড়িবার ইচ্ছা আছে।” আমি কাগজ পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি যে আমার আগ্রহটি মনে রাখিয়াছেন তাহাতে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইল। যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, পড়িয়াছিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয় অচিরেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইল না। বঙ্গদেশের কেন, সমস্ত শিক্ষিত জগতের দুর্ভাগ্য যে ঐ বক্তৃতা সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। Vedic Literature সম্বন্ধে ইহা যে এক অমূল্য পদার্থ হইত, সন্দেহ নাই। এইবার তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ক্রমোন্নতির অবতারণা করিয়া উপসংহার করিব।

সাহিত্য-জীবনের শৈশবকাল তিনি ঈশ্বর গুপ্তের ‘সাহিত্য-পাঠশালায়’ অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহার দুই জন সতীর্থ ছিলেন—৩৬ দারিকানাথ অধিকারী ও ৩৬ দীনবন্ধু মিত্র। গুপ্ত কবি ইহাদের তিনজনকে বড়ই স্নেহ করিতেন, এবং সর্বতোভাবে উৎসাহ দিতেন। একবার ইহাদের তিন জনকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। ইহাদের কখন কখন কবিতায় কলহ হইত। সেই সব কবিতা “কলে-জীয় কবিতাযুদ্ধ” নামে অভিহিত হইয়াছিল। প্রভাকর পাঠে জানা যায় তদানীন্তন লোকে ইহাদের দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যে যুগান্তর প্রত্যাশা করিয়াছিল। সে আশাও পূর্ণ হইয়াছিল। তবে বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ ৩৬ দারিকানাথ অধিকারী ‘নীলদর্পণ’ বা ‘দুর্গেশনন্দিনী’র দ্বায় কোন পুস্তক রচনা করিবার পূর্বে অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার প্রতিভা মুকুলেই শুখাইয়া গেল। অপর দুই জন সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ অবলম্বন করিয়া নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন। এই সময় তাঁহাদের আর একজন সহযোগী ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যে, নাট্যে ও

উপস্থাসে তাঁহারা এক সময়েই রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিন পুণ্য স্রোতস্বিনীর শ্রায় একত্র যুক্ত হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্র পবিত্র করিয়া-
ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গমকে সাহিত্যের প্রয়াগতীর্থ বলা যাইতে
পারে। যদি বিদেশী উপমা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে বঙ্গ-
সাহিত্যের এই দিব্য যুগকে Literary Triumvirate নির্দেশ
করা যাইতে পারে। এবং মধুসূদন, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র Literary
Triumvirs বা সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ ছিলেন। এই ভাব-
অবলম্বনে মৎকর্তৃক রচিত একটি সনেটের শেষ ছয় চরণ উদ্ধৃত
করিলাম,—

মহাকবি মাইকেল পুরুষ বিরাট,
হাস্তসিন্ধু দীনবন্ধু দীনের তারণ,
বঙ্কিম মাধুর্য্যমণি কোরকসম্রাট,
একাধারে রাজদণ্ড করিল ধারণ।
ধন্য মাতা বঙ্গভাষা বড় ভাগ্য জোর,
সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ সিংহাসনে তোর ॥

বঙ্গসাহিত্যের, বঙ্গদেশের, বঙ্গসমাজের, চির আক্ষেপের বিষয় এই
ত্রয়াধিপের দুইজন—মধুসূদন ও দীনবন্ধু ১২৮০ সালে, চারিমাস ব্যবধানে
স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহাদের পরলোক গমনের পর ‘কোরক সম্রাট’
বঙ্কিমচন্দ্র একছত্র সম্রাট হইলেন। সম্রাটের কার্য—পালন ও শাসন
করা। বঙ্কিমচন্দ্র এ দুই কার্যই সম্যকভাবে করিয়াছিলেন। তিনি
যেমন স্বীয় কল্পনাপ্রসূত রচনায় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে
লাগিলেন, অপর দিকে সমালোচনার তীব্র কশাঘাতে সাহিত্যে
জঞ্জালের প্রবেশ রোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ বৎসর যাবৎ সম্রা-
টের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের এই
পালন ও শাসন কার্যের জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের সব্যাসাচী বলিয়া।

বর্ণনা করিয়াছেন। এই ভাব অবলম্বনে মৎকর্তৃক রচিত আর একটি সনেটের শেষ ছয় চরণ উদ্ধৃত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব,—

এক হস্তে দিব্যতান বীণার বঙ্কার
অম্ব হস্তে শক্তিশেল কঠোর সন্ধান
দিগন্তব্যাপিনী করি প্রতিভা অপার,
আপনার সিংহাসন করিলে মহান।
সাহিত্যের রাজসূয় তব অনুষ্ঠান,
জীবনের মহাত্মত পূর্ণ সমাধান।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র ।

মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন । এই সকল প্রবন্ধ সাধারণতঃ দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে,—“ভারত-কলঙ্ক বা বাঙ্গালার কলঙ্ক” এবং “বাঙ্গালীর উৎপত্তি” । তখনও বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাস রচনায় আধুনিক বিজ্ঞানানুসৃত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই । যাহারা ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ইতিহাস রচনা করিতেন, তাহারা তখনও এই প্রণালীর নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ । ইউরোপে তখন ফরাসী ও জার্মান পণ্ডিতগণের আবিষ্কারের ও আলোচনার দরুণ, বাইবেল-বর্ণিত প্রাচীন ইহুদী জাতির ইতিহাস যে সত্য ইতিহাস নহে, কিন্তু কল্পনাবহুল কিস্বদন্তি মাত্র, এ কথা প্রচার হইয়াছে । ধর্ম্মভীরু খৃষ্টীয়ান পণ্ডিতগণ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংঘর্ষে পুরাতন ধর্ম্ম ও সমাজ বিনষ্ট হইবার ভয়ে, বাইবেলের ঐতিহাসিক অংশের অসত্য গুলিকেও সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করিতেছিলেন । অপর পক্ষে যাহারা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মিসর, বাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যের ভগ্ন স্তূপ খনন করিয়া প্রাচীন জগতের লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারা বাইবেলের কোন অংশকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই । এই দ্বন্দ্বের ফলে ইউরোপে ইতিহাসের আলোচনায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছিল । জগতের ইতিহাসের খাত্রা ইউরোপে যখন ইতিহাস চর্চায় এই অবস্থা, তখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মার্সম্যান, এবং ফুয়ার্টের ইতিহাস ব্যতীত ঐতি-

দেশে ইতিহাসবিষয়ক অপর পাঠ্য পুস্তক ছিল না। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্ধ শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহা-দিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিম-চন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন-উক্তির মতন বলিয়া বান নাই ; এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইতে যত্ন করি, তিনিও তেমনি করিয়া, সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ‘ভারতকলঙ্ক’ প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং ‘বঙ্গালার কলঙ্ক’ প্রকাশের পরে, বিশ বৎসর অতীত হইয়াছে ; কিন্তু অতাবধি যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বোধ হয় না। এখনও কোন লেখক এমন কথা বলিতে সাহস করেন নাই যে, মুসলমানগণ স্বতঃসহজে প্রাচীন সিরিয়া বা পারস্যদেশে অধিকার করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষও সেইরূপ অনায়াসে অধিকৃত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যুগালিনীতে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ হইতে পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের অসম্ভবতা প্রমাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখনও ‘তবকাৎ-ই-নাসিরি’র কোন বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয় নাই, ‘রাভার্ট’র অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই, তখন ইলিয়ট কর্তৃক প্রকাশিত ‘তাজ্-উল-মাসি’র ও ‘তবকাৎ-ই-নাসিরি’র সারাংশ মাত্রই এতদেশীয় লেখক ও পাঠকবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গালার মুসলমান-বিজয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ১২৮৭ সালে ‘বঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—

“সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখতিয়ার খিলজী কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কি প্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? সেসকল দেশে কে রাজা ছিল? কি প্রকারে অবশিষ্ট অংশের স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল?”

বাস্তবিক মাসুমানের ইতিহাস পাঠ করিয়া যাহারা বিখ্যাত করিয়াছিলেন, ওরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস যাহাদের নিকটে স্বর্ণমুষ্টির স্থায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে এই সকল প্রশ্ন আশা করা যায় না। বহুকাল পূর্বে একদিন বন্ধিমচন্দ্রের ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ পড়িতে পড়িতে এই প্রশ্নগুলি দেখিয়া মনে বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল। সেই দিনই ইহার সন্তুস্তর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। একাধো অনেক সময় লাগিয়াছিল। কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা দেশের আরও দুই একজন ঐতিহাসিক অবগত আছেন। রাজশাহীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বোধ হয় বলিতে পারেন যে, বন্ধিমচন্দ্রের প্রশ্নগুলির সন্তুস্তর বাহির করিতে লেখকের কত সময় লাগিয়াছিল। যে সকল উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলাম, তাহা ‘লক্ষ্মণসেন ও মুসলমান বিজয়’ নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি (বঙ্গদর্শন, ১৩১৫)। তৎকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমার সহিত একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও অশ্বাশ্ব দুই একজন বঙ্গদেশীয় লেখক আমার সিদ্ধান্তগুলিকে কিছুতেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। ব্যক্তিবিশেষের মতামতে কিছু আসে যায় না। রমাপ্রসাদ বাবু ‘অদ্ভুত সাগর ও দানসাগরে’র কতকগুলি শ্লোকের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কিন্তু অশ্বাশ্ব লেখকগণ পুরাতন মতের সমর্থন করিতে যাইয়া অনেক আশ্চর্য্য কথার অবতারণা করিয়াছেন। অনেকদিন পরে আবার “বিবিধ প্রবন্ধ” পড়িতে

পড়িতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, নব-শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রত্ন-প্রীতির কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন :—

“কিন্তু সেই গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোল-কল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এইমাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিন্‌হাজ্-উদ্দিনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরি হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন?”

“তাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতেরজন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত? যদি তাহা না হয়, হে চাকরিপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর?”

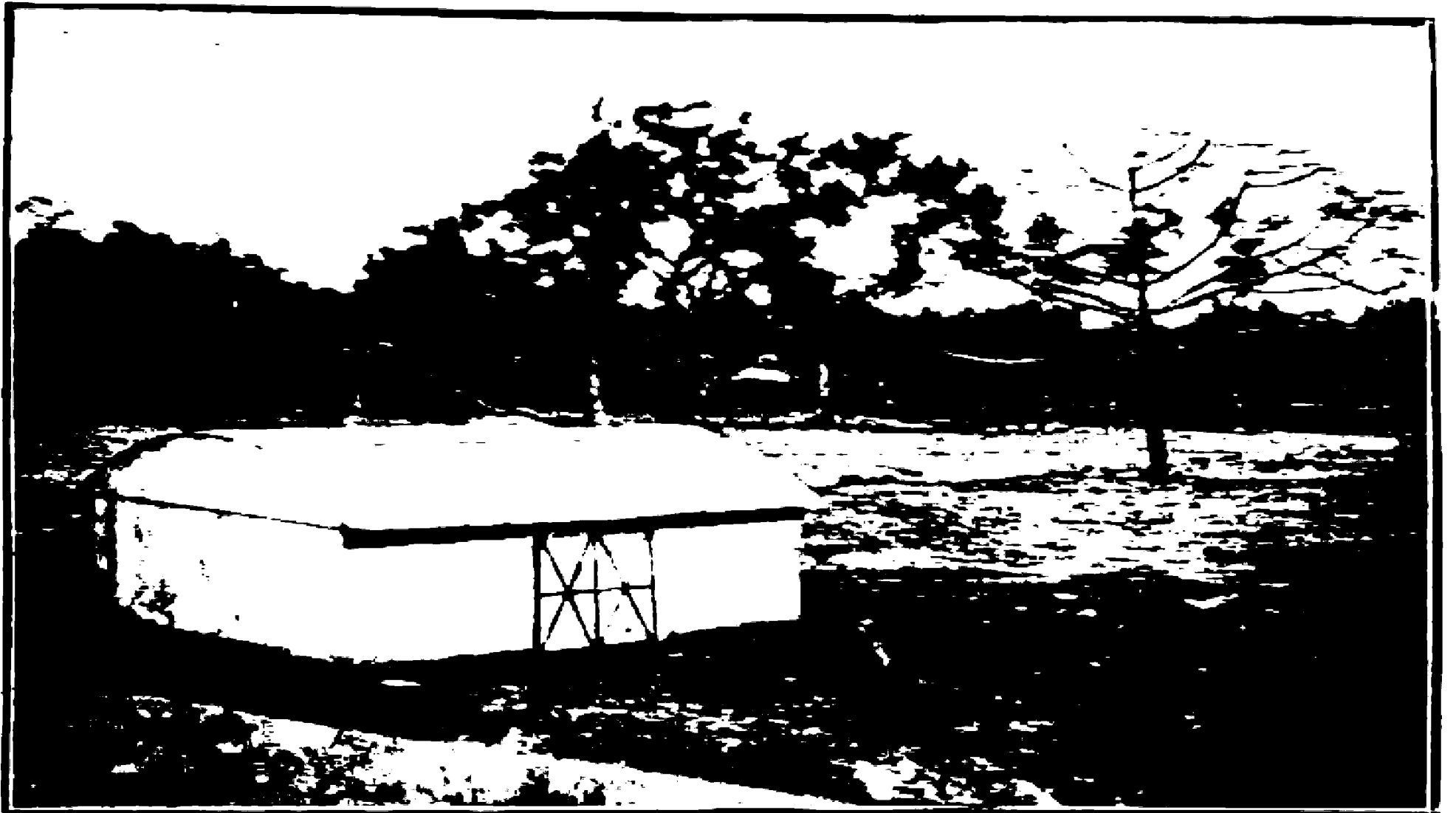
এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন ;—

“পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন? সেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল? সেটুকু কি প্রকারে শাসন করিতেন? আমি যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কস্মিনকালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, উপনিবেশের পার্শ্ব-বর্তী স্থানসকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত।”

যদি কখনও ‘বাঙ্গালার ইতিহাসে’র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের সন্তুস্তর প্রদানের চেষ্টা করিব।

ইতিহাসের উপাদান পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহম্মদ বখতিয়ার তাঁহার অবোধ্যার জাইগীর হইতে চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি এইরূপ লুণ্ঠন করিতে আসিয়া মগধদেশের প্রধান নগর উদয়পুরের সজ্জারাম ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। পৰ্ব্বতপীর্থে পাষণ-নির্মিত সজ্জারাম দেখিয়া মুসলমানেরা

নারায়ণ



রাধাবল্লভের মেলার স্থান ।
(এখন রেলওয়ের অধিকারভুক্ত)
৫১৩ পৃষ্ঠা ।

দুর্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং অনায়াসে নিরস্ত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু-দিগকে সংহার করিয়া সজ্জারাম অধিকার করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ মুসলমান বিজয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে গোড়নগরে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে বখতিয়ারের সহচর দুইজন সৈনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই নিরস্ত্র, গর্ভাক্ত, বৃদ্ধ সৈনিকদ্বয়ের প্রলাপোক্তি অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মিন্‌হাজের গোড়-বিজয়-কাহিনী প্রকৃত ইতিহাসে স্থান পাইতেছে না। তাঁহার ইতিহাসে কোন্ পথে বখতিয়ার গোড়ে গিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই; কে, কেমন করিয়া গোড়-রাজ্যের রাজধানী লক্ষণাবতী অধিকার করিয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই; গোড়রাজ্যের কতটুকু অধিকৃত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে মিন্‌হাজের বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দিল্লীর চাহ-মান বংশ অথবা কানাকুজের গাহডবাল বংশের পরাজয়-কাহিনীর সহিত গোড়ের সেনবংশের অধঃপতন-কাহিনীর তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, শেষোক্ত বিবরণ বাতুলের প্রলাপ অথবা মূর্খের অসম্বদ্ধ কাহিনী।

মুসলমান-বিজয় সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা,—১১৯৯ বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া অধিকৃত হয় নাই; যদিই বা হইয়া থাকে তাহা হইলে হিন্দুগণ উহা পুনরধিকার করিয়াছিল; লক্ষণসেন মুসলমান-বিজয়ের অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; ১২৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সপ্তগ্রাম বিজিত হয় নাই। সুতরাং এখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে যে বখতিয়ার বোধ হয় কেবল রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলাভি-ষিক্তের শাসনকালে উত্তরে দেবকোট, ও দক্ষিণে লক্ষণোর পর্য্যন্ত বিশাল বঙ্গদেশের শতক্রোশব্যাপী অংশমাত্র মুসলমানগণের হস্তগত হইয়াছিল। “বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজী যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখতিয়ার খিলিজী বহুতর সৈন্য লইয়া।

বান্দালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখতিয়ার খিলিজীর পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববান্দালায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বান্দালা শাসন করিয়া আসিলেন ;—ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তর বান্দালা, দক্ষিণ বান্দালা, কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজী জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্ব প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজী সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজী বান্দালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বান্দালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।”

উত্তরবঙ্গের সপ্তম সাহিত্য-সন্মিলনের সভাপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বলিয়াছিলেন, “অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি ছিল বা ছিলনা, সে কথার বিচার তখন মনে আসে নাই। তিনি যে সাহসপূর্বক স্বাতন্ত্র্যের পতাকা হস্তে লইয়া দেশকে অনুসরণ করিতে ডাকিতেছেন ইহাই যথেষ্ট।” তখন আমার মনে হইয়াছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কথাই বোধ হয় অক্ষয়কুমারকে ‘সিরাজদ্দৌলা’ রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। সে কথাটি এই, “ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অল্পে রণজয় করিল। কথাটি উপস্থাপন মাত্র। পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ-তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ফৌজিচিকুর মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখ্বিরান নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।”

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “বান্দালার ইতিহাস চাই। নহিলে বান্দালী কখনও মানুষ হইবে না।” এখন বান্দালার অনেকগুলি ভাল ভাল ইতিহাস লিখিত হইয়াছে,—কুলশাস্ত্রের দ্বারা স্বকপোল-কল্পিত রচনা অথবা পিতামহীর গল্প নহে। আজ যদি বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরণপ্রান্তে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বান্দালার ইতিহাস স্থাপন করিয়া প্রবোধ ও নবীন অনেক ঐতিহাসিক আপন

আপন পরিশ্রম সফল হইল, মনে করিতেন। বাঙ্গালার কলঙ্ক অপ-
নোদিত হইয়াছে ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্যকুজের বা চৌরবংশের কলঙ্কও
অপনোদিত হইয়াছে। নূতন আবিষ্কারের উজ্জ্বল আলোকে স্পষ্ট
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, “Effeminate Hindoo” কথাটি
মিথ্যা। তিরোরীর যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তরাপথ বিজিত হয় নাই, যুধিষ্ঠি
চাহমান বীরগণ পদে পদে মুসলমানের গতিরোধ করিয়াছিলেন ; আজ-
মীর বিজয়ের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র অভিযানের আবশ্যক হইয়াছিল ; দিল্লী
পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল। এ সকল কথা “গোহত্যাকারী কৌরিত-
চিকুর” মুসলমান ঐতিহাসিকেরই কথা, হিন্দুর নহে। তাজ্-উল-মাসির
এবং কামিল-উৎ-তওয়ারিখ্ নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয়ে এই সকল
ঘটনার বিবরণ আছে। যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জয়চন্দ্র আত্মবলি-
দান দিয়া স্বদেশ-দ্রোহীতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধান্তে
বিশাল গাহডবাল সাম্রাজ্য মুসলমানের পদানত হয় নাই। জয়চন্দ্রের
মৃত্যুর সাত বৎসর পরেও তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র কাশ্যকুজ রক্ষা
করিয়াছিলেন, মহম্মদ-বিন্-সাম কাশ্যকুজ অধিকার করিতে পারেন
নাই। আমি এই কথা দেখাইয়া দিয়াছিলাম। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা
ভিন্সেন্ট স্মিথ্ তাঁহার ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে একথা স্বীকার
করিয়াছেন।

চতুর্দশবর্ষীয় আকবর অগণিত মোগলবাহিনীর সাহায্যে পিতৃ-
রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা ও প্রশস্তি রচয়িতাগণ
মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণগান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু যে বীর বালক
সপ্তদশবর্ষ বয়সে একাকী সমুদ্রোন্মীর মতন মুসলমান-প্লাবনের গতি-
রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, যাহার বাহুবলে জয়চন্দ্রের মৃত্যুর
সপ্তবর্ষ পরেও কাশ্যকুজের প্রাচীন দুর্গশীর্ষে গাহডবাল-কেতন অক্ষুণ্ণ
ছিল, সেই হরিশ্চন্দ্রদেবের চিরস্মরণীয় নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে
নাই। মুসলমানের ইতিহাসেও নাই, হিন্দুর ইতিহাসেও নাই। ষোড়-
পুরের রাঠোর রাজবংশ জয়চন্দ্রের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া

থাকেন, তাঁহারাও অল্পদিন পূর্ব পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রদেবের নাম অবগত ছিলেন না। মেবারের শিশোদীয় চারণকুল হাশির, জয়মল, পণ্ডের বীরত্বের গাথা গাহিয়া থাকে ;—রাঠোর চারণ যশোবন্ত ও দুর্গাদাসের গুণগান করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহারাও সপ্তদশবর্ষীয় বালক নরপতি হরিশ্চন্দ্রদেবের অপূর্ব বীরত্বের কথা অবগত নহে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দুর মরণ নিকট হইয়াছিল। সেই জন্মই মুসলমানগণ দশ বৎসরের মধ্যে সিদ্ধুতীর হইতে গোঁড়ে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু যখন মরিতে বসিয়াছিল, তখনও তাহার বীরত্বের অভাব হয় নাই, নূতন আবিষ্কারের আলোকে ইহা স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায়। যখন চাহমান পরাজিত হইল, তখন গাহডবাল হয় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, না হয় বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল ; তখন পাল ও সেন, চন্দেল ও শিশোদীয় দূরে দাঁড়াইয়া দর্শকের মত সর্বোত্তম প্রতিবেশীর সর্বনাশ দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে গাহডবালের সর্বনাশ হইয়া গেল। জয়চন্দ্রের পুত্র যখন কাম্বুকাজ রক্ষায় ব্যস্ত, তখন হীনবল পালেদেরও সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সেন তখনও নির্বিকার, অথবা গৃহবিবাদে ব্যাপ্ত। যখন সেন মরিল, তখন আর দর্শক রহিল না। এই জন্মই উত্তরাপথের সর্বনাশ হইয়াছিল। এতদিনে ভারত-কলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছে, সত্য সত্যই অপনোদিত হইয়াছে। কিন্তু বক্ষিমচন্দ্র নাই, তাহা শুনিয়া উপভোগ করিবে কে ?

ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বক্ষিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্তি বাঙ্গালীর উৎপত্তির বিশ্লেষণ। ১২৮৭ সালের পৌষ মাস হইতে ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বক্ষিমচন্দ্রের ‘বাঙ্গালার উৎপত্তি’ নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার প্রতিপাত্ত বিষয় সাত ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং সর্বশেষে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশের অধিবাসিগণ বিশুদ্ধ আর্য্যবংশ-সম্মত নহেন। “বাঙ্গালা-
নার মধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অতীত কোন আর্য্যদেশে অনার্য্য শোণিতের

এত প্রবল স্রোত বহে না।” তেত্রিশ বৎসর পূর্বে আর্য্যজাতিমানী বাঙ্গালাদেশে এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রমাণ দান করে। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, “অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্বে পৌণ্ড্রদেশ বলিত। মনুর শেষোক্ত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এদেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই, বা আর্য্যজাতি আইসে নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, সেখানে পৌণ্ড্রদিগকে লুপ্তকিয় ক্ষত্রিয়মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি আইসে নাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহুপূর্বে ক্ষত্রিয়েরা এদেশে আসিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারস্য, এবং গ্রীস্ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে হইবে। কেন না, পৌণ্ড্রগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পহ্লব, এবং যবন-সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে। মনু, শক, যবন, পহ্লব (কেহ লিখেন পরুব) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এতদেশবাসী পৌণ্ড্রদিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, মনুসংহিতা সঙ্কলনকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-বিহীন অনার্য্যজাতির বাসস্থান ছিল।” ইহার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া বঙ্গ আর্য্যাদিকারের কাল নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে কেবল চেষ্টামাত্র। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে “বঙ্গ ব্রাহ্মণাধিকার” লিখিত হইয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন আশাই ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সুহৃদ্ মহামহোপাধ্যায় ত্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর্য্যাদিকারের পূর্বে বঙ্গের অবস্থা নিরূপণের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে ইহার কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত এবং হরপ্রসাদের

পদ্মাবলম্বনেই বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আৰ্য্যবিজয় নামক মৎ-
প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' প্রথম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখিত
হইয়াছে।

শ্রীরাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বক্ষিম-মণ্ডল বা বঙ্গদর্শন।

স্বপ্ন আবেশে অনন্ত আকাশে
দেখিলাম, তানু, অনুচর লয়ে,
আলোক-লীলায় চলেছে কোথায়,
বিবিধ ছটায় উজ্জলি আনয়ে ;
রবির প্রভাসে গ্রহদল ভাসে,
আলোক লইয়া আলোক বিলায় ;
সৌর কেন্দ্র ঘিরে কত দূরে ফেরে,
কত নব পথ আলোকিয়া ধায় ;
সেথা দিবানিশি হাসে পূর্ণ শশী,
সেথা দিবাকর নাহি অন্ত যায় ;
চির সমুজল সেই গ্রহদল
চির সমুদিত সেই সবিতায়।

দেখিতে দেখিতে যেন আচম্বিতে
দেখি সে রবির ছবি সেথা নাই।

অকণ্ঠের সম অতি অনুপম
 যেন তনু কার ভাতিছে সে ঠাই ;
 শশীকর দিয়া যেন তা' গড়িয়া
 রবির করে কে করিয়েছে স্নান,
 প্রখরতা নিয়া ছানিয়া ছানিয়া
 কে যেন লাভ্য করেছে নির্মাণ ;
 অঙ্গের সৌষ্ঠবে বর্ণের গৌরবে
 যেন সে সরম দিবে দেবতায় ;
 ললাটের তলে নয়ন-কমলে
 আপনি প্রতিভা ফুটিবারে চায় ।

দেখে চিনিলাম, সে যে অবিরাম
 এ বঙ্গের মহাপুরুষ-প্রবর,
 যাঁর কণ্ঠ হতে অমৃতের স্রোতে
 বহিল নবীন ভাষার নিঝর ;
 যাঁর কণ্ঠানিলে সাহিত্য-সলিলে
 একটি বুদ্ধ একদিন উঠি,
 অনন্ত তরঙ্গে আলোড়ি' এ বঙ্গে
 সঞ্জীবন স্রোতে ঘাইতেছে ছুটি ।

সৌর ক্ষেত্রে চাই, সৌর সখা নাই ;
 প্রতি গ্রহে দেখি নবীন মুরতি ;
 নবীন সৃজন, নবীন ভুবন,
 নবীন ভাবের নবীন ক্ষুরতি ;
 সৌর সভাস্থলে নব নভোতলে
 অভিনব সভা দেখি সমাবেশ ;
 সে পুরুষবরে বসিয়াছে ঘিরে
 প্রতিভার করে উজলিয়া দেশ ;

হেমচন্দ্র কবি— দেশপ্রেম ছবি—
 গিরিস্রোত প্রায় ভাষায় প্রবল ;
 পাশেতে নবীন, বহে অশ্রুদিন
 কাব্যক্ষেত্রে যেন প্রবাহ তরল ;
 কাছে জ্ঞান জ্যোষ্ঠ সেই রাজকৃষ্ণ—
 অক্ষুণ্ণ বিস্তার বিদ্যাবারিধির ;
 সঙ্গে চন্দ্রনাথ, ভাবের প্রপাত
 শাস্ত্র উৎস হ'তে ঝরে ঝির ঝির ;
 চন্দ্রশেখরের 'উদ্ভাস্ত প্রেমের'
 উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গ একদিকে ;
 সুধী রামদাস দিতেছে আভাস
 পুরাবৃত্ত পটে, অশ্রু, অনিমিকে ;
 সে ইন্দ্রনাথের রহস্য ভাণ্ডার
 রস চারিদিকে উছলিয়া যায় ;
 স্থির রসময় 'গ্রাবু'র অক্ষয়
 রসের সাগরে ডুবাইতে চায় ।

বুঝিলাম আজি সেই গ্রহরাজি
 উঠেছে আবার স্মৃতির আকাশে,
 সৌর বিশ্ব প্রায় আলোক ছটায়
 একদিন যারা ফুটিল এ বাসে ;
 বঙ্গভাষারূপ গগনের ভূপ
 আলোকিল যেই বিচিত্র মণ্ডল,
 এষে সে ভাস্কর কোবিদ-নিকর—
 বঙ্গদর্শনের সৌর সভাস্থল ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ।

নারায়ণ



আটচালা বা নাচঘর—দক্ষিণ দিক হইতে ।

(বকুল বৃক্ষের নীচে একটি প্রকাণ্ড বেদী ধরিয়া একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে । ঐ বেদীর উপর রাধাবল্লভকে মেলার সময় ফুলের সাজ করিয়া বসান হয় । বেদীটি আগে বাড়ির বাহিরে দক্ষিণ দিকে মেলার স্থানে ছিল । কিন্তু এখন ঐ স্থান রেলওয়ের অধিকারভুক্ত হওয়ায় বেদীটি ভাঙ্গিয়া বকুলতলায় নিয়া আসা হইয়াছে)

বঙ্কিমবাবু ও উত্তর চরিত

১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২/৭৩ খৃঃ অব্দে “বঙ্গদর্শন” সর্বপ্রথম বাহির হয়। যে আজি বিয়াল্লিশ বৎসর হইল। তখন ইংরাজীওয়ালাদের ভিতর সংস্কৃত জানা লোক অতি অল্প ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ সংস্কৃত লইতেই চাহেন নাই। পরে কাউএল সাহেবের চেষ্টায় পরীক্ষায় সংস্কৃত লওয়া হইয়াছিল। সংস্কৃত পরীক্ষা ৫১৭ বৎসর মাত্র হইবার পর ‘বঙ্গদর্শন’ প্রথম বাহির হয়। তখন অতি অল্প লোকই উত্তরচরিত পড়িয়াছিল। কারণ এদেশের টোলে উত্তর-চরিতের চলন ছিল না। ও বইখানি উইলসন সাহেব বোম্বাই হইতে আনিয়াছিলেন। সংস্কৃত উত্তরচরিত যে অধিক লোকে পড়ে নাই ইহা বঙ্কিমবাবু পাকতঃ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন,—

“উত্তর চরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাক্ষ বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত, কেননা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন।”

এতপূর্বে এরূপ একখানি অপ্রচলিত নাটকের দোষগুণবিচার করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু ষাধেট সহৃদয়তা ও সাহস প্রকাশ করিয়াছেন। সহৃদয়তা,—কেননা, নাটকখানি খুব ভাল, বাহার হৃদয় আছে সেই, এ নাটকের মর্ম্ম বুঝিতে পারে, অশ্বে পারে না, পণ্ডিত মহাশয়েরা পারেন নাই, সেইজন্য তাঁহারা ভবভূতিকে মাঘ, ভারবি ও শ্রীহর্ষের নীচে স্থান দিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর হৃদয় ছিল, তিনি এ নাটকখানির মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহা স্বদেশবাসিগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সাহসও প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ, তখন ইউরোপীয় ধরণে কাব্যপরীক্ষা এদেশে আরম্ভ হয় নাই। এদেশের

পণ্ডিতেরা ‘সাহিত্যদর্পণ’ ‘কাব্যপ্রকাশ’ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থের মত-
অনুসারে কাব্যপরীক্ষা করিতেন। বঙ্কিমবাবু সেমত একেবারে ত্যাগ
করিয়া নূতন, ইউরোপেও নূতন, ধরণে উত্তর চরিত সমালোচনা করিতে
বসিলেন।

সংস্কৃত উত্তরচরিত বঙ্কিমবাবুর যে ভাল করিয়া পড়া ছিল, বোধ
হয় না। তিনি ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট
যে সকল কাব্য পড়িয়াছিলেন উত্তর চরিত তাহার ভিতর ছিল না।
তিনি নিজেই বলিয়াছেন, নৃসিংহবাবুর বাঙ্গালা ও টনি সাহেবের
ইংরাজী তর্জমা বাহির হওয়াতেই তিনি উত্তরচরিতের দোষগুণ পরী-
ক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু নিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোক
ছিলেন, উত্তর চরিতের মত কাব্য বুঝিয়া লইতে তাঁহার অধিক বিলম্ব
হয় নাই। তথাপি তিনি বলিয়াছেন “আমরা যে ভবভূতির সমুচিত
প্রশংসা করিতে পারিব, এমত নহে, বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি
অল্প।”

উত্তরচরিত পরীক্ষা করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু আনুষ্ঠানিকগণকে
অত্যন্ত ব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন
যে, উঁহার যেভাবে কাব্য বা নাটক বুঝাইতে চান, সে ভাবে কাব্য
নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। তিনি এক জায়গায়
বলিয়াছেন, “পাঠকগণ আমাদের মার্জ্জনা করিবেন। আমরা
আনুষ্ঠানিক নহি, অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর আমাদের বিশেষ ভক্তি নাই।
এই উত্তরচরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কিনা, ইহা ‘রূপক—কি
উপরূপক, নাটক কি প্রকরণ, ব্যাযোগ কি ত্রোটক, ইহার বস্তু
কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোণায়, কোথায় প্রকরী, কার্য
কি, এ সকল তত্ত্বের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত নহি, ইত্যাদি ইত্যাদি।
পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ, যে অলঙ্কার শাস্ত্র তিনি একে-
বারে বিস্মৃত হউন। নচেৎ নাটকের রস গ্রহণ করিতে পারিবেন
না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাই—এই কবির

সৃষ্টির মধ্যে কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না। পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন, তবে আমাদের অনুমতি ইউন।” অর্থাৎ বাক্সমবাবু এদেশে চলিত কাব্যপরীক্ষা একেবারে ত্যাগ করিয়া ইউরোপের নূতন ধরণের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার জয় জয়কার হইল। বাস্তবিকও একটা পুরাণ, পটা, একঘেয়ে সরুকাটা উপায় ত্যাগ না করিলে তখন কাব্যের ষথার্থ মর্মগ্রহণ করিবার উপায়ই ছিল না, এবং এইরূপে ত্যাগ করিতে বলায় বাক্সমবাবু ষথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, আপনার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং দেশের ষথেষ্ট উপকারও করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তিনি বঙ্গবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু এই বিয়াল্লিশ বৎসরে সংস্কৃত অলঙ্কারের অনেক প্রাচীন ও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে বাক্সমবাবু আধুনিক আলঙ্কারিককে ষত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তত নিন্দার পাত্র নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যশাস্ত্র পরীক্ষা করিতে গিয়া ষথেষ্ট গুণপণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমার এখন এই ধারণা হইয়াছে যে, নব্য আলঙ্কারিকেরা পিঁজিয়া পিঁজিয়া যেখানে যে ছোট বড় গুণটি, দোষটি, অলঙ্কারটি ও রসটুকু থাকে, তাই দেখাইয়া দিতে খুব মজবুত। প্রাচীনেরা ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু পারিতেন। তাঁহার গল্পটি কিরূপে সাজাইতে হয়, সে সম্বন্ধেও পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। রস ও ভাব কিরূপে ধীরে ধীরে ফুটাইতে হয়, তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। মোটামুটি বলিতে গেলে, কিন্তু তথাপি তাঁহার পিঁজিতে পটু “অ্যানালাইজ” করিতে খুব পটু। নূতন ধরণের ষে পরীক্ষা অষ্টাদশ শতকে জার্মানীতে আবির্ভূত হইয়া এখন সমস্ত ইউরোপ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং আমাদের দেশেও আসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত। ছোটখাট দোষ গুণ অলঙ্কার রস তাঁহার একেবারেই দেখিতে চাহেন না। তাঁহার সমস্ত বইটা বেশ

করিয়া হজম করিয়া তাহা হইতে রস আকর্ষণ করিতে চাহেন। ইহাকে আমরা সমগ্রভাব বা “সিন্থেসিস্” বলিতে চাহি। এই দুই প্রকারের পরীক্ষায় না পাকিলে কাব্যের রসাস্বাদে অধিকারই হইতে পারে না, এই আমার বিশ্বাস। যদি শুধু দেশী প্রথায় চল, কেবল ছোট ছোট জিনিষ দেখিবে,—যদি শুধু ইউরোপীয় প্রথায় চল, কেবল বড় জিনিষ দেখিবে, ছোটের দিকে একেবারে দৃষ্টি থাকিবে না। সুতরাং এই দুইএর একত্র মিলনই সকলের চেয়ে ভাল। কিন্তু যখন একটার দিকে অধিক ঝোঁক দিয়া আর একটাকে একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া হয়, তখন সেই লোপকরা জিনিষটার উপর ঝোঁক দিয়া যেটা চলিতেছে, তাহাকে লোপ করিবার চেষ্টা হয়। বঙ্কিমবাবুও ঠিক তাই করিয়াছিলেন, তিনি প্রাচীন পথ লোপ করিয়া নূতন পথ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় সেটা দরকারই হইয়াছিল, নহিলে অলঙ্কারে ও দর্শনে কিছু তফাৎ থাকিত না এবং সে অলঙ্কারের হাতে পড়িয়া কাব্য একেবারে অতল জলে ডুবিয়া যাইত। কিন্তু এখন সময় আসিয়াছে যে, আমরা দুই পথই দেখিব, ছোট জিনিষও দেখিব, বড় জিনিষও দেখিব। শব্দের পর শব্দ দিয়া যে গুণ হয় বা অলঙ্কার হয়, তাহাও দেখিব এবং ঘটনার পর ঘটনা পড়িয়া গল্পটি কি প্রকারে মনোহর হইয়া উঠে তাহাও দেখিব। তবে ত পূরা কাব্যখানার রস আস্বাদন করিতে পারিব? এ দুয়ের কোন-টিই ছাড়িবার যো নাই।

উত্তর চরিত্রের প্রথম অঙ্কে “চিত্রদর্শন।” বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন “ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে, যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব ঘটনা সকল বর্ণনা করেন। রামসীতার অলৌকিক অসীম ও প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য।” আমরা বলি যদি চিত্রদর্শনটি প্রথম অঙ্কে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে বাধ্য হইতাম, যে উত্তরচরিত্র মহাবীর চরিত্রের শেষ অংশ মাত্র। মহাবীরচরিত্রে ভবভূতি বাণ্যীকির গল্পটা অনেক জায়গায় ত্যাগ করিয়া নিজের মনগড়া করিয়া লইয়াছিলেন,

সেই মনগড়া গল্পের উপর মহাবীরচরিত হইতে পারিয়াছিল ; কিন্তু উত্তর-চরিত হইতে পারে না। তাই কবি বীরচরিতের গল্পটিকে পরিহার করিয়া আবার পুরাণ পথ অনেকটা ধরিলেন। যেন ভবভূতি মহাবীর-চরিতে বাঙ্গালীর পথ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছিলেন, চিত্রদর্শনে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে কত-কটা মিটমাট করিয়া লইলেন। কিন্তু বন্ধিমবাবু বলিলেন এটা উদ্দেশ্যই নয়। আমরা ত দেখিতেছি এ একটা প্রধান উদ্দেশ্য। এই চিত্রদর্শন ভবভূতি কোথায় পাইলেন ? সেটাও ত একটি দেখিবার কথা। সেটা দেখিতে পাইলে আমরা যে কেবলমাত্র উত্তরচরিত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব তাহা নহে ; সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে একটা পরম্পর সম্বন্ধ আছে, তাহাও বুঝিতে পারিব এবং বুঝিয়া আনন্দরসে আপ্ত হইব। ভবভূতি এটি কালিদাসের গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন। ভবভূতি সংস্কৃতের শেষ কবি—ভাবে শেষ কবি—রসের শেষ কবি—প্রতিভার শেষ কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে বাহা কিছু ভাল আছে, তিনি সব সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাতে আরও রসান দিয়াছেন। রঘুবংশের চতুর্দশ সর্গের পঁচিশ কবিতায় আছে যে, রাম ও সীতা সমস্ত ইচ্ছিকার্থ লাভ করিয়া নানাচিত্রশোভিত গৃহমধ্যে দণ্ডকারণ্যে যে সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন তাহাই স্মরণ করিয়া সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সুতরাং সেই যে, চিত্রগুলি সে গুলি দণ্ডকারণ্যেরই চিত্র। সে চিত্রগুলি দেখিলেই পূর্বের কথাগুলি মনে পড়িত এবং রাম ও সীতার তাহাতে আনন্দ হইত। তাই এখানে ভবভূতি সাহস করিয়া এই চিত্রগুলি আনিয়াছেন। ইহাতে সুধু দণ্ডকারণ্যের বৃত্তান্ত নহে রামচরিতের প্রথম হইতে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত ছবিই ছিল। ভবভূতি এই চিত্রদর্শন এত বাড়াইয়া তুলিলেন কেন ? কালিদাসের শ্যায় সুধু দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার লইয়া থাকিলেই ত হইত। একটু বিশেষ কারণ আছে। রাম ও সীতার মনে আবার সেই বিরহ-ভাবটা জাগাইয়া দেওয়ার দরকার হইয়াছিল। তাই কবি বর্ষাকালে

মাল্যবান্ পর্বতে রামের কাম্মার ছবি দেখাইয়া চিত্রদর্শন এক প্রকার সাগ্ন করিলেন। যখন লক্ষ্মণ বলিলেন,

“সোহয়ং শেলঃ ককুতসুরভির্মাল্যবান্ নাম যস্মিন্
নীলঃ স্নিগ্ধঃ শ্রয়তি শিখরং নূতন স্তোয়বাহঃ ॥”

অমনি রাম বলিয়া উঠিলেন,

“বৎসৈতস্ম্যাৎ বিরম বিরমাতঃ পরং ন ক্রমোহস্মি
প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জ্ঞানকীৰ্ত্তিপ্ৰয়োগঃ ॥”

চিত্র দেখিয়া রামেরি মনে হইতে লাগিল সীতার সহিত বিচ্ছেদ হইবে, তখন সে চিত্র দেখিয়া সীতার মনে কি ভাব হইল, অনায়াসেই অনুমান করা বাইতে পারে। রামসীতার মনে এইরূপ একটা বিরহের ত্রাস উৎপাদন করা চিত্রদর্শন প্রস্তাবের একটা উদ্দেশ্য নয় কি? এ প্রস্তাবের একটা উদ্দেশ্য বন্ধিমবাবু ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “রাম সীতার অলৌকিক অসীম প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য।” কথাটা ঠিক, কিন্তু যে তিনটি বিশেষণ দিয়াছেন, তাহাতে কবির কথাটি ফোটে নাই। চিত্রদর্শনে ও সীতার নিদ্রায় কবি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাম ও সীতা গোড়ায় দুই থাকিলেও ক্রমে ক্রমে ক্রমে,—ক্রমে ক্রমে ক্রমে এক হইয়া গিয়াছিলেন, রামের হাতে মাথা রাখিয়া সীতার নিদ্রা আর কিছু নহে, রামের সন্ধ্যায় সীতার সন্ধ্যা সম্পূর্ণরূপে ভুবিয়া যাওয়া। যতক্ষণ চিত্র দেখিতে-ছিলেন, ততক্ষণ উহাদের শরীর ও মন ক্রমে কাছে কাছে আসিতেছিল। নিদ্রাবেশে আরও কাছে, আরও কাছে, আরও কাছে আসিল; সীতা যখন ঘুমাইয়া পড়িলেন তখন রাম বলিলেন,—

“ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবন্তি নয়নয়ো—

রসাবস্থাঃ স্পর্শো বপুষি বহলচ্চন্দনরসঃ।

অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমহগো মৌস্তিকসরঃ

কিমস্তা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহস্তু বিরহঃ ॥”

তখন সীতার স্পন্দ নাই। ইহারই একটু পরে সীতা স্বপ্ন দেখিয়া

কাঁদিয়া উঠিলেন “হা আর্ধ্যপুত্র! তুমি কোথায়?” রাম সীতার ঘুম যাহাতে না ভাঙ্গে তাহা করিলেন, বলিলেন চিত্রদর্শনের ক্ষণ্য ইহার উৎকর্ষ। বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইক্ষণ্য ইনি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহার পরই সীতার মুখের দিকে চাহিয়া রাম বলিলেন:—

“অদ্বৈতং সুখদুঃখয়ো রমুগুণং সর্দাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যন্মিল্লহার্যো। রসঃ।
কালেনাবরণাত্যাৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সূমানুষস্য কথমপোকং হি তৎ প্রাপ্যতে ॥”

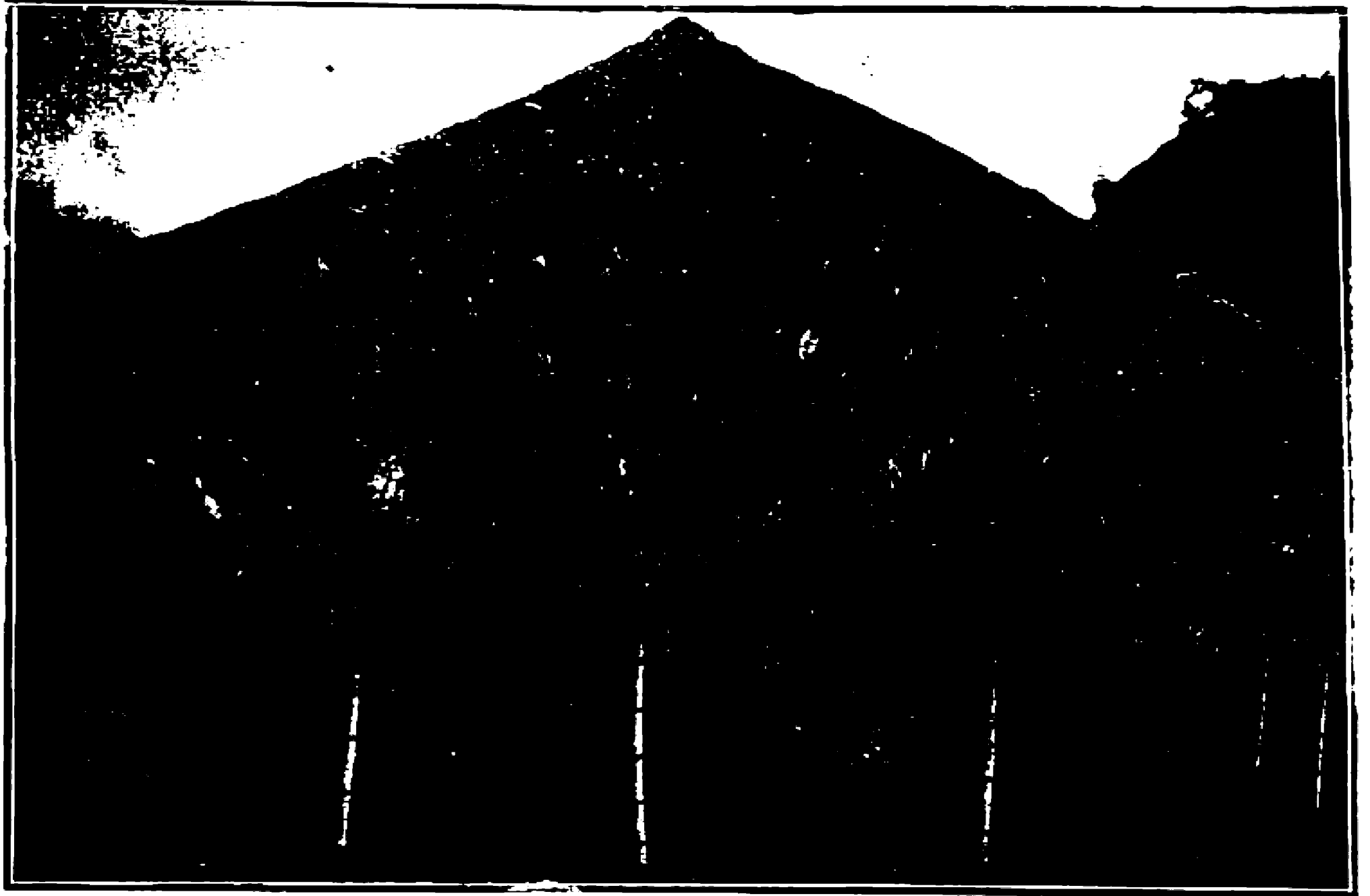
এরূপ সূমানুষের প্রেম অতিক্রম্যেই পাওয়া যায়। এরূপ বোধ হয় একবারই হইয়াছিল। ইহা সুখে এবং দুঃখে অদ্বৈত। সকল অবস্থাতেই অনুকূল। এই প্রেমেই হৃদয়ের বিশ্রাম হয়। বৃদ্ধি হইলে ইহার রস শুদ্ধ হয় না বরং যত কাল বাইতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে যে আবরণ থাকে তাহা দূর হইয়া যায় এবং সে প্রেম স্নেহের সার হইয়া উঠে।

সীতার সত্তা ত নাইই, সেত রামে ডুবিয়াই গিয়াছে। তাহার উপর রাম বলিতেছেন “অদ্বৈতং”, “একং” অর্থাৎ সীতা ও আমি একমেবাদ্বিতীয়ং। চিত্রদর্শন প্রস্তাবের এই যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য বন্ধিমবাবু তাহা ধরিয়াছিলেন, কিন্তু বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি ফুটাইতে পারেন নাই। আমি ফুটাইবার কতকটা চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফুটাইতে গেলে প্রবন্ধ তিনগুণ হইয়া পড়িবে, তাই এই-খানেই ক্ষান্ত হইলাম।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এত কৌশলে ভবভূতি রাম ও সীতার প্রেমে সম্পূর্ণ অদ্বৈত ভাবটি দেখাইলেন, এর উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, জগৎকে দেখান যে, সীতার বনবাসে রাম যথার্থই আত্মবলি দিয়াছেন। যখন সীতা ও রামে কোন প্রভেদ নাই, তখন সীতার বিসর্জনের অর্থ রামেরও আত্মবিসর্জন। বন্ধিমবাবু ভবভূতির উপর বড় চটিয়াছেন, কারণ, তিনি রামকে কঁাদাইয়া-

ছেন। তিনি বলিয়াছেন “এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। নিম্নলিখিত উক্তি শুনিলে বা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কোন অধ্যাপক বা ছাত্রের রচনা,—শব্দের বড় ঘটা কিন্তু অস্তঃশূন্য—” “এইরূপ রচনা ভবভূতির শ্যায় মহাকবির অযোগ্য, কেবল আধুনিক বিদ্যালঙ্কার-দিগের যোগ্য।” বঙ্কিমবাবু যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহার যেরূপ প্রতিভা ছিল, তাহাতে তিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সাহস করিয়া সেই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল উক্তি, তাঁহার সাহস ও প্রতিভার পরিচয়। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। যে রামচন্দ্র এই-মাত্র আপনাকে সীতার সহিত এক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রামচন্দ্র সীতার বনবাসে নিজের যে সব নাশ হইল তাহাও বুঝিয়াছেন। সীতাকে, দুশ্মুখের মুখে নিন্দা শুনিবামাত্র, ত্যাগ করিতে তিনি স্থির সঙ্কল্প; এই যে ঝটপট একটা মীমাংসা করিয়া ফেলা কি অসামান্য বীরের কৰ্ম্ম নহে? তিনি মন্ত্রসভা আহ্বান করিলেন না, মন্ত্রণা করিয়া সময়ক্ষেপ করিলেন না, একেবারে দুশ্মুখকে দিয়া লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, সীতাকে বিসর্জন দাও। বঙ্কিমবাবু এ দিক হইতে একেবারে দেখেন নাই, তিনি কান্নাই দেখিয়াছেন, কিন্তু সেই কান্নার ভিতর যে অমানুষ তেজ—অমানুষ বীরত্ব রহিয়াছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। তিনি ভবভূতিকে পরীক্ষা করিতে গিয়া ভবভূতির অলৌকিক ক্ষমতার কথাটা ধরিতেই পারেন নাই। রামায়ণে রামচন্দ্র সভায় সীতার অপবাদের কথা শুনিয়া একটুও বিচলিত হইলেন না। হইলে তখনি তাঁহাকে লোকে কাপুরুষ বলিত। সেখান হইতে উঠিয়া ভাইদের ডাকাইলেন, মন্ত্রণা করিলেন, বলিলেন,—‘সীতাকে বিসর্জন দিয়া আইস’ কিন্তু সীতার সহিত দেখা করিলেন না। সূতরাং তিনি ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন, চোখের জল সামলাইতে পারিলেন, মনের আগুণ মনেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু ভবভূতির ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্তরূপ। চিত্রদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া রাম ভাবি-

নারায়ণ



আটচালা বা নাচঘর ।
(পশ্চিম দিক হইতে)
৫১৫ পৃষ্ঠা ।

গাছেন সীতার কথা ; সীতা ভাবিয়াছেন রামের কথা ; ক্রমে সীতার সস্তা রামে ডুবিয়া গেল, রাম সীতাময় ও সীতা রামময় হইয়া উঠিলে ক্রমে দুইয়ে এক হইয়া গেলেন । তখনই দুস্মুখ তাঁহাকে সীতার অপ-
বাদের কথা বলিল । রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং পরে উঠিয়া
কাঁদিলেন । বন্ধিমবাবু বলিলেন, রাম কাপুরুষ, কিন্তু সীতা বিসর্জন
মীমাংসার উপনীত হইতে ত তাঁহার এক মিনিটও দেরি হইল না ।
লক্ষ্মণকে আক্রান্ত করিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না । তিনি আত্মবলি
দিলেন, তাহার উপর দুকোঁটা চোখের জল পড়িল বলিয়া তাঁহাকে
কাপুরুষ বলিব ? বন্ধিমবাবু বলিয়াছেন, আর যে বলিতে হয় বলুক,
আমি ত পারিব না । আমি ত দেখি এ রাম রামায়ণের রামের
অপেক্ষা, প্রেমেও বড়, বিরহেও বড়, বীরত্বেও বড় । তবে মানুষ
ত ? রক্ত মাংসের শরীর ত ? এ অবস্থায় নির্জনে বিশেষ সীতার
সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন ও বিলাপ কিছুতেই পরিহার করা যায়
না ।

উত্তর চরিত্রের তৃতীয় অঙ্ক সব অঙ্কের চেয়ে ভাল । উহাতে
রামকে পঞ্চবটী আনা হইয়াছে, যে পঞ্চবটীতে রামচন্দ্র সীতার সহিত
বনবাসে থাকিয়া দশ বৎসরকাল নির্মল দাম্পত্যসুখ উপভোগ
করিয়াছিলেন, বিধির বিপাকে আজ আবার রামচন্দ্র সেই পঞ্চবটীতে
উপস্থিত হইতেছেন । এখন সীতা নাই, সীতাকে রাম ইচ্ছাপূর্বক
বনবাস দিয়াছেন, সুতরাং তাহার কোন খোঁজও লইতে পারেন নাই ।
অথচ পঞ্চবটীর সর্বত্রই সীতার স্মৃতি জাগরুক । এরূপ অবস্থায় রামকে
কিভাবে সাহুনা করা যায় । যদি কোন বিশেষরূপ সাহুনার উপায়
না করা যায়, তাহা হইলে তিনি পাগল হইয়া যাইবেন, বা তাঁহার
জীবননাশের সম্ভাবনা । পঞ্চবটীতে গোদাবরীর নিকট মুরলানদী গিয়া
তাই বলিলেন,—রামচন্দ্র এখনই মূর্চ্ছিত হইবেন, তুমি ঠাণ্ডা হাওয়া
করিয়া তাঁহার মুচ্ছা দূর করিও । গোদাবরী বলিলেন,—রামকে
সাহুনা করিবার একটি ভাল উপায় উপস্থিত হইয়াছে, ভগীবতী

ভাগীরথীর কথায় সীতা নিজেই ফুল তুলিতে পঞ্চবটী আসিয়াছেন, আজ তাঁহার ছেলেদের জন্মতিথি পূজা। সীতার সঙ্গে তমসানদী আছেন। ভগবতী ভাগীরথী তাঁহাদের দুজনকেই অদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা সকলকেই দেখিতে পাইবেন, অথচ তাঁহাদের কেহই দেখিতে পাইবেন না। বলিতে বলিতে গোদাবরীর হ্রদ হইতে সীতা উঠিতে লাগিলেন, এমন সময় নেপথ্যে শব্দ হইল “প্রমাদঃ প্রমাদঃ।” কে একজন বলিয়া গেল, সীতা যে হাতীর ছানাটিকে নিজে হাতে মানুষ করিয়াছিলেন, আর একটা দুষ্ট হাতী আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, কে এখন ইহাকে রক্ষা করিবে? শুনিয়াই সীতা বুলিয়া উঠিলেন, “আর্য্যপুত্র আমার বালককে রক্ষা কর”। এ যে পঞ্চবটী, পঞ্চবটীতে তাঁহার যেমন অভ্যাস ছিল, তেমনি বলিয়া ফেলিলেন; তাহার পরই যখন সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহার যাহাতে চেতনা হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে রামের রথ আসিয়া পৌঁছিল। রাম বলিলেন, “বিমানরাজ অত্রৈব স্থীয়তাম্”। সে স্বর সীতার কানে ঢুকিবামাত্র তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া তমসা তাহাকে ব্যঙ্গ্য করিয়া বলিলেন, “কি একটা স্বর শুনিয়া তুমি এমন বিহ্বল হইয়া গেলে?” সীতা বলিলেন, “না তমসা, এ স্বর আমার চিরপরিচিত। ইহা আমার আর্য্যপুত্রের স্বর, ইহাতে আমার কান ভরিয়া গিয়াছে।” ক্রমে বনদেবতা বাসন্তী আসিয়া রামের কাছে জুটিলেন। সীতার কাছে ত তমসা আছেনই। সীতা শোকে অভিভূত হইলে তমসা তাঁহাকে সাহুনা করেন; কেননা তিনি নদী, তিনি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা করাই তাঁহার স্বভাব। কিন্তু ওদিকে রামচন্দ্র বেশী শোকে অভিভূত হইলে বনদেবতা বাসন্তী তাঁহাকে পুরাণ কথা স্মরণ করাইয়া আরও উত্তেজিত করিয়া তুলেন, কারণ তিনি বনদেবতা তাঁর সহৃদয়তা বড় কম। তাঁহাকে একটু নির্ভুর বলিলেও বলা যায়, যেহেতু তিনি বনের দেবতা। রাম মূর্চ্ছিত

ইইলে তমসার পরামর্শে সীতা আসিয়া রামকে স্পর্শ করেন, তাহাতে রামের মুচ্ছা ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি সীতার হাত ধরিবার চেষ্টা করেন, একবার ধরিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয়, কিন্তু তিনি সে হাত রাখিতে পারেন নাই। এই যে সীতা,—অদৃশ্য সীতা—ছায়া সীতা—ভবভূতি ইহা কোথায় পাইলেন? বঙ্কিমবাবু ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু সে কথাটি বলেন নাই বরং বলিয়াছেন জিনিষটা একটু লম্বা হইয়াছে। যতটুকু ইইলে মানাইত তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ভূদেববাবু বলিয়াছেন যে, ও ছায়া-সীতা রামের কল্পনা মাত্র। “হ্যালিউসিনেশন” মাত্র। কেননা রাম যখনই ধামেন তখনই সীতা কথা কন, অর্থাৎ রাম সুখে থাকিলে তাঁহার হৃদয় হইতে ঐ সকল কথা বাহির হয়। এই ‘হ্যালিউসিনেশন’ বুঝাইবার জন্য ভূদেববাবু তেষ্টা পাতা লিখিয়াছেন, অনেক গুণপনা দেখাইয়াছেন, অনেক গভীর কথার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু জিনিষটি খোলে নাই। তাঁহার তেষ্টা পাতা পড়িয়াও কাহারও বিশ্বাস হয় নাই যে এটি সত্য সত্যই রামের বিপ্রলম্ব বা “হ্যালিউসিনেশন”। বঙ্কিমবাবু বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন নাই। ভূদেববাবুর কথায় প্রতীতি ইইল না। তবে এ ছায়া সীতা কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া বুঝিব? এক উপায়—সেই উপায়—সংস্কৃত সাহিত্য-সাগরে ডুব দাও। দেখ ভবভূতি কোথা হইতে এ ছায়াসীতা আনিয়াছেন, এবার বেশী-দূর বাইতে হইবে না, অভিজ্ঞানশকুন্তলেই ছায়াসীতার মূল পাওয়া যাইবে। কোশলী কালিদাস শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে একটি অপ্সরাকে তিরস্করণী বিভাঘারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে দুঃখস্তের বিরহযন্ত্রণা দেখাইয়াছেন ও তাহার মুখে শ্রোতাদের শকুন্তলার অবস্থা জানাইয়াছেন। সে অপ্সরা বারম্বার বলিয়াছে যে শকুন্তলা যদি দুঃখস্তের এইরূপ অবস্থা দেখিতেন তাহা ইইলে তিনি তাহাকে রাজা যে, পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার জন্য দুঃখ করিতেন না। ভবভূতি দেখিলেন, বাঃ এত বেশ সাজানই আছে! আমি কেন তিরস্করণী-

আচ্ছাদিত তমসার সঙ্গে সীতাকে আনাইয়া, কালিদাস যাহা করেন নাই তাহা করি; নাটক খুব জমিয়া যাইবে। বাস্তবিকও ভবভূতি তাহাই করিয়াছেন। ভাস হইতে কালিদাসের একটি সুসজ্জিত ঘটনা পাইলেন, তাহার উপর আর একটুকু রসান দিয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আবার সীতার হাত ধরার চেষ্টাটা তিনি ভাসের বাসবদত্তা হইতে লইয়াছেন। এ সৃষ্টিতে মুগ্ধ না হইয়াছেন এমন লোকই নাই। তথাপি বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, ভবভূতির সৃষ্টি ক্ষমতা তত উচ্চদরের নহে। একবিষয়ে বঙ্কিমবাবু ভবভূতিকে খুব উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে আমরা তাঁহার কথাই উদ্ধার করিতেছি,—

“রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিমিত। যখন রস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে স্নেহ উচ্ছলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে—দস্ত ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙিতেছে, মর্ষ ছিঁড়িতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, চেতনা লুপ্ত হইতেছে, দেখিতে পাই, সীতা কখনও বিস্ময়স্তিমিতা, কখনও আনন্দোন্মিতা, কখনও প্রেমাভিভূতা, কখনও অভিমানকুণ্ঠিতা, কখনও আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা, কখনও অনুতাপবিবশা, কখনও মহাশোকে ব্যাকুল। কবি যখন দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক-নায়িকার হৃদয় বেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন।”

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বন্ধিম-প্রসঙ্গ—“গীতার” কথা

সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা—যেদিন প্রথম বন্ধিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। তখন বন্ধিমবাবু ডেপুটিগির্ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পটলডাঙ্গার প্রতাপ চাটুয্যির লেনস্থ বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন।

ইহার পূর্বেও দুই তিনবার প্রকাশ্য সভায় বন্ধিমচন্দ্রের দর্শনলাভ ঘটয়াছিল—কিন্তু তাহা দূর হইতে ; আলাপ পরিচয় ঘটে নাই। আমি তখন বন্ধিমচন্দ্রের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলাম—‘ছিলাম’ কেন বলি, এখনও আছি। যখন স্কুলে পড়ি, সে অবস্থাতেই ভক্তির পূর্বস্বরাগে হৃদয় আপ্নত হইয়াছিল। অতএব প্রথম দর্শনে বন্ধিমচন্দ্রকে সম্ভ্রম মিশ্রিত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছিলাম। আমার তখনকার অবস্থা সেক্সপীয়র অমর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন ;—

Thus, Indian like

* * * I adore

The sun, that looks upon his worshipper
But knows of him no more.

এইভাবে কত বৎসর কাটিয়াছিল, ইতিমধ্যে আমি কলেজ ছাড়িয়া কর্মক্ষেত্রে প্রায় প্রবিষ্ট হইতে বসিয়াছিলাম ; এমন সময় ভাগ্যদেবী একদিন আমাকে বন্ধিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় উপনীত করাইলেন।

উপলক্ষ্যটা বলি। ইহার কিছুদিন পূর্বে আমরা শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলাম। লিওটার্ড নামে একজন আধা ইংরেজ আধা ফরাসী সহৃদয় ভারতভক্ত সাহেব ও আমার স্বর্গগত বন্ধু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। আমিও একজন ছোটখাট পাণ্ডা ছিলাম। তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম ছিল—The Bengal Academy of Literature। ইহার সভাপতি ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ। বঙ্কিমবাবু যাহাতে এই সভার সহিত সংযুক্ত হন, তজ্জন্ম আমাদের সকলেরই আগ্রহ ছিল। তাঁহার সম্মতিসংগ্রহরূপ দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়া, তাই কোন এক অপরাহ্নে আমি বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন ‘ষৌবনে ষোগিনী’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনিই ছিলেন প্রধান দূত—আমি সহকারী মাত্র।

গোপালবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত—কতকটা স্নেহপাত্রও ছিলেন। তিনি তখন কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলি সংগ্রহ ও সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন—বঙ্কিমবাবু ইহার ভূমিকা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব এই উপদূতের কার্য্য করিতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। বিশেষতঃ তখন পর্য্যন্ত আমি ‘সাহিত্যিক’ বলিয়া পরিচিত হই নাই, যদিও তৎপূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি ‘সাহিত্যে’ ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। কারণ, আমার স্মরণ আছে ইহার কিছুদিন পরে কোন বিদ্বৎ সমালোচক নবীনচন্দ্রের ‘কুরুক্ষেত্র’ সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে ‘নবজাত শিশু’ বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইয়া আমরা বধারীতি সংবাদ দেওয়ার পর তাঁহার দ্বিতল কক্ষে নীত হইলাম। আমি সজ্জমের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলে, গোপালবাবু আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্মিতমুখে আমাদের অত্যাধিকার করিয়া

বসিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“দেখুন, ‘সাহিত্যে’ আপনার যে ‘কালিদাস ও সেন্সপীয়ার’ শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি”। বলা বাহুল্য, আমি ইহাতে বিশেষ সম্মান বোধ করিলাম। আমি বলিলাম, “মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ সব আপনি পড়েন নাই।” বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, “হাঁ অনেকই দেখিতে হয় বই কি! কোথায় কোন নূতন লেখকের উদয় হইতেছে তাহার সংবাদ রাখিতে ইচ্ছা করি।” প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু শুনিলেন যে, আমি শীঘ্রই কৰ্মক্ষেত্র ওকালতীতে প্রবিষ্ট হইব, তাহাতে তিনি কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, “তাহা হইলে আপনাকে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে হইতে হারাইব।” আমি নির্বন্ধ করিয়া বলিলাম যে, “তাহা কেন? আমি সাহিত্য চর্চা কিছুতেই ছাড়িব না।” বঙ্কিমবাবু বলিলেন, “আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে Law কিরূপ exacting mistress। বিশেষতঃ যে উকিলের সাহিত্য-চর্চারূপ দুর্গাম রটে, মকেল তাহাকে দূর হইতে পরিহার করে।” বলাবাহুল্য, বঙ্কিমবাবুর উপদেশে আমি তখন মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমি কায়ক্ৰেশে উভয়কূলই বজায় রাখিয়াছি।

এইবার গোপালবাবু নানারূপ ভূমিকা করিয়া আমাদের দৌত্য পেশ করিলেন। তীক্ষ্ণদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র কথার আবরণ ভেদ করিয়া, আরম্ভেই আমাদের দৌত্য নামঞ্জুর করিলেন এবং সাহিত্য পরিষদ কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যখন ভূদেববাবু জীবিত রহিয়াছেন, তখন আর কেহই Bengal Academy of Literature-এর সভাপতি হইতে পারেন না। সভার কার্য আরও অগ্রসর হইলে এবং সভার কিছু সফলতা দেখিলে তিনি সভায় যোগদান করিবেন কিনা স্থির করিবেন। আমাদের দৌত্য এখানেই শেষ হইল। কিন্তু

প্রতিগমনের পূর্বে বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা কহিবার সুযোগ করিয়া লইলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ইহাতে বঙ্কিমবাবু গীতার বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল “ধর্ম-তত্ত্ব” ও “কৃষ্ণ চরিত্রে” নহে, তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের জন্য গীতার এক অভিনব ভাষাও রচনা করিতেছিলেন এবং ইহার কিয়দংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। আমিও তখন গীতার কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা এই যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্ত্তীকালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে। তিনি আরও বলিলেন যে, শেষ ছয় অধ্যায়ের ভাষার ভঙ্গী দেখিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না; বিশেষতঃ বিশ্বরূপ দর্শনই গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত।

বঙ্কিমবাবুর কথা নিঃসার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে পরে আমি অনেক ভাবিয়াছি। তাহাতে আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, বঙ্কিমবাবুর মন্তব্য ভিত্তিহীন নহে। গীতার মর্যাস্তিক ঘটনা অর্জুনের মোহ। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধার্থে সম্বৃত্ত হইলে বিপক্ষ পক্ষে আত্মীয়স্বজন অবস্থিত দেখিয়া অর্জুনের চিত্তমোহ উপস্থিত হয় এবং তিনি ধর্মযুদ্ধে পরাভূত হইতে উদ্যত হইয়া করুণ স্বরে পার্শ্বসারথি ভীকৃষ্ণকে বলেন,—

ন কাঙ্ক্ষ্যে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

তিনি আরও বলেন যে, বরং কৌরবেরা তাঁহাকে নিশিত শরে নিহত করুক, তিনি তাহাদের সঙ্গে অস্ত্রপাত করিবেন না।

এবমুক্তাঃ অর্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাষিতঃ।

বিশৃঙ্গ্য শশরং চাপং শোকসংবিগ্ন মানসঃ ॥

অর্থাৎ এই বলিয়া অর্জুন রণস্থলে শশর ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া

নারায়ণ



বৈঠকখানার বড় হল ।

এইদরে একটা ফরাস পাতা থাকিত, অনেকগুলি থাকিয়া থাকিত এবং কোণের জানালায় নিকটে যে স্থানে একখানা ছাতা রহিয়াছে, তথায় একটা হারমনিয়ম থাকিত । বক্তৃতা বা নৃত্য সময় এই হারমনিয়মে সঙ্গীতাভাস করিতেন ।

২১৬ পৃষ্ঠা ।

বিজয়া প্রেস, কলিকাতা ।

শোকাবুলচিত্তে রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইহারই নাম অর্জুনের মোহ। গীতা ইহার নাম দিয়াছেন “কামল”।

“কুতস্তা কামলমিদং বিষয়ে সমুপস্থিতং।”

এই কামল হইতেই গীতার আরম্ভ। অর্জুনের মোহ অপনোদন করিয়া তাঁহাকে ধর্মযুদ্ধে প্রবর্তিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে বহুবিধ উপদেশ দিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে মৌখিক উপদেশে সে মোহ তিরোহিত হইল না, তখন তিনি আপনার বিশ্বরূপ অর্জুনকে প্রদর্শন করিলেন। এই বিশ্বরূপের বর্ণনায় গীতার একাদশ অধ্যায় নিযুক্ত। সেই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের মোহ তিরোহিত হইল। তাহার পর তিনি বলিলেন :—

নমোমোহঃ স্মৃতির্লক্ষা হংপ্রসাদান্মরাচ্যুত।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

“আমার মোহ অপনীত হইয়াছে। হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।”

আমার বিশ্বাস, গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত ছিল এবং এই বিশ্বরূপ দর্শনই গীতার মুখ্য ঘটনা ছিল। মহাভারতের আদি পর্বে যে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ আছে ইহা সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের সারসংগ্রহ। এই ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের একটি শ্লোক এই :—

যদা শ্রৌষং কামলেনাভিপরে
রথোপস্থে সীদমানেহর্জুনে বৈ
কৃষ্ণং লোকং দর্শয়ানং শরীরে
তদানানশংসে বিজয়ায় সজয়!

ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন যে, “যখন শুনিলাম যে, অর্জুন ‘কামল’-এস্তু হইয়া ‘রথোপস্থে’ অবসর হইয়া উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে সমস্ত লোক দর্শন করাইয়াছেন তখন আর জয়ের আশা করিতে পারি না।”

ভগবদগীতার বক্তা সঞ্জয়ও বলিতেছেন যে, ব্যাসের প্রসাদে তিনি কৃষ্ণার্জুনের সেই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ বাজন্ হৃদ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥

“শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণে আসিতেছে এবং তাহা স্মরণ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ বিস্ময় ও হর্ষ অনুভব করিতেছি ।”

এখানেও বিশ্বরূপ দর্শনের কথা । এই বিশ্বরূপ দর্শনে বাহার মোহ দূর না হয়, তাহাকে সাংখ্যের ত্রিগুণ-তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক, রাজস্বিক ও তামসিকের প্রভেদ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । অতএব বঙ্কিম-বাবু যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত মনে করিতেন, ইহা অসঙ্গত নহে । বাস্তবিক বিশ্বরূপ দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি । কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে দ্বাদশ অধ্যায়—যাহাতে ভক্তের ও ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে এবং যাহাকে বঙ্কিমবাবু গীতার মৌলিক অংশ বিবেচনা করিতেন এবং যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

“যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে । যাহার সকল চিন্তাবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে সে ভক্ত নহে । গীতোক্ত ভক্তির মূল কথা এই । এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই । সেইজন্য ভগবদগীতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ।”—সেই দ্বাদশ অধ্যায়ের কি গতি হইবে ? আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতার শেষ ছয় অধ্যায়েও এমন কয়েকটি শ্লোক আছে, যাহার ধ্বনি মূল গীতার ধ্বনির অনুরূপ । * আমার মনে হয়, এ সমস্তার পূরণ এই যে, মূল ভগবদগীতা (যাহার প্রতি

* দৃষ্টান্তস্বরূপ চতুর্দশ অধ্যায়ের ২২—২৬ শ্লোক ; ১৫ অধ্যায়ের ৫—৬, ও ১২—১৮ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১ হইতে ৬৬ শ্লোকের উল্লেখ করা ঘাইতে পারে ।

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তাহার অধ্যায় ও শ্লোক সংস্থান (arrangement) অশুদ্ধরূপ ছিল। গীতার বর্তমান আকারে পুনঃ সংস্থানের সময় কতকগুলি শ্লোক বিপর্যস্ত হইয়া দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমবাবুর এ কথা ঠিক যে, বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়েই গীতার পরি-সমাপ্তি।

বঙ্কিমবাবুর কথা বলিতে গিয়া গীতার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বসিলাম। কিন্তু ঐদিন বঙ্কিমবাবু গীতার শেষ ছয় অধ্যায় সম্বন্ধে যে মূল্যবান প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা গীতার পাঠক ও সমালোচক-বর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐ দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীন্তন ভারতীয় শ্রমীসমাজে কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অদ্বুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে এই আমি প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম। পরবর্তীকালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপ-দেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। অতএব তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্কিম-স্মৃতি

সে সেদিনকার কথা বলিয়া মনে হইলেও দেখিতে দেখিতে চল্লিশ বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে। যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্ব প্রথম দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তখন আমার বয়স ষোল সতের বৎসর হইবে। আমাদের গ্রামে ভট্টাচার্য্য পল্লীর কালীনাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহের মকদ্দমা। ভিন্ন জাতীয় এক কন্যার সঙ্গে ঐ ভট্টাচার্য্যবংশীয় কালীনাথের বিবাহের ঘটক ও অভিভাবকের বিরুদ্ধে জাতি ও ধর্ম্মনাশের মকদ্দমা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারাসতের মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট, সেই সময়ে উপযুক্ত ঘটনা-সংস্ফট আসামীদের বিচার হয়। আমরা গ্রামের বহুসংখ্যক বালক সেদিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়াছিলাম।

বারাসতের আদালতগৃহ উদ্যান-পরিবেষ্টিত এক সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইহার অল্প দিন পূর্ব পর্য্যন্ত বারাসত জেলা ছিল এবং মহকুমার পরিণত হওয়ার সময়ে দেশবিশ্রুত স্মর আসলি ইডেন সাহেব এখানকার প্রথম মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট হন। বহু বহু প্রধান ব্যক্তির পদার্পণে সেকালে বারাসত পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। প্যারিচরণ সরকার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এখানে জেলা স্কুলের শিক্ষক। কালীকৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র সহোদরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিসূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সর্বদাই তাঁহাদের সঙ্গ-সুখ সন্তোগের লোভে বারাসতে ষাতায়াত করিতেন। সেকালে সমগ্র বঙ্গের মধ্যে বারাসত কলিকাতার নিকটে একটি প্রধান স্থান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বহু বহু সাধুজনের পদরক্ষস্পর্শে পূত-তীর্থস্থানে বিচারাসনে যখন উপবিষ্ট, তখনই তাঁহার সেই সর্বজন-লোভনীয় সৌন্দর্য্যের লীলা-বিলাস সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদা ঋষিরা রামরূপে মুগ্ধ হইয়া রামের পুরুষকান্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমি সে-

দিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়া সেই যে বিচারক বন্ধিমচন্দ্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সৌন্দর্যের তেমন বিজলী-লীলা আর কখন কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কলিকাতার সিংহ-সৌন্দর্য ও চুঁচুড়ার ভূদেব-রূপ দেখিয়াছি, তাহা মানবীয় সাধারণ সৌন্দর্য বলিয়াই মনে হয়। জনসমাজের নেতৃস্থানীয় কেশবের সৌন্দর্য দেখিয়াছি, তাহা প্রতিভার পরাক্রমপুষ্ট, হৃদয়-মন-মাতান সৌন্দর্য সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সে স্থির গম্ভীর সৌন্দর্যরাশিও বিরল বটে, তদায় কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথও সুপুরুষ, কিন্তু যেন মনে হয় মেয়েলী ঢংএর রূপরাশি তাঁর চারিদিক আলো করে। কিন্তু বন্ধিগের সে সিংহ-বিক্রম-বিমণ্ডিত পৌরুষভাবময় সৌন্দর্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে রূপের দেমাক্ বড়ই স্বাভাবিক। বন্ধিমচন্দ্র যে ভয়ানক দেমা'কে ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই, সে অহঙ্কারের কিয়দংশ বোধ হয় তাঁহার পুরুষোচিত সর্বদা-সুন্দর দেহের অহঙ্কার। 'বোধ হয়'—বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উত্তর কালে তাঁহার নিকট, (অস্বদীয় সাহায্য ব্যতিরেকে) পরিচিত হওয়ার সময়ে বা তৎপরে কখনও অহঙ্কারের পরিচয় পাই নাই। সর্বদা সরল লোকের মত সহজ ব্যবহারই করিতেন। ইহাতে পারে হয় ত বা আমি তাঁহার অহঙ্কার প্রদর্শনের যোগ্যপাত্র ছিলাম না।

দেখিতে গিয়াছিলাম বিবাহবিচার, কিন্তু সে সব ভুলিয়া দেখিয়াছিলাম—নয়ন ভরিয়া, পরমানন্দে দেখিয়াছিলাম বন্ধিমবাবুকে। আমার দ্বিগুণ বয়সের বিচারক বন্ধিমচন্দ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট, আর আমি তাঁহার অর্ধেক বয়সের বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাঠক হয় ত বলিবেন, আমি খুব রসজ্ঞ বালক ছিলাম, কিন্তু সে কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না, কারণ বৎসরের বয়স্ক বালকও ফুলের শোভায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। আমিও তেমনি বন্ধিম-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রকৃত কথা এই যে, সেদিন আদালতে বহু উকিল মোক্তার উপস্থিত ছিলেন, পক্ষাপক্ষ আমলা ও অসংখ্য দর্শকে আদালতগৃহ পূর্ণ হইয়া-

ছিল ; সেই জনমগুলীর মধ্যস্থলে রাজাসনে উপবিষ্ট রাজবোধ্য শোভামণ্ডিত বক্ষিমচন্দ্রকেই দেখিয়াছিলাম । তাঁহাকে দেখিয়া একটি রূপবান পুরুষ, অথবা স্বর্গচ্যুত বিদ্যধর বলিয়া মনে হইয়াছিল । সে-দিনকার সে স্মৃতি আজিও নয়নে লাগিয়া আছে ।

প্রথম পরিচয়ের দিন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নবীন বয়সের সে লাবণ্য-লীলার উল্লেখ করিয়া যখন বলিলাম, “আমার জন্মস্থান নলকুঁড়াগ্রামের কালীনাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহ বিষয়ক মকদ্দমা উপলক্ষ্যে বারাসতের আদালতগৃহে বিচারাসনে উপবিষ্ট আপনাতে, আর এই প্রবীণ ও পরিণত বয়সের আপনাতে কত প্রভেদ ! আপনার সে বাবুরিকাটা রুক্ষ অথচ ঘনকৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি-পরিশোভিত মুখ যে দেখিয়াছে, সে আজ আপনাকে দেখিয়া সেই বক্ষিমবাবু বলিয়া কখনই চিনিতে পারিবে না ।” বক্ষিমচন্দ্র প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনি আমাকে বারাসতে দেখিয়াছিলেন ? হ্যাঁ হ্যাঁ এক বামুনের ছেলের বিবাহবিভ্রাটের মামলা আমার স্মরণ হইতেছে । সেইদিন দেখেছিলেন ? সে আজ কতদিনের কথা, আর এ শরীরের উপর দিয়া কতশত প্রকারের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কত অত্যাচারও হইয়াছে, সে সকলের সংখ্যা হয় না । বেঁচে আছি, সময়ে সময়ে ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় ।” আমি যেই বলিলাম, “সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘজীবন যাপনের উপযোগী আয়োজনের ত অভাব ছিল না, তবে কেন এমন হইল ?” উত্তরে বলিলেন, “কতগুলি অত্যাচার শুনিবেন ? প্রথম চাকরির চাপ, চাকরিতে মানুষ আধমরা হয় । তার উপর নিজের সখ—কিছু লেখাপড়ার রোগ ছিল । বঙ্গদর্শনের জন্য কত রাত্রি যে জাগিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই । ঘাড়ে ভূত চাপার মত, আমার বিশ্বামস্থখ-লালায়িত অবসন্ন শরীর গনকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিবারাত্রি খাটাইয়াছে, ইহার উপর অল্প নানা প্রকারেও শরীরের উপর অত্যাচার হইয়াছে । এখন এ বয়সে আর সামলাইবার উপায় নাই ।” বক্ষিমবাবুর এই অকপটতা আমার হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা ফুটাইয়া তুলিল । দেখেছি অনেক

লোক, অনেক বড় লোকও, অনেক সময়ে আত্মগোপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অমরপুরুষ বন্ধিমচন্দ্রের অকপটতা আমার নিকট ঋষি-জনোচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

তারপর বলিলেন, “দেখুন, আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে ও সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কিছু কাজ করিতে বড় সাধ, কিন্তু দেহের অবস্থা সম্যক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। মানসিক পরিশ্রমেই মানুষ অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়ে, শরীর মন উভয়ের শ্রমের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিলে হয় ত এখনও আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত, কিন্তু এ বয়সের উপযোগী শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্র কোথায়?” শেষে গ্রাডফোর্ড প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় দু’চারিটি কন্সর নাম করিয়া বলিয়াছিলেন, “এঁদেরমত স্তর রমেশচন্দ্র প্রভৃতি আমরা কতকগুলি লোক মিলিত হইয়া নানাবিধ শ্রমকর ক্রীড়াকৌতুকে অপরাহ্নকাল গড়ের মাঠে কাটাইতে পারিলে, বোধ হয় শরীরে কিঞ্চিৎ শাস্তি ও শক্তির সঞ্চার হইতে পারিত। কিন্তু এ বয়সে ‘সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশা’র মত ব্যাপারে লিপ্ত হইতেও লজ্জাবোধ হয়। আর সহরের লোক, বিশেষতঃ কলেজের ছেলেরা, বুড়োদের খেলা নিয়ে কত তামাসা করিবে, সেটা বড়ই মুশ্কিলের কথা।”

বন্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার কত কথাই আজ স্মরণ হইতেছে। সেগুলি গুছাইয়া লিখিতে হইলে, নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহারই কথা আলোচনা করিতে গেলে, অনেক কথার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, অথচ তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ছিল বলিয়া নিজের কথাও প্রবন্ধের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে সম্মত নহি। তাই আজ অনেক কথা হাতে রাখিয়া কেবলমাত্র আর দু’তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন উত্তর ও পূর্ববঙ্গালা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বর্তমান হিন্দু সমাজের অবসন্ন কলোবরে, শক্তিসঞ্চারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বক্তৃতা

করিয়াছিলেন, সে সকলের কয়েকটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আল-বার্ট্ হলে আহূত সভা সকলের কয়েকটিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। তৎপূর্বেই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। দুই তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হওয়ার পর, আর তাঁকে দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামত তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কয় দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম, ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া ‘ধর্মকে সরা জ্ঞান’ করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, কোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম টাঁকাক, আর ঐ গুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্ত দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজ-ধর্ম এখন সর্বদ্বন্দ্বমুক্ত হইবে, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই বা খুঁসি তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জে ব্যস্ত।”

এখানে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, স্বর্গীয় বিবেকানন্দও বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণ বাঁধিয়া লোকের নাচানাচির মাথায় মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কীরূপ ধর্মের সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য-ভাণ্ডারেই তাহা পাওয়া যায়। অতি পরিষ্কার ভাবেই তিনি “প্রচারে” সে কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। গুরুশিষ্যের প্রয়োজনের ছলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য গুণের আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে দুটি মাত্র ব্রাহ্মণ্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। কুল-মর্যাদা-সম্পন্ন উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে এক বৈষ্ণবকুলোদ্ভব কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেই প্রকৃত

ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার সমাজ-ধর্মের আদর্শ কত উচ্চগ্রামে উঠিয়াছিল। অধুনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ধর্মতত্ত্বে কেশবচন্দ্রের নামটি উঠাইয়া দিয়া তাঁহার ভক্তেরা হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়াছেন। হায় রে দেশ !

মোগলকুলতিলক আকবর সাহকে আমরা সম্রাটশিরোমণি বলিয়া জানি। বাল্যকাল হইতে শিক্ষাসূত্রে আকবরের বিবিধ গুণমণ্ডিত দিল্লীর মোগল-রাজদরবারকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে জেনারেল এসেম্বলীর হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অবগের প্রলোভন-তাড়িত জনমণ্ডলীর মজলিসে বন্ধিমচন্দ্র সভাপতি। সে সময়ে বন্ধিমবাবু সবেমাত্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ছেন। সভা সমিতিতে যাতায়াত তাঁহার বড় বেশী অভ্যাস ছিল না। বিশেষতঃ সেকালের রবীন্দ্র-সম্মিলন যে কি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। যাহা হউক দারুণ গ্রীষ্মে কঠাগতপ্রাণ সেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রের প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, বন্ধিমচন্দ্র সভাপতির কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। রবীন্দ্রনাথের সে প্রবন্ধের শিরোনাম স্মরণ নাই, তবে তাতে প্রসঙ্গ-ক্রমে মোগল শাসনের উল্লেখ ছিল এবং আকবরের প্রসঙ্গও ছিল।

সভাপতি বন্ধিমচন্দ্রের মস্তব্যে সেদিন একটা বৃহৎ মিথ্যা ধরা পড়িল, একটা দীর্ঘকালব্যাপী লুক্কায়িত সত্যকথা প্রকাশ পাইল। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, “আকবরের নামে দেশের লোক এত নাচে কেন ? তাঁহার দ্বারা হিন্দুজাতির রক্ষা ও স্থিতি বিষয়ে ইচ্ছাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার উচ্চ উদার রাজ-নীতিজ্ঞানের মূলে বিজাতীয় স্বার্থপরতা লুক্কায়িত। তিনি সুবিধামত বাছিয়া বাছিয়া রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজকুমারীদিগকে মোগল অন্তঃপুরে গ্রহণ করিয়াছেন এতে স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়, উদারতার লেশমাত্রও ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, মোগল রাজকুমারীদের সঙ্গে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজকুমারীদের

পরিণয় ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলেও না হয় একদিন মনে করা যাইত যে, তিনি সমদর্শী ছিলেন। সমাজ ও শাসন বিষয়ে আব্দুর সার্থপরতাপুষ্ট অসাধারণ শক্তিসামর্থ্যের পরিচালনায় কৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন মাত্র।”

উপরে কথিত সভার পরদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আপনি কাল আমায় খুব বাঁচাইয়াছেন। এত লোকের জনতা হবে জান্নে কি আমি যেতুম। আমি মনে করেছিলুম, ডিবেটিং ক্লাবের মত অল্প লোক হবে, সেখানে রবিবার প্রবন্ধ পড়্নেন। পরে আমি দু’দশ কথায় আমার মন্তব্য শেষ করিব। একি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার! আমাদের দেশে মিটিংগুলি কি ঐ রকমই হয়?” এই “ঐ রকম” কথাটির অর্থ এই যে, সে দিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ন জেনারেল এসেম্বলীর স্বল্পায়তন হলে লোকে লোকারণ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত। সেই সভায় বহুলোক অতিক্রমে কেবল দাঁড়াইবার স্থান পাইয়া কৃতার্থ। রবিবার প্রবন্ধপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত অধ্যাতনামা জনৈক ভদ্রলোক কিছু বলিতে উঠিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্টভাবে, শেষে রুদ্ধভাবে, পরে অভ্যুত্থিত ইতর বচন-বিদ্ভাসে নানা রঙ্গভঙ্গ করিয়া শ্রোতার সভাগৃহকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সেরূপ দৃশ্য-দর্শন আর কখন ঘটিয়াছিল কি না জানি না। বন্ধিমবাবুর ত নিশ্চয়ই ঘটে নাই। সেই গোলটা খামাইবার জন্য আমি সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাই বন্ধিমচন্দ্র বলিলেন, “আমি পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইবার চেষ্টায় ছিলাম, ভাগ্যে আপনি সে বিরাট গোলটা খামাইতে পারিয়াছিলেন, তাই কাল মান বাঁচাইয়া বাড়ী আসিয়াছি।”

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান্ “পাঠক”

১৮৮৫ খৃঃ অঙ্কের কথা লেখা যাইতেছে। তখন পিতৃব্যদেব বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বহুবাজারের চৌমাথার নিকট ৯২ নম্বর কি এমনি একটা নম্বরের বাড়িতে থাকিতেন। “বঙ্গদর্শন”-প্রেস তখন কাঁটালপাড়া হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে ; কলিকাতা হইতে পিতাঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় তখন “বঙ্গদর্শন” বাহির হয়।

১ আমি তখন চাকুরির উমেদার। কাঁটালপাড়া হইতে প্রায়ই কলিকাতায় যাতায়াত করি, সেখানে আফিস অঞ্চলে ঘুরি। আমাকে বাপ, খুড়া, জ্যেষ্ঠা সকলেই স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন, “আমাদের দ্বারা বাপু, কিছু হইবে না ; নিজে চেষ্টা করিয়া যাহা পার কর।”

কাজেই কলিকাতায় সমস্ত দিন টো-টো করিয়া সন্ধ্যার সময় পিতৃব্য-নিকेतনে ফিরিয়া আসিতাম ; কিছুতে মন বসিত না। তবে সেখানে একটা মৃতি হস্তরস ছিল। তাহাতেই কোন রকমে—কোন রকমে কেন, এক প্রকার আনন্দেই কাটাইতে পারিতাম।

সে হস্তরস পিতৃব্য মহাশয়ের জামাতা, কনিষ্ঠা ভগিনীপতি রাখালচন্দ্র। আমরা উভয়ে সমবয়স্ক ছিলাম। দৈব-দুর্বিপাকে রাখাল আজি অনেক বৎসর হইতে পরলোকে।

আমাদের চট্টোপাধ্যায়-গোষ্ঠীকে রাখাল “Royal Family” বলিত। এই “লব্জের” উপযোগিতা সে অনেকবার, অনেক প্রকারে, নানা অবাস্তুর কথার অবতারণা করিয়া আমাকে বুঝাই-
য়াছিল। সান্ধ্য-মুহুর্তে, উমেদারিতে বিফল-প্রয়াস হইয়া আমি প্রত্যাগত হইলে, সে আমাকে হাসিয়া বলিত, “দেখিলে ত, আমি বলি নাই ? Royal Familyর ছেলে চাকুরি করিবে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ? আর যাইও না। Don't make a fool of yourself any more”.

কথায় রাখাল কাহাকেও ছাড়িত না। কারণ পাইলে সকলেরই সহিত লাগিত, কিন্তু উহারই মধ্যে একটু যথাযোগ্যভাবে রাগাইয়া দিয়া পরে সকলকেই হাসাইত। শ্বশুরও যে তাহার নিকট একেবারেই বাদ যাইতেন, তাহা নহে। তবে শ্বশুর জামাতার উপর রাগ করার বড় কিছু প্রকাশ্য অভ্যুহাত পাইতেন না। এই প্রকল্পেই তাহা বুঝা যাইবে।

কাকামহাশয়ের একজন দরওয়ান ছিল। নাম, কি-একটা “পাঠক।” এখন তাহা আমার মনে নাই। পাঠক বাটীর ভৃত্যাদির এবং রাখাল ও আমার নিকট “মহারাজ” খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সকলে তাহাকে “পাঠক-মহারাজ” বলিত। তাহার কারণও ছিল। সে সকলেরই প্রিয়—নিরোহ, ধর্ম্ম-ভীরু, কোমল-হৃদয়, পঞ্চাশবর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠে রত, কিন্তু বেজায় বোকা। তাহার বোকামিও অনেক সময় আনন্দদায়ক হইত। তাহাকে শিশুরাও ভালবাসিত।

পাঠক-মহারাজ নামে মাত্র দরওয়ান ছিলেন, অর্থাৎ নিজেই সর্বদা দরওয়ান সাজিয়া থাকিতেন। আসল দরওয়ানের কাজ অপরের দ্বারা হইত। তিনি নাগরাজুতায়, অর্ধমলিন সাদা ধান কাপড়ে, অপেক্ষাকৃত সিতপ্রভাবিশিষ্ট কতুয়ায়, উর্দ্ধপুণ্ডে এবং উষ্মীষ-স্পন্দী, হাতে-বাঁধা শ্বেত পাগড়ীতে সম্বিজিত হইয়া গেটের নিকট একটা টুলের উপর ছেলেদের লইয়া নিয়ত বসিয়া থাকিতেন। সেখানে তাঁহার অপর কাজ ছিল—নিত্যকার সংবাদ পত্র ও অশ্রান্ত ডাক লওয়া। ডাক লইয়া তিনি কাকামহাশয়ের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিতেন। ইহা ভিন্ন বাহিরের ডাক লইয়া যাইতেন, কাহাকেও ডাকিতে হইলে ডাকিতে যাইতেন। এই সকল শ্রম-সাধ্য কাজ ছাড়া তাঁহাকে আর বড় একটা কিছু কাজ করিতে দেখি নাই। তিনি যে এক কড়া বুদ্ধি লইয়া ঘর করিতেন না, ইহা পিতৃব্যমহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন। সেইজন্য পাঠক-মহারাজের পক্ষে দ্বারবানের ম্যায় উচ্চ পদলাভ আশ্চর্যের কথা হইয়াছিল। যে কারণে হউক, কাকা-

মহাশয় লোকটাকে পছন্দ করিয়াছিলেন ; বুঝি তাহার ভিতরটা ভাল ছিল জানিয়া তাহাকে কোনরূপে একটা বোড়াতাড়া কাজ দিয়া রাখিয়াছিলেন । কিন্তু দুইট রাখাল, এহেন পাঠক-মহারাজের নিয়োগের দুর্ভাগ্যজনকত্বভেদ করিতে অনেক মাথা ঘামাইয়াছিল । শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একদিন নিশ্বাস ছাড়িয়া আমাকে সাধু ভাষায় বলিয়াছিল, “বুঝিয়াছি, ইহা শশুর মহাশয়ের তাঁহার শ্রুতির প্রতি প্রীতির ফল ।” কথাটার তখন টীকা ভাষ্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় আমি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিলাম । রাখাল বলিল, “আরে জাননা, তোমার কাকার শ্রুতাকুরাণী বলেন, ‘আহা ! পাঠক যথার্থই ভক্তিমান ব্রাহ্মণ ।’ কাজেই, পাঠক আর যান কোথা ?”

পাঠক-মহারাজ একদিন পূজায় বসিয়া গীতার একাদশ অধ্যায়োক্ত অমৃতনিস্যান্দিনী স্তোত্রমালা ভক্তিগদগদ কণ্ঠে আওড়াইতেছিলেন । তিনি সংস্কৃত বুঝিতেন মাথামুণ্ড, এমন কি দেবনাগরও বুঝি ভাল চিনিতেন না । কিন্তু বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ তাঁহার আবৃত্তি মন্দ হইত না । তাহাতে আবার ভক্তির উচ্ছ্বাস সে শ্লোকগুলিকে মধুময় করিয়া তুলিতেছিল । আমি তাহা শুনিতে শুনিতে “আনন্দ মঠে”র পাণ্ডুলিপি লুকাইয়া পড়িব বলিয়া কাকার বৈঠকখানায় যাইতেছিলাম । সে দিন বোধ হয় রবিবার ছিল । সে সময় কাকা ভিতরে থাকেন বলিয়া আমি বৈঠকখানায় যাইতেছিলাম । তখন পাঠক-মহারাজের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল,—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তুমস্যা বিশ্বস্য পরং নিধানং ।
বেদাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥
বায়ুর্ধমোহগিবর্কণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিভূং প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃতঃ
 পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥
 নমঃ পুরস্তাদধ পৃষ্ঠতস্তে
 নমোহস্ততে সর্বত এব সর্বত ।
 অনন্তবীৰ্য্যামিত বিক্রমস্তুং
 সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥

এমন সময় আমি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলাম । ঢুকিয়াই দেখি, আর কেহ নাই, কেবল কাকা একখানি কোচে শুইয়া আছেন, তাঁহার উভয় চক্ষু মুদ্রিত, মুখ-সংলগ্ন সটকার নল নিঃশব্দ, তিনি যুক্তকর বন্ধের উপর গুস্ত করিয়া অনন্যভাবে সেই ব্রাহ্মগোষ্ঠারিত স্তব শুনিতেছেন । মুখে অদ্ভুত ভাব ; কি সুন্দর, কি পবিত্র ! আমি সভয়ে, সসন্ত্রমে পিছাইয়া বাহিরে ঘাইলাম । সেই দৃশ্যে—সেই দৃশ্যে কেন, তাহার পূর্বের ও পরের ঐক্য কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনাতেও আমি অল্প বয়সেও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে কাকার ভিতরে একটা প্রবল ভক্তিশ্রোত গিরিনিরুদ্ধকালোনিবৎ লুক্কায়িত আছে ; বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সময়ে বেগরোধকারী শিলা স্থানচ্যুত হইলে ঐ পূত-শ্রোত কি তরঙ্গলগ্নেই ছুটিয়া সমস্ত বঙ্গভূমিকে প্রাবিত করিবে ! পরে সে শ্রোত পথ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু হায় ! নিষ্ফল হইতে না হইতেই সহসা সন্মুখে কালের অনন্ত সাগর-সঙ্গম দেখিতে পাইয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মিলিয়া গিয়াছিল । বুঝি তেমন করিয়া তাহার সকল তরঙ্গগুলি তটপ্রহত করিয়া খেলিতে অবসর পায় নাই । যদি তাহা হইত তাহা হইলে প্রেমধর্ম-প্রাবিত সমগ্র বঙ্গভূমিতে আজি আবার ভগবন্তক্তির বান ডাকিয়া ঘাইত ।

রাত্রি :০টা পর্য্যন্ত নোচের বৈঠকখানার হলঘরে কাকামহাশয়ের বন্ধুবর্গ সমবেত থাকিতেন । তাঁহারা চলিয়া গাইলে কাকাও উপরে ঘাইতেন । তখন রাখালচন্দ্র ও আমি নির্ভয়ে গল্প-গুজব করিতাম ।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মহারাজেরও স্মৃতি আসিত। কারণ তিনি কাকাকে বায়বৎ ভয় করিতেন। কাকা উপরে যাইলে তিনি ফটকের কাছে একখানি খাটিয়া পাড়িতেন। তাঁহার একটি জীর্ণ দপ্তর ছিল। তাহার দ্বিতরে অনেক অমূল্যরত্ন তুলসীদাসের রামায়ণ, গীতা প্রভৃতি—তিনি শুধু গুছাইয়া রাখিতেন। খাটিয়া পাড়িয়া সেই দপ্তরটি লইয়া তিনি প্রতাহ পাঠ বসিতেন। পাঠ অবশ্য সুর করিয়াই হইত। শ্রোতা ছিল মেঘা সহিস (কোচমান্ মুসলমান ছিল বলিয়া আসিত না) এবং জনৈক পশ্চিমা ফুলুরি-বিক্রেতা। সে ঐ সময় ঙ্কি আসিয়া জুটিত। কখন কখন তাহার সঙ্গে এক বিপুল-দেহ-ভারাক্রান্তা ঘনঘোর কৃষ্ণাঙ্গিনী আসিয়াও হরিগাথা শ্রবণ করিতেন। এই কৃষ্ণাঙ্গিনীকে দেখিলেই রাগালের হাসির উৎস খুলিয়া যায়, তাঁহার সম্বন্ধে তখন অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্যো হাসিতে হাসিতে আমার পেট বাধা হইয়া উঠিত। একদিন পাঠ হইতেছে; পাঠক-মহারাজ পুস্তক-লিখিত কোন কপাই পাঠকালীন একেবারে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে প্রায় প্রত্যেক কথাই কষে বানান করিয়া পড়িতে হইত; তাহাতে শ্রোতাদিগের অর্থবোধ হওয়া দূরে থাকুক, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। কিন্তু “মহারাজের” ভয়ে কেহই উঠিয়া যাঁতে পারিত না। “মহারাজ” বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, রামায়ণ পাঠ শুনিতে শুনিতে উঠিয়া যাইলে মহাবীর কৃপিত হন, আর তাঁহার ক্রোধ হইলে কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ হয় না; পরন্তু রামায়ণ-পাঠ শুনিলে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়। এখন, বেচারী মেঘার বড়ই অর্থকষ্ট ছিল, পঞ্চাশৎ-পরায়ণ ফুলুরিওয়ালারও তখন পর্য্যন্ত পুত্র-মুখদর্শন ভাগো ঘটে নাই। কাজেই তাহারা প্রাণপাত করিয়া পাঠ শুনিত। কিন্তু এ দিন বড়ই দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল। পাঠক-মহারাজ বহু বিলম্বে এক একটি শব্দের বানান নিষ্পন্ন করিতেছিলেন; সম্ভবতঃ তাহা শ্রোতাদিগের একপ্রকার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই অল্পবয়স্ক যুবক মেঘা সহিসের তুলুনি আসিতেছিল; তাহার অন্ত-

রাস্তা তাহাকে ঘুমাইবার জন্য গালি পাড়িতেছিল ; কিন্তু ব্রাহ্মবাক্যে তাহার অটল আস্থা বশতঃ সে তখনও কোনরূপে বসিয়াছিল। পাঠক-মহারাজ পড়িবার অগ্রে বানান করিতেছিলেন,—

প-প-প ; র-র ; পর-ম, ম ; পরম—ইত্যাদি।

“মহারাজ” এইরূপ বানান করিতেছিলেন, এবং এক একবার “আরে মেঘুয়া !” বলিয়া নিদ্রালু মেঘাকে শাসাইতেছিলেন। তদুত্তরে মেঘা প্রতিবারেই চমকিয়া উঠিয়া “শুন্তেই মহারাজ !” কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতেই নিদ্রা-প্রভাবে আবার নতশির হইতেছিল।

উক্ত প্রকারে বানান করিয়া পাঠক যখন সম্পূর্ণ একটি ছত্র বুদ্ধিতে পারিলেন, তখন তিনি উহা হাঁকিয়া পড়িলেন। সেটা যেন তাহার বানানরূপ শত্রুজয়োল্লাসজনিত সিংহনাদ বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হইল। হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথা ও শরীর দুলিয়া উঠিল ; তিনি সোৎসাহে পড়িতে লাগিলেন,—

পরম প্রেম নেহি ষাতি।

সেই সময় অভাগা মেঘার সমুদয় মাথাটা সামনে বুঁকিয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছিল। পাঠক-মহারাজ তাহা দেখিতে পাইয়া বিরক্ত হইয়া পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং মেঘাকে যে শীঘ্র উৎসন্ন ঘাইতে হইবে দয়ার্দ্ৰচিত্তে তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। “ভকত” ফুলুরিওয়ালাও তাহাতে যোগদান করিল। তখন মেঘা ভয়বিহ্বলচিত্তে ব্রাহ্মণের পায়ে জড়াইয়া পড়িল। প্রসন্ন হইয়া শেষে পাঠক-মহারাজ মহাবীরের কৃপার ব্যবস্থা করিলেন ; মেঘাকে ভোগাদি খরচ বাবৎ ১।০ দিতে হইবে। মেঘা অগত্যা অবনত মস্তকে স্নীকৃত হইল। সেদিন আর পাঠ হইল না। পরে শুভদিনে, শুভক্ষণে একদিন পাঠক-মহারাজ মহাবীরের পূজা করিয়া ভোগ লাগাইলেন। প্রসাদে পুরি এবং মালপুষ্পার বাছল্য ছিল,

“জামাইবাবু” এবং আমিও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু ১।০ খরচেও যে সেবার প্রতি মহাবীর প্রসন্ন হইলেন না, তাঁহার আর্থিক কষ্ট যুটিল না, বরং তাহা অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল, তজ্জগৎ মেঝাকে বহুদিন পরেও দুঃখ করিতে শুনিয়াছি।

একদিন কাকার বাসায় সাহিত্যিকদিগের সাক্ষা-সম্মিলন হইয়াছিল। সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত, “বান্ধবের” কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীন-চন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সিংহ-ব্যাঘ্র সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন। যথাকালে সকলে খাইতে বসিলেন। তখন কালীপ্রসন্ন বাবু “বঙ্গদর্শনে” পিতৃদেব-লিখিত “বৈজিকতত্ত্ব” সম্বন্ধে পিতার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রনাথ বাবু তাহাতে যোগ দিলেন। শেষে তিনি বরফ চাহিলেন। তখন কিন্তু বরফের ঠিক সময় নহে। সেটা কাক্সন মাস ছিল বোধ হয়। কাজেই বরফের ষোগাড় তেমন ছিল না। বাহা ইউক বরফ তখনই আনান গেল, কিন্তু রাখাল ও আমি কাকা-মহাশয়ের বিরক্তির কারণ হইলাম। কাকা বলিতেছিলেন, “এখন-কার ছেলেগুলো মানুষ নয়, রাখাল ত কেবল কথা শিখিয়াছে, আর যতশ যেন এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে; কাজেই উহাদের এসব দেখিবার আবশ্যক হয় না।” বলা বাহুল্য যে রাখাল ও আমি উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলাম; গতক দেখিয়া আমি নীরবে সরিয়া পড়িলাম, রাখাল কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি সব পেট ভরিয়া শুনিল। খাওয়া দাওয়া চুকিলে সে গজেন্দ্রগমনে আমার কাছে আসিয়া Hamletএর Soliloquy আওড়াইতে আরম্ভ করিল। শুনিয়াই আমি বুঝিলাম সে একটা কি মতলব আঁটিয়াছে। আমি হাসিয়া বলিলাম, “খবরদার”। সে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া বলিল, “রেখে দাও তোমার খবরদার; রাখাল বাঁড়ুর্ষ্যকে রাগান সহজ কথা নহে—old man কি দেখেনা, আমি কি করি।”

‘ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়।’ যেমন রাখালচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূর্ণ করিবার উপায় উপস্থিত ; পাঠক-মহারাজ সহসা আমাদের নিকট সশরীরে আবির্ভূত হইলেন। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল,—

“কিয়া খবর মহারাজ !”

পাঠক। এহি বাবু, বাড়ীকা খবর বহুৎ রোজসে নেহি মিলি।

রাখাল। মিলা নাই কেন ?

পা। আরে কিয়া জানে বাবু, চিট্টি লিখ্তা তো, লোকেন্ জবাব নেহি মিল্তা।

রা। তা, তার কর না কেন ?

পা। আরে বাবু, গরিব আদমি পয়সা কাঁহা মিলি ?

রা। তা বাড়ীর কি খবরের জন্ত এত ব্যস্ত ?

পা। হামারা মূলুকমে বহুৎ রোজসে পানি নেহি ভায়া ; গঁহ ভুট্টা সব্ একদম্ জল্ গেয়ী, খানা বেগর সর্ব্ আদমি মর্তা।

রা। উপায় ?

পা। ওহি এক্ হায়—কি হামারা চাচেরা ভাইকা বরমে গঁহ বহুৎ মোজুদ্ হায়। ও আগর্ হামারা বালবাচ্ছাকো খেলায় তো সব জিয়েগা নেহি তো—

বলিতে বলিতে পাঠক-মহারাজের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

রা। তা খেলাবে বৈ কি। তবে ভাবনা নেই।

পা। এ হি লিয়ে তো হাম্ উনকো দোঠো খৎ ভেজা, মগর জবাব্ নেহি মিলা ; কেয়া জানে, ভাইয়া কাঁহা রোজগার খাতির চলা গিয়া হোগা।

এই সময় রাখাল ভায়া যেন একটু চিন্তিত হইল। কণেক পরেই তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, একটা বেশ কিছু মতলব তাহার মাথায় আসিয়াছে। তখন রাখাল বলিল,—

“তা, ও সব খবর জানা ত কোনও শক্তি কথা নয়। ও ত তুমি কর্তাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পার।”

পা। কেয়সে বাবুসাহেব, কর্তাবাবুকা হামারা ঘরকা বাত্ কেয়সে মানুম হোয়েগা।

রাখান হাসিয়া উত্তর করিল, “আরে মহারাজ তুমি কেবল পূজা-পাঠ কর, এ সহজ কথাটা আর বোঝনা? কর্তাবাবুর কাছে কত বড় বড় খবরের কাগজ আসে দেখেছ ত?”

পা। হাঁ, হাঁ, আতা তো, হাম তো ও সব কর্তাবাবুকা টেবিল্ পর রাখতা হয়।

রা। তাতে দুনিয়ার সব খবর লেখা থাকে জান না?

পা। তব্ কিয়া হামারা ঘরকা খবর ভি উস্মে লিখা রহ্ তা?

রা। নয় ত কি? তোমার বাড়ী কি দুনিয়া ছাড়া?

পাঠক একটু ভাবিল—কথা ত ঠিক বটে; তাহার বাড়ী ত দুনিয়া ছাড়া নহে। সে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ বাবু; হামারা ঘরকা খবর কোন কাগজমে লিখ সক্তা বোলিয়ে, হাম ও কাগজ আপ্কা পাস পহিনেই লেআওয়েগা।

রা। না মহারাজ, তা করো না। তা হলে কর্তাবাবু গোসা হবেন।

পা। তব্ কর্তাবাবুকে পড়া হো যানেসে আপ্না পাস্ হাম ও কাগজ লেআওয়েঙ্গ?

রা। না, তাও না। কোন কাগজে কবে তোমার দেশের বাড়ীর কথা লেখা থাকে, তার ঠিকানা নেই; দশখানা পড়তে পড়তে একখানায় হয় ত পাওয়া যেতে পারে। আর যে সব কাগজ রোজ পড়ে, সেই জানে কোথায় কোন দেশের খবর থাকে; সে যেমন দরকার হলে বার করতে পারে, অশ্বে তেমন পারে না।

পা। আরে জামাইবাবু! তব্ হামারা কিয়া উপায় হোয়েগা?

রা। উপায় ত বল্লুম। কর্তাবাবুকে জিজ্ঞাসা করো। তিনি

যখন কাল সকালে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়বেন তখন জিজ্ঞাসা করো। আর দেখ, জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোসা হবেন, তোমাকে ধমক দিবেন, বকবেন। কারণ তাঁরে অনেক খুঁজে দেখে বলতে হবে; তা তুমি ভয় পেওনা, আর কিছুতেই ছেড় না। নেহাৎ তখন না বলেন, অশু দিন এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিও, সেদিন না বলেন, আর একদিন ধরে পড়ে।

পা। বহুৎ আচ্ছা, বাবু।

রা। আর দেখ, আমি যে একথা বলেছি, তা কর্তাবাবুকে কিছুতেই বলো না; বললে তোমার চাকুরি টুটবে। বুঝলে ত?

পা। আরে বা জামাইবাবু। হাম কিয়া বোকা হায়?

তখন আমি হাসিতে হাসিতে রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম, “পাঠক, তুমি কর্তাবাবুর কাছে যেও না। খবরের কাগজে তোমার বাড়ীর কোনও কথা লেখে না। মিথ্যা কথা।”

কিন্তু পাঠককে সে কথা বুঝান আমার সাধ্য কি! “জামাই-বাবু”র উপর তাহার অটল বিশ্বাস ছিল। আর “জামাইবাবু”কে সে তাহার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিত। তন্নিম্ন “জামাই-বাবু” মধ্যে মধ্যে মহাবীরের পূজা বলিয়া পাঠককে টাকাটা সিকাটাও দিতেন।

তখন রাখাল বলিল, “যতীশের ও কথা শুনো না, আর কেহ তোমাকে কিছু বলিলেও শুনো না। আর একথা কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা কর্তেও এস না। এস যদি, ভাল হবে না।” রাখালের উদ্দেশ্য, সে কোনও রকমে ধরা না পড়ে। তখন পাঠক-মহারাজ চলিয়া গেলে আমি রাখালকে বলিলাম, “রসো আমি তোমার নষ্টামি ভাবছি। আমি এখনই একথা বলে দিব।”

তখন রাখাল আমাকে অনুময় করিয়া একটা বড় কঠিন দিব্য দিল। শেষে বলিল, “ভাই, দুনিয়াটা আনন্দের জায়গা, যতদিন পার আনন্দ কর। এমন একটা মজায় কি ব্যাঘাত দিতে আছে?”

আমি কাজেই চুপ দিলাম। একটু মজা দেখিবার যে নিতান্ত ইচ্ছা ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না।

পরদিন সকালে কাকামহাশয় চা খাইয়া বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময়ে দীনভাবে পাঠক-মহারাজ তথায় দর্শন দিলেন। কাকা খবরের কাগজ হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন। পাঠক তখন নমস্কার করিলেন। কাকা প্রতি-নমস্কার করিয়া কথ-
কিৎ বিরক্তি-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিয়া?”

পাঠকের সেই শেখান কথা। তিনি বলিলেন, তাঁহার দেশে দুর্ভিক্ষ, বাড়ীর কোনও সংবাদ চিঠি লিখিলেও তিনি পান না। তা-
কাগজে তাঁহার বাড়ীর কথা কি লেখে, তাহাই তাঁহার জিজ্ঞাসা।

বৌবাজার দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেনের বলাইচাঁদ দত্ত তখন সেখানে বসিয়া একখানা কি কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি আমার বাপ-
খুড়ার বন্ধু ছিলেন। তিনি ত শুনিয়াই একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া অস্থির। কিন্তু কাকা মহাশয়? তাঁহার গম্ভীর মুখ সঙ্গে সঙ্গে আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি চীৎকার করিয়া হাতের কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পাঠক-মহারাজ ত একে-
বারে দৌড়।

যদি অপর কেহ হইত, তাহা হইলে বুকিত যে, ইহার ভিতর একটা কিছু রহস্য আছে, নহিলে এমনটা হয় না। কিন্তু কাকা অসঙ্গত কিছু, এমন কি এরূপ একটা জীবন্ত আহাম্মুকিও, দেখিলে কখনও কখনও হঠাৎ রাগিয়া উঠিতেন। তখন তাঁহার সে কথা ভাবিবারও অবসর থাকিত না।

যাহা হউক, সেদিন ত গেল। তাহার পরদিন কাকা আপিস হইতে আসিয়াছেন। গাড়ী তখনও গেটে দাঁড়াইয়া আছে। পাঠক যুক্তকরে আবার উপস্থিত; আবার তেমনিই চীৎকার, পাঠকের তেমনিই পলায়ন।

শেষে আর একদিন, রাত্রিতে সকলে চলিয়া যাইলেন, পাঠক

বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত। কিন্তু কাকা সেদিন বিনা বাক্যব্যয়ে বিরক্তি-সহকারে তখনই উপরে উঠিয়া যাইলেন।

ভাগ্যবলে তৎপরদিন পাঠকের দেশ হইতে চিঠি আসিল—সব খবর ভাল। পাঠকের মুখে আর হাসি ধরে না।

রাখাল ভায়া বলিল, “দেখিলে কেমন? ছেলেদের যেমন জুজুর ভয় দেখায় তেমনি জুজুর ভয়—না শুধু ভয় কেন, আন্ত জুজুই—দেখাইয়াছি। এখন বৈঠকখানা হইতে পলাইতে হয়। রাখাল বাঁড়ুয়োর উপর বুঝিয়া সৃজিয়া মন্তব্য পাস না করিলেই জুজু আসে।”

ইহার পর পাঠক আর আমাদের বাড়ীতে ছিলেন না।

কাকামহাশয়ের নভেলে হুঁসো পশ্চিমাদের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পাঠক এবং তাঁহার কদরের অপর দুই একজনই তাহার উদ্দীপক।

শ্রীজ্যোতিষ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

— —

চরিত-চিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র

১।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র লিখিতে বসিয়া আজ নব-পর্যায় বঙ্গ-দর্শনের শেষ সম্পাদক প্রিয়মুহূৎ শৈলেশচন্দ্রের কথা বারবার মনে পড়িতেছে। এক বৎসর হয় নাই, শৈলেশচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র লিখিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করেন। বহুদিন হইতেই তাঁর এই সাধ ছিল। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের চরিত-চিত্র প্রকাশিত হইবার পরেই, দু'চারিজন প্রাচীন ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি চরিতালেখ্য লিখিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠান। শৈলেশচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে ইতিপূর্বেই আমাকে এ কাজে হাত দিতে হইত। আজ শৈলেশচন্দ্র এলোকে নাই। তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই আমি তাঁর সাধের বঙ্কিম-চরিত-চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম।

নিজের সাধ এবং অপরের অনুরোধ সত্ত্বেও এতাবৎকাল বঙ্কিমের চরিতালেখ্য রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই; কারণ, সাহসে কুলাইয়া উঠে নাই। ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় না থাকিলে, কাহারও যথাযথ চরিতালেখ্য অঙ্কন করা সহজ নয়; সম্ভব কিনা তাহাই অনেক সময় সন্দেহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দু'চারবার সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু সে সামান্য পরিচয়ে মানুষকে চিনা যায় না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমকে বাঙ্গালাদেশের কে না জানে? বাল্য অতিক্রম করিতে না করিতেই, তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে আমারও পরিচয় আরম্ভ হয়। যে বয়সে আমাদের দেশে, পুত্র পিতার মিত্র হইয়া থাকে, সেই বয়সেই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় মাসে মাসে বঙ্কিমের মানস-সৃষ্টি সকলের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। বুকিতাম না, কিন্তু পড়িতাম। অথবা বুকিতাম নাই বা বলি কেমনে? আপনার অধিকার

অমুখ্যায়ী বাহা পড়িতাম, তাহা বুঝিতাম বই কি ? না বুঝিলে তাহাতে এমন রস পাইতাম না । আর দুর্গেশনন্দিনী কি কপাল-কুণ্ডলা, মৃণালিনী বা চন্দ্রশেখর, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহন্নাসুলের সভা কিম্বা উত্তররাম-চরিতের সমালোচনা, এগুলি ত স্কুল কালেজের পাঠ্য ছিল না যে বুঝি আর না বুঝি, রস পাই আর না পাই, স্টেটিক্সের থার্ড সিস্টেম অব পুলির (Third System of Pulley'র) মতন, “রোগী করত যৈসে ঔষধ পান,” তেন্নি করিয়া গলাধঃকরণ করিতেই হইত । স্কুলের বই ছাড়িয়া বন্ধিমের লেখা পড়িতাম । কালেজে আসিয়া,—তখন প্রেসিডেন্সী কালেজের এখনকার ঐশ্বর্য্যও ছিল না বন্ধনও ছিল না,—চারিদিকে খোলা মাঠ, আর মাঠের পরেই রাজপথের পরপারে যোগেশচন্দ্রের ক্যানিং লাইব্রেরী—কালেজ হইতে পালাইয়া, রাজকৃষ্ণবাবু ও হ্যাণ্ড সাহেবকে কাঁকি দিয়া, যোগেশবাবুর কৃপায়, তাঁর দোকানে বসিয়া, দিনের পর দিন বন্ধিমচন্দ্রের এই সকল রসসৃষ্টি প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতাম । রসবস্ত্ত কি, তখন ইহা জানিতাম না । সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিবার পাণ্ডিত্য এখনও জন্মায় নাই, তখন ত ছিলই না । তবে রস-পিয়াসটা প্রবলই ছিল । আর রসের জ্ঞান না থাকিলেও, সহজ রসানুভূতির শক্তিটা বিধাতা যেমন দিয়াছিলেন, সেইরূপই ছিল ; মানুষের শিক্ষার তাড়নায় তখনও তার বিচক্ষণতা জন্মায় নাই । বাহা ভাল লাগিত, তাহাকেই ভাল বলিতাম । বাহা ভাল লাগিত না, তাহাকেই মন্দ ভাবিতাম । বন্ধিমচন্দ্রের লেখার আর কি দোষগুণ আছে, জানি নাই, বুঝি নাই ; কিন্তু বড় মিষ্ট লাগিত, এ কথাটা এখনও মনে আছে । আর মিষ্ট লাগিত বলিয়াই সেগুলি খুবই পড়িতাম । যখন যেটি প্রকাশিত হইত, তখনই সেটি পড়িয়াছি । সে-পড়ার প্রভাব মন হইতে আজি পর্য্যন্ত ধুইয়া যায় নাই ।

সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যিক-চরিত্র

এরূপ ভাবে, বাঙ্গালাদেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ

লোকের মতন, আমিও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে আযৌবনই জানি-
 য়াছি। কিন্তু এ ত তাঁর বাহিরের দিক ; তাঁর সত্তার দিক নয়, তাঁর
 প্রকাশের দিকমাত্র। এ সকল তাঁর রূপ, স্বরূপ ত নয়। রূপের
 অন্তরালে স্বরূপটি সর্বদাই লুকাইয়া থাকে, সত্য। কিন্তু রূপের
 ভিতর দিয়া স্বরূপে যাওয়া যায় না। প্রকাশের ভিতরে বস্তুর বাহির-
 টাই দেখা যায়। রূপের মধ্যে স্বরূপের তটস্থ লক্ষণ মাত্র প্রকাশিত
 হয়। সৃষ্টিকে দেখিয়া স্রষ্টাকে ষতটুকু জানা যাইতে পারে, সাহিত্য-
 সৃষ্টির মধ্যেও সাহিত্যিককে ততটুকুই জানা সম্ভব। কিন্তু সৃষ্টি দেখিয়া
 স্রষ্টার সত্যজ্ঞানলাভ অসম্ভব। এ জ্ঞান পরোক্ষ, অপরোক্ষ নয়।
 ইহা অল্পবিস্তর অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের উপরে নহে।
 অনুমিত-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয় না ; প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের অপেক্ষা
 রাখে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি দেখিয়া তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ
 হয়, তাহা অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অনুমান সত্যও হইতে পারে,
 মিথ্যাও হইতে পারে। অনুমানের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করা
 যায় না। এইজন্য কেবল তাঁর গ্রন্থাদি পড়িয়া সাহিত্যিক বঙ্কিম-
 চন্দ্রের একটা স্ফুটন মনগড়া ছবি অঁকা সম্ভব হইলেও, সত্যকার
 মানুষটি যে তিনি কেমন ছিলেন, তার প্রতিকৃতি পরিস্ফুট করা সহজ
 ত নয়ই, সম্ভব কি না তাই সন্দেহ। এই মানুষটিকে ভাল করিয়া
 নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই। খালি গারে
 কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। খোলা প্রাণে কথাবার্তা কহিতে
 কখনও শুনি নাই। সুখেতে তিনি কতটা বিহ্বল, দুঃখেতে কতটা
 অবসন্ন হইতেন ; প্রাপ্তিতে তাঁর কতটা আনন্দ, অপ্রাপ্তিতে কতটা
 বিষাদ হইত ; প্রশংসায় কতটা কাঁপিয়া উঠিতেন, স্তুতিবাদে কতটা
 গলিয়া পড়িতেন, আবার অপ্রশংসায় ও নিন্দাতে কতটা উদ্ভ্র বা
 উত্তেজিত হইতেন ; সংসারের বহুবিধ সম্বন্ধে তিনি কখন কোন
 মূর্তি ধারণ করিতেন ;—এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে, দীর্ঘকাল ধরিয়া না
 দেখিলে, মানুষটি যে কেমন ছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া ধরা সম্ভব

নয়। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ লোকে সাহিত্যিক বন্ধিমচন্দ্রকেই কেবল একটু আধটু চিনে, মানুষ বন্ধিমচন্দ্রকে চিনে না। অথচ সেটিকে না চিনি, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির নিগূঢ় এবং বর্ধাৰ্থ মৰ্ম্মও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এইজন্যই সাহিত্য সমালোচনার, সাহিত্যিকের খাঁটি চরিত্রটি বর্ধাসম্ভব জানা ও ধরা এত আবশ্যক।

এই ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ কত অগণ্য যুগ হইতে তাঁহার এই বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া, তাঁহাকে বুঝিতে ও জানিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কিছু জানিয়াছে কি? অষ্টোতে আমরা যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণ আরোপ করিয়া তাঁহার স্তুতিবন্দনা করি, সৃষ্টিকার্যের আলোচনাতে তার পরিতোষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি? আমাদের প্রাচীন লোকাযতগণ, ইউরোপের আধুনিক যুক্তিবাদী ও জড়বাদীগণ—সকলেই এপথে ঘাইয়া, কেহবা প্রকাশ্য আর কেহবা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যে পৌঁছিয়াছেন। অষ্টোকে দয়াময় বল; সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন জীবন-সংগ্রামের শোণিত-প্রবাহে দয়ার চিহ্ন কোথায়? অষ্টোকে মঙ্গলময় বল, রোগশোক-পাপতাপ-জর্জরিত সংসারে মঙ্গলই বা কৈ? এই পথে ঈশ্বরজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে ঘাই-য়াই ইংরাজ মনোবী জন্ ফুয়ার্ট মিল—জগৎঅষ্টো সর্বমঙ্গলময় হইলে, সর্বশক্তিমান নহেন, কিম্বা সর্বশক্তিমান হইলে সর্বমঙ্গলময় নহেন,—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। সৃষ্টির ভিতরে তার সকল বিরোধের নিষ্পত্তি, তার সকল সমস্যার মীমাংসা, তার সকল সত্তার বা ক্রিয়ার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা না করিয়া, আত্মজ্ঞানের দ্বারা, অপরোক্ষানুভূতিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে পরে, সেই স্বরূপের সাহায্যে এই বিচিত্র বিশ্বরূপের মৰ্ম্মোদঘাটনে নিযুক্ত হইলেই কেবল সৃষ্টির সত্য অর্থ বুঝা সম্ভব হয়। সৃষ্টির দ্বারা অষ্টোকে সত্যভাবে জানা যায় না। অষ্টোর ভিতর দিয়া, তাঁর সৃষ্টিকে যিনি দেখিতে পারেন, কেবল তিনিই সৃষ্টি ও অষ্টো উভয়ের বর্ধাৰ্থ তত্ত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন।

জগৎস্রষ্টাকে যেমন করিয়া জানিতে হয়, সাহিত্যস্রষ্টাকেও সেইরূপ করিয়াই জানিতে হয়। আগে মানুষটিকে জানি, চিনি, বুঝি; তার পরে তিনি কি ভাবে কি করিয়াছেন, কি উদ্দেশ্যে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কি বলিতে চাহিয়াছেন, আর কতটাই বা তাহা বলিতে পারিয়াছেন, কোথায় তিনি পরিপূর্ণ সফলতা, কোথায় আংশিক সফলতা, আর কোথায় বা একান্ত নিষ্ফলতা লাভ করিয়াছেন; ইহা ধরিতে, বুঝিতে, এবং প্রমাণপ্রয়োগে অপরকে বুঝাইতে পারা যাইবে। ইহাই সাহিত্য-স্রষ্টার চরিতালেখ্য রচনার মুখ্য প্রয়োজন।

সাহিত্য ও জীবন।

স্রষ্টাকে না জানিলে, তাঁর সৃষ্টির সকল রহস্যভেদ ও সকল রসভোগ সম্ভব হয় না। সেইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া না জানিলে, তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যেরও সকল রহস্য-ভেদ ও সকল রস-সম্ভোগ করা যায় না। সাহিত্য-সমালোচনায়, সাহিত্যিকের জীবন-চরিতের বিচার ও আলোচনা এই কারণেই অতিশয় আবশ্যিক। অথচ লোকে অনেক সময় সাহিত্য পড়িতে বাইরা সাহিত্যিকের জীবনের খোঁজ করে না। এদেশে পুরাকাল হইতেই, মনে হয়, এ পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই; কোনও কালে হইয়া থাকিলেও, আমরা যে যুগের সাহিত্য-চর্চার সংবাদ পাইয়াছি, সেকালে তাহা লোপ পাইয়াছিল। এইজন্যই আমরা কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত, বা শকুন্তলার পঠন-পাঠন কালে, কালিদাস কোথাকার, কোন্ সময়ের, কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর সংসার-জীবন ও ধর্ম-সিক্কা কিসের ছিল, তাঁর নৈসর্গিক ও সামাজিক আধার ও আবেষ্টন বা এনভায়রন্মেন্টস্‌ই বা কি ছিল, কোন্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে তাঁর অলৌকিক কবিকল্পনা ফুটিয়া ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, তিনি হিমালয়ের কোন্ অংশের, কোন্ ছবির, কোন রূপের, কোন্ ভাবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, কোন্ বাস্তব ঘটনার বা রসানুভূতির উপরে তাঁর চিত্রিত কাব্যকলার অপূর্ব রস সকল

ক্ষুরিত ও উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়াছিল, এ সকল কোনও দিন জানিবার জন্ম ব্যাকুল হই নাই। তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে আমরা কেবল কল্পনারই খেলা দেখি ; দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কল্পনা যে সত্যকে ছাড়িয়া জন্মে না, একথাটা ভুলিয়া যাই। ভুলিয়া যাই বলিয়াই, বোধ হয়, কালিদাসের সকল কথার ভিতরকার মর্ম্মও সকল সময়ে ধরিতে পারি না। কালিদাসকে যদি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম, মানস-কল্পনাতেও যদি এই অমর-কবির একটি জীবন্ত চনস্ত প্রতিচ্ছবি আঁকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁর সৃষ্টিকল আমাদের চক্ষে একেবারে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিত। তাঁর হিমবৎ, তাঁর মেনকা, তাঁর মহাদেব, তাঁর পার্বতী, আমাদের নিকট কেবল আকাশের দেবতা হইয়াই চিরদিন পড়িয়া রহিতেন না, কিন্তু তাঁর এসকল কাব্য পড়িবার সময়, ইঁহারা ঘরের মানুষ হইয়া, চক্ষে চক্ষে চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেন। এখনও যতটুকু বুঝি ও সম্বোধন করি, তাহা ইঁহাদের অতিমানবতা নহে, মানবতা মাত্র। রতি-বিলাপের রতি, কামদেবের পত্নী নহেন ; কিন্তু আমাদের ঘরের, সমাজের, চিরপরিচিতা পতিবিরোগ-বিধুরা আদরিণী মাত্র। স্বামীর সোহাগে তাঁর পাতিব্রতের প্রকৃতি একান্ত স্বামীগত না হইয়া কতকটা আত্মগত হইয়া পড়িয়াছে। কত সোহাগিনী এইভাবে স্বামীতে আপনাকে ডুবাইতে না পারিয়া, স্বামীর গুণেই স্বামীকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতেছেন ! রতি চিত্ত-রোহণোদ্ভূতা হইয়াও আত্মস্থখাভিমানিনী। এ চিত্র কালিদাস কোথা হইতে পাইলেন, আমরা ঠিক জানি না। জানি না বলিয়াই, খুঁটি নাটি ধরিয়া তার কিচর-আলোচনাও করিতে পারি না। এই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের অভাবে, তার পরিপূর্ণ রসবোধও সম্ভব হয় না। সেইরূপ কোন মানবী কালিদাসের উমার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিচ্ছায়া ছিলেন, কোন মহাযোগী বা তাঁর মহাদেবকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কোন বিরহী তাঁর মেঘদূতের মূল-চরিত্র, কোন রাজাই বা তাঁর দুঃস্বপ্ন ও দিলীপ, কোন রমণীকে দেখিয়াই বা তিনি তাঁর শকুন্তলাকে আঁকিয়া-

ছেন, এসকলের কোনও সন্ধান আমরা রাখি না, জানি না ; কালিদাসের জীবনের কোন অঙ্কে, কি সম্বন্ধের ভিতরে এ সকল রস-মূর্তির মূল আদর্শ ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। এইজন্য তাঁর কাব্যকে আমরা কেবল বাহির হইতেই দেখি ; তাঁর কাব্যকলার অন্তঃপুরের খবর কিছুই রাখি না ও জানি না। যে প্রণালিতে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পুরাতন বাইবেলের কলা-সৃষ্টির ভিতর হইতে, প্রাচীন ইহুদীয় জাতির একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন, এদেশের প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের কবিকল্পনার ভিতর হইতে যদি কখনও কোনও ভারতীয় মনোবী, যে যে যুগে এসকল কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, তদন্ত-যুগের এক একটা স্বল্পবিস্তর প্রামাণ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস না হউক, অন্ততঃ এক একটা ঐতিহাসিক কাঠাম গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদির এবং কালিদাস প্রভৃতি কবিকুলগুরুগণের কাব্যসৃষ্টির মধ্যে আমরা এমন জ্ঞান, এমন রস, এমন সত্য, এমন ভাব ও উদ্দীপনা পাইব, যাহা এখন আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। কাব্যকে লোকে সচরাচর কেবল কল্পনার সৃষ্টি বলিয়াই মনে করে। কাব্যও যে বাস্তবকে ধরিয়া, বাস্তবকে ফুটাইয়া, বাস্তবকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করিয়াই আপনার নিজের সত্য ও সার্থকতা লাভ করে, একথা সকলে বুঝে না। সকল কবিও বুঝেন না, সকল পাঠকে বুঝিবে তবে কিরূপে ?

কাব্য কল্পিত সৃষ্টি নহে। শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেরই জীবনের অভিব্যক্তি। মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যেমন সমুদায় বিজ্ঞান বা সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা হয় ; এই অভিজ্ঞতার উপরেই যেমন যাব-

• আমাদের ভাষায় বিজ্ঞানের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে। যে জ্ঞানের উপরে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন, খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রহণের একত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকেই তুমি “ব্রহ্ম” বলিয়া জানিয়াছিলেন। বিজ্ঞান

ভীষ দার্শনিক তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত গড়িয়া উঠে ; সেইরূপ এই অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই সর্বপ্রকারের কবিকল্পনারও স্ফূরণ এবং বিকাশ হইয়া থাকে । এই অভিজ্ঞতা নইয়াই মানুষের জীবন । এই অভিজ্ঞতার দ্বারা বাহাকে ধরি ধরি, অথচ ধরিতে পারি না, এই অভিজ্ঞতার ভূমিতে বাহা ফোটে ফোটে- কিন্তু ফুটিয়া উঠে না, এই অভিজ্ঞতা বাহার আভাসমাত্র দেয়, কিন্তু বাহাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারে না, কবিকল্পনা তাহাকেই আর একটু পরিস্ফুট, আর একটু জ্ঞানগম্য, আর একটু রসানুভাব্য, আর একটু প্রত্যক্ষ করিয়া তুলে । কাব্যও এই অভিজ্ঞতারই অভিব্যক্তি । কবির অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি তাঁর কাব্য । সাহিত্য-স্রষ্টার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতির অভিব্যক্তি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি । শব্দ যেমন অর্থের অভিব্যক্তি, সার্থক শব্দ যেমন সত্য বস্তু বা সত্যতাবের অভিব্যক্তি, সাহিত্য-সৃষ্টিও সেইরূপ সাহিত্যিকের সত্যকার বহির্জীবনের ও অন্তর্জীবনের প্রতিচ্ছবি । শব্দার্থবোধ যেমন বস্তুজ্ঞানসাপেক্ষ, কাব্য-সৃষ্টির সত্যরসানুভূতি সেইরূপ কবির বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞানসাপেক্ষ । যে কবিকে জানে না, সে তাঁর কাব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারে না । সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টির সত্য ও নিগূঢ় মর্ম্মবোধের জন্য, তাঁর জীবন-চরিতের, তাঁর চরিতালেখ্যের ধ্যান একান্ত আবশ্যিক । ঐ চরিত্রই যে এই চিত্রের কলকাঠি ।

বন্ধিম-সাহিত্য বন্ধিম-চরিত্রের অভিব্যক্তি । ঐ চরিত্রকে যে না বুঝিল, এই সাহিত্যকে কখনওই সে সত্যভাবে বুঝিতে পারিবে না ।

বন্ধিম-চরিত্র-চিত্রের উপাদান ।

এই চরিত্র-চিত্রের মূল উপাদান বন্ধিমচন্দ্রের জীবন । কিন্তু এ

শব্দের এই বিশিষ্ট অর্থটি মনে করিয়াই, আজিকালি বাঙালি ভাষায় আমরা বাহাকে বিজ্ঞান বলি, তার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য, এখানে ইহার ইংরাজি প্রতিসম—সায়ন্স—Science কথাটা দিতে হইল ।

পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় নাই। বাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ-ভাবে, বিবিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে দেখিয়াছিলেন ও নানাদিক হইতে সে জটিল চরিত্রের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য বাঁহাদের ঘটিয়াছিল, “বঙ্কিম-মণ্ডলের” সে সকল সাহিত্যরথী প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। সেই পুণ্যস্থতির শলিতা হাতে লইয়া একমাত্র অক্ষয়বাবুই আমাদের সৌভাগ্যবলে এখনও বাঁচিয়া আছেন। অক্ষয়বাবু এ কাজ করিবেন, কিম্বা এই বয়সে, এই ভয়দেহে, তাহা করিতে পারিবেন কি না, জ্ঞানি না। কিন্তু এ কাজটি যিনিই করুন না কেন, যতদিন না বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি সর্বাসুন্দর জীবন-চরিত রচিত হইয়াছে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রালেখ্য-রচয়িতাকে নিজেই চারিদিক হইতে যথা-সাধ্য ও যথাসম্ভব তাঁর আলেখ্যের উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। এখনও একাজটা কিয়ৎপরিমাণে সহজসাধ্য আছে, আর কিছুদিন পরে অসাধ্য না হউক, অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। ফলতঃ এখনও আমাদের পক্ষে যত সহজ, আমাদের পুত্রস্থানীয়দের পক্ষে ততটা সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বয়সে অনেক কনিষ্ঠ হইলেও আমরা যে যুগে জন্মিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগেরই লোক। যে সকল সামাজিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল অবস্থার ভিতরেই, মোটের উপরে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও গড়িয়া উঠিয়াছে। যে সকল জ্ঞান ও ভাবের সংঘর্ষে, যে সকল আদর্শের প্রেরণায় তাঁর অমৃত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই সংঘর্ষের মধ্যে, সেই প্রেরণাতেই আমাদের জ্ঞানও প্রথমে ফুটিতে আরম্ভ করে। যে বিষম যুগ-সঙ্কীর্ণকালে, বিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তা-স্রোতের আবর্তে পড়িয়া, সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতিগতি ঘূর্ণিপাকে পতিত ভরণীর মতন বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছিল; আর যে কালে, যে আবর্তের মধ্যে স্বদেশের ও স্বজাতির চিন্তাতরণীকে স্থির রাখিবার জন্ত,

বঙ্কিমচন্দ্র আপনার বক্তৃষ্টিতে তার কর্ণধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া-
ছিলেন ; আমরা সেই যুগসন্ধি-সময়ে জন্মিয়া, সেই চিন্তাবর্তের
মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া, ডুবিয়া ভাসিয়া, বাড়িয়া উঠিয়াছি।
বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও, তাঁর
সাহিত্য-জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ
ও অপরোক্ষ সম্বন্ধ ছিল। এইজন্যই তাঁহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার
একটু আধটু অধিকার আছে বলিয়া মনে করি। কারণ এই পারি-
পার্শ্বিক অবস্থাটাই বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রলেখের মূল জমি। এটি
বুঝিতে পারিলে, তবে বঙ্কিম-চরিত্রের ও বঙ্কিম-সাহিত্যের বিকাশের
মূত্রটি ধরা সম্ভব হইবে।

চিরজীব বঙ্কিমচন্দ্র।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্কিম-
চন্দ্রের জীবদ্দশাতেই দিন দিন ইহা বদলাইয়া গিয়াছিল। দুর্গেশ-
নন্দিনীর রচনা-কালের আর আনন্দমঠের রচনা-কালের মধ্যে
ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর ঘটিয়াছিল।
এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আপনিও পরিবর্তিত
ও পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিন
আপনার পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে
যথাযোগ্য সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন নাই। কোনও দিন তিনি
কাল-স্রোতের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই। এইজন্যই মৃত্যুদিন
পর্যন্ত সত্য সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়াছিলেন। তিনি যে বয়ঃক্রম
পাইয়াছিলেন, সে বয়সের অনেক লোকই দেখি মরিবার বহুপূর্ব
হইতেই মৃত হইয়া যায়। সাহিত্য-জগতেও এ সকল জীবন্মূর্তের
সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, অস্তুতঃ
আধুনিক সময়ে, অতি অল্প লোকেই মরণকাল পর্যন্ত জীবিত
থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চাশ বৎসরকাল ইহলোকে ছিলেন। ইংরাজি-
শিক্ষিত, আচারপ্রকট, কর্ম-বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীর পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর

বাঁচিয়া থাকি, নিতান্ত সামান্য কথা নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুদিন পর্যন্ত জীবনের শক্তি ও যৌবনের দীপ্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। জীবন কেবল নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার শক্তিতে। যৌবন কালে নয়, রসানুভূতির সামর্থ্যে। এই দুইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুদিন পর্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এদেশের তিনজন চিন্তানায়ককে এইভাবে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। দুইজনকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজনের কথা শুনিয়াছি। এক রাজা রামমোহন, দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র। ইহাদের মধ্যে অশ্রুশ্রু বিষয়ে বিস্তর অভেদ ও পার্থক্য ছিল। কিন্তু তিনজনেরই জীবনী-শক্তি প্রায় সমান ছিল। তিনজনেই নিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ, নিত্য নূতন আদর্শ আয়ত্ত এবং নিত্য নূতন রস আশ্বাদন করিয়াছেন। ইহাদের তিনজনারই জীবন-শতদল দিন দিন নূতন বর্ণে ও নূতন তেজে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুদিন পর্যন্ত এ ফোটা থামে নাই। ইহাদের দৈবী প্রতিভার স্বরূপটি নিত্য নূতন অবস্থার ভিতরে, নিত্য নূতনরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তিশালী প্রতিভামাত্রেরই এইরূপ বহুরূপী। নূতন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, নূতন সাধনের আবিষ্কার, নূতন রসের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁরা অস্টার গুণ ও ধর্ম লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। অস্টা স্বয়ং যেমন সৃষ্টির জন্ম বহু হইয়া থাকেন,—“বহুশ্রাং প্রজায়েতি”—প্রজোৎপত্তির জন্ম বহুরূপ ধারণ করেন, দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন লোকোত্তরগণও সেইরূপই বহুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। রামমোহন একজন, না বহুজন, বলা কঠিন। “তহফুতুলে” যে রামমোহনের পরিচয় পাই, “বেদান্তসারে” তাঁহাকে চিনা যায় কি? পঞ্চোপনিষদের ভূমিকায় যে রামমোহনকে দেখি, “ব্রাহ্মণ-সেবধিতে”, খৃষ্টীয়ান পাদ্রিদিগের সহিত বিচারে, হিন্দুধর্মের পরিপোষক রামমোহন যে সেই রামমোহন, ইহা বলা কঠিন হয়। আবার *Three Appeals to*

the Christian Publicএতে আর এক রামমোহনকে দেখিতে পাই। ব্রহ্মসভার সঙ্গীতে—

স্বর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে

বিবেক বৈরাগ্য, দুই সহায়-সাধনে—

যে রামমোহনের পরিচয় পাই, বিলাতের রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠতম রস-মূর্ত্তি সকলের প্রতিষ্ঠাত্রী ইংরাজ-অভিনেত্রীদের কাব্যরসানুশীলননিপুণ রামমোহনে আর এক ভাব ও আর এক আদর্শ দেখিয়া থাকি। অথচ এসকল বহু রূপের ভিতরে একটি স্বরূপই, দেশকাল-পাত্রাদির দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া, নব নব মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেশবচন্দ্রের মধ্যেও এই অদ্ভুত বৈচিত্র্য, বিকাশ ও পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি। আদিব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র, ভারতবর্ষীয় সমাজের কেশবচন্দ্র, নববিধানের কেশবচন্দ্র, ঠিক একই ব্যক্তি কি না, কেবল বাহির হইতে বিচার করিয়া এ সন্দেহের নিরসন করা যায় না। আমরা তাঁহাকে একব্যক্তি বলিয়া দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, সেইজন্যই এ সন্দেহ আমাদের মনে উঠে না। সুদূর ভবিষ্যতে কেশব-সাহিত্য পুরাণে ও কেশব-চরিত্র কিম্বদন্তিতে পরিণত হইলে এই সমস্যা যে উঠিতে পারে না, বা উঠিবে না, এমন কথা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনী বা স্বর্ণালিনীর অঙ্ক। যে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহাকেই আবার কৃষ্ণচরিত্রের রচয়িতা বা গীতাধর্মের উপদেষ্টা বলিয়া চিনা কঠিন হয়। তাঁর চারিদিকের সামাজিক, মানসিক অবস্থার যেমন পরিবর্তন ও বিকাশ হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৈবপ্রভাও তেমনি, এ সকল পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া, নিত্য নূতন সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে জয়শ্রী কেবল সংগ্রাম-ক্রম প্রতিদ্বন্দ্বী বল-প্রহরণপটু শক্তিকেই বরণ করে না; দুর্দ্বর্ষ শক্তির সঙ্গে সুনিপুণ নীতি যেখানে সম্মিলিত হয়, সেইখানেই বিজয়লক্ষ্মী বীধা পড়িয়া রহেন। জীবনের সঙ্কেত কেবল প্রতিকূল শক্তির

প্রতিরোধের সামর্থ্যেই লুকাইয়া রহে না, সন্ধির কুশলতার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেবল সংগ্রাম করিতেই জানে, সন্ধি করিতে জানে না; যে কেবলই প্রতিবাদপরায়ণ, কিন্তু সমন্বয়পারগ নহে; তাহার পক্ষে জীবনসংগ্রাম কেবল অপচয়েরই কারণ হয়, অফুরন্ত উপচয়ের পন্থা হইয়া উঠে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবনে এই সন্ধির নিপুণতা, এই সমন্বয়ের সামর্থ্য, এই উপচয়ের কুশলতা বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই তাঁর মনীষার ও অদ্ভুত মানসিক শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই শক্তির বল্লেই তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একজন অনগ্রপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক হইয়া ছিলেন। মৃত্যুর পরেও ত প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিতে চলিল, কিন্তু বঙ্কিমের এই অধিনায়কত্ব এখনও লোপ পায় নাই; অপচিত হওয়া ত দূরের কথা, দিন দিন যেন বাড়িয়াই যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোরতর যুক্তিবাদী ছিলেন, সে যে যুক্তিবাদেরই যুগ ছিল। ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া ইউরোপের প্রবল যুক্তিবাদকে পরিহার করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মহর্ষিপদার্থ দেবেন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই; প্রবক্তা ধর্ম্মী কেশবচন্দ্র তাহা পারেন নাই, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র যে এ যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র দুইজনে স্বল্পাধিক অজ্ঞাতসারেই এই অভিনব যুক্তিবাদকে অন্তরে অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের আবরণে, ফলতঃ এই যুক্তিবাদকেই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃতিগত আন্তরিক্যবুদ্ধি, কতকটা ডিপ্লোমেসীর (diplomacy) পথেই যেন এই যুক্তিবাদের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া মিশাইয়া চলিয়াছিল; প্রকাশ্যভাবে তাহাকে একেবারে গ্রহণও করে নাই; অকুতোভয়ে সম্মুখসমরে তাহাকে বিধ্বস্ত করিতেও চেষ্টা করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যৌবনে ইউরোপের এই আধুনিক যুক্তিবাদকে আপনার অন্তরে অকুণ্ঠসহকারেই বরণ করিয়া

লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভয় কাহাকে বলে, বন্ধিমচন্দ্র ইহা জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। “পাছে লোকে কিছু বলে”—এ ভাবনা তাঁর কখনও ছিল বলিয়া বোঝা যায় না। না থাকারই কথা। ধর্ম-প্রবর্তক ও ধর্মোপদেষ্টার পক্ষে একান্তভাবে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয় না। প্রাচীন লোকমতকে অগ্রাহ্য করিয়া, যাহারা প্রথমে বীরদর্পে স্বাধীনতার নিশান হাতে লইয়া, নূতন সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে দণ্ডায়মান হন, তাঁরাও দু’দিন পরে, আপনাদের কর্মের ও ধর্মের—আপনাদের মিশনের—খাতিরে, নিজেদের দলের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। সমাজের আনুগত্য ছাড়িয়া অনেক সময়ই ইহাদিগকে নিজেদের দলের বা সম্প্রদায়ের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তিহাভিমান ও যুক্তিবাদ উভয়ই এখানে শেষে হার মানিয়া যায়। লোকনায়ক হইলেই লোকরঞ্জন করিতে হয়। যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তখনই তাহাকে আর প্রকাশ্যে চিন্তায় ও কর্মে, আচারে ও অনুষ্ঠানে বরণ করা সম্ভব হয় না। নিজের প্রতিপত্তি হানির ভয়ে না হউক, অস্তুতঃ লোকহিতার্থায়, ধর্মের খাতিরেই, অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

সাহিত্যের সন্ন্যাস।

কেবল যাঁরা খাঁটি সন্ন্যাসী তাঁরাই সর্বদা নিজের কাছে খাঁটি থাকিয়া চলিতে পারেন। আর পারেন যাঁরা খাঁটি কবি। যাঁরা নিজের রসেই নিজে ভোর, নিজের সৃষ্টিতেই নিবন্ধদৃষ্টি, নিজের সৃষ্টি-কলার অনুধ্যানে ও বহিঃ-প্রকাশেই যাঁরা আত্মারাম হইয়া রহেন, যাঁদের জীবনের সার্থকতা নিজের তৃপ্তিতে অপরের স্তুতিবাদে নহে, যাঁদের কর্মের সাফল্য সেই কর্মেরই মধ্যে যে আত্মপ্রকাশ হয় তাহাতে, বাহিরের প্রতিপত্তি-বিপত্তির মধ্যে নয়; সেই সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও, খাঁটি সন্ন্যাসী। অলৌকিক প্রতিভার একটা আত্মসম্ভাবিতভাব সর্বদাই থাকে। ইহা প্রকৃতপক্ষে আত্মসম্ভাবিতভাবও নহে, কিন্তু অনেক সময় ইহাকে

লোকে self-conceit বলিয়াই ভুল বুঝিয়া থাকে।^১ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা self-conceit নহে, self-confidence মাত্র। আপনার উপরে এই একান্ত নির্ভরটুকু, আপনার শক্তিতে—এই অটল আস্থাটুকু যার নাই, তাঁর কোনও প্রতিভা আছে বলিয়াই বিশ্বাস করা যায় না। ইহা অহঙ্কার নহে। প্রতিভা কি করিতে পারে যেমন জানে, কি করিতে পারে না, তাহাও তেগনি বুঝে। নিজের সাধ্যসাধ্যের জ্ঞান সাধারণ লোকেরই থাকে না, সেইজন্য তাহাদের অহঙ্কারও শোভা পায় না, বিনয়েরও কোনও দাম হয় না; দু'ই কল্পিত,—মিথ্যাভিমান এবং অলীকাভিনয় মাত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আত্মনির্ভর ও বিনয় দু'ই খাঁটি বস্তু। সত্য সত্যই একত্রে “উজ্জ্বলে মধুরে” মিলিয়া যায়, মিশিয়া রহে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই self-confidence তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভারই উপযোগী ছিল। এ ব্যক্তি কোনও দিন কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সমাজেরও মুখাপেক্ষী হন নাই, নিজে দল বাঁধিয়া, সেই দলের মতামতের ভিতরেও বাঁধা পড়েন নাই। নিজের মনে যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, নিজের বুদ্ধিতে যাহাকে যখন সঙ্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, নিজের প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি যখন যে পথে চলিতে চাহিয়াছে, অকুতোভয়ে, অকুণ্ঠসহকারে তাহাই বলিয়াছেন, তাহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই পথেই চলিয়াছেন। আর চলিয়াছেন মানুষের মতন, কৃমির মতন নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর মধ্যে বিস্তর দেখা গিয়াছে; কিন্তু কৃমি-প্রকৃতিস্থূলভ বক্রতা ও পিচ্ছিলতা কখনও লক্ষিত হয় নাই। ভিতরে ভিতরে এইরূপ একটা মুক্তভাব ছিল বলিয়াই, বঙ্কিমচন্দ্র এমন করিয়া আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও দিন চারিদিকের চিন্তার ও ভাবনার তরঙ্গপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তুণের মতন ভাসিয়া চলেন নাই, এই প্রবাহকে ঠেলিয়া তাহার তরঙ্গভঙ্গের উপরে •

উঠিয়া, তাহার মূল গতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াই, আপনি নিত্যনূতন রসে, নিত্যনূতন জ্ঞানে, নিত্যনূতন শক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকরা যেমন ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফুটিয়া উঠে, প্রত্যেক ঋতুর বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহাকে নিজের বিকাশ ও সার্থকতাসাধনে নিয়োগ করে; প্রত্যেক নূতন অবস্থার মধ্যে যাহা গ্রহণীয় তাহাকে গ্রহণ, যাহা বর্জনীয় তাহাকে বর্জন করিয়া অশুকূল ও প্রতিকূল উভয় শক্তিকেই আপনার বিকাশের উপযোগী করিয়া তুলে। শক্তিশালী মহাপুরুষেরাও নিজ নিজ অধিকারে তাহাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান না, অথবা ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া স্রোতের শক্তি ও সত্যতাকে মায়িক এবং অলীক বলিয়াও উড়াইয়া দেন না; কিন্তু তটস্থ হইয়া তাহার চাঞ্চল্যের ও অমঙ্গলের সম্বন্ধে ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করেন না, কিন্তু স্রোতের মাঝখানে যাইয়া, আপনার শক্তি ও নিপুণতার দ্বারা, তাহারই বেগে তাহাকে নিজের সার্থকতাসাধনে ও জনসমাজের ইষ্টপথে পরিচালিত করেন। বাঙ্গালাদেশের আধুনিক চিন্তার বিকাশে, ত্রিশচল্লিশ বৎসরকাল, বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদাই এই স্রোতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এই জন্মই অধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এমন অনন্ত প্রতিযোগী ও সর্বতোমুখী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথের স্থায় আধুনিক জ্ঞান ও ভাবস্রোতের আগে আগে তাঁহার দেবদত্ত শব্দ বাজাইয়া চলিয়া ছিলেন বলিয়াই, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, সকলের আগে তাঁর সময়কার নবশিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের আধুনিক চিন্তার ইতিহাসটি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। এই ইতিহাসটিই বঙ্কিম চরিতালেখ্যের মূল জমি। ঐ আলেখ্যাটিকে পরিস্ফুট করিতে হইলে আগে এই জমিটিকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলি। আবশ্যক।

• • কিন্তু জমির গুণ বুঝিবার আরও আগে বীজের বৈশিষ্ট্য এবং

শক্তিটা জানা প্রয়োজন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেই কথাই আগে
কহিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

:

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ঠাকুরদাস যুথোপাধ্যায়

[ঐযুক্ত হুশেন সমাজপতি মহাশয় ঠাকুরদাস বাবুর এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি
“নারায়ণে”র বঙ্কিম-সংখ্যার স্তম্ভ পাঠাইয়া আমাদেরকে
অমুগৃহীত করিয়াছেন—নাঃ সঃ।]

১২৯০ সালে, বঙ্কিমবাবুকে আমার দ্বিতীয় বার দেখার প্রায়
চৌদ্দ বৎসর পরে বঙ্গদেশের বহদূর হইতে আমরা এক কাগজ
বাহির করিয়াছিলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার; ব্যাপারটা কিছু
বিসদৃশও ছিল বটে। সে ব্যাপারের সহিত আমার বহু স্মৃতি বিজ-
ড়িত;—তাহা বরং বারাস্তরে বলিব; আপাততঃ তাহা হইতে বঙ্কিম-
বাবু সম্বন্ধীয় স্মৃতিটুকুই যথাসম্ভব ছাঁকিয়া লইতেছি।

আমাদের ঐ কাগজ বাহির হওয়ার প্রায় অব্যবহিত পরে হিন্দু-
ধর্ম্মান্দোলনের বা হিন্দুধর্ম্মের তথা-কথিত “পুনরুত্থান” উদ্দেশ্যিত
হয়। বঙ্কিমবাবুর লেখনী সেই সর্বপ্রথম স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মান্দোচনায়
প্রবৃত্ত। বঙ্কিমবাবুর নাম সংযুক্ত ও লেখনী নিযুক্ত হওয়াতে শিক্ষিত
সমাজে, বিশেষতঃ সাহিত্য-সমাজে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব অমুভূত
হইয়াছিল; এবং অপেক্ষাকৃত অল্পদিন মধ্যে ঐ আন্দোলন আত্ম-

সামর্থ্য প্রতিপন্ন করিতে পারগ হইয়াছিল; ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। ধর্ম্যালোচনা মুখে করিয়া “নবজীবন” ও “প্রচার” একই মাস মধ্যে উভয়ে আবির্ভূত হয়। অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে সেটা ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস। আমাদের পত্রখানা প্রকাশিত হইয়াছিল উহার কয়েক মাস পূর্বে, ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে। “নবজীবন” ও “প্রচার” ছিলেন মাসিক; আমাদের পত্রখানা হইয়াছিল পাক্ষিক; এবং সাহিত্যাদির সমালোচনাই ছিল তাহার সর্বপ্রধান লক্ষ্য। উক্ত আন্দোলনে এবং তদুপলক্ষে ‘নবজীবনাদি’ নূতন নূতন পত্রের আবির্ভাবে, বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি বড় বড় লোকের নূতন লাইনে নিয়মিত লেখনী চালনায়, আমরা সমালোচনার এক মহাসুযোগ পাইয়াছিলাম। আমরা সে সুযোগ যথাসাধ্য ছাড়ি নাই; সবিশেষ আগ্রহেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে আমি প্রথম ও পরোক্ষে বঙ্কিমবাবুর নিকট কিছু পরিচিত হই। আমরা প্রধান প্রধান পত্রের ও প্রবন্ধ মাত্রেরই সমালোচনা করিতাম; তাহার মধ্যে অবশ্য আসরের সর্বপ্রধান অধিনায়ক বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধগুলি বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের বিশিষ্ট বিশ্লেষণ ও সবিশেষ সমালোচনা করিতাম। সেগুলি সবই আমি নিজের লিখিতাম। প্রবন্ধে, প্যারায়, সারসংগ্রহে এবং সহযোগী সাহিত্য-অভিধেয় সন্দর্ভে সমালোচনার তীব্র তুফান ছুটিত। বঙ্কিমবাবুই হউন আর যিনিই হউন, বাগে পাইলে আমরা কাহাকেই ছাড়িয়া কথা কহিতাম না। তখন সাহিত্যালোচনার নবানুরাগ কিনা! সকলকেই মিঠা-কড়া বিলক্ষণ ছু’কথা শুনাইয়া দেওয়া বাইত। সমালোচনার আর আর বিষয়ের যতই অভাব থাকুক সাহসের সন্ধ্যাবটা সম্পূর্ণ মাত্রাতেই থাকিত। তবে শিষ্টাচার ও সভ্যতার সীমা সর্বথা উল্লঙ্ঘন করিতাম না; শ্রদ্ধেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কখনই কুণ্ঠিত হই নাই। সহৃদয়তা ভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনা সম্ভবে না, সৌভাগ্যক্রমে সে শিক্ষাটা অশ্রান্ত অনেক শিক্ষার অভাবসম্ভেও তখন হইয়াছিল।

বঙ্কিমবাবু, আমাদের ঐ পাদ্রিক পত্র, শুনিয়াছিলাম, প্রায়ই পাঠ করিতেন। তাঁহার নিজের প্রবন্ধের ও অতিমতের বিরুদ্ধ সমালোচনা উহাতে কখনও থাকিলেও বিরুদ্ধ হইতেন না; এবং অনেক দূর হইতে ও অশ্রের মুখে বেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বরং আমাদের উৎসাহিতই করিতেন; আমাদের অভিমত তাঁহার সপক্ষে বা বিপক্ষেই হউক, আমাদের সমালোচনা প্রণালীতে শ্রীত হইতেন; প্রশংসাও কিছু না করিয়াছিলেন, এমন নয়। আমাদের কোনও পরিচিত ব্যক্তির সহিত একদিন তাঁহার এ বিষয়ের কথা হওয়াতে, শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছিলেন,—“এঁরা বেশ করিয়াছেন; এরূপ একখানি পত্র থাকার খুব প্রয়োজন আছে।”

পুনঃ আর একদিন ‘পাদ্রিকের’ কথা উঠাতে বলিয়াছিলেন, শুনিয়াছি,—“অন্য কার্য্য করিতে করিতে; প্রতিপক্ষে এরূপ একখানি কাগজ বাহির করা কঠিন বটে; তা’ পাদ্রিককে মাসিক করিয়া ফেলুন না কেন? মাসিক করিতে বলিও।”

বলা আবশ্যক আমরা যে কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া এই পাদ্রিক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলাম, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আপিসে চাকুরি করিতাম। চাকুরি করিতে করিতেই এই পত্রের পরিচালনা করিতে হইত। তজ্জন্ম সকলেরই, বিশেষতঃ এই লেখকের প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। রাত্রিদিন খাটিয়াও কুল পাইতাম না। বঙ্কিমবাবুর কথা অনুসারে পাদ্রিককে মাসিক করিলে মন্দ হইত না; তাহাতে তত দোষও হইত না। বিলাতের “ফর্টনাইটলি রিভিউ” মাসে মাসেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা আমাদের পাদ্রিককে মাসিকে পরিবর্তিত করি নাই। ষত দিন ঐ পত্রের পরমায়ু ছিল, প্রতিপক্ষেই প্রকাশিত হইত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঠিক সেই সময়ে, অথবা তাহার কিছু পূর্বে বঙ্কিমবাবুর “দেবী চৌধুরাণী” প্রকাশিত হয়। আমি ঐ পুস্তকের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা করি। তাহা আমাদের পাদ্রিকেই

প্রকাশিত হয়। আর কোন কাগজেই দেবী চৌধুরাণীর অত বড় বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। ভূদেববাবু ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন এবং “এডুকেশন গেজেটে” “উচ্চ অঙ্গের সমালোচনা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহার পুস্তকের ঐ সমালোচনা দেখিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কোনও বন্ধুর নিকট সমালোচকের তত্ত্ব লইয়াছিলেন।

এইরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট আমি প্রথম পরিচিত হই। কিন্তু এ পরোক্ষ পরিচয়। তখন এবং তাহার পর বহু বৎসর পর্যন্ত বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। হইবার সম্ভাবনাই ছিল না; কারণ বিদেশে ছিলাম। দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরে কখনও সংবাদ জিজ্ঞাসাও হয় নাই। আমি উপরোক্ত পরোক্ষ পরিচয়ের কিঞ্চিৎ উন্নতি না করিতে পারিতাম এমন নহে; কিন্তু তাহা করি নাই। ঔদাসিন্য বশতঃ তাহা করি নাই; এমন কেহ বুঝিবেন না। বঙ্কিমবাবুর নিকট পরিচিত হইতে কাহার না একান্ত ইচ্ছা হইত? অতএব বলা বাহুল্য আমারও সে ইচ্ছা বিলক্ষণ বলবতী ছিল। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার কেমন একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং তাহা ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য তাঁহার অতুলনীয় রচনাবলীই আমাকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করে,—সে এক অনিবার্য আকর্ষণ। কত সময়ে কত লোকের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে নিন্দা-কুৎসার কথা শুনিয়াও আমি সে আকর্ষণ সম্বরণ করিতে পারি নাই। অতি দূরে, তাঁহার অপরিচিত ও অজ্ঞাত থাকিয়াও তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রকৃতই বলিতেছি, সে অনুরাগ হৃদয়ের অকৃত্রিম, অবিমিশ্র বস্তু। তাহার সহিত সংসারের স্বার্থস্বার্থের কিছু সংশ্রব ছিল না; তাহা পরিচয়ের প্রত্যাশা করিত না; বাক্যালাপের বা চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের জন্ত আদৌ ব্যস্ত ছিল না। বঙ্কিম-

বাবুর লেখাই আমাকে তাঁহার প্রতি অবিচলিতভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত রাখিতে প্রচুর ছিল। একজনের মানসিক শক্তি অপরকে এতাদৃশ বিমোহিত করিয়া রাখিতে পারে আমি অগ্রে জানিতাম না। এরূপ লুকাবস্থা যে ভাল তাহা আমি বলি না; কারণ ইহাতে সমালোচনার সুবিচারের ব্যাঘাত হয়। বঙ্কিমবাবুর সব লেখা, সমস্ত ভাব, যাবতীয় কল্পনা ও কবিত্ব-চিত্র, চরিত্র এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্য, সমুদয়ই যে আমি সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিতাম বা এখনও বুঝিতে পারি, এমত অহঙ্কার করি না। কিন্তু, তাঁহার নির্বাচিত প্রত্যেক অঙ্করই আমার মনের উপর কার্য করে, আমি যেন মত্ত-মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হই। ইহার একটি কথাও অতিরঞ্জিত নহে। বঙ্কিমবাবুর বার্কাক্যের বিনয়ের শ্রায় তাঁহার বোবনের ঈষৎ আত্মগরিমাও আমার নিকট উপাদেয়। আত্মগরিমা অতীব দূষণীয় ইহা আমি অবশ্য জানি এবং গানি, কিন্তু উহা বঙ্কিমবাবুর বলিয়া আমি মনে মনে উহার আদর করি। সমালোচকের শক্তি বা সুবিচার প্রদর্শনার্থে, বঙ্কিমবাবুর যাহা ভাল নয় বলিয়া হয় ত আমি সমালোচনা করিয়াছি, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহাও আমি অহরে অহরে ভালবাসি। অপর একটি লেখকের রচনা সম্বন্ধেও আমার ভালবাসা উপলক্ষে এই উক্তি বর্তে। কিন্তু এই সকল কথা এতটা খুলিয়া বলাতে হয় ত আমার আত্ম-অসঙ্গতি ও মনের অসামঞ্জস্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু তাহাতে আমি নাচার। যখন আমি আমার স্মৃতি ও স্বাভাবিক আনুরক্তির কথা ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি, তখন সব কথাই খুলিয়া বলিতে আমি বাধ্য। ফলতঃ ভাল বলা বা মন্দ বলার উপর ভালবাসাটা বড় বেশী নির্ভর করে না বলিয়াই আমার বোধ হয়। যাহা ভালবাস তাহা ভাল নয় বলিয়াও তুমি ভালবাসিতে বাধ্য। ভাল নয় বলিয়াই ভালবাসাতে “রোক শোধ” দেওয়া যায় না। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া আপন স্থান অধিকার করে। বড়ই আত্ম-রক্ষণক্ষম এই ভালবাসা। যাহা তুমি একবার সুন্দর বলিয়া দেখি-

গাছ, তাহা অসুন্দর করে সাধ্য কার ? সমালোচনার শত অন্ত্রাঘাতে, বিক্রপের ধারা-শ্রাবণ বর্ষণেও তুমি তাহা হইতে তোমার অনুভূত সৌন্দর্য্যের এক বিন্দুও বিনষ্ট করিতে পার না।

আমি বঙ্কিমবাবুর বিনয় অপেক্ষা তাঁহার বিক্রপকে বেশী ভালবাসি, কারণ শেষোক্তকেই সর্বাত্মে দেখিয়াছিলাম এবং সাহিত্যাংশে সুন্দর বলিয়া দেখিয়াছিলাম। পরন্তু, বঙ্কিমবাবু ইদানীং তাঁহার প্রথম জীবনের কোন কোনও লেখা পরিবর্জন করিয়াছিলেন ; তাহাতে আমি প্রীত হই নাই ; এবং বিষন্ন ও বিরক্তই হইয়াছিলাম। “সাম্য” শেষ অবস্থায় মারা পড়িল কেন ? বঙ্গদর্শনের শ্রীকৃষ্ণ-সমালোচনা ধ্বংস হইল কেন ? শেষাবস্থার শ্রীকৃষ্ণ সমালোচনা অত্যন্তকৃষ্ণ ও উপাদেয় হইলেও, প্রথমাবস্থার প্রবন্ধটির পরিবর্জন আমার পছন্দ হয় নাই। ইহা আমার—বঙ্কিমবাবুর জনৈক পাঠকের ও উপাসকের মনের খেয়াল মাত্র ; হয় ত আর কিছুই নহে। আগষ্ট কোমৎ শেষাবস্থায় আত্মমতের কতকাংশ পরিত্যাগ করায়, বঙ্কিমবাবু একদিন বঙ্গদর্শনে যে পরিতাপ করিয়াছিলেন, আমিও বঙ্কিমবাবু নিজের কোন কোনও রচনা প্রত্যাহার করায়, সেই পরিতাপ পুনঃ-কৃত করি।

বঙ্কিমবাবুর লেখা পড়িয়া বাঙ্গালা শিথিতে ও লিখিতে সাধ গিয়াছিল। তাঁহারই কথা আমার শ্রাব কীটগুকে সাহিত্যের সুবিশাল সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই লেখা হইতেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা সংগ্রহ করিয়াছিল, সাহিত্য-প্রীতি জন্মিয়াছিল ; সাহিত্যের সৌন্দর্য্যানুসন্ধান প্রণোদিত ও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নহিলে আমার মত মূর্থ লোকে কখনই সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিতে সাহসী হইত না। বঙ্কিমবাবু, তাঁহার উত্তরচরিত সমালোচনার একস্থানে লিখিয়াছিলেন, “যদি ইহার” (উত্তর সমালোচনার) “দ্বারা এক জন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাঁহার কাব্য-রস-গ্রাহিনী-শক্তির কিছুমাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল

বিবেচনা করিব।” এখানে আমার বলা আবশ্যিক যে বঙ্কিমবাবুর আকাঙ্ক্ষিত সেই “একজন পাঠক” আমি, অথবা আমি অনেকের মধ্যে একজন। বঙ্কিমবাবুর উক্ত সমালোচনা পাঠ করিয়াই আমি কাব্য-রসাস্বাদ-শক্তির অনুশীলন করি ও সমালোচনা-ভাষ্যের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই। সাহিত্য-শালায় বঙ্কিমবাবু আমার সর্বপ্রথম শিক্ষাগুরু; পরে দেশে বিদেশে বিস্তর শিক্ষক পাইয়াছি বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এবং (বোধ হয়) প্রধান শিক্ষক।

অতএব বলা বাহুল্য, বলা আদৌ অসম্ভব যে, বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিমাণ কি এবং প্রগাঢ়তা কত ছিল। কিন্তু তাহা যতই থাকুক আমি সে কথা কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই; বঙ্কিমবাবুর নিকট বলিয়া পাঠাইবারও প্রয়োজন বোধ করি নাই। বঙ্কিমবাবুর নিকট পরিচিত হইবার ইচ্ছা ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিকতর ইচ্ছা হইত তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার আলাপ ব্যবহার অধ্যয়ন করিতে। তবুও কিন্তু, উপরোক্ত পরোক্ষ পরিচয়ের উপর এক বিন্দুও উন্নতি করিতে পারি নাই। আসল কথা এই যে, “উপরপড়া” হইয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করা, আলাপ করা বা চিঠিপত্র লেখা আমার সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ। সেজন্যও বটে এবং উপরোক্ত যৎসামান্য উপলক্ষে তাঁহার নিকট আমার পরিচয় প্রশস্ত করা অযোগ্য বিবেচনায় তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু উহার কয়েক বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহারা বঙ্কিমবাবুর নিকট আমার পরিচয় পরোক্ষে আর একবিন্দু বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

পান্নিকে লেখা আরম্ভ করার সময় হইতেই আমার লেখার ঝোঁকটা সাংঘাতিক বাড়িয়া উঠিয়াছিল। (অসম্পূর্ণ)।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

ବକ୍ସିଂଚନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତଲିପି ।

ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ।

“ହେଁ, ଆଜି, ମତ୍ତ ବଳ ଲାଗି, ତୋର
ଲିଖିବି କି ? ହୁଏ ଆଜି ?”

ହେଁ, ଦୂର ଡାକି ଆସିବି-ହେଁ ବନ୍ଧୁ
ବିଷୟର ଲେଖିବି । ଅନ୍ଧାର ଦେଖ, ଲେଖିବି
ହେଁ ଡାକି ଆସିବି - ବହୁ ବାଣୀ ଲେଖିବି
ହେଁ ଲେଖିବି, ହେଁ ବାଣୀର ଅନ୍ତ
ହେଁ ବହୁ ଲେଖିବି ଲେଖିବି ଲେଖିବି
ହେଁ ବନ୍ଧୁ ହେଁ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟର ଲେଖିବି ।

ଆଜି ବହୁ ବାଣୀ ଲେଖିବି ଲେଖିବି
ହେଁ ବାଣୀର ଲେଖିବି ବାଣୀ ଲେଖିବି
ଲେଖିବି ଲେଖିବି ଲେଖିବି, ଲେଖିବି
ଲେଖିବି ଲେଖିବି, ଆଜି ବାଣୀ ଲେଖିବି
ହେଁ ବାଣୀର ଲେଖିବି, ବାଣୀ
ହେଁ ବାଣୀର ଲେଖିବି, ଲେଖିବି ଲେଖିବି

ସମା ସୁନ୍ଦର, ଅସ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କାଳ
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି/ ଗାନ୍ଧି, ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି, ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି, ଗାନ୍ଧି,
 "ଓଡ଼ ? ନା"

~~ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି~~
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି

ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି, "Lacome"
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି

"Lacome ? ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି
 "ଓଡ଼ ଗାନ୍ଧି - ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି

ହେଉ "କା" ଆମି ଚାଲିଯାଉ
 "ହୁଏ ? କା" ହୁଏ ? କେଉଁଠି
 ଚାଲିଯାଉ | କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉ |

ଅତରା ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ
 ଅତରା, ଏହି ଅତରା ଚାଲିଯାଉ
 ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ ନାହିଁ | "ହୁଏ ଚାଲିଯାଉ
 କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ | ଅତରା
 ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ, ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ
 ଚାଲିଯାଉ |

ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ, ଚାଲିଯାଉ
 ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ ?

କେଉଁଠି

କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ ?

କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ

କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ - ଅତରା

କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ - ଅତରା

କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ ?

କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ ଚାଲିଯାଉ

ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମର

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି - କିଛି

କାହିଁ କଥାଟା ଚାଲିଲା, କି କଥାଟା
କି ଚାଲିଲା କିଲିଲା,

“କିଲିଲା, କିଲିଲା କିଲିଲା,
- ୧୧୪ Philosophically true.

କେତଳି କଥାଟା “more human
heart possibilities of human-

tion” କଥାଟା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା,

୧୧୫ କି କଥାଟା କିଲିଲା କିଲିଲା,

- କେତଳି କିଲିଲା possibilities human

tion କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା

କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା

କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା,

୧୧୬ କିଲିଲା, କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା, କିଲିଲା possibilities

humanities କିଲିଲା

କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା possibilities

କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା.

କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା

୧୧୭ କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା

କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା କିଲିଲା

- ୧୩ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହୁ ?
 ୧୪ | ଆମିଷାସନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ?
 ୧୫ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ?
 ୧୬ | ନାହିଁ କି ?
 ୧୭ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ?
 ୧୮ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୧୯ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୦ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୧ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୨ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୩ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୪ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୫ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୬ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୭ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୮ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୨୯ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?
 ୩୦ | ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କହୁ ?



Not sentimental - ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱୀକୃତି ପାଏ ।

କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ ?
କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ ?

କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ ?
କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ ?

କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ -
କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ -
କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ -

କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ

କିମ୍ଭାବି ନାହିଁ